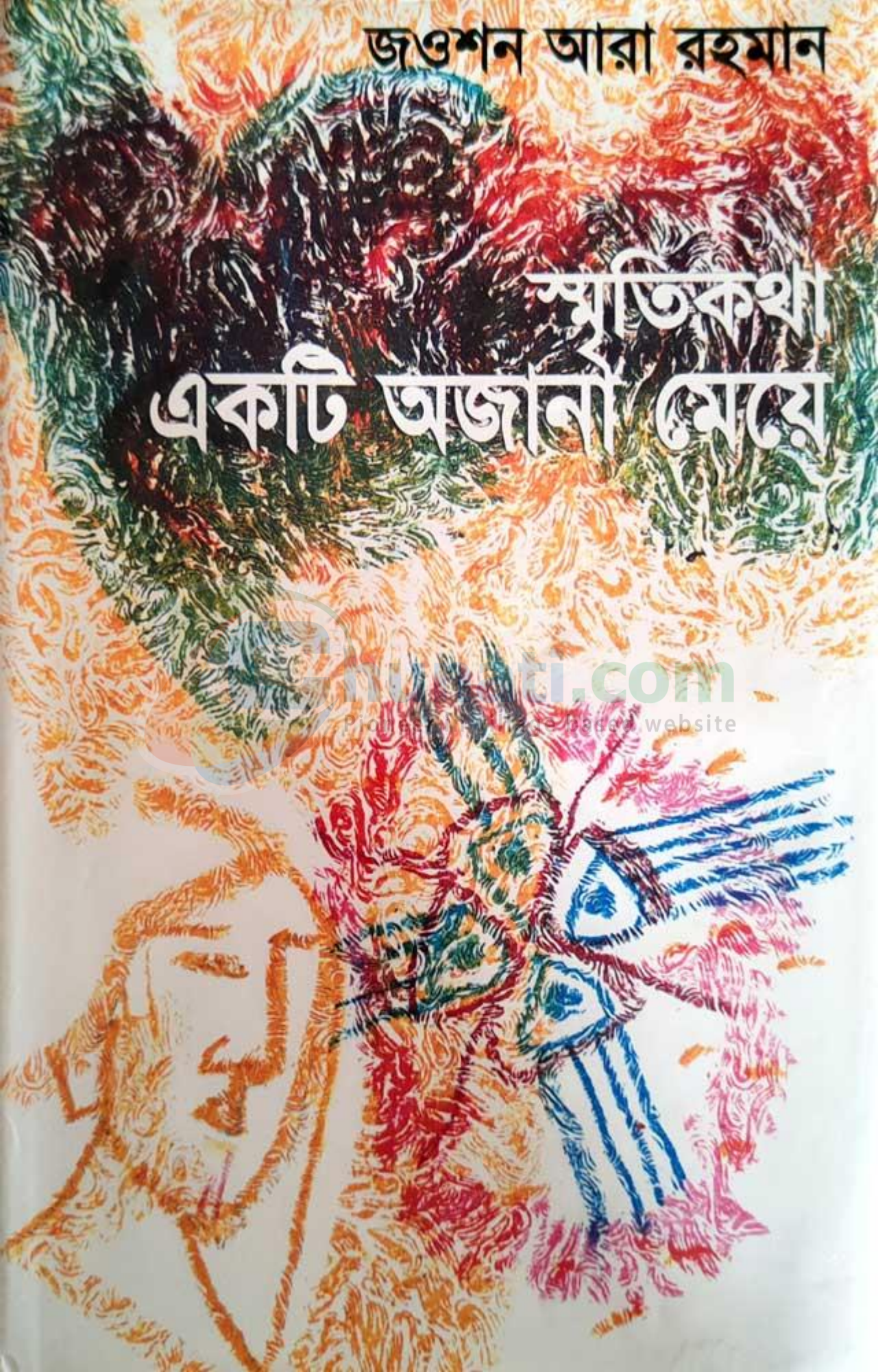
জওশন আরা রহমান

স্মৃতিকথা
একটি অজানা মেয়ে



amarboi.com
Powered by your personal digital library website

বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ জওশন আরা রহমানের কর্মময় জীবন। প্রথমে নারী-উন্নয়ন কর্মসূচি প্রধান এবং পরবর্তীতে প্রোগ্রাম-প্ল্যানিং সেকশনের প্রধান হিসেবে ইউনিসেফে সাড়ে সতেরো বছর কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করেন। এসব কর্মসূচিতে নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে তাঁর অবদান সর্বজন স্বীকৃত। এই সুদীর্ঘ সময়ে নারী উন্নয়ন এবং শিশু অধিকার বিষয়ে তার বিভিন্ন লেখা দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকায় ছাপানো হয়। এর আগে তৎকালীন সমাজকল্যাণ বিভাগে সাড়ে আঠারো বছর বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৬০ সালে চট্টগ্রামে শহর সমাজকল্যাণ অফিসার হিসেবে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। ডেপুটি ডাইরেক্টর হিসেবে ১৯৭৫ সালে গ্রামীণ সমাজকল্যাণ 'মাদার্স ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৯ সালে ইউনিসেফে যোগদান করেন।

তিনি লেখাপড়া, প্রশিক্ষণ, কনফারেন্স ইত্যাদিতে যোগদানের জন্য আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ইউরোপ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং এশিয়ার প্রায় ত্রিশটি দেশ ভ্রমণ করেন।

১৯ অক্টোবর ১৯৩৬, চট্টগ্রাম জেলার তৎকালীন সাতকানিয়া থানার চুনতী গ্রামে সম্ভ্রান্ত মুন্সেফ পরিবারে তার জন্ম। ১৯৫২ সালে চট্টগ্রাম শহরের বিখ্যাত ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা বিদ্যালয় থেকে বৃত্তিসহ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। পরীক্ষার ফল প্রকাশ হবার আগেই বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরীর সঙ্গে। বিয়ের পর নিয়মিত লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটে। চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে অধ্যায়নরত অবস্থায় ১৯৫৫-১৯৫৬ সালে চট্টগ্রাম কলেজ ছাত্র সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ সালে কলেজের বার্ষিক ম্যাগাজিন 'অন্বেষা' সম্পাদনা করেন। ১৯৫৭ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রী সংসদের চট্টগ্রাম জেলা শাখার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ সালে বি.এ পাস করেন। সমাজকল্যাণ বিভাগে চাকরিতে থাকাকালীন ১৯৬৪-১৯৬৫ সালে কলম্বোপ্ল্যান স্কলারশীপ নিয়ে দু'বছরের জন্য নিউজিল্যান্ডে যান। ওয়েলিংটনে ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে সোস্যাল সায়েন্স-এ পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৬৮ সালে চাকরিরত অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তৎকালীন ইনস্টিটিউট অব সোস্যাল ওয়েলফেয়ার থেকে এম. এ. পাস করেন।

অক্টোবর ১৯৯৬, ইউনিসেফ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে কনসালটেন্সি এবং বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে যুক্ত থেকে সময় কাটান। ১৯৯৭-২০০২ সালের পাঁচ বছর মেয়াদী 'National Action Plan for Children' প্রণয়নে তিনি টিম-লীডার হিসেবে কাজ করেন। বাংলাদেশের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় 'নারী উন্নয়ন' এবং পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় 'শিশু উন্নয়ন' ম্যাক্রো চ্যাপ্টার সংযোজনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

তিনি গ্রামীণ ট্রাস্টের উপদেষ্টা, গ্রামীণ-শিক্ষা পরিচালনা পরিষদের সদস্য, গণবিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও ট্রেজারার, কেমপেইন ফর পপুলার এডুকেশন-এর স্পনসারশীপে প্রকাশিত বাৎসরিক 'এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট'-এর এডভাইজরি বোর্ডের সদস্য। এছাড়া বহুবিধ উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে জড়িত আছেন।

Bhunati.com
Project of village based website

স্মৃতিকথা একটি অজানা মেয়ে

জওশন আরা রহমান

Shunati.com
Pioneer in village based website

নবযুগ প্রকাশনী
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী

© সাকিনা আহমেদ
ইশতিয়াক আহমেদ

Chhati.com
Pioneer in village based website

প্রথম প্রকাশ: ভাদ্র ১৪১২, আগস্ট ২০০৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ : পৌষ ১৪১৫, ডিসেম্বর ২০০৮
তৃতীয় মুদ্রণ : চৈত্র ১৪১৬, মার্চ ২০১০

মূল্য : ৩৮০.০০ টাকা

প্রকাশক : অশোক রায় নন্দী, নবযুগ প্রকাশনী, ৬৭ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ। মোবাইল : ০১৭১১-৫২১৯৯৮, ০১৭১৮-০৪১০৯৩
মুদ্রক : রুক্কু শাহ্ কম্পিউটার, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

SMRITI KATHA : Ekti Ajana Meya. Jowshan Ara Rahman
Published by Ashok Roy Nandi of Nabajuga Prokashani
67 Pari Das Road. Banglabazar. Dhaka-1100
Bangladesh. First Published : August 2005
2nd Print : December 2008. Tk. 380.00
3rd Print : March 2010
Cover : Qayyum Chowdhury.
ISBN : 978-984-8858-18-9

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধেয় মা এবং আব্বাকে
যাঁরা আমাকে দুর্গম পথে চলার সাহস যুগিয়েছিলেন

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস, ফজলে হাসান আবেদ
ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীকে
নারী উন্নয়নে তাঁদের অগ্রণী ভূমিকার জন্য

Chunati.com
Pioneer in village based website

আমার প্রিয় স্বামী মাহবুব উল আলম চৌধুরীকে
আমাকে একটা সুন্দর জীবন উপহার দেয়ার জন্য

আমার স্নেহের কন্যা সাফিনা (মুন্নি), জামাতা ইশতিয়াক
আমার দুই নাতি ইখতিসাদ ও ইবতিসামকে
আমাকে অশেষ প্রেরণা যোগাবার জন্য ॥

মুখবন্ধ

প্রতিটি ব্যক্তিই অনন্য। যত নগণ্য, যত অবহেলার পাত্র হোক না কেন প্রতিজন মানুষ তুলনাবিহীন। প্রতিজন মানুষের জীবনেতিহাস এক একটি অপূর্ব মহাকাব্য। শুধু প্রকাশের ক্ষমতা ও সুযোগ হয়ে ওঠে না বলে সেই অপূর্ব মহাকাব্য সকলের অজানা থেকে যায়। যাঁরা স্মৃতিকথা লিখে যেতে পারেন তাঁরা অতি সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। জওশন আরা তাঁদের একজন। অভিনন্দন জওশন আরাকে।

যাঁদেরকে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে চিনি তাঁদের স্মৃতিকথা পড়ার মধ্যে অনেক বিপদ। প্রথমত একটা বিরাট ধাক্কা খেতে হয় এরকম স্মৃতিকথা পড়তে গিয়ে। যাঁকে এতো ভালভাবে জানি মনে করতাম তাঁর বই পড়ে হঠাৎ অবাক হয়ে যেতে হয়। এই অতি পরিচিতের এতো কথা অজানা ছিল আমার। মনে মনে লজ্জা হয়। কেমন জানি সংকোচ বোধ হতে থাকে আবার নতুনভাবে পরিচিত হতে হচ্ছে বলে।

একজন মানুষ যত আপনজনই হোক না কেন তাঁর সঙ্গে পরিচয় আসলে অনেক টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতার যোগফল। সেই যোগফল যতই না ওজনে ভারী আমরা তাতে আমাদের কল্পনাশক্তি মিশিয়ে এটাকে তার চাইতে অনেকগুণ ভারী করে নিতে তৃপ্তি বোধ করি। যে সম্পর্কের ভিত্তিতে বা যে ভূমিকার কারণে আমরা অন্য একজনকে চিনি ততটুকুই আমাদের চেনা। এর বাইরে পড়ে থাকে মানুষটির বিশাল এক অস্তিত্ব। আমরা যদি জন্ম মুহূর্ত থেকে মানুষটির সারাজীবনকে সার্বক্ষণিকভাবে চলচ্চিত্রে ধারণ করে দেখতে পারতাম তাতে তাঁকে কিছুটা ভালভাবে জানার সুযোগ হতো বটে, তবু সম্পূর্ণ জানা হতো না। কারণ, তাঁর জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক কোনদিন চলচ্চিত্রে রেকর্ড করা সম্ভব হবে না। সেটি হলো তাঁর মনের রেকর্ডিং। সেখানে কী সব ঝড়তুফান চলছে, কী সব শলা পরামর্শ, ভাবনা, পরিকল্পনা চলছে সেটা উপস্থিত সৌম্যমূর্তি আপনজনকে দেখে কখনো বোঝার উপায় নেই। স্মৃতিকথায় তার কিছুটা প্রকাশ পেলে অপরিচিতির আরেক ধাক্কা আমাদের সামাল দিতে হয়।

জওশন আরার স্মৃতিকথা পড়তে গিয়ে এই রকম চিন্তাগুলি আবার মনে এসে ভিড় করলো। তিনি আমার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। আমার বহুদিনের বন্ধু এবং সহকর্মী। কিন্তু তাঁর স্মৃতিকথা পড়ে দেখলাম তাঁর জীবনের অতি সামান্য অংশই আমার জানা ছিল। এই বই পড়ে আবার নতুনভাবে তাঁকে চিনলাম। আগের পরিচয়ে তাঁকে আমি বরাবরই শ্রদ্ধা করে এসেছি। এবার নতুন পরিচয়ে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরো অনেক বেড়ে গেলো।

জওশন আরা চট্টগ্রামের মানুষের ক্রমবিকাশের ধারায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বিবর্তন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী। সেজন্য তাঁর স্মৃতিকথা এত বেশী আকর্ষণীয়। কোন মহাকবি কিংবা কালজয়ী ঔপন্যাসিক যদি বৃটিশ ভারত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলন, মুসলমান নবজাগরণ, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, হিন্দু-মুসলমান সংঘাত, বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী সম্পর্ক, সামাজিক বিপ্লব, মুক্তিযুদ্ধ, নারী আন্দোলন, আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার ভূমিকাকে ঘিরে একটি সুদীর্ঘ মাহকাব্য কিংবা উপন্যাস রচনা করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় চরিত্র খুঁজতেন, তাহলে জওশন আরাকে বাছাই করলে তিনি মোটেই ভুল করতেন না। তাঁর মাধ্যমে তিনি সব কিছুকে একই ক্যানভাসে নিয়ে আসতে পারতেন।

আমার সঙ্গে জওশন আরার পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা চট্টগ্রাম কলেজে। কলেজ বার্ষিকী 'অন্বেষা' প্রকাশনায় উৎসাহী কর্মীর ভূমিকায় ছিলাম আমি। জওশন আরা ছিলেন সম্পাদক। বার্ষিকী খুবই প্রশংসিত হলো। তারপর মাথায় এলো পত্রিকা বের করবো। বের করলাম। নাম দিলাম 'দু'পাতা'। সত্যি সত্যি দু'টি পাতার একটি পত্রিকা। জওশন আরা আর আমি যৌথভাবে সম্পাদনার দায়িত্ব নিলাম প্রথম সংখ্যার। সেই থেকে বহুদিন ধরে 'দু'পাতা' প্রকাশিত হয়েছে এবং চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্রদের মাতিয়ে রেখেছে।

জওশন আরার সঙ্গে দ্বিতীয় পর্বে যোগাযোগ গ্রামীণ ব্যাংককে ঘিরে। আমি জোবরা গ্রামে সবে ভূমিহীনদের বিনা জামানতে ঋণ দেয়া শুরু করেছি। ১৯৭৬-৭৮ সালে। জওশন আরা তখন ইউনিসেফে। তিনি আমার প্রকল্প দেখবেনই। দেখার পর ইউনিসেফ থেকে সাহায্য দেবার জন্য এগিয়ে আসলেন। আমি কয়েকটা কর্মশালা করার জন্য অল্প টাকা নিলাম। এই সম্পর্ক আর থামেনি। জওশন আরা গ্রামীণ ব্যাংকের সঙ্গে লেগে রইলেন। বললেন : আপনি যে কাজে টাকা চান আমি সে কাজে টাকা দেবার ব্যবস্থা করবো ইউনিসেফ থেকে। তিনি তাই করলেন। আমরা নানা রকম কর্মশালার কাজ হাতে নিলাম। ক্রমে মহিলাদের কর্মশালা গ্রামীণ ব্যাংক কার্যপদ্ধতির একটা অংশ হিসেবে দাঁড়িয়ে গেলো। তার থেকে জন্ম নিলো গ্রামীণ ব্যাংকের বিখ্যাত "ষোল সিদ্ধান্ত"। যৌতুক নেবো না, যৌতুক দেবো না, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করাবো, টিপকলের পানি খাবো, গর্ত করে পায়খানা বানাবো, সারা বছর সবজীর আবাদ করবো, চারা লাগানোর মৌসুমে চারা লাগাবো— ইত্যাদি। গ্রামীণ ব্যাংকের এখন ৩৫ লক্ষ সদস্য। এঁদের সবাই 'ষোল সিদ্ধান্ত' জানেন এবং এর বাস্তবায়নে তৎপর। তাঁদের জীবনে স্থায়ী প্রভাব ফেলেছে এই 'ষোল সিদ্ধান্ত'। এরই প্রভাবে গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের ছেলেমেয়েরা এখন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বৈজ্ঞানিক হয়ে বেরুচ্ছে।

আমরা শুরু থেকেই সদস্যদের জীবন কাহিনী সংগ্রহ করতাম। তাঁদের জীবনকে স্পষ্টতরভাবে অনুধাবন করার জন্য। এগুলি তাঁদেরই জবানীতে তাঁদের জীবন কথা। কিন্তু তাঁদের কথা শুনতে গিয়ে সমাজের চেহারা দেখে আৎকে উঠতে হয়। এক একটি কাহিনী এক একটি উপন্যাসের মতো। পত্রিকায় ছাপতে পারলে ভাল হতো। জওশন আরাকে ধরলাম— টাকা দিন এগুলির কয়েকটা একত্র করে বই বের করবো। জওশন

আরা রাজী হয়ে গেলেন। বের করলাম 'বেলতৈল গ্রামের জরিমন'। ১৯৮২ সালে। এরপর থেকে বহুবার পুনর্মুদ্রিত হয়েছে বইটি। গ্রামীণ ব্যাংক সম্বন্ধে যাঁরা জানতে চান, যাঁরা বাংলাদেশের দারিদ্র্য সম্বন্ধে বুঝতে চান, গরীব মহিলাদের জীবন সম্বন্ধে ধারণা পেতে চান তাঁদের জন্য এই বই একটি অমূল্য সংগ্রহ।

অনেকে বললেন এ বইয়ের ইংরেজী সংস্করণ হওয়া দরকার। আবার জওশন আরার শরণাপন্ন হলাম। তিনি আগের মতই উৎসাহে এগিয়ে এলেন। এবার প্রকাশিত হলো "Jorimon and Others — Faces of Poverty", ১৯৮৪ সালে। একটি সমাদৃত গ্রন্থ হিসেবে এটা এখনো তার পরিচিতি অক্ষুণ্ন রেখেছে।

কোন দাতা সংস্থার অনুদান নেবার পাঠ গ্রামীণ ব্যাংক বহুকাল আগে সমাপ্ত করে দিয়েছে। সে কারণে ইউনিসেফের সঙ্গেও ব্যাংকের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু জওশন আরার সঙ্গে আমাদের বন্ধন স্থায়ী। তিনি এখনো আমাদের সহকর্মীদের কাছে অতি পরিচিত। তিনি নানা গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজেকে সেচ্ছাসেবী হিসেবে জড়িয়ে রেখেছেন। বাংলাদেশের নারী জীবনে পরিবর্তন আনার ব্রতে তিনি যে কতো আন্তরিকভাবে ব্রতী অবসর জীবনে তাঁর ব্যস্ততার পরিমাপ নিলেই সেটা বোঝা যায়।

জওশন আরার স্মৃতিকথা বাংলাদেশের নারীজীবনকে একবিংশ শতাব্দীর মর্যাদায় গড়ে তোলার কাজে সবাইকে উদ্যোগী করে তুলুক এই কামনা করছি।

Ghurati.com
Pioneer in village based website

ঢাকা
মে ১, ২০০৫

মুহাম্মদ ইউনূস

আমার কথা

মানুষের জীবন ঘটনাবহুল। দুঃখ এবং আনন্দভরা এ জীবন ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু জীবনে যা ঘটে যায় তা মনের মাঝে স্থায়ী আসন গেঁড়ে বসে। আমার কিছু স্মৃতি, কিছু শঙ্কা, কিছু মনোভাব এই বইয়ের মাধ্যমে ধরে রাখার প্রয়াস পেয়েছি। ব্যক্তিগত জীবনের কিছু স্মৃতিচারণ করেছি। বিয়ের আগে এবং পরে চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে বিভিন্নভাবে জড়িত থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম। তারও কিছু কিছু স্মৃতি-চিত্র এখানে উল্লেখ করেছি। আবার পেশাগত জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথাও বলেছি। আমার শৈশবকাল, ছাত্র জীবন, বিবাহিত জীবন এবং পেশাগত জীবনের যে সব স্মৃতি আমাকে আলোড়িত করেছে, সেই সব খণ্ড খণ্ড চিত্র এর মাঝে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

ঘটনাগুলো ধারাবাহিকভাবে লেখা হয়নি। সেভাবে বইতে সাজাতেও পারিনি। এটা আমার আত্মজীবনী নয়, জীবন ইতিহাসের কিছু খণ্ড চিত্র যা আমার স্মৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে।

Pioneer in village based website

১৯৬০ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত তৎকালীন সমাজকল্যাণ বিভাগের বিভিন্ন শাখায় কাজ করেছি। ১৯৭৯ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত ইউনিসেফে নারী উন্নয়ন এবং প্রোগ্রাম প্ল্যানিং-এ কাজ করেছি। সরকারি এবং ইউ.এন সিস্টেমে সুদীর্ঘ ছত্রিশ বছরের কর্মজীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, চড়াই-উতরাই পার হয়ে আজ আমি অবসরপ্রাপ্ত। কিন্তু আমার সংগ্রাম এখনও থামে নি। নারী উন্নয়ন এবং শিশু উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাধ্যমত কাজ করে চলেছি।

ষাট দশকে চাকরি জীবন শুরু করে আমার মতো একজন নারীকে কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং কী কর্মকৌশল অবলম্বন করে তার মোকাবিলা করতে হয়েছে, এর কিছুটা আভাস দিয়েছি। আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তৎকালীন নারীদের সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে।

জীবনের সাধনা সত্যের সাধনা। এই সত্যের সাধনায় ব্রতী হতে গিয়ে কখনো কখনো বাস্তবের রূঢ়তায় জর্জরিত হয়েছি। কিন্তু হাল ছাড়িনি। নিজেকে ক্লান্ত অনুভব করার সুযোগ দিই নি। সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চেয়েছি। সত্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে আমাকে কঠোর হতে হয়েছে। জনগণের জন্য কাজ করতে গিয়ে সবসময় জনগণের হয়ে উঠতে পারিনি। এই অক্ষমতার জন্য মনের মাঝে দারুণ পীড়া অনুভব করি।

আমার বড় নাতি ইখতিসাদের সাথে আমার চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে একদিন গল্প করছিলাম। ১৯৯৮ সালের শেষের দিকে। তখন তার বয়স ছিল চৌদ্দ। সে-ই প্রথমবারের মতো আমাকে অনুপ্রাণিত করে এই বই লেখার জন্য। বলেছিল, নানিমা তোমার এই বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার কথা লেখা দরকার। আমরা বড় হলে জানতে পারবো সে যুগে তোমাদের মতো নারীরা কিভাবে জীবনযাপন করতেন। তার এই শিশুসুলভ অথচ মূল্যবান কথাগুলো শুনে সেদিনই কাগজ কলম নিয়ে বসেছিলাম শৈশবের স্মৃতিচারণ করতে। ২০০২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত কিছু কিছু লিখেছি। পরিমার্জন এবং পরিবর্ধনের কাজ করেছি ২০০৩ সালেও। চার বছরের টুকরো টুকরো লেখা দিয়ে এই বইয়ের সমাপ্তি। বিভিন্ন ঘটনা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বস্তুনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করেছি। অজ্ঞতাবশত যদি কোন ভুল-ভ্রান্তি হয়ে থাকে, এরজন্য সকলের কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী।

আমার স্বামী মাহবুব উল আলম চৌধুরী এই বই লেখা এবং প্রকাশনার ব্যাপারে আমাকে প্রতিনিয়ত সার্বিকভাবে সাহায্য করেছে। তার কথা বহু ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছি। যেহেতু স্বামী-স্ত্রী অভিন্ন জীবন যাত্রার পথিক তাই আমার কথা বলতে গিয়ে তার ঘটনাবহুল জীবনের কথাও অনেক সময় লেখায় এসে গেছে।

নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত কয়েকটি পরিচ্ছেদ যেমন দাতা সংস্থার উইড নেটওয়ার্ক, লোকাল কনসালটেটিভ সাব গ্রুপ অন উইড, জয়েন্ট গভর্নমেন্ট-ফরেন ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্স টাস্কফোর্স অন উইড, উইড ফোকাল পয়েন্ট, বিশেষ করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রথম নারী উন্নয়ন এবং শিশু উন্নয়ন বিষয়ক ম্যাক্রো চ্যাপটারগুলোর খসড়া আমার অনুজপ্রতিম শিরীন হককে কয়েকবার পড়ে শুনিয়েছি। তার উপাত্তপূর্ণ পরামর্শ কৃতজ্ঞতাভরে গ্রহণ করেছি। এই কাজগুলো করার সময় ও আমার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল।

Pioneer in Village based website

আমাদের বন্ধু জাহেদ হোসেন এবং আমার ছোট বোন জাহানারা ইসলাম বিভিন্ন সময় মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছে। আমার মেয়ে মুন্নি, জামাতা ইশতিয়াক এবং আমার ছোট নাতি ইবতিসাম আমাকে সব সময় উৎসাহ দিয়েছে। আমার সাথে তাল মিলিয়ে অশেষ ধৈর্য সহকারে এই বইয়ের খসড়া বহুদিন ধরে কম্পিউটারে কম্পোজ করেছে মোকতাদুল হক। তাদের সকলের সহযোগিতা ছাড়া এই বই লেখা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না।

এই বইয়ের মুখবন্ধ লিখে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন আমার কলেজ জীবনের সহকর্মী, গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ও কিংবদন্তি পুরুষ প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক মফিদুল হক এবং 'কালি ও কলম'-এর সম্পাদক আবুল হাসনাত এই বই প্রকাশের ব্যাপারে আমাকে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। আমার স্নেহভাজন রেজাউল হায়দার এবং অশোক রায় নন্দী আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। সর্বোপরি যাঁরা আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, অনুপ্রাণিত করেছেন তাঁদের প্রতি জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা।

জওশন আরা রহমান
উত্তরা, ঢাকা

লেখাক্রম

আমার শৈশব ১৫-২৩

পুকুর পাড়ের কালো মেয়ে ১৫
আব্বার আটটি অট্টালিকা ১৮
মালেকা ও ছেনু : দু'জন গৃহকর্মী ২২

শিক্ষা জীবনের শুরু ২৪-৩২

লেখাপড়ায় গুটিকয় মুসলিম মেয়ে ২৪
খাস্তগীর স্কুলে ২৮

বিয়ের প্রস্তাব ও আমার বিদ্রোহ ৪১-৫৬

বিয়ের প্রস্তাবে আমার বিদ্রোহ ৪১
প্রথম দেখা ৪৪
প্রথম প্রেম ৪৫
সিদ্ধান্ত নিলেন বড় ভাই ৪৭
বিয়ের অনুষ্ঠান এবং আমার নেকলেস ৪৯
শ্বশুর বাড়িতে এক বছর ৫১

বিপন্ন সময় ৪৭-৬৪

কদমমোবারকে বিপন্ন সময় ৫৭
দুর্দিনে পিত্রালয়ে ৬০
কৃষ্টিকেন্দ্রের জন্ম ৬৩

কলেজ জীবন ৭৩-৮২

মেয়েরা বিচ্ছিন্ন দ্বীপবাসি ৭৩
চড়ের মূল্য সাতচল্লিশ হাজার টাকা ৭৮
বাসায় নবীনদের আড্ডা ৮০

সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ৮৩-৮৮

ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন ৮৩
বাড়িতে পয়লা বৈশাখ ৮৫

Chunati.com
Pioneer in village based website

কতিপয় শ্রদ্ধেয় সুহৃদ ৮৯-১০১
শিখার চিঠি ৮৯
ইংরেজ বন্ধু রবার্ট ক্রস ৯১
নিরভিমান বৈদ্যনাথ মিত্র ৯২
অগ্রজপ্রতিম সুচরিত চৌধুরী ৯৩
সাংবাদিক দেবপ্রিয় বড়ুয়া ৯৩
চট্টগ্রামে প্রফেসর মফিজুল ইসলাম ৯৫
সুহৃদ জাহেদ হোসেন ৯৫
চট্টগ্রামের কৃতী সন্তান আহসাবউদ্দীন ৯৫
মানবতাবাদী শরদিন্দু দস্তিদার ৯৬
শ্রদ্ধাভাজন কল্পতরু সেনগুপ্ত ৯৭
গোপাল বিশ্বাসের বিয়ে ৯৮
বন্ধুবৎসল হাসানাত আবদুল হাই ১০০
শিল্পী কামরুল হাসান ১০০

চাকরি জীবনের শুরু ১০২-১১৭
স্বল্প সংখ্যক গ্রাজুয়েট মেয়ে ১০২
একটি চেয়ার দখল ১০৩
জামালখান বস্তি এলাকায় ১০৪
সুইপারদের সম্পর্কে ধারণা পরিবর্তন ১০৭
আমার পেশা, না সন্তান ১০৮
শাড়ির আঁচলের নিচে চারটি ডিম ১০৮
আবারও কন্যা সন্তান ১১০
চট্টগ্রামে আপোয়া ১১১
স্যোস্যাল ওয়েলফেয়ার ইনস্টিটিউটে ১১২
সব ছাপিয়ে স্নেহ-মায়া-মমতা ১৬

প্রথম বিদেশ যাত্রা ১১৮-১২৮
তরুণীর একা বিদেশ যাত্রা ১১৮
প্রফেসর মিনের মহানুভবতা ১২০
দেশ থেকে প্রথম চিঠি ১২২
বাঙালি হিসেবে গর্ববোধ ১২৫
ক্রাইস্টচার্চে : পারাঠা এ জীবন চায় না ১২৭

কর্মক্ষেত্রে নারী ১২৯-১৪২
আমার গাড়ি চালানো বন্ধ ১২৯
ড্রাইভার সালেহা ১২৯
মেয়েদের প্রমোশন : নির্দেশ এলো না ১৩৩

bunati.com
Pioneer in Village based website

পুরুষ সহকর্মীদের আস্থা অর্জন ১৩৫
বোরখা না পরার বিড়ম্বনা ১৩৭
অভুক্ত শিশুর স্নেহশীল পিতা ১৩৮
সরকারি সনাতনী নিয়ম ১৪০

মহৎজনের সান্নিধ্যে ১৪৩-১৫৭
সুফিয়া কামাল : মামানিকে যেমন দেখেছি ১৪৩
কনিকা বন্দোপাধ্যায় : একটি সুখস্মৃতি ১৪৭
বাড়িতে কাজী মোতাহার হোসেন ১৪৯
আবুল ফজল ও অভিমানী মাহবুব ১৫১

মুক্তিযুদ্ধ : রুদ্ধশ্বাস নয়মাস ১৫৮-১৬৭
চট্টগ্রাম শহর ত্যাগ ১৫৮
গ্রামে গ্রামান্তরে ১৬০
মাহবুবকে আশ্রয় দিতে ভয় ১৬২
ঝুঁকি নিয়ে আবার কর্মস্থলে ১৬৪
নব প্রত্যয়ে সঞ্জীবিত ১৬৫
সেলাই মেশিন এবং রিলিফের কাপড় ১৬৬

ঢাকায় বদলি ১৬৮-১৮৭
সুযোগ বারবার আসে না ১৬৮
বন্ধু গোষ্ঠীর সৃষ্টি ১৭০
স্থায়ী বাসিন্দা হলাম ১৭৫
ডা. ইব্রাহীমের সান্নিধ্যে ১৭৭
কয়েকটি মাতৃকেন্দ্রের স্মৃতি ১৭৯
চাকমাদের নিজস্ব প্রথা ১৭৯
গোপালপুরে বিশ্বব্যাংক টিম ১৮২
প্রাইমারি স্কুলে রাত্রিযাপন ১৮৩
ছনকা মাতৃকেন্দ্রে বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট ১৮৩

আমেরিকায় ১৮৮-১৯৩
বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ম্যাকনামারার সাথে সাক্ষাৎ ১৮৮
মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটিতে কিছুক্ষণ ১৯০
স্টেনফার্ড ইউনিভার্সিটিতে একদিন ১৯০
কতিপয় বৃদ্ধের নিঃসঙ্গ জীবন ১৯১

জাপানে ১৯৪-২০১
পশ্চাদগামিতার দ্বাররুদ্ধ ১৯৪
লেকচার ট্যুর ১৯৯

Ehunati.com
Pioneer in village based website

কানাডায় টুয়েন্টি-টুয়েন্টি সিমপোজিয়াম ২০২-২০৫
প্রফেসর রেহমান সোবহানের আশাবাদী বক্তব্য ২০২
শৈশবের লালিত একটি ইচ্ছা ২০৪

নারী এবং সামাজিক নির্যাতন ২০৬-২১৬
লন্ডনের বারনারী প্রসঙ্গে ২০৬
মেয়েদের জীবন ও সামাজিক কুসংস্কার ২০৮
একটি মেয়ে শিশুর সাথে কিছুক্ষণ ২১০
কিশোরীদের অগ্রযাত্রা ২১৩

নারীর মাতৃত্ববোধ ২১৭-২২৪
জীবনের কোন এক সময় নারী মা হতে চায় ২১৭
একমাত্র শিশুকে গড়ে তোলা কষ্টকর ২২১

মনুষ্যত্ব ২৩৩-২৩৬
মনুষ্যত্ব তখনো বিলুপ্ত হয় নি ২৩৩
এসিড সন্ত্রাস ও প্রথম আলো সহায়ক তহবিল ২৩৪

ইউনিসেফে সাড়ে সতেরো বছর ২৩৭-২৯৫
রিনীর দীর্ঘ প্রতীক্ষা ২৩৭
ইউনিসেফ ও সরকারি নিয়ম-কানুনে পার্থক্য ২৩৯
শুধু কাজ শিখেছি ২৪১
নারী-পুরুষ বৈষম্য ২৪২
গ্রামীণ ব্যাংকের সঙ্গে ইউনিসেফের প্রথম সংযোগ ২৪৩
তিনজন নারী একা ২৪৫
প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সাথে ২৪৭
ঢাকায় পোস্ট-কোপেনহেগেন সেমিনার ২৫১
নারীর অবস্থা সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের প্রথম প্রকাশনা ২৫৩
সংগ্রাম চালিয়ে যাও ২৫৬
নারী উন্নয়নে দাতা সংস্থার নেটওয়ার্ক ২৫৮
জয়েন্ট গভর্নমেন্ট-ফরেন ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্স উইড টাস্কফোর্স ২৬০
লোকাল কনসালটেটিভ উইড সাব-গ্রুপ ২৬৪
উইড ফোকাল পয়েন্ট ২৬৮
চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : প্রথম নারী উন্নয়ন ম্যাক্রো অধ্যায় ২৭১
পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : প্রথম শিশু উন্নয়ন ম্যাক্রো অধ্যায় ২৭৯
ইউনিসেফে ছয়জন কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভের সাথে ২৮৪
ইউনিসেফ থেকে অবসর গ্রহণ ২৯৩

Chunati.com
Pioneer in village based website

আমার শৈশব

পুকুর পাড়ের কালো মেয়ে

কক্সবাজার যাওয়ার পথে যেখানে লাল মাটি শুরু হয়েছে সেখানে পাহাড়ঘেরা আমার গ্রাম চুনতী। চুনতী আমার জন্মভূমি। এর প্রকৃতির মধ্যে আমি শৈশব স্মৃতিকে খুঁজে পাই। চট্টগ্রাম জেলার তৎকালীন সাতকানিয়া থানায় অবস্থিত। আমাদের বাড়ি মুনসেফ বাড়ি নামে পরিচিত। আমার পিতামহ সিদ্দিকুর রহমান ছিলেন একজন নামকরা কাজী। প্রপিতামহ শুকুর আলী মুনসেফের দেশজোড়া খ্যাতি ছিল। বিভিন্ন কর্মস্থলে তাঁর নামে মসজিদ, বাজার ও রাস্তাঘাট এখনো বিদ্যমান। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরের কিউরেটর শামসুল হোসাইন সম্পাদিত 'ইতিহাস ও যাদুঘর সময়িকী'-র (জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৯ সংখ্যা) তথ্য অনুসারে দেখা যায় ১৮৩৫ খৃস্টাব্দে জমিদার দাতারাম চৌধুরী সুলতানপুরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৬১ সালে শুকুরআলী মুন্‌সেফ রাউজানে চাকরিরত অবস্থায় এই স্কুল রাউজান থানা সদরে স্থানান্তর করেন এবং মিড্‌ল স্কুলে রূপ দেন। পরবর্তীকালে ১৮৯৮ সালে এটি রাউজান হাইস্কুলে উন্নীত হয়। চট্টগ্রাম শহরে আমাদের বাস্তুভিটায় যাওয়ার যে রাস্তা, তার নাম শুকুর আলী মুনসেফ লেইন, যা রুমঘাটা নামে পরিচিত। চুনতী আমাদের বাড়ির পেছনে পাহাড়ের গা ঘেঁষে বিরাট এক হাওর। তাতে ফুটে থাকে অসংখ্য পদ্ম ফুল। সামনে আমার প্রপিতামহের দেয়া চার পাড়ে আম গাছ ঘেরা বিরাট পুকুর। এর পাড়ে দাঁড়ালে দেখা যায় পূব দিকে সবুজ ধানের ক্ষেত, ধীরে ধীরে পাহাড়ের মাঝে মিলিয়ে গেছে।

তিন চারটি পাহাড় ডিঙ্গিয়ে আমরা ছোটবেলায় মায়ের সাথে হেঁটে নানার বাড়ি যেতাম। মা বোরখা পরে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতেন। নানার বাড়ি ডেপুটি বাড়ি নামে পরিচিত। আমার নানা তৈয়বুল্লাহ খান ছিলেন জমিদার এবং পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। মায়ের পিতামহ খান বাহাদুর নাসির উদ্দিন ছিলেন ঐ অঞ্চলের জনপ্রিয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। প্রতি সপ্তাহে আমরা একবার নানার বাড়ি যেতাম। সারাদিন সেখানে আনন্দে কাটাতাম। বিকেলে আমরা যখন ফিরে যেতাম, আমার নানি পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন, যতক্ষণ না আমরা চোখের আড়ালে চলে যেতাম। আমরা পাহাড়ের ওপর উঠে গাছের ফাঁক দিয়ে নানিকে হাত নেড়ে বিদায় জানাতাম। নানি যখন অদৃশ্য হয়ে যেতেন তখন মা দু'চোখের পানি ফেলতেন। এ একটা করুণ দৃশ্য, আমার মনে গেঁথে আছে।

Chunati.com
Pioneer in village based website

আব্বা মাহবুবর রহমান সরকারি চাকুরে। সাব-রেজিস্ট্রার হিসেবে কর্ম জীবন শুরু করেন দ্বিতীয় দশকে জলপাইগুড়ির বল্লাতে। তিনি বিভাগপূর্ব বাংলায় চট্টগ্রামের প্রথম ডিসট্রিকট্ রেজিস্ট্রার হিসেবে চাকরিরত ছিলেন। তিনি তৎকালীন চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন স্থানে পোস্টেড ছিলেন এবং প্রতিটি কর্মস্থলে নিজের সাধ্যমত স্কুল, মাদ্রাসা, দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেন। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নতি সাধনে তিনি নিরলস কাজ করে গেছেন। সাব-রেজিস্ট্রারের পদে অধিষ্ঠিত হয়ে আধুনাগর, সাতকানিয়া, ফতেহাবাদ ইত্যাদি জায়গায় বিভিন্ন সময়ে কাজ করেন। এই সুবাদে তাঁর সাথে মা এবং আমরা ছোটবেলায় এসব জায়গায় বেশ ঘুরে বেরিয়েছি। আব্বা ছিলেন একজন নীরব সমাজ কর্মী। অনেক দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীকে নিজ খরচে লেখাপড়া শিখিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। তাঁর উদ্যোগে চুনতী গ্রামে শুকুর আলী পোস্ট অফিস এবং মুনসেফ বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি আধুনাগরে এবং চকরিয়ায় দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন।

জীবন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত প্রগতিশীল। আধুনিক ভাবধারাকে সমর্থন করতেন বলে তিনি তাঁর সন্তানদের লেখাপড়ার পাশাপাশি গান বাজনা শেখার জন্য উৎসাহিত করতেন। ছুটির দিনে আব্বা বাড়ি আসতেন। মনে পড়ে আমাদের বাড়ির উঠোনে বসে আব্বা হারমোনিয়াম বাজিয়ে আমাদের চার ভাইবোনকে গান শোনাতেন— 'বাগে জাঁহামে আইই বাহার', পৃথিবীর বাগানে বসন্ত এসেছে। তখন এর অর্থ বুঝতাম না। সকলে মনোযোগ দিয়ে আব্বার গান শুনতাম। বড় ভাই হাবিবুর রহমান তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। মেজ ভাই লুৎফর রহমান খুব সম্ভব ফতেহাবাদ স্কুলে পড়েন। আব্বার সাথে থাকেন, যখন তিনি সেখানে সাব-রেজিস্ট্রার হিসেবে চাকরিরত। বড়আপা হুসনুন্নাহার ও মেজআপা নুরুন্নাহার বাল্য বিবাহের শিকার। দু'জনে শ্বশুড়বাড়ি। আমাদের বাড়িতে মা, আমার সেজ ভাই আবু মোহাম্মদ শাহাবুদ্দীন, ছোটভাই আহমদ ফরিদ, আমি এবং আমার ছোটবোন জুবলী— আমরা চার ভাইবোন এবং আমার বড় ভাবি। আমরা চার ভাইবোনের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। চার জন একই টেবিলে বসে আমাদের শিক্ষক এনাম বদ্দার কাছে পড়তাম। মা ঘর-সংসার, আমাদের পরিচর্যা, রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। এর মাঝে সময় করে আমাদের জন্য জামা সেলাই করতেন। অবসর সময়ে পত্রপত্রিকা ও গল্পের বই পড়তেন।

ভাবতে অবাক লাগে আমার মা কিভাবে আট সন্তানকে লালনপালন করতেন। আব্বার সীমিত আয়ের মধ্যে এতগুলো সন্তানকে মানুষ করা, এত বড় সংসার চালানোর জন্য যথেষ্ট দক্ষতা প্রয়োজন। মা অত্যন্ত সুচারু রূপে এই কর্তব্য সম্পাদন করে গেছেন। মাঝে মধ্যে তাঁর ধৈর্যের যে চ্যুতি ঘটে নি তা নয়। আমাদের কাজের মেয়ে অছিমাকে একবার থাপ্পড় দিতে দেখেছিলাম। সেদিনই বিকেলে আবার তাকে একটা শাড়িও মা কিনে দিয়েছিলেন। কাজের লোকদের তিনি কড়া শাসন করতেন একথা সত্যি। আবার অজস্র স্নেহ দিয়ে তাদের মন জয় করতেও মাকে দেখেছি। আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার অনেক দিন পরও তারা মাকে দেখতে আসতো। তাঁর জন্য তাদের সাধ্যমত উপহার নিয়ে আসতো— কারো গাঁছের ফল, কারো হাঁসের ডিম

Sitemati.com
Pioneer in Village based website

ইত্যাদি। মায়ের নির্দেশে আমরা কোন কাজের লোককে নাম ধরে কোনদিন ডাকি নি। কাউকে দিদি, কাউকে বুবু, কাউকে কাকা, চাচা, ভাই এভাবে সম্বোধন করতে হতো। কাজের লোকরাও মানুষ, তাদের সাথে আমরা যেন সেভাবে ব্যবহার করি— এ শিক্ষা মায়ের কাছে আমরা পেয়েছি। মা দুপুরবেলা আমাদের ঠাকুরমা'র ঝুলি থেকে রূপকথার গল্প পড়ে শোনাতেন। এত চমৎকার এবং সহজ করে গল্পগুলো বুঝিয়ে দিতেন, আমরা মুহূর্তের মাঝে কল্পনা জগতে চলে যেতাম। চোখের সামনে যেন দেখতে পেতাম রূপোরকাঠি-সোনারকাঠি ছুঁইয়ে দেয়ার সাথে সাথে পাতালপুরীর রাজকন্যা জেগে উঠেছে। মায়ের নাম সাদীদা খানম। আমার মামা কামালউদ্দীন আহমদ খান তাঁকে বুবু বলে ডাকতেন। মামা কলকাতা থেকে আমার মায়ের জন্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা পাঠাতেন। এই সুবাদে মা সাহিত্যানুরাগী হয়ে উঠেছিলেন এবং কিছুটা সাহিত্যচর্চাও করতেন। তাঁর কিছু কিছু লেখা কলকাতার কোন কোন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। আব্বার সহযোগিতায় মা আমাদের গ্রামের বাড়িতে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে একটি ছোটখাট লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, কায়কোবাদ, নজরুল, বন্দেআলী মিঞা এবং সেই সময়কার নবীন কবি-সাহিত্যিকদের বই পুস্তকও সেই লাইব্রেরিতে স্থান পেত। জীবনের এক পর্যায়ে মা আধ্যাত্মিকতার পাঠ গ্রহণ করেন। স্রষ্টার কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা ছিল এ পাঠের অন্তর্গত। তিনি ছিলেন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ খান বাহাদুর আহসানউল্লার একজন অনুরাগী শিষ্য। ছোট বেলায় তাঁকে আমরা নানা বলে ডাকতাম। দেখতাম, আমাদের রুমঘাটার বাড়িতে মা তাঁর সাথে গভীরভাবে আধ্যাত্মিক আলোচনায় রত। নানা খুলনা থেকে এলেই চট্টগ্রামে আমাদের দেখতে আসতেন। শেষ বয়সে মা'র পঁচিশ বছর অন্ধত্ব জীবনে এই আধ্যাত্মিকতাই তাঁকে বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগাত। তাঁর মানসিক শক্তি ছিল অদম্য।

শ্বশুরবাড়ি থেকে আসলে বড়আপা আমরা চার ভাইবোনকে গান শেখাতেন। আমাদের গ্রামোফোনে সারাদিন নানান ধরনের গান বাজতো। তার মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নজরুল গীতির প্রাধান্য ছিল বেশি। আমাদের বিস্তৃত বারান্দায় মাঝে মাঝে আমরা মা'র শাড়ি দিয়ে স্টেইজ বানিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতাম। মেজ ভাই পঙ্কজ মল্লিকের গান খুব ভালোবাসতেন, গাইতেনও। আমরা তাকে অনুকরণ করতাম। এইসব অনুষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র ছিল নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরীর ছোট বোন, আমার বড় ভাবি সুলতানা রহমান এবং আমার মেজ ভাই। অনেক সময় সারারাত ধরে আমাদের অনুষ্ঠান চলতো। পাড়ার সকলে দর্শক হিসেবে এই অনুষ্ঠান উপভোগ করত।

পিতৃদত্ত নাম রশীদ আহমদ চৌধুরী, আমাদের প্রিয় টুনুভাই বুলবুল চৌধুরী ছিলেন আমাদের সাংস্কৃতিক প্রেরণার আরেক উৎস। তিনি যখন কলকাতা থেকে আসতেন, তখন চুনতী, তাঁদের বাড়ি উৎসবমুখর হয়ে উঠতো। আমরা সেই উৎসবে যোগ দেয়ার জন্য তাঁদের বাড়ি চলে যেতাম। সেখানে সবাইকে নিয়ে তিনি গানের আসর বসাতেন। মজার মজার গল্প বলে আমাদের চমকে দিতেন। সব সময় তাঁর উচ্ছল হাসি দিয়ে সবাইকে উদ্বেলিত করে রাখতেন।

আব্বার চাচাতো বোন জোসনা আমার প্রিয় বন্ধু ছিল। আমার মেজ আপার মেয়ে শাহনওয়াজ পারুল বয়সে অনেক ছোট হলেও আমার সাথে তার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল।

আমার অসুখ হলে সেও অসুস্থ হয়ে যেত। এই বন্ধুত্বের বন্ধন সে আজও অটুট রেখেছে। সে খুলনা বি.এল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে অধ্যাপনা শেষে অবসর গ্রহণ করেছে। তার প্রথম বই 'টেরাকোটা' প্রকাশিত হলে আমাকে একটা কপি দিয়ে বলল, খালাম্মা তোমাকে এখনো ছোট বেলার মতো ভালোবাসি। আমার চাচাতো বোন মনোয়ারা এবং জেঠাতো বোন রেনুসহ আমি আর জুবলী ভোরবেলা শিউলী কুড়িয়ে মালা গাঁথতাম। গান গেয়ে বড় ভাবির গলায় আমরা ফুলের মালা পরাতাম। তাঁর কোকড়া চুল, টানাটানা চোখ, ফর্সা রং, মোনালিসার মতো হাসি আমাদের অত্যন্ত আকৃষ্ট করত। ছোটবেলা থেকে হয়তো আমরা সুন্দরের পূজারী ছিলাম। মনে হয় এই দিনগুলি জীবনে সবচেয়ে বেশি আনন্দমুখর ছিল।

খুব সম্ভব আমার বয়স চার কি পাঁচ হবে। সেই সময়ের একটা বিষাদময় স্মৃতি আমার মনে কাঁটার মতো বিঁধে আছে। আমার চাচা মখলুকুর রহমান প্রায়ই বলতেন – আমাকে পুকুরপাড় থেকে কুড়িয়ে এনেছে। আমার মা আমাকে পোষ্য নিয়েছে। তার কথাকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য আরো বলতেন, আমার অপর তিন বোন ফর্সা, আমি কালো, তাই আমি তাদের বোন নই। এতে আমি দুঃখে জর্জরিত হতাম এবং চাচাকে মোটেই পছন্দ করতাম না। বোধকরি এই কারণে আমি সব সময় নিরাপত্তাহীনতা এবং হীনমন্যতায় ভুগতাম। সারাক্ষণ মায়ের আঁচল জড়িয়ে থাকতে পছন্দ করতাম। মা কোথায়ও বেড়াতে গেলে সঙ্গে যাবার জন্য কাঁদতাম। এমনকি বাথরুমে গেলে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতাম, যতক্ষণ না তিনি বের হয়ে আসতেন। আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে এ ধরনের ঠাট্টা প্রচলিত ছিল। হয়তো এখনো আছে। নিজের আগোচরে তারা কত শিশুকে এ অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দেয়, কেইবা জানে। হয়তো এই কারণে আমি খুব জেদি ছিলাম। যা করবো বলে ভাবতাম, তা সম্পন্ন করতে না পারলে আমার মেজাজের অন্ত থাকতো না। মা বলতেন, তোর মিলিটারি মেজাজ, তোকে বিয়ে দিতে পারবো না। শ্বশুরবাড়িতে মাকে ছাড়া কেমন করে থাকবি, ইত্যাদি। ছোটবেলা থেকে যেন আমাকে বিয়ে দেয়ার জন্য তৈরি করা হচ্ছে। আমার জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে তা আমাদের মতো এমন প্রগতিশীল পরিবারেও তখনকার দিনে চিন্তা করা হতো না। একটি ভিত্তিহীন কৌতুকের জন্য কেন আমাকে এই নিরাপত্তাহীন শৈশবকাল অতিবাহিত করতে হলো। শুধু শৈশব নয়, কিশোর, যৌবনকালেও আমি শৈশবের এই হীনমন্যতায় ভুগেছি। এই দুঃসহ বেদনা থেকে উত্তীর্ণ হতে আমাকে রীতিমত মানসিক সংগ্রাম করতে হয়েছে। কেন এমন করে আমার কোমল শিশুমনে আঘাত হানা হয়েছিল! এতে যে আমার মনে মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা কেউ বুঝতে পারে নি। এর মর্ম আমি অনুভব করলাম ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটিতে যখন চাইল্ড সাইকলজী পড়লাম, তখন। কোন শিশুকে পোষ্য বলে যেন অহেতুক ঠাট্টা করা না হয়। এরূপ মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে না হয়। মানবগোষ্ঠীর কাছে এই আবেদন রাখছি।

Chuadi.com
Pioneer in village based website

আব্বার আটটি অট্টালিকা

আব্বা চট্টগ্রাম শহরে বদলি হয়ে আসলেন সপরিবারে। আমরা রুমঘাটায় থাকতাম। সাপ্তাহিক ছুটির দিন রোববারে আব্বা আমাদের পিকনিকে কিংবা বেড়াতে নিয়ে যেতেন।

মাঝে মাঝে ঘোড়ার গাড়ি করে চাকতাই পুলে, ট্যাকসি করে পতেঙ্গা সমুদ্র তীরে বেড়াতে যেতাম। জীবন ছিল নির্বিঘ্ন-সুন্দর। তখনকার দিনে মানুষের এত ভিড় ছিল না। খুব অল্প সংখ্যক মানুষই এসব বিনোদনে সপরিবারে যেত। ছুটির দিনে মা নিজ হাতে স্পেশাল খাবার রান্না করতেন। আব্বার নির্দেশ ছিল দুপুরে খাবার টেবিলে সবাইকে তাঁর সাথে খেতে হবে। সকালে এবং সন্ধ্যায় সবাইকে পড়তে বসতে হবে। নিয়মিত স্কুলে যেতে হবে। আব্বা, মা কিংবা বড় ভাই ছাড়া আমরা কোথায়ও গেলে আব্বা অপছন্দ করতেন। একদিন আব্বা অফিসে ছিলেন, এই সুযোগে আমি ও জুবলী পাড়ার মামাতো বোনদের সাথে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। আব্বা অফিস থেকে এসে আমাদের সিনেমায় যাওয়ার খবর শুনে খুবই রেগে মাকে বকাবকি করে বললেন, আজকে তিনি এমন শাস্তি দেবেন যেন আর কোনদিন আমরা এভাবে বাইরে না যাই। মা ভয়ে সন্ত্রস্ত। আমরা এসে দেখি বাসায় থমথমে ভাব। আব্বাকে দেখে ভয়ে চুপি চুপি ঘরে ঢুকতেই মা সব খবর জানালেন। আমরা শাস্তির জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়ে গেলাম। আব্বা কিছুই বললেন না। বাসায় নিরানন্দ পরিবেশে আমাদের দিন দুয়েক কাটাতে হলো। মা বললেন, তোর আব্বার লম্ফঝম্ফ সব আমার ওপর। নিজের মেয়েদেরকে কিছুই বলবে না। যেন সব দোষ আমার। এমন স্নেহময় ছিলেন আব্বা। কিন্তু তাঁর কঠোর শৃঙ্খলাবোধকে কখনো বিসর্জন দিতে দেখি নি।

আব্বা ভোরবেলা উঠে নামাজ শেষে, ইংরেজি তরজমাসহ সুর করে কোরান শরীফ পড়তেন। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে তখনকার পপুলার সংবাদপত্র স্টেটসম্যান পড়তেন। স্নান সেরে মাথায় জবাকুসুম তেল দিতেন এবং গায়ে কিউটিকুরা পাউডার মাখতেন। তাঁর ঘরে ছড়িয়ে থাকতো এ দুয়ের সংমিশ্রিত সৌরভ। তিনি যেদিকে হেঁটে যেতেন সেদিকে আমরা যেন আব্বার শরীরের ঘ্রাণ পেতাম। রোজ সকাল আটটায় আমার মার হাতের তৈরি নাশতা খেয়ে অফিসে যেতেন।

আমরা স্কুলে পড়ার সময় কোনদিন আব্বার কাছ থেকে স্কুলের ফিস চেয়ে নিতে হয় নি। নির্ধারিত দিনে তিনি আমাদের হাতে ফিসের টাকা তুলে দিতেন। আমার ভাইরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় যেন মাসের প্রথম সপ্তাহে খরচের টাকা পেয়ে যায়, এ ব্যাপারে আব্বা অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। নির্দিষ্ট দিনের আগেই সকলের হাতে টাকা পৌঁছে যেত। আবার এও সত্যি যে আব্বার হাতে কোনদিন প্রচুর টাকা ছিল না। তিনি আয় বুঝে ব্যয় করাতে বিশ্বাসী ছিলেন। এজন্য জীবনে কোনদিন আমরা অভাব অনুভব করি নি, আবার প্রাচুর্যের মধ্যেও বড় হই নি। যতটুকু দরকার, ততটুকু পেয়েছি।

বড় ভাইয়ের কাছে একটি রেডিও ছিল। আমি আর ছোটবোন জুবলী প্রতি রোববারে তাঁর বাসায় রেডিওতে গান শুনতে যেতাম। তখন পঙ্কজ কুমার মল্লিক কলকাতার আকাশবাণী থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখাতেন। বড় ভাই আমাদের দু'জনকে এই ব্যাপারে খুবই উৎসাহ দিতেন। মনে পড়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রণ দামামার মধ্যে ১৯৪৪ সালে তাঁর প্রচেষ্টায় চট্টগ্রাম মুসলিম হলে (বর্তমানে জেমিশন ম্যাটারনিটি হাসপাতালের পেছনে) অনুষ্ঠিত হয় ঈদ-পূজা সম্মিলনী। এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে আমার মেজ ভাই এবং আমরা দুই বোন গান করেছিলাম। ঐ সময়ে চট্টগ্রামে কোন মুসলমান মেয়ে নাকি মঞ্চে গান করতো না। ১৯৫০ সালে কমিশনার এন.এম খানের উদ্যোগে,

বর্তমানে যেখানে স্টেডিয়াম, সেখানে বড় আকারে অনুষ্ঠিত হয় কৃষি, শিল্প ও সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী। সেখানে সুচরিত চৌধুরীর উৎসাহে আমি সলিল চৌধুরীর 'কোন এক গাঁয়ের বধূর কথা তোমায় শোনাই শোন' গানটি গেয়েছিলাম। সেই একই মঞ্চে আমার পরেই গান করেছিলেন ফ্রকপরা ফেরদৌসী রহমান, বর্তমানের খ্যাতনামা শিল্পী। জুবলী ছোটবেলা থেকে সঙ্গীতের প্রতি বিশেষভাবে অনুরাগী ছিল। আমরা দু'জনে একসাথে হারমোনিয়াম নিয়ে বসতাম, যদিও বাজাতে জানতাম না। ক্রমে আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। সে লেগেই রইল। হারমোনিয়াম বাজানো আয়ত্ব করলো। গান শিখলো। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলো। বাংলাদেশ বেতার এবং টেলিভিশনে বহুদিন সঙ্গীত পরিবেশন করেছে। সঙ্গীতই যেন তার জীবন। সঙ্গীত শিক্ষক হিসেবে ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলে বহু বছর কাজ করেছে।

শৈশবে ফিরে আসি। তখন আমরা একটা ভাড়া বাসায় থাকতাম। অদূরে আরেকটি বাসায় বড় ভাই এবং ভাবি থাকতেন। পরবর্তীকালে পৈত্রিক ভিটায় আব্বা টিনের ছাউনি দেয়া একটি বেড়ার ঘর বানিয়েছিলেন। রুমঘাটার আত্মীয়রা বলতেন— এতদিন সরকারি চাকরি করেও সাবরেজিস্ট্রার সাহেব একটি পাকা বাড়ি বানাতে পারেন নি। আব্বা উত্তরে বলতেন, আমার আটটি অট্টালিকা (তাঁর সন্তান-সন্ততি) আছে। আমার দালানবাড়ির দরকার নেই। আব্বা তাঁর সন্তানদেরকে গড়ে তুলতে সব সময় সচেষ্ট ছিলেন। আমাকে প্রায়ই বলতেন, বুলবুল (আমার ডাক নাম) আমার ছেলের মতো, তার লেখাপড়ার দিকে ভীষণ ঝোঁক। তখনকার দিনে ছেলেদেরকেই কেবল উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেয়া হতো। মেয়েরা লেখাপড়া করলেও তাকে আদর করে ছেলের মতো গণ্য করা হতো। আমাদের পরিবারও এর ব্যতিক্রম ছিল না।

সেজ ভাই শাহাবুদ্দীন বামপন্থী ছাত্র ফেডারেশনের সাথে জড়িত ছিলেন। আমাকে আর জুবলীকে দিয়ে মাঝে মাঝে পোস্টার লেখাতেন। আমরা তখন স্কুলে পড়ি। তাকে প্রায়ই লিফলেট বিলি করতে দেখতাম। এসব কাজে তার সঙ্গী ছিল শহীদ সাবের এবং আমার মামাতো ভাই ফজলুল্লাহ খান। সাবের, সম্পর্কে আমার ফুফাতো ভাই। তাঁর মা বেঁচে থাকা সত্ত্বেও বাবা আর একটি বিয়ে করেছিলেন। সৎমায়ের বিরূপ ব্যবহারের জন্য তিনি স্বাভাবিক পারিবারিক জীবনের সুস্থতা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। ফলে স্নেহের সন্ধানে তিনি প্রায়ই আমাদের বাসায় আসতেন। তার শুকনো চেহারা দেখে মা বুঝতে পারতেন হয়তো তিনি অভুক্ত। মা সেজ ভাইয়ের সাথে তাকে সযত্নে খাওয়াতেন। ছোট ভাই আহমদ ফরিদ তমদ্দুন মজলিশের কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিল। এই সুবাদে আজিজুর রহমান এবং আমার মামাতো ভাই ফরমান উল্লাহ খানেরও আমাদের বাসায় যাতায়াত ছিল। দুই ভাইয়ের ভিন্ন ধারার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও তখন তাদের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব দেখি নি।

বড় ভাই হাবিবুর রহমান ইকনমিকস্-এ অনার্স নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিলেন। এম.এ তে সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট হওয়ায় তিনি খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। যদিও ওই সময় একজন মুসলমান ছাত্রের এত গৌরবময় সাফল্যলাভ করাও ছিল বিরল ঘটনা। তাঁর এই সাফল্যের প্রতি অভিনন্দন জানিয়ে

Ghorati.com
Pioneer in village based website

চট্টগ্রামের তৎকালীন ধনাঢ্য ব্যক্তি খান বাহাদুর ফরিদ আহমদ চৌধুরী একটি প্রীতিভোজের আয়োজন করেছিলেন। মায়ের কাছে শুনেছি, এম.এ পাশ করে বড় ভাই যেদিন আমাদের গ্রামের বাড়ি চুনতী এলেন, সেদিন অসংখ্য গ্রামবাসী বাজনা বাজিয়ে, ফুলের মালা পরিয়ে দুই মাইল দূর থেকে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। আব্বা গরু জবাই করে মেজবান দিয়েছিলেন। আমাদের বাড়ির সামনে পুকুরের চারপাশে সারাদিন-সারারাত ধরে এই মেজবান চলেছিল। কয়েক হাজার লোক খেয়েছিল সেদিন এই আনন্দ উৎসবে। পরবর্তীতে সুদীর্ঘ সময় তিনি চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৩ সালে করাচি চলে যান এবং চিফ ইকনমিস্ট হিসেবে প্ল্যানিং কমিশনে যোগ দেন। সেখান থেকে স্কলারশীপ নিয়ে আমেরিকার ভেনডারবিল্ট ইউনিভার্সিটি থেকে ইকনমিকসে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। অর্থনীতির ওপর প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ Growth Model : Pakistan সেই সময় বিভিন্ন মহলে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। আমাদের দুর্ভাগ্য যে মাত্র ছেচল্লিশ বছর বয়সে (১৪ই এপ্রিল ১৯৬২) তাঁকে আমরা হারিয়েছি। এভাবে আমরা আমাদের প্রিয় বড় ভাইয়ের ছত্রছায়া থেকে বঞ্চিত হলাম।

মেজ ভাই লুৎফর রহমান বি.কম পাস করে ব্রিটিশ কোম্পানি, জেম্‌স ফিনলেতে চাকরিতে যোগ দেন এবং পরবর্তীকালে চাকরি ছেড়ে ব্যবসা শুরু করেন। শাহাবুদ্দীন ভাই চট্টগ্রাম কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন (১৯৪৯-১৯৫১)। ১৯৫৩-১৯৫৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইকনমিক্‌স-এ বি.এ অনার্স পড়ার সময় ডাকসুর (ঢাকা ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন) সদস্য ছিলেন। তখন ছাত্রদের গোপন মিটিং করার সময় এফ.এইচ হল থেকে নিরাপত্তা আইনে তাকে এবং কয়েকজন সহকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে বি.এঅনার্স পাস করে সেজ ভাই কয়েক বছর বড় ভাইয়ের সাথে করাচিতে ছিলেন। চট্টগ্রামে ফিরে এসে ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন। বর্তমানে সি. রিসোর্সেস গ্রুপ অফ কোম্পানীর ডাইরেক্টর। ফরিদ ভাই তৎকালীন পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে (১৯৫৯) বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে সচিব পর্যায়ে অধিষ্ঠিত হন। পরবর্তীতে ইউ.এ.ই তে রাষ্ট্রদূত হিসেবে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন (১৯৮৯-১৯৯৩)। তিনি সিভিল সার্ভিস পাস করার পর আব্বা খুবই খুশি হয়েছিলেন। বলেছিলেন, ফরিদের মাধ্যমে আমার স্বপ্ন পূর্ণ হবে। কিন্তু তার সাফল্য আব্বা দেখে যেতে পারেন নি। ফরিদ ভাই ফেনীতে এস.ডি.ও হিসেবে পোস্টিং পাওয়ার কয়েক মাস আগে (১৯৬১) আব্বা ইহজগৎ ত্যাগ করেন। এখনও লেখাপড়া নিয়ে কর্মব্যস্ত জীবন যাপন করেন। ইতোমধ্যে Encounter with Islam নামে তাঁর একটি বইও প্রকাশিত হয়েছে (১৯৯৫)।

আমার চার ভাবির মধ্যে বড় ভাবির কথা আগেই উল্লেখ করেছি। আমার মা'র সাথে তাঁর একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বড় ভাবি যেন মার আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গী। মায়ের মতো সাহিত্য চর্চাতেও তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। এখনো তিনি সেই অভ্যাস বজায় রেখেছেন। খালেদা ভাবি মারা যাওয়ার পর মেজ ভাই আমার মামাতো বোন মরিয়ম রহমান বেনুকে বিয়ে করেন। শিল্পী মনের অধিকারী বেনু এক সময় গানের চর্চা করত। সেজ ভাবি নীনা শাহাবুদ্দীন দুই পুত্রের সার্থক জননী। ছোট

ভাবি নূজহাত ফরিদ সুগৃহিণী এবং যে কোন কাজে পারদর্শী। তাদের সকলের সঙ্গে রয়েছে আমার প্রীতির সম্পর্ক। আমার বড় দুলাভাই প্রফেসর সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরীর কাছে চট্টগ্রাম কলেজে পড়েছি। তাঁর কথা কলেজ জীবন অধ্যায়ে কিছুটা উল্লেখ করেছি। তিনি রবীন্দ্রপ্রেমিক ছাড়াও ছিলেন অনন্য মননের অধিকারী। তাঁর এমন বহু লেখা আছে যা কাল হরণ করতে পারবে না। তাঁর মরণোত্তর প্রকাশিত 'সংস্কৃতি কথা' দুই বাংলার সাহিত্যিক মহলে বিশেষভাবে সমাদৃত। মেজ দুলাভাই প্রফেসর আবদুল ওয়ালী খুলনায় তৎকালীন দৌলতপুর কলেজে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেন। একাত্তরে পাক বাহিনীর হাতে শহীদ হন। ছোটবোন জুবলীর স্বামী প্রফেসর রফিকুল ইসলামের কথা বিভিন্ন প্রসঙ্গে বলেছি। পি.এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। গভীরভাবে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। নজরুল গবেষক হিসেবে দুই বাংলায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থের প্রণেতা। আমাদের পারিবারিক বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসর শামসুল হুদা হারুন একদিন কৌতুক করে বলেছিলেন, আপা, আপনার আব্বা কি সাহিত্যিক দেখে দেখে সব মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন? উত্তরে বলেছিলাম, সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি আব্বার অশেষ আগ্রহই ছিল বোধকরি এর অন্তর্নিহিত কারণ।

মালেকা ও ছেনু : দু'জন গৃহকর্মী

আমার বয়স তখন সম্ভবত দশ বছর। আমাদের একজন কাজের মেয়ে ছিল। নাম মালেকা। আমি যখন রাতে ঘুমাতে যেতাম, সে আমার বিছানার পাশে মাটিতে বসে আমাকে নানা ধরনের গল্প শোনাতো। একদিন তার করুণ কাহিনী বলতে বলতে কেঁদে ফেললো। তাকে তার স্বামী পরিত্যাগ করে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। দুই বছর ধরে সে স্বামীর কোন খবর জানে না। কেন এমন হলো জানতে চাইলাম। মালেকা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। তার অবস্থা দেখে আমারও কান্না পেল। কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, তার স্বামী বিদেশে অর্থাৎ চট্টগ্রাম থেকে অনেক দূরে অন্য কোন শহরে কাজ করত। মাঝে মাঝে বাড়িতে আসতো। বিয়ের পর মোট পাঁচ ছয়বার তার স্বামী বাড়ি এসেছে। এমনই দুর্ভাগ্য যে তার স্বামী যতবার বাড়ি আসে ততবারই মালেকার শরীর খারাপ থাকে। তাই রাগ করে তাকে তালাক দিয়েছে। একথা শুনে আমি খুবই আশ্চর্য হলাম। ভাবলাম তার স্বামীর মতো এমন নিষ্ঠুর লোক পৃথিবীতে নেই। বললাম, শরীর খারাপ থাকলে তোমাকে সেবা-যত্ন করে সুস্থ করে তোলা উচিত ছিল, তাতে তোমার স্বামী রাগ করবে কেন? কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মালেকা আমার কানের কাছে এসে চুপি চুপি বলল, শরীর খারাপ মানে আমার 'মাসিক' হতো। মেয়েরা বড় হলে সকলের এরকম মাসিক হয়। এই সময় কারো বাসায় যেতে হয় না। মাছ-মাংস খেতে হয় না। গাছের নিচে যেতে হয় না, তাতে ভূতে ধরার সম্ভাবনা থাকে। মাসিকের সময় পুরোনো কাপড়ের টুকরো ব্যবহার করতে হয়। সেগুলো রাতের অন্ধকারে পুকুরে গিয়ে ধুতে হয়। কেউ না দেখার আগে রাতেই শুকিয়ে নিতে হয়। এবং ভোর বেলা কোন পুরুষ ঘুম থেকে ওঠার আগেই সেগুলো তুলে নিয়ে গোপন স্থানে রেখে দিতে হয়।

এতসব কথা শুনে হতবাক হয়ে গেলাম। ভীষণ ভয় পেলাম আমার কী হবে একথা চিন্তা করে। এই প্রথম জানতে পারলাম মেয়েদের 'পিরিয়ড' হয়। আমি এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার আগে পর্যন্ত আমার মা, বড় বোন, ভাবি মেয়েদের শরীরের এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার কথা কেউ কোনদিন আমাকে বলেন নি।

মনে পড়লো ছেনু বলে আমাদের দেশের বাড়িতে আরেকজন কাজের মেয়ে ছিল। আমি তখন বেশ ছোট। ছয় বা সাত বছরের বেশি বয়স হবে না। তখন আমরা আমাদের গ্রামের বাড়ি চুনতীতে। একদিন দেখলাম তাকে আমাদের পেছনের বারান্দার এক কোণে পর্দা দিয়ে শুইয়ে রাখা হয়েছে সপ্তাহ খানেক। এ সময় তাকে কারো সঙ্গে কথা বলতে দেয়া হয় নি। আমাদের তার কাছে যাওয়া নিষেধ ছিল। তাকে শুধু নিরামিষ খেতে দেয়া হতো। আমার মা তাকে একটা বাসনে করে ভাত ও তরকারি দিয়ে আসতেন। পর্দার আড়ালে তার খাওয়া-দাওয়া সারতে হতো। বারান্দার পেছনে বাঁশের বেড়া দিয়ে তার জন্য ছোট একটা টয়লেট বানানো হয়েছিল। সাতদিন পর আমার মা নিজ হাতে ছেনুকে সোনা-রূপার পানি দিয়ে গোসল করালেন এবং এভাবে তাকে পবিত্র করা হলো বলে শুনেছিলাম। কি কারণে সে অপবিত্র হলো, আবার তাকে পবিত্র করা হলো তা তখন আমার বোধগম্য হয় নি। তাকে আমাদের মাঝে ফিরে পেয়ে আমি ভীষণ খুশি হলাম। কিন্তু তার সাত দিনের বন্দি জীবন আমার কাছে এক বিরাট রহস্য হয়ে থাকলো। একে কেন্দ্র করে আমার শিশু মনে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়। নানা প্রশ্নের উদ্রেক হয়। কিন্তু সাহস করে মা'কে এই সম্পর্কে কিছু জিগ্যেস করতে পারি নি, পাছে বেয়াদবি হয়। বহু বছর পর জানতে পারলাম ওই সময় ছেনুর প্রথম 'পিরিয়ড' হয়েছিল।

তখন কুসংস্কার এবং শরীরতত্ত্ব সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞানের অভাবে মেয়েদের 'মাসিকের' ব্যাপারটাকে স্বাভাবিকভাবে না নিয়ে একে ঘিরে একটি রহস্যের জাল বিস্তার করা হতো। ফলে ওই বয়সে মেয়েদের মনে এক ধরনের অপরাধবোধের সৃষ্টি হতো। অথচ এই প্রক্রিয়াকে সহজভাবে বিশ্লেষণ করে যদি তাদের সঠিক জ্ঞান দান করা যেতো তাহলে তারা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতো না।

দুঃখজনক হলেও সত্যি যে একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এখনও গ্রামেগঞ্জে মেয়ে শিশুদের একইভাবে মানসিক গঞ্জনার শিকার হতে হয়। এই ব্যাপারে কিছু কিছু সংস্থার সচেতনতামূলক কর্মসূচি বিশেষ করে 'রিপ্রোডাকটিভ হেলথ' সম্পর্কিত কাজ পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ফলে সিংহভাগ মেয়ে শিশুরা এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত নয়। এই ব্যাপারে সার্বিক সচেতনতা গড়ে তোলা দরকার যেন এই কুসংস্কার এবং কূপমণ্ডুকতা থেকে মেয়ে শিশুরা চিরতরে মুক্তি পায়।

pathagar.net
Number one image based website

শিক্ষা জীবনের শুরু

লেখাপড়ায় গুটিকয় মুসলিম মেয়ে

স্কুল জীবনের দশটি বছর কীভাবে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। কী নির্ঝঞ্ঝাট, সমস্যাবিহীন স্কুল জীবন। প্রতিটি মুহূর্ত আনন্দ ভরা। এ জীবন তুলনাহীন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রাম শহরে মেয়েদের স্কুলের সংখ্যা ছিল হাতে গোণা গুটিকয়। আব্বার ইচ্ছা আমি ও আমার ছোট বোন জুবলী স্থানীয় গুল-এ-জার বেগম স্কুলে পড়ি। গুল-এ-জার বেগম ছিলেন খান বাহাদুর ফজলুল কাদেরের স্ত্রী। চন্দনপুরায় তাঁদের বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় চট্টগ্রামের মেয়েদের শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। খান বাহাদুর ফজলুল কাদের কেবল অবিভক্ত বাংলার একজন এম.এল.এ ছিলেন তা নয়, তিনি একজন সমাজ সংস্কারকও ছিলেন।

ওই সময়ে প্রাইমারি স্তরে সহ-শিক্ষার যদিও প্রচলন ছিল, মুসলিম মেয়েরা সাধারণত এইসব স্কুলে পড়তে যেতো না। ফলে স্বল্পসংখ্যক মুসলমান মেয়ের ভাগ্যে লেখাপড়ার সুযোগ জুটতো। কুসুমকুমারী প্রাইমারি বালিকা বিদ্যালয় ছিল শুধু পঞ্চম শ্রেনী পর্যন্ত। এছাড়াও অপর্ণাচরণ নামে একটি বেসরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ছিল। এই বিদ্যালয়টি নন্দনকানন বালিকা বিদ্যালয় নামে পরিচিত। ডা. খাস্তগীর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় একটি উঁচুমানের সরকারি প্রতিষ্ঠান। এই স্কুলে ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করা ছিল অত্যন্ত কঠিন। ফলে মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য সুযোগ সুবিধা তেমন ছিল না। এই পরিপ্রেক্ষিতে ফজলুল কাদেরের প্রচেষ্টায় মুসলমান মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করা নিঃসন্দেহে একটি প্রগতিশীল পদক্ষেপ। সেই সময় একজন মুসলমানের তাঁর স্ত্রীর নামে মেয়েদের জন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান একটি অনন্য উদাহরণ।

আমার প্রাইমারি শিক্ষার প্রথম চার বছর গুল-এ-জার স্কুলেই কাটে। ছোটবেলায় আমি অত্যন্ত ভীতু ছিলাম। প্রথম যখন স্কুলে ভর্তি হই, তখন আমি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতাম এবং সব সময় আমার ছোট বোনের কাছে কাছে থাকতে চাইতাম। আমি যখন প্রথম শ্রেনীতে, সে তখন শিশু শ্রেনীতে পড়ে। আমি প্রায়ই তার কাছে চলে যাওয়ার জন্য কান্নাকাটি করতাম। আমাদের শিক্ষক অমিয় মাসিমা বিরক্ত হয়ে আমাকে শিশু শ্রেনীতে পাঠিয়ে দিতেন। জুবলী তার বড় বোনের কান্না দেখে বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যেতো।

বেশ কিছুদিন এভাবে অতিক্রম হয়। অমিয় মাসিমা ছিলেন একজন দক্ষ শিক্ষক এবং স্নেহময়ী নারী। তাঁর ভালোবাসার বন্ধন আমি ভুলতে পারি নি কোনদিন, আজও নয়। তাঁর স্নেহের উষ্ণতায় সিক্ত হয়ে আমি ধীরে ধীরে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করলাম। তাঁর উৎসাহে তাঁর হাতের লেখা পুরোপুরি নকল করতে শিখলাম। আজও মনে পড়ে আমি যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমিয় মাসিমাকে সালাম করতে গেলাম, তিনি তখন ক্লাসে পড়াচ্ছিলেন। আমাকে ক্লাসের ভেতরে ডেকে নিয়ে বসতে দিলেন। আলমারির ভেতর থেকে তাঁর নিজের হাতে সযত্নে রাখা আমার সেই প্রাইমারি স্কুলের হাতের লেখার খাতাটি বের করে গর্ব ভরে তাঁর ছাত্রীদেরকে দেখালেন এবং বললেন, আমার ছাত্রী বুলবুল কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক পাস করেছে। তোমরাও তার মত হতে চেষ্টা করবে। আমাকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করলেন যেন আমি জীবনে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি। আমি অবাক হলাম। দেখলাম, দশ বছর ধরে আমার হাতের লেখার খাতাটি তাঁর কাছে সুরক্ষিত। কৃতজ্ঞতায় আমার দু'চোখ অশ্রুসিক্ত হলো। তখনকার শিক্ষকদের যে অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং দায়বদ্ধতা ছিল তা অতুলনীয়।

প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেনী পর্যন্ত পড়ে পঞ্চম শ্রেনীতে ভর্তি হলাম রহমতগঞ্জে অবস্থিত কুসুমকুমারী বালিকা বিদ্যালয়ে। কুসুমকুমারী তৎকালীন একজন বিদুষী মহিলা ছিলেন। এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করার পর আমৃত্যু তিনি প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব পালন করে গেছেন। কুসুমকুমারী স্কুলে বেশির ভাগই হিন্দু মেয়েরা পড়তো এবং তারা নাচে-গানে বিশেষ পারদর্শী ছিল। তখন কুমকুমদি ষষ্ঠ শ্রেনীতে পড়তো। দেখতে অপূর্ব সুন্দরী। যখন নাচতো মনে হতো তার চোখ-মুখ, হাত-পা সব কথা বলছে। অপূর্ব তার নৃত্যভঙ্গি। তখনকার দিনে মেয়েরা নিজে গান গেয়ে নাচতো। কুমকুমদির কাছে অনেকে ছুটির পরে নাচ শিখতো। এই স্কুলে মাত্র এক বছর অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেনীতে পড়েছি।

Pioneer in village based website

ষষ্ঠ শ্রেনীতে আবার গুল-এ-জার বেগম স্কুলে চলে গেলাম। আমার দুই প্রিয় বন্ধু শামসুন এবং মোহসেনাও আমার সাথে এই স্কুলে চলে যায়। ষষ্ঠ শ্রেনী থেকে তিন বছর অর্থাৎ অষ্টম শ্রেনী পর্যন্ত এখানে পড়লাম। এই সময় হাসনাহেনা, চেমন, মমতাজ, আনজু, জলি, ভুলু, রেবা, তাহেরা, মোহসেনা, হোসনে আরা, শামসুন এরা আমার স্কুলসাথি ছিল। আমি লেখাপড়ায় অত্যন্ত সাধারণ ছিলাম। বন্ধুদের সঙ্গে পড়ায় তাল মিলিয়ে চলতে আমার রীতিমত হিমশিম খেতে হতো। রাতদিন পরিশ্রমের পর পরীক্ষায় কোন রকমে পঞ্চম বা ষষ্ঠ স্থান পেতাম।

গুল-এ-জার বেগম স্কুলে পড়ার সময় যদিও আমি সপ্তম শ্রেনীতে পড়তাম, দশম শ্রেনী পর্যন্ত সকল ছাত্রীর মধ্যে একটা প্রগাঢ় বন্ধুত্বের বন্ধন ছিল। রওশন জাহান, নুরুননাহার কছির ও নেরীনা আপা দশম শ্রেণীতে পড়তেন। এদের মধ্যে রওশন খালাম্মা সুন্দর ছোট গল্প ও কবিতা লিখতেন এবং নুরু আপা খুব ভাল আঁকতেন। তারা আমাকে ছোট বোনের মতো স্নেহ করতেন আবার বন্ধুর মতো ভালোবাসতেন। রওশন, সম্পর্কে আমার খালা হলেও স্কুল জীবনের বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করে আমাকে মাঝেমধ্যে চিঠি লেখেন। বর্তমানে চট্টগ্রামে তিনি সমাজ সেবায় নিয়োজিত। অষ্টম শ্রেণীর আখতার জাহান আপা, খালেদা আপা, এরা ব্যাডমিন্টন খেলতো স্কুলের মাঠে। আখতার আপার অপূর্ব সুন্দর চেহারা, লম্বা গড়ন, গোলাপের মতো রং। তিনি যখন ব্যাডমিন্টন খেলতেন

আমরা সকলে মুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। পরবর্তীকালে তার ফুফাতো ভাই মাহবুবের সাথে আমার বিয়ে হয়।

এরকম পরিবেশে আমাদের আনন্দের শেষ ছিল না। রোজ বিকেলে স্কুল থেকে এসে আমার খালাতো বোন রোকেয়া ও মামাতো বোন সাহেদা (সাদু), জুবলী এবং আমি চারজনে জোর আড্ডা জমাতাম। সাদু, জুবলীর এক ক্লাস নিচে পড়তো। আমরা একই পাড়ায় মানুষ। স্কুল থেকে এসে প্রায়ই সাদু আমাদের বাসায় আসতো। যদিও আমাদের দু'বোনের চেয়ে সে বয়সে ছোট, তার সঙ্গে আমাদের মধুর সম্পর্ক ছিল। সাদুকে আমরা অনেক সময় রসিকতা করে 'রেডিও রুমঘাটা' বলে সম্বোধন করতাম। কোন খবর যদি রুমঘাটায় কোন আত্মীয়কে জানাতে হয়, সাদুকে বললেই কিছুক্ষণের মধ্যে তা পুরো রুমঘাটায় প্রচার হয়ে যেত। সে লেখাপড়ায় ভাল ছিল, সংস্কৃতিমনাও বলা চলে। পরবর্তীতে নূরের সাথে তার বিয়ে হয়। নূর অত্যন্ত সুরসিক এবং মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ। পেশায় এডভোকেট, কিন্তু গান শোনা তার একটা নেশা। সাদুর এমন সহজ সুন্দর চরিত্র বোঝার জন্য নূর ভাইয়ের মতো একজন স্নেহপ্রবণ লোকেরই দরকার ছিল।

গুল-এ-জার স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেনীতে এসে ভর্তি হলো আনোয়ারা খুকু। সদ্য কলকাতা থেকে এসেছে। চমৎকার আবৃত্তি করে। একবার স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছিল। সকলে রিহার্সেলের জন্য জড়ো হয়েছি। খুকুকে অনুরোধ করতেই কোন জড়তা ছাড়াই মুহূর্তের মাঝে উঠে আবৃত্তি শুরু করে দিলো— 'আমি মোল্লা বাড়ির ঝি'। তার অপূর্ব বাচনভঙ্গি এবং নাটকীয় কায়দা দেখে সকলে পুলকিত হলো। সে স্বভাবে খুবই চটপটে ও প্রাণবন্ত ছিল। ক্রমে তার সঙ্গে আমার আন্তরিক বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। আমাদের রুমঘাটার বাড়িতে যে কোন অনুষ্ঠানে খুকুর উপস্থিতি আমাদের আনন্দমুখর করে তুলতো। মনে পড়ে সুচরিত চৌধুরীর সুরারোপিত 'ঝুমুর সুরে পাহাড়িয়ার বাঁশী বাজে'— এই গানের সাথে তাল মিলিয়ে খুকু ও জুবলী আমাদের বারান্দায় নাচতো। পরবর্তীকালে তাদের দু'জনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়।

বহু বছর পর নিউইয়র্কে ইউনিসেফের পানি ও পরিবেশ সংক্রান্ত একটি সভায় খুকুর স্বামী মনজুর আহমেদের সাথে দেখা। তিনি তখন ইউনিসেফের উপদেষ্টা। সভা শেষে আমাকে তাদের বাসায় নিয়ে গেলেন। খুকু যত্ন করে খাওয়ালো। অনেক রাত পর্যন্ত আমরা অতীতের স্মৃতিচারণ করলাম। মনজুর ভাই অত্যন্ত অমায়িক ও বিনয়ী। ইতোমধ্যে শিক্ষা বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে যথেষ্ঠ খ্যাতি অর্জন করেন। ইউনিসেফ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর মনজুর ভাই এবং খুকু এখন ঢাকায় বসবাসরত। ছোটবেলার সেই প্রাণবন্ত বন্ধুকে আমাদের মাঝে ফিরে পেয়ে আমরা গভীরভাবে আনন্দিত। মাঝে মাঝে আমরা নির্মল আড্ডায় মেতে থাকি আর ভাবি আমাদের যেদিন গেছে, একেবারেই কি গেছে ? রবীন্দ্রনাথের কাছে উত্তর পাই— রাতের সব তারাই থাকে দিনের আলোর গভীরে।

স্কুল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। গুল-এ-জার স্কুলে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেনী পর্যন্ত পড়ার সময়ের কয়েকজন শিক্ষকের কথা উল্লেখ না করে পারলাম না। এই সময় জ্যোস্নাদি,

রানীদি, রাবেয়া আপা— তাঁরা সকলে অত্যন্ত যত্ন সহকারে আমাদের পড়াতেন। স্নেহ-মমতারও কার্পণ্য ছিল না। বারবার পড়া বুঝে নেয়ার জন্য গেলেও কোন সময় তাঁরা বিরক্ত হতেন না। ললিতবাবু অঙ্ক, এলজেব্রা এবং জ্যামিতি পড়াতেন। এমন নৈপুণ্যের সঙ্গে পড়াতেন, যেন আমাদের সব মুখস্থ হয়ে যেত। বাসায় এসে আর বেশি কষ্ট করতে হতো না। পরীক্ষার সময় শুধু রিভিশন করলেই চলতো। আজকাল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে স্কুলের পড়া ছাড়াও প্রাইভেট কোচিংয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এই সকল পন্থা আমাদের অজানা ছিল। মনে পড়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় আমি কেবল দু'মাসের জন্য একজন প্রাইভেট শিক্ষকের কাছে পড়েছিলাম। অষ্টম শ্রেনী পর্যন্ত আরতীদি আমাদের ইংরেজি পড়াতেন। তাঁর ভয়ে আমরা সকলে সন্ত্রস্ত থাকতাম। তিনি ভাবগম্ভীর চেহারা এবং হাতে একটা স্কেল নিয়ে ক্লাসে আসতেন। প্রায় সবসময়ই মৌখিক পড়া নিতেন। তাঁর ভয়ে অন্য পড়া বাদ দিয়ে আমরা সব সময় ইংরেজি পড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম।

আমার বিয়ের পর আমরা কদমমোবারক হরিখোলার মাঠের বিপরীত দিকে একটা বাসায় থাকতাম। আমার স্বামী তখন রাজনীতি নিয়ে ভীষণভাবে ব্যস্ত। আমার মেয়ে মুন্নি ছোট। রোজ সন্ধ্যায় তাকে কোলে নিয়ে হাঁটতে যেতাম। এমনি একদিন সন্ধ্যায় হাঁটতে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম, ঠিক এই সময় আরতীদি এসে হাজির। আমি আগের মতোই একটু ভয় পেলাম। তিনি হেসে বললেন, তোমাকে দেখতে এসেছি। তোমার স্বামী আমাদের পরিবারের একজন রাজনৈতিক বন্ধু। তাঁর স্বামী সুধাংশুবিমল দত্ত একজন প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা এবং আমার স্বামীর বন্ধু। আরতীদিও কল্পনা দত্তের সহযোগী একজন কমিউনিস্ট নেত্রী। একথা স্কুলে পড়ার সময় জানতাম না এবং বুঝতামও না। তখন (১৯৫৪) চট্টগ্রামে নারীদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নারী সমিতি নামে একটি সংগঠন কাজ করত। এর সভানেত্রী ছিলেন মিসেস শওকত ওসমান এবং সম্পাদক ছিলেন ফওজিয়া সামাদ। আরতীদি আমাকে এই নারী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করেন। নারী সমিতির মাসিক বৈঠকে আমরা মিলিত হতাম এবং তৎকালীন রাজনীতি ও নারীর সামাজিক অবস্থার পর্যালোচনা করতাম। মনে আছে, একবার আমি, মাক্কি আপা (হোসনে আরা) এবং রেবেকা মহীউদ্দিন ভাষার দাবিতে এই সংগঠনের পক্ষে বিভিন্ন ইস্যুতে চট্টগ্রাম কলেজের কাছে রাস্তার ধারের দেয়ালে পোস্টার লাগিয়েছিলাম। সম্ভবত মেয়েদের দিয়ে রাস্তায় পোস্টার লাগানো চট্টগ্রামে এই প্রথম। মাক্কি আপার স্বামী ছিলেন একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। তিনি এই খবর শুনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। সরকারি কর্মকর্তার স্ত্রী হয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এতসব সত্ত্বেও মাক্কি আপা এরূপ কর্মতৎপরতা থেকে কোনদিন বিরত হয়নি। প্রগতিশীল রাজনীতির প্রতি তার ছিল অকুণ্ঠ সমর্থন। সারা জীবন তাকে এই বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হতে দেখি নি।

ইতোমধ্যে গুল-এ-জার বেগম স্কুলে কঠিন পরিশ্রম করে আমি লেখাপড়ায় ভাল ছাত্রী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করি। এতে আমার মেজ ভাই উৎসাহিত হয়ে আমি ও জুবলী দু'জনেই যাতে খাস্তগীরের মতো একটি বনেদী স্কুলে ভর্তি হতে পারি তার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠলেন।

Pioneer in village based website

খাস্তগীর স্কুলে

আমার মেজ ভাই লুৎফর রহমান একদিন আমাদের বহু প্রতীক্ষিত খাস্তগীর স্কুলে নিয়ে গেলেন। আমি নবম শ্রেনীতে এবং জুবলী অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা দিলাম। গুল-এ-জার স্কুলের ছাত্রী বলে প্রধান শিক্ষিকা লতিফা খাতুন, আমাদেরকে এক ক্লাস নিচে ভর্তি করতে চাইলেন। আমাদের খুব মন খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু মেজ ভাই নাছোড়বান্দা। তিনি লতিফা আপার সাথে আলোচনায় বসে গেলেন। বললেন, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি আমার বোনদের ভর্তি করলে ওরা দু'জনেই ভালোভাবে পাস করতে পারবে। প্রথম তিন মাসের জন্য ভর্তি করে তাদেরকে আপনার স্কুলে পড়ার সুযোগ দিন। যদি পড়াশোনায় ভালো ফল দেখাতে না পারে, তাহলে আমি নিজেই তাদের নিয়ে যাবো। আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আমার ভাইয়ের অনুনয়-বিনয়ের ফলে লতিফা আপা অগত্যা আমাদের তিন মাসের জন্য ভর্তি করলেন। এই তিন মাস অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে কাটল। অল্প সময়ের মধ্যে আমরা নতুন পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে কঠিন পরিশ্রম করে লেখাপড়ায় আশানুরূপ দক্ষতার পরিচয় দিলাম। ক্রমে লতিফা আপা আমাদের প্রতি সদয় হয়ে উঠলেন।

পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এবং বিখ্যাত চিকিৎসক ডা. বিধানচন্দ্র রায় কলকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে যে বাড়িতে জীবন কাটিয়েছেন সেটি ছিল ডা. অন্নদাচরণ খাস্তগীরের বাড়ি। বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজের জন্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন।

ইত্তেফাকের চট্টগ্রাম সংবাদদাতা খলিলুর রহমান এ ব্যাপারে কিছু মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন (দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ জুলাই ২০০৪)। তা এখানে সংযোজন করা প্রয়োজন মনে করছি। উনিশ শতকের শেষের দিকে চট্টগ্রামে নারী শিক্ষার আলো জ্বেলেছিলেন শিক্ষানুরাগী ডা. অন্নদাচরণ খাস্তগীর। বর্তমান জামালখান সড়কে ১৮৭৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটি ভার্নাকুলার স্কুল। নারী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে মাত্র সাতজন ছাত্রী নিয়ে একশ ছাব্বিশ বছর আগে সেই স্কুলটির যাত্রা শুরু হয়েছিল। চট্টগ্রামের সামাজিক আন্দোলনের পথিকৃৎ যাত্রামোহন সেন বিয়ে করেন ডা. অন্নদাচরণ খাস্তগীরের তৃতীয় কন্যা বিনোদিনীকে। ১৯০৬ সালে বিনোদিনীর অকাল মৃত্যু হয়। শোকাকুল যাত্রামোহন স্ত্রীর প্রতি সম্মান দেখিয়ে শ্বশুর ডা. খাস্তগীর প্রতিষ্ঠিত ভার্নাকুলার মধ্যবিদ্যালয়কে ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেন। এ লক্ষ্যে তাঁর এক খণ্ড জমিতে একটি স্কুল ভবন নির্মাণ করেন। ১৯০৭ সালে তিনি স্কুলটিকে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করেন। নাম রাখেন ডা. অন্নদাচরণ খাস্তগীর গালর্স স্কুল। এ বছরই সরকার স্কুলটি জাতীয়করণ করে। এই স্কুল চট্টগ্রামের প্রথম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।

রহমতগঞ্জে অবস্থিত খাস্তগীর স্কুল। গেট দিয়ে ঢুকতেই সামনে গোলাপ বাগান। বাম পাশে নানা রকম ফুলের বাগান। ডান পাশে বিরাট দোতলা স্কুল বিল্ডিং। নিচতলায় ছোট একটি কক্ষে অফিস। তারপর সাদা পর্দা দেয়া প্রধান শিক্ষিকার পরিপাটি কক্ষ। এরপর ক্লাস রুম। আমাদের নবম শ্রেনী নিচতলায়। তার পাশে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায়

Pioneer in village based website

উঠলেই দশম শ্রেনী। দোতলায় বাকিটা ডর্মিটরি, স্কুলের হোস্টেল। সব শেষের দু'টি রুমে ছিল লতিফা আপার নিবাস। দোতলায় আগাগোড়া বিস্তৃত বারান্দা।

নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে হয় যখন খাস্তগীর স্কুলের শিক্ষকদের কথা মনে পড়ে। রোকেয়া রহমান কবীর, এদেশের প্রগতিবাদী নারী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা এবং ফরিদপুরের সপ্তগ্রাম স্বনির্ভর নারী সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আমার একজন প্রিয় শিক্ষক। তিনি আমাদের ইতিহাস ও ভূগোল পড়াতেন। পড়াবার সময় কোনদিন বই বা নোট খুলতেন না। অনর্গল পড়িয়ে যেতেন। ইতিহাসে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য দেখে আমরা অভিভূত হতাম। অথচ জ্ঞানের অহংকার তার মধ্যে কোনদিন লক্ষ্য করি নি। স্বাধীনচেতা এবং স্পষ্টবাদী হিসেবে তিনি সবার কাছে পরিচিত ছিলেন। আমৃত্যু তাঁর সাথে আমার বিশেষ সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। তাঁর ছোট বোন রুবী গজনবী আমার একজন বন্ধু এবং একজন গুণী নারী।

অন্যদের মধ্যে নিরুপমাদি, স্নেহদি, গোলাপদি, পুষ্পদি, তাপসীদি - এরা ছিলেন খাস্তগীর স্কুলের বহুদিনের পুরোনো শিক্ষক। নতুনদের মধ্যে ছিলেন রোকেয়া আপা, ডলি আপা, হাসনা আপা, কামেলা আপা। তাঁদের কাছ থেকে কেবল পুঁথিগত বিদ্যা শিখিনি, জীবনভিত্তিক শিক্ষাও লাভ করেছি। পরবর্তীকালে কামেলা আপার মেয়ে ফারা কবীরের সাথে (ব্রিটিশ কাউন্সিলে চাকরিরত) আমার বিশেষ স্নেহের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অনেকবার আমরা নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। খাস্তগীর স্কুলে আমাদের অংক এবং বিজ্ঞান পড়াতেন মীর হোসেন স্যার। তিনি চট্টগ্রামের বিখ্যাত সরকারি মুসলিম হাই স্কুলের শিক্ষকতা শেষ করে অবসরপ্রাপ্ত জীবনে খাস্তগীর স্কুলে পড়াতেন। তাঁর মত শিক্ষকের সাক্ষাৎ আর কেউ কোনদিন পাবে কিনা জানি না। আমরা তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। তিনি একদিন আমাদের বিজ্ঞান পড়াবার সময় আঙুল দিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে দেখিয়ে বললেন, কারা প্রথম বিভাগে পাস করবে। কারা স্কলারশিপ পাবে। কারা অতিরিক্ত পরিশ্রম করলে প্রথম বিভাগে পাস করতে পারবে এবং কারা দ্বিতীয় বিভাগে পাস করবে। খাস্তগীর স্কুলের সুনাম ছিল। এই স্কুল থেকে কখনো কেউ ম্যাট্রিক পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে পাস করে নি এবং কেউ ফেলও করে নি। কিন্তু মীর হোসেন স্যার একজন ছাত্রীকে দেখিয়ে বললেন, তুমি তৃতীয় বিভাগে পাস করবে যদি খুব কষ্ট করে লেখাপড়া কর। তা না হয় পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবে।

আমরা সবাই অবাক হয়ে গেলাম, যখন দেখলাম মীর হোসেন স্যারের ভবিষ্যৎদ্বাণী হুবহু মিলে গেছে। একটুও হেরফের হয় নি। আমাদের সময়ের শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্কে এত সঠিক মূল্যায়ন করতেন, তার কারণ বোধকরি তাঁরা তাঁদের শিষ্যদের সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতেন। শিক্ষার্থীদের বুঝতে চেষ্টা করতেন এবং সর্বোপরি তাঁদের মধ্যে একটা মমত্ববোধ ছিল। ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্য নিয়ে তাঁরা গৌরববোধ করতেন। আজ হয়তো তাঁদের মধ্যে অনেকেই পৃথিবীতে নেই। তাঁদের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

খাস্তগীর স্কুলে সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল মনোরম এবং বিদ্যা-শিক্ষার সহায়ক। এখানে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ঋতুভিত্তিক উৎসব হতো। স্কুলের ছাত্রীরা গান, নাচ, আবৃত্তি

Pioneer in village based website

ইত্যাদিতে বেশ পারদর্শী ছিল। প্রতি শনিবার বিকেলে এবং রোববার স্কুলের সাপ্তাহিক ছুটির দিন আমরা বিখ্যাত শিল্পী কলিম শরাফীর কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখতাম। রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য প্রথমে তিনি আমাদের কয়েকটা গান শোনাতেন । 'তোমার অসীমে মন প্রাণ লয়ে' 'আজি বিজন ঘরে', 'শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে', 'আমি তখন ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে যখন বৃষ্টি নামল...'- এসব গান যখন কলিম ভাই গাইতে শুরু করতেন তখন আমরা বিভোর হয়ে গানের কথা ও সুর অনুভব করতাম। মনে হতো স্বর্গ থেকে এ গান ভেসে আসছে। কি অপূর্ব তাঁর কণ্ঠস্বর! আমরা সকলে তাঁর ভক্ত হয়ে গেলাম। এখনও আমরা এবং আমার পরিবারের সকলে কলিম ভাইয়ের গানের মূর্ছনায় আকৃষ্ট। পরবর্তীকালে জানতে পারলাম কলিমভাই আমার স্বামীর বিশেষ বন্ধু। এই সুবাদে তিনি আমাদের পরিবারে বন্ধুর আসনে অধিষ্ঠিত হলেন।

আমি ভর্তি হওয়ার আগে হালিমার বিশেষ বন্ধু ছিল নূরমহল। আমি যোগ দেয়ার পর হালিমা, নূরমহল এবং আমি তিনজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এছাড়া নূরজাহান, লতিফা, চেমন, লাকী, জলি, আয়শা, মোহসেনা, রেবা, শাহেদা, লিলি এদের সাথেও আমার বন্ধুত্ব ছিল। ক্লাসের সকলেই সকলের বন্ধু। এ একটা অপূর্ব পরিবেশ। এমনকি আমাদের অগ্রজ যারা ১৯৫০ এবং ১৯৫১ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন তাদের সাথেও আমাদের বেশ হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তাদের মধ্যে যাদের কথা বিশেষ করে মনে পড়ে তারা হলেন— প্রতিভা মুৎসুদ্দি (কুমুদিনী স্কুলের উপদেষ্টা), লায়লী বেগম, তালেয়া রেহমান (ডেমক্রেসি ওয়াচের নির্বাহী পরিচালক), হোসনে আরা কামাল (প্রফেসর), খালেদা খানম (পরবর্তীতে আমার মেজ ভাইয়ের সাথে বিয়ে হয়), নার্গিস আরা (প্রফেসর) এবং সেলিনা খান। পরবর্তীতে আমার দুই মামাতো ভাইয়ের সাথে সেলিনা আপা এবং নার্গিস আপার বিয়ে হওয়াতে তাদের সাথে আমার মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

খাস্তগীর স্কুলে আমরা প্রায় চৌদ্দজন ছাত্রী দশম শ্রেনীতে পড়ি। কিন্তু একসাথে ম্যাট্রিক পাস করি তেরজন। পরীক্ষার কয়েক মাস আগে লাকীর বিয়ে হয়ে যায়। আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ছিল হালিমা খাতুন। আমার সম্পাদিত স্কুলের দেয়াল পত্রিকায় নিয়মিত লিখত। ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের সময় হালিমা মেয়েদের মিছিলের নেতৃত্ব দেয়। আমরা সকলে মিছিলে অংশগ্রহণ করি। মনে পড়ে, তখন তালেয়া আপা ও প্রতিভাদির নেতৃত্বে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে একদল ছাত্রী এসে আমাদের মিছিলে যোগ দেয়।

হালিমা ফুল ভীষণ ভালোবাসতো। প্রায়ই স্কুলের বাগান থেকে তুলে আমাকে টকটকে লাল গোলাপ উপহার দিত। আমি ও হালিমা পরীক্ষায় সবসময় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করতাম। একবার হালিমা দ্বিতীয় এবং আমি তৃতীয় স্থান পেলে, পরেরবার ঠিক তার উল্টো হতো। আমরা দু'জনে কোনদিন প্রতিযোগিতা করি নি বা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে চিন্তা করি নি। কিন্তু নিয়মিতভাবে এইরূপ ফল হতো বলে আমরা অবাক হতাম। পরবর্তীতে হালিমা ইংল্যান্ড থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করে

ঢাকায় হোম ইকনমিকস্ কলেজে বহু বছর অধ্যাপনা করে। আমাদের সঙ্গে সব সময় প্রথম স্থান অধিকার করতো নূরজাহান। তাকে কেউ কোনদিন অতিক্রম করতে পারি নি। তার সঙ্গে আমাদের নম্বরেরও অনেক ব্যবধান থাকতো। কিন্তু আমরা আশ্চর্য হতাম, নূরজাহান সবসময় গল্পের বই পড়তো। তাকে পাঠ্যবই পড়তে সচরাচর দেখা যেত না। ম্যাট্রিক পাস করার পর সে আর পড়াশোনা করলো না। তার বিয়ে হয়ে গেল। সুগৃহিণী হয়ে সাতটি সন্তানকে সুযোগ্য করে গড়ে তুলেছে। তার সাথে এখনও যোগাযোগ আছে। অত্যন্ত সহজ-সরল প্রকৃতির মানুষ নূরজাহান। তার স্নিগ্ধ হাসি দিয়ে সকলকে জয় করে নেয়। আমরা সব বন্ধুরা কলেজে পড়তাম, কিন্তু নূরজাহান ঘর সংসার নিয়ে ব্যস্ত। তার অভাব অনুভব করতাম খুব। কলেজ থেকে একদিন সকলে মিলে তার বাসায় গিয়েছিলাম। তাকে জিগ্যেস করলাম, পড়াশোনায় এত ভলো হয়েও কেন আর পড়লে না। নূরজাহান হাসিমুখে উত্তর দিয়েছিল, না পড়ার জন্যইতো বিয়ে করলাম। আনুষ্ঠানিক লেখাপড়ার চেয়ে গল্পের বই ইত্যাদি পড়াকে তার বেশি পছন্দ ছিল। এখন সে পত্রিকায় সমসাময়িক সমস্যা নিয়ে নিয়মিত চিঠিপত্র লেখে। আমার সাথে যারা পড়তো তারা সকলে পরবর্তীতে বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করে। এরমধ্যে প্রায় ছয় জন ডাক্তার এবং কয়েকজন কলেজের অধ্যাপক, স্কুলের শিক্ষক, সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

আগেই বলেছি, আমি লেখাপড়ায় অত্যন্ত সাধারণ ছিলাম। কিন্তু কঠোর পরিশ্রম করে মেধাকে খাটিয়ে যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তা আমার জীবনে বারবার অনুভব করেছি। নিজের প্রচেষ্টার সাথে শিক্ষকদের এবং নিকট আত্মীয়-স্বজনের সহযোগিতাও অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করি লতিফা আপার সহযোগিতার কথা। আমরা বাসে করে স্কুলে আসা-যাওয়া করতাম। সেকেন্ড ট্রিপে বাসায় গেলে, ছুটির পর প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় পেতাম। তখন সকলে একসাথে খেলাধুলো করতাম। আমি যখন দশম শ্রেনীতে পড়ি, লতিফা আপা একদিন আমাকে ডেকে বললেন, আগামী সপ্তাহ থেকে স্কুল ছুটির পর তোমাকে আমি ইংলিশ পড়াবো। তুমি ইংরেজিতে বেশ দুর্বল। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস করতে হলে ইংরেজিতে ভালো করতে হবে। তাই রোজ বাসায় যাবার আগে তুমি দোতলায় আমার বারান্দায় গিয়ে পড়তে বসবে। লতিফা আপাকে আমরা সকলে যমের মতো ভয় করতাম। তাঁর পায়ের শব্দ পেলে আমরা পালিয়ে যেতাম। তাঁর এই কঠিন আবরণের মধ্যে এমন স্নেহমাখা মমত্ববোধ দেখে বিস্মিত হলাম। এরপর থেকে নিয়মিতভাবে ছুটির পর তাঁর বারান্দায় বই-খাতা নিয়ে বসে যেতাম। লতিফা আপা এসে আমাকে কাজ দিয়ে ঘরে চলে যেতেন। আবার মাঝে মাঝে এসে তদারক করতেন। এভাবে প্রায় তিন মাস আমি নিয়মিতভাবে তাঁর কাছে ইংরেজি পড়েছি, শিখেছি অনেক কিছু। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় যখন প্রথম বিভাগে স্কলারশিপ নিয়ে পাস করলাম সেদিন লতিফা আপাকে স্মরণ করেছিলাম কৃতজ্ঞতাভরে। তাঁর কাছে পায়ের ধুলো নিতে গিয়ে বলেছিলাম, তাঁর অকৃত্রিম সহযোগিতা না পেলে আমি এই সফলতা অর্জন করতে পারতাম না।

খাস্তগীর স্কুল থেকে চলে গেলাম। অনেক পথ অতিক্রম করে যখন ইউনিসেফে মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচির প্রধান হিসেবে কাজ করছিলাম তখন একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে

Pioneer in Village based Website

লতিফা আপা এলেন আমাকে দেখতে আমাদের ধানমণ্ডি অফিসে। বোধকরি আশির দশকের প্রথমদিকে। লতিফা আপা চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তাঁর ছোট বোন বানুর কাছ থেকে আমার কথা শুনেছেন। বললেন, তাঁর ছাত্রীর উন্নতি দেখে তিনি অত্যন্ত গর্বিত। আমি স্মৃতির গভীরে ডুব দিলাম। মুহূর্তের মাঝে সেই দিনগুলোতে ফিরে গেলাম, যখন খাস্তগীর স্কুলের দোতলার বারান্দায় লতিফা আপা আমাকে পড়াতেন। তাঁকে বললাম, আপা, আপনার কাছ থেকে শিক্ষা না পেলে আজ এই কাজের গুরু দায়িত্ব বহন করতে পারতাম না। আপনার কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ।

Chunati.com
Pioneer in village based website



আব্বা মাহবুবর রহমান এবং মা সাদীদা খানম



আব্বা মাহবুবর রহমান

Chunati.com
Pioneer in village based website



বড় ভাই হাবিবুর রহমান

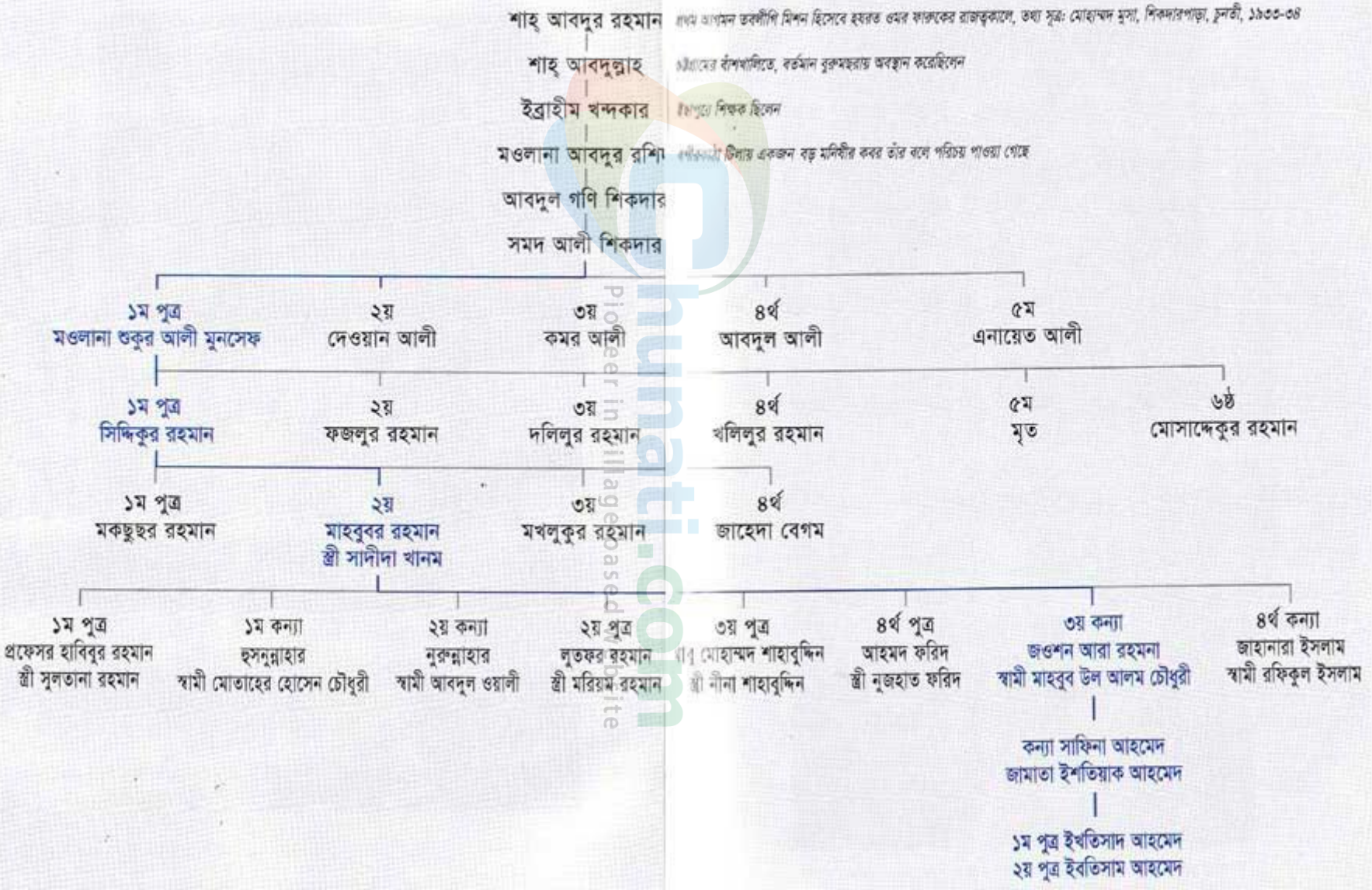


মেজভাই লুতফর রহমান



বাম দিক থেকে - মেজ বোন নুরুন্নাহার, বড় ভাবী সুলতানা রহমান, মেজভাই লুতফর রহমান, মা সাদীদা খানম, সেজভাই শাহাবুদ্দীন
আমি, বড় বোন হুসনুন্নাহার

জ ও শ ন আ রা র হ মা নে র ব ং শ প রি চি তি



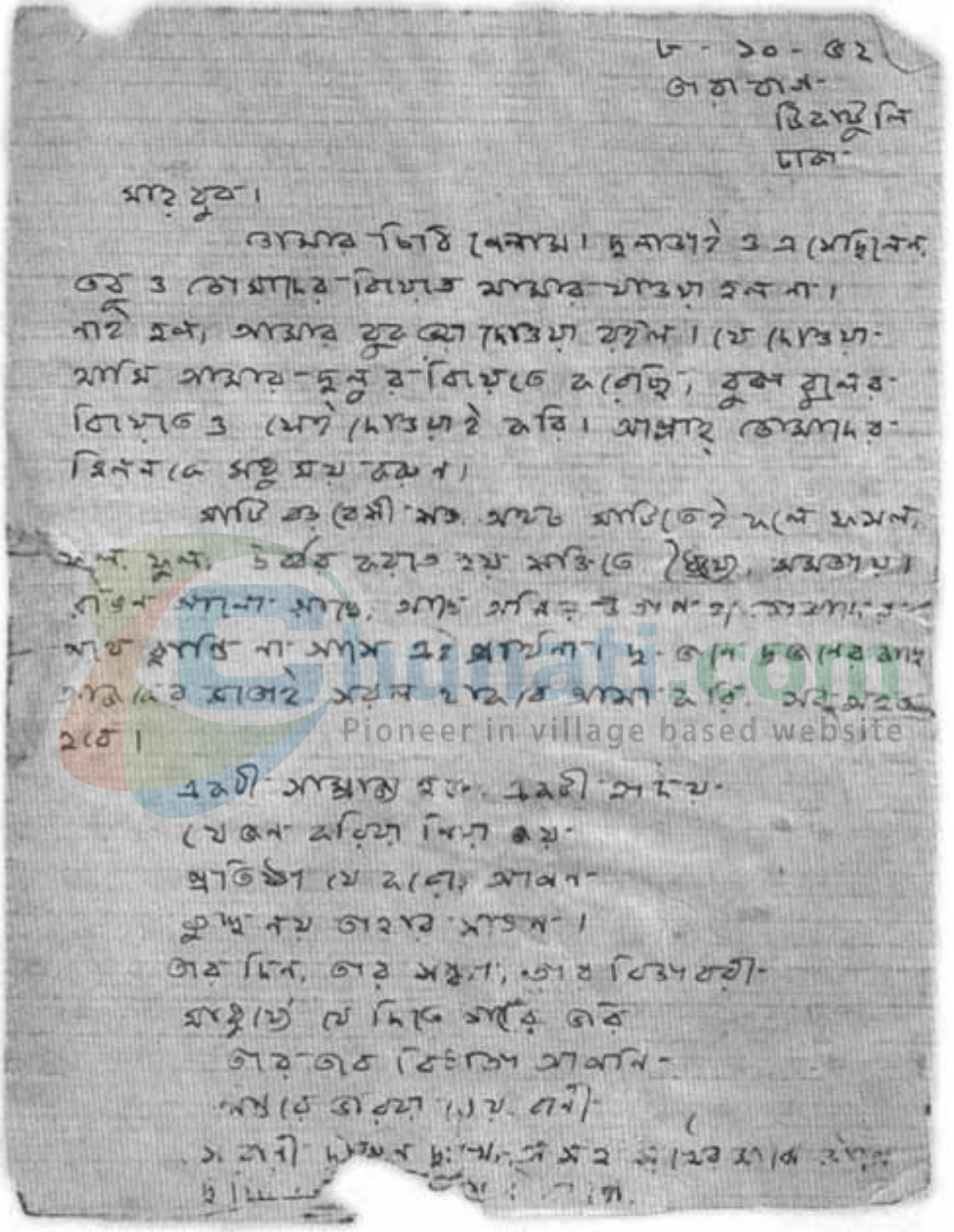


মায়ের সাথে পাঁচ বছর বয়সে

Chunati.com
Pioneer in village based website



খাস্তগীর স্কুল থেকে পতেঙ্গা সমুদ্রতীরে পিকনিকে বাম দিকে থেকে হালিমা, আমি আনজু, জলি, নূরজাহান, খালেদা, চেমন আরা



মামানীর চিঠি





মামানী সুফিয়া কামাল এবং মামা কামালউদ্দীন আহমদ খান

Chunati.com
Pioneer in village based website



মামানী সুফিয়া কামালের সাথে উত্তরার বাড়িতে

বিয়ের প্রস্তাব ও আমার বিদ্রোহ

বিয়ের প্রস্তাবে আমার বিদ্রোহ

১৯৫২ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়ার আগে আমি মাস দু'য়েক খাস্তগীর স্কুলের হোস্টেলে ছিলাম। তখন সবে আমার মেজ ভাইয়ের বিয়ে হয়েছে আমার মামাতো বোন খালেদা খানমের সাথে। এই উপলক্ষে বাসায় প্রচন্ড হৈ চৈ, রাতদিন মানুষের ভিড়। এই অবস্থায় আমার পরীক্ষার প্রস্তুতিতে বিশেষ ব্যাঘাত হচ্ছিল। তাই হোস্টেলে চলে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। মা রাজি হবে জানতাম কিন্তু ভয়ে আব্বাকে সরাসরি বলতে পারিনি। আমার মেজ ভাই লুৎফর রহমানের মাধ্যমে আব্বার কাছে প্রস্তাব দেয়া হলো। যথেষ্ট খোঁজ খবর নেয়া হলো। সেখানে কত ছাত্রী থাকে, মেট্রন কে, ইত্যাদি জানার পর আব্বা সম্মতি দিলেন। দু'মাস আমার হোস্টেলে বাস। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মেট্রন এবং প্রধান শিক্ষিকার কড়া নজরে থাকতাম। কিন্তু তার মাঝেও আমাদের অনেক স্বাধীনতা ছিল। প্রতিটি দিন যেমন লেখাপড়ায় ব্যস্ত থাকতাম, তেমনি আনন্দও করতাম। সকালে হোস্টেলের সুদীর্ঘ বারান্দায় সকলে একসাথে আধ্যাত্মিক গান গেয়ে আমাদের দিন শুরু হতো। তারপর নাশতা খাওয়া, লেখাপড়া, স্নান করা, স্কুলে পড়া— আবার বিকেলে খেলাধুলো, সন্ধ্যায় লেখাপড়া, রাতের খাবার, এভাবে দিনের শেষ হতো। খুব সম্ভব হোস্টেলে প্রায় একশ জনের মতো বিভিন্ন ক্লাসের ছাত্রী ছিল। নূরমহল এবং হালিমা অনেকদিন ধরেই হোস্টেলে ছিল। আমি তাদের সাথে যোগ দেয়াতে তিন বন্ধুর দিনগুলো কাটতো অশেষ আনন্দে। হলিমার মা ছিলেন আমাদের মেট্রন। তাঁকে আমরা খালাম্মা বলে ডাকতাম। আমরা যেমন তাঁকে ভয় পেতাম, তেমন শ্রদ্ধাও করতাম। প্রতিটি ছাত্রীর খুঁটিনাটি সমস্যা তিনি অহরহ সমাধান করতেন। আমরা সময়মত পড়ার ডেস্কে বসেছি কিনা, প্রতিদিন পুষ্টিকর খাবার আমাদের পরিবেশন করা হলো কিনা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। খালাম্মার জীবন সংগ্রামবহুল। পরবর্তীকালে তিনি আত্মজীবনীতে তাঁর বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন। প্রফেসর আনিসুজ্জামানের সম্পাদনায় কয়েক বছর আগে আত্মজীবনীটি প্রকাশিত হয়। এই বইতে তিনি খাস্তগীর স্কুলের স্মৃতিবিজড়িত অনেক কথা লিখেছেন।

হোস্টেলের আনন্দঘন দিনগুলোতে একদিন ছোট বোন জুবলী এসে খবর দিল আমাকে মেজ ভাই বাসায় যেতে বলেছে। হোস্টেল থেকে অনুমতি নিয়ে বিকেলে জুবলীর সাথে স্কুলের বাসে করে বাসায় গেলাম। তখন মা এবং আব্বা আমাদের চুনতী

গ্রামের বাড়িতে। রুমঘাটার বাসায় ছিলেন মেজ ভাই, ভাবি, জুবলী, সেজ ভাই ও ছোট ভাই। মেজ ভাই তখন আন্দরকিল্লায় মডেল ড্রাগ স্টোর নামে একটি ওষুধের দোকান দিয়ে ব্যবসা শুরু করেছেন। সেজ ভাই শাহাবুদ্দীন চট্টগ্রাম কলেজে ইকনমিক্স নিয়ে বি.এ পড়েন। অত্যন্ত বন্ধুবৎসল এবং পরোপকারী। এখনো গরিব আত্মীয়স্বজনের উপকার করতে পারলে দারুণ তৃপ্তি পায়। ছোট ভাই আহমদ ফরিদ আই.এ প্রথম বর্ষে পড়েন। সবসময় লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি তার বিশেষ অনুরাগ ছিল। আমার সব চেয়ে বড় ভাই চট্টগ্রাম কলেজের অর্থনীতির প্রফেসর হাবিবুর রহমান তাঁর পরিবারসহ কলেজ হোস্টেলের একটি কোয়ার্টারে থাকেন।

রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে মেজ ভাই আমার রুমে এসে বললেন, তোর সাথে জরুরি কথা আছে। আমি ভয় পেলাম, ভাবলাম আমাকে হোস্টেল থেকে হয়তো নিয়ে আসতে চায়, কারণ আমার জন্য প্রতি মাসে অনেক খরচ। আমি জড়সড়ো অবস্থায় বসে আছি, এমন সময় মেজ ভাইয়ের জরুরি কথার সূত্রপাত হলো। বললেন, তোর একটি বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। তোকে আমি এখানে বিয়ে দিতে চাই। মানুষের জীবনে সুযোগ একবারই আসে। তাই যখন সুযোগ আসে, তখন তার সদ্ব্যবহার করতে হয়। আশা করি তুই আমার কথায় রাজি হবি। মেজ ভাইয়ের এসব সাঙ্কেতিক এবং সুক্ষ্ম কথা শুনে আমি আকাশ থেকে পড়লাম। ছোটবেলা থেকে উচ্চ শিক্ষার জন্য আমার সুদৃঢ় বাসনা ছিল। স্বপ্ন ছিল শান্তিনিকেতনে পড়বো, প্রফেসর হবো, চাকরি করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবো। কিন্তু একি? দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় বিয়ের প্রস্তাব? এতো আমি কোনদিন ভাবিনি। যখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি তখনও মেজ ভাই তার বন্ধু ডাক্তার মোবিনুল হকের সাথে আমাকে বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তখনকার দিনে (১৯৪৯ সালের দিকে) বাল্যবিবাহ অহরহ হতো, যদিও আমাদের পরিবারে মেয়েদের সম্মতি না নিয়ে বিয়ে দেয়া হতোনা। মেজ ভাইয়ের বন্ধু হিসেবে আমাদের বাসায় মোবিনুল হকের যাতায়াত ছিল। তার প্রতি আমার যে কিছুটা দুর্বলতা ছিল না তা নয়, কিন্তু তাকে আমি ভালোবাসতে বা শ্রদ্ধা করতে পারিনি। হয়তো মনে মনে আমি যে ধরনের জীবন সঙ্গীর কথা কল্পনা করতাম— মোবিনুল হক এবং আকাঙ্খিত সেই মানুষটির সঙ্গে মিল খুঁজে পেতাম না। তাছাড়া এত কম বয়সে লেখাপড়া শেষ না করে আমার বিয়ে হবে, এ কথা কোনদিন ভাবতেও পারতাম না। বোধকরি এই দুর্বার মনোবল নিয়ে আমি এ বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। আমার মেজ ভাই এবং বড় আপা এতে খুব দুঃখিত হয়েছিলেন। আমার কাছ থেকে লিখিত কথা নিতে চেয়েছিলেন লেখাপড়া শেষ করে আমি যেন ডাক্তার মোবিনের সাথে বিয়ে করতে রাজি থাকি। আমি তাদের লিখিতভাবে জানিয়েছিলাম, লেখাপড়া আগে শেষ হোক, তারপর দেখা যাবে। তখন যদি আমার ইচ্ছা করে, তবে তার সাথে আমার বিয়ে হতে পারে। এই ঘটনার পর আমাকে আর কেউ হয়তো এখন বিয়ে দিতে চাইবে না, এরকম প্রত্যাশা নিয়ে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করেছিলাম।

মেজ ভাই নতুন প্রস্তাবের কথা আবার বলতে শুরু করলেন। এবার যার সাথে বিয়ের প্রস্তাব এসেছে— তিনি একজন সাহিত্যিক, কবি। চট্টগ্রামের নামকরা পরিবারের

ছেলে। তার সাথে বিয়ে হলে তোর জীবনের স্বপ্ন সফল হবে। শান্তিনিকেতনে পড়তে পারবি। এম. এ পাস করতে পারবি। ইত্যাদি আরো অনেক কিছু বললেন। সব শেষে পাত্রের নাম উচ্চারণ করলেন— চট্টগ্রামের মাসিক 'সীমান্ত' পত্রিকার সম্পাদক মাহবুব উল আলম চৌধুরী। তিনি সুচরিত চৌধুরীর বন্ধু। আমার বড় ভাই প্রফেসর হাবিবুর রহমানের প্রিয় ছাত্র। সুচরিত চৌধুরী এই প্রস্তাব এনেছে। আমাদের বাসায় সুচরিতদার নিত্য আনাগোনা। বাসায় সকলের সাথে তার একটি চমৎকার সম্পর্ক। আমার মা, ভাইবোন সকলের কাছে সুচরিতদা ছিলেন অত্যন্ত প্রিয়জন। মেজ ভাইয়ের সাথে তার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। সেজ ভাই তার কাছে বাঁশি বাজানো শিখতেন। সুচরিতদা বাঁশি বাদক হিসেবেও পারদর্শী ছিলেন। মেজ ভাই গান শিখতেন। আমরাও মাঝে মাঝে গান শিখতে বসে যেতাম। সুচরিতদা আমাদের দু'বোনকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। এই স্নেহের দাবি নিয়েই মাহবুব উল আলম চৌধুরীর সাথে আমার বিয়ের প্রস্তাব আনলেন। মাহবুব এবং সুচরিতদা ছোটবেলা থেকে অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। এই প্রিয় বন্ধুর সাথে আরেক বন্ধুর (মেজ ভাই) বোন তার স্নেহপ্রতিম বুলবুলকে (আমার ডাকনাম) বিয়ে দেয়ার জন্য সুচরিতদার আন্তরিকতার অন্ত ছিল না।

তখন মাহবুব উল আলম চৌধুরী চট্টগ্রামে খ্যাতির শীর্ষে। রাজনীতি এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানকারী ভূমিকার জন্য তিনি প্রগতিশীল মহলে সর্বত্র প্রশংসিত। মর্যাদা-বান মাসিক 'সীমান্তের' সম্পাদনা ছাড়াও ইতোমধ্যে প্রান্তিক নবনাট্য সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, চট্টগ্রাম জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক। রবীন্দ্র জয়ন্তী, নজরুল জয়ন্তী এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা হিসেবে কিছু কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তিনি আমাদের যুক্ত করেছিলেন। একবার চট্টগ্রাম কলেজে পড়ার সময় কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠানে নিজের রচিত ও সুচরিত চৌধুরীর সুরারোপিত একটি লোকসঙ্গীত, 'ও ব্রিটিশ কোম্পানি গাট্টী-বোচ্‌কা বাঁধি ধাইলানি' গান গেয়ে শ্রোতাদের চমকে দিয়েছিলেন। তখন আমরা গুল-এ-জার স্কুলে পড়ি। বড় ভাই আমাদের এই অনুষ্ঠানে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই থেকে তিনি আমাদের পাড়ায় বড় ভাইয়ের কাছে এলেই, সবাই তাকে দূর থেকে 'ব্রিটিশ কোম্পানি' এসেছে বলে কৌতুক করতো। আসলে তিনি গায়ক ছিলেন না। তার প্রিয় অধ্যাপক মোতাহের হোসেন চৌধুরী এবং এ.কে.এম. আহসানের আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে তাকে নাকি এই গান গাইতে হয়েছিল। সেই মাহবুব উল আলম চৌধুরীকে আমার পরিণয়প্রার্থী হিসেবে মেজ ভাই উল্লেখ করাতে আমি মনে মনে কিছুটা গর্ব অনুভব করলাম, কিন্তু আমার উচ্চশিক্ষা গ্রহণের প্রবল ইচ্ছার কাছে এই বিয়ে একটি বিঘ্ন বলে মনে হলো। তাৎক্ষণিকভাবে আমি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম। তখন মেজ ভাই আমাকে একদিন একরাতের সময় দিয়ে বললেন, সরারাত চিন্তা করে দেখ। তোকে জোর করবোনা। কিন্তু এ বিয়ে না হলে পরে হয়তো অনুতাপ করবি। আমরাতো তোকে এম.এ পর্যন্ত নাও পড়াতে পারি। একদিন তো তোকে বিয়ে দিতেই হবে। আর কারো সঙ্গে বিয়ে হলে তোর জীবনের মোড় ঘুরে গিয়ে হয়তো একজন সুগৃহিণী হতে পারবি— কিন্তু একজন সংস্কৃতিবান মানুষকে নিত্য সহচর হিসেবে নাও পেতে পারিস।

আমি রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে, অপমানে সারারাত কাঁদলাম। সকলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলাম। রাতে ভাত খেলাম না। সকালে নাশতা খেলাম না। শুধু চিন্তা আর চিন্তায় কখনো অস্থির, কখনো অন্যমনস্ক হয়ে উঠছিলাম। সামনে ম্যাট্রিক পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় ভালোভাবে পাস করার ওপর আমার ভবিষ্যত নির্ভর করবে। আমি ভাল ফলাফল করার দৃঢ়তা নিয়ে লেখাপড়া করছিলাম। এমন সময় আরেকটি অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে কঠিন দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গেলাম। সময় চলে যাচ্ছে। রাত কেটে গেছে। সকাল বয়ে দুপুর হয়ে গেছে। বিকালের রোদ সন্ধ্যা আকাশে বিলীন হয়ে গেছে। পরদিন সকালে হোস্টেলে চলে যেতে হবে। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর মনে শক্তি সঞ্চয় করে স্থির করলাম আমার বিয়ের পক্ষে মত দেব। কিন্তু শর্ত হলো আমাকে এম.এ. পর্যন্ত পড়াতে হবে। এতে কোন রকম বাধাবিপত্তি চলবে না। বিকেলে আধো-অন্ধকারে মেজ ভাইয়ের ঘরে গিয়ে আমার সিদ্ধান্তের কথা জানালাম। মেজ ভাই অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন, যাক্, অবশেষে তোর সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে। রাতে আব্বা এবং মা দেশের বাড়ি থেকে ফিরে এসে সব কথা শুনলেন মেজ ভাইয়ের মুখে। ইদানীং তাঁরা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তখনকার দিনে চৌদ্দ বছর বয়স হলেই মেয়েদের বিয়ে দেয়ার জন্য মা বাবার চিন্তার অন্ত থাকতো না। এই বিয়ের প্রস্তাবে আমার সম্মতি আছে জেনে তাঁরা আশ্বস্ত হলেন।

প্রথম দেখা

পরের দিন সকালে হোস্টেলে চলে গেলাম। কেমন যেন উদাসীন হয়ে উঠলো মনটা। লেখাপড়ায় মন বসে না। ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলাম, পরীক্ষায় যদি ভালো করতে না পারি? এর মধ্যে একদিন মাহবুব আমাদের বাসায় এলো। আমার কাছে একটা ছোট্ট চিরকুট পাঠালো। আমি সাহস করে খামটা খুলতে পারলাম না, আমার মায়ের হাতে দিয়ে দিলাম। মা বললেন, আলম তোর সাথে কথা বলতে চায়, এতে আমার কোন আপত্তি নেই। আব্বার নাম যেহেতু মাহবুবর রহমান, সে কারণে মা তাকে মাহবুব না বলে আলম বলে ডাকতো। সেই সময় মেয়েরা স্বামীর নাম মুখে উচ্চারণ করতো না। মা বললেন, আলমের সাথে দেখা করে আয়। আমার একা যেতে সাহস হলো না। সেজ ভাইকে সাথে নিয়ে বহু কষ্টে সেই রুমে ঢুকলাম। দেখলাম, এক তরুণ বসে আছে। সুদর্শন, ফরসা, উন্নত ললাট, পাতলা গড়ন, সাদা সার্ট ও পায়জামা পরা এবং পায়ে এক জোড়া স্যান্ডেল। কণ্ঠস্বর আকর্ষণীয়। তাকে আগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখেছি। কিন্তু আজকে মনে হলো সে আরেক মানুষ, আমার স্বপ্নলোকের বাসিন্দা। সেজ ভাইকে কানে কানে বললাম, তুমি মাহবুব ও আমার মাঝখানে বসবে। দারুণ লজ্জায় অবনত হয়ে কোন রকমে সেজ ভাইয়ের পাশে বসলাম। আমার পরনে একটি নীল পারের সাদা শাড়ি এবং নীল রং-এর ব্লাউজ ছিল। মাহবুব আমার পরীক্ষা কবে শুরু হবে ইত্যাদি ভূমিকা করে কথা বলা শুরু করলো। বলল, সুচরিতের কাছে তোমার কথা শুনে তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে। কিন্তু তুমি আমাকে কতখানি গ্রহণ করেছো, তা নিজের মুখে শুনতে

Ghumati.com
Pioneer in village based website

চাই। তাই তোমার সাথে কথা বলার আগ্রহ প্রকাশ করেছি। আমি রাজনীতি করি। যেকোন দিন জেলে যেতে পারি। আমার নামে হুলিয়া বের হতে পারে। এসব জেনেশুনে আমার সাথে বিয়েতে তোমার সম্মতি আছে কিনা, সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত হতে চাই। তবে একথা সত্যি যে, তোমার লেখাপড়ার যেন কোন ক্ষতি না হয় সে ব্যবস্থা আমি অবশ্যই করবো। এই বলে সে আমার উত্তরের অপেক্ষায় উদগ্রীব। রাজনীতির কথা শুনে প্রথমে আমি নির্বাক হয়ে গেলাম। ভাবলাম যে লোকটি আমার লেখাপড়া সম্পর্কে এত উৎসাহী এবং যে বাস্তবতার নিরিখে আমার জীবনে কি ঝুঁকি নিতে হবে তা সরলভাবে বলে ফেললো, সে একজন সত্যবাদী। তার মধ্যে কোন শঠতা নেই। একেতো সে কবি, তার ওপর একজন সত্যবাদী মানুষ। এসব চিন্তা করে তার প্রতি আমি আরো আকৃষ্ট হলাম। আমি সব সময় কবিতা ভালোবাসতাম। তাই যারা কবিতা লেখে তাদের প্রতি আমার আমোঘ আকর্ষণ ছিল। অনেকক্ষণ নিশ্চুপ থাকার পর সেজ ভাইয়ের হাত ধরে মাহবুবের কথার উত্তর দিলাম, হ্যাঁ, আমি তার সাথে ঘর করতে পারবো। আমার দু'হাত তখন কাঁপছিল। কণ্ঠ থেকে ভাল করে স্বর বের হচ্ছিল না। আসলে তাকে দেখেই আমি ভালোবেসে ফেলেছিলাম। সেজ ভাইয়ের কোলের ওপর আমার হাত দু'টো টেনে নিয়ে মাহবুব গোলাপি রুবির একটি আংটি আমার বাঁ হাতে পরিয়ে দিলো। তারপর বলল, যে মেয়ে আমার বাস্তব জীবনের দুঃখ সুখের সাথী হবে তার সঙ্গেই আমার বিয়ে হবে। তুমি আমার জীবন-সাথী হতে পারবে। আমার মাকে ডেকে আনা হলো। দু'হাত দিয়ে পা-ছুঁয়ে সে মাকে সালাম করলো। আমার মা মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে আশীর্বাদ করলেন। তারপর সে চলে গেলো। এভাবে আমাদের প্রথম প্রেমের সূচনা। প্রেমের অর্থ জানতাম, কিন্তু তার কী দারুণ যন্ত্রণা তা এই প্রথম অনুভব করলাম। আমার হাতে আংটি পরানোর মাধ্যমে আমাদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধনের সেতু রচনা হলো। আমরা দু'জনে ক্রমশ অভিন্ন ভাবতে শুরু করলাম।

প্রথম প্রেম

১৯৫২ সাল। সামনে ম্যাট্রিক পরীক্ষা। ভালো ফল করার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করতে শুরু করলাম। পড়তে বসি, বইয়ের পাতায় তার মুখ ভেসে ওঠে। বই বন্ধ করে আবার ভাবতে শুরু করি। এভাবে কয়েক দিন গেল। পরীক্ষা শুরু হবে, এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে। প্রথম দিন ইংরেজী ফার্স্ট পেপার। আগের দিন বিকেলে হঠাৎ সুচরিতদা একটি ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে এসে হাজির। তখন মোটর গাড়ি খুব কমসংখ্যক লোকের ছিল। আমাদেরতো ছিলইনা। আমাকে ছবি তোলার জন্য কোর্ট রোডে আর্ট গ্যালারি স্টুডিওতে নিয়ে যাবে। আমার ছবি বিয়ের 'শুভেচ্ছা'য় ছাপাবার জন্য তাদের বিশেষ দরকার। মায়ের অনুমতি নিয়ে চলে গেলাম। ফটো তোলা শেষে রাত আটটার দিকে বাড়ি ফিরে দেখলাম, সেজ ভাই আমার সাথে ভীষণ রেগে আছেন, পরীক্ষার সময় না পড়ে বাইরে গিয়েছি বলে। সেজ ভাই আমাকে পড়াতো। আমার প্রতি তার দারুণ বিশ্বাস ছিল, মন দিয়ে পড়লে পরীক্ষায় ভালো করতে পারবো। কারো কাছে সংবাদ পেয়ে শহরের অপর

প্রান্ত পাহাড়তলি থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষার সম্ভাব্য ইংরেজি প্রশ্ন যোগাড় করে এনেছে। প্রত্যেকটা উত্তর লিখে রেখেছে। আমি বাসায় ফেরার সাথে সাথে সেগুলো আমার হাতে দিয়ে বলল, ইংরেজি প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেছে। অনেকে কিনেছে। এসব প্রশ্নের উত্তর তোর মুখস্থ করতে হবে। রাত একটা পর্যন্ত কষ্ট করে সব প্রশ্নের উত্তর শিখলাম। পরদিন পরীক্ষার হলে গিয়ে দেখলাম, সেই প্রশ্নপত্র ভূয়া। মাত্র একটি ছোট এক্সপ্লেনেশান ছাড়া আর কিছুই সেখানে নাই। মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। যাহোক, মুখস্থ বিদ্যা না খাটিয়ে নিজে যা জানি তার ওপর নির্ভর করে পরীক্ষা দিলাম। ভূয়া প্রশ্ন-পত্র বিক্রি করার মাধ্যমে ছাত্রদের বিভ্রান্ত করে পয়সা রোজগার করার ঘটনা তখনো ছিল। কিন্তু তখনকার প্রশ্নগুলো ছিল ভূয়া আর আজকাল আসল প্রশ্নপত্রই বের হয়ে যায়।

তৃতীয় দিনে ইতিহাস এবং ভূগোল পরীক্ষা। চারটার সময় ছুটির ঘন্টা পড়লো। স্কুলের দফতরি এসে জানালো, আমার ভাই আমাকে নিতে এসেছে। খুশি হয়ে গেইটের বাইরে যেতেই দেখলাম, মাহবুব। আমি অপ্রত্যাশিতভাবে তার দেখা পেয়ে অনেকটা অপ্রস্তুত হলাম। মাহবুব তাদের স্টেশন ওয়াগেন গাড়ি নিয়ে এসেছে। আমাকে গাড়িতে তুলে বলল, পাছে তোমাকে আমার সাথে দেখা করতে না দেয়, সেই ভয়ে তোমার ভাই নিতে এসেছে বলে খবর পাঠিয়েছিলাম। আশা করি তুমি কিছু মনে করোনি। ওই সময়ে একজন পরপুরুষের সাথে কোন মেয়ে বাইরে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল না। বিয়ের আগে মাহবুবকে সকলে একজন পরপুরুষ বলে গণ্য করাটাই ছিল স্বাভাবিক।

গাড়িতে উঠে পথ চলছি। মাহবুব সোনালি রংয়ের একটি হাতঘড়ি পরিয়ে দিলো আমার ডান হাতে। সেই থেকে আমি ডান হাতে ঘড়ি পরি। আজও তার পরিবর্তন হয়নি। আমাকে একটা গোলাপ ফুল দিয়ে মাহবুব বলল, এটা আমাদের বাগান থেকে তোমার জন্য তুলে এনেছি। ফুলটা হাতে নিয়ে তার স্পর্শ অনুভব করলাম। দু'জনে কথা বলতে বলতে দেওয়ান বাজার, শুকুরআলী মুনসেফ লেইন, রুমঘাটার গলির মাথায় চলে এলাম। আমি গাড়ি থেকে নেমে নিমেষের মাঝে পায়ে হেঁটে গলির ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলাম, পাছে আমার আত্মীয়স্বজন কেউ দেখে ফেলে, এই ভয়ে।

বিয়ের তখনো পাকা কথা হয়নি। এমন সময় ২০ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২ সাল) রাতে খবর পেলাম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ অফিসে কর্মরত অবস্থায় মাহবুবের গায়ে জলবসন্ত দেখা দিয়েছে। সে চট্টগ্রাম জেলা সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক। ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্রদের ওপর গুলি চালনার খবর শুনে রোগাক্রান্ত অবস্থায় সেই রাতেই ভাষা শহীদদের উদ্দেশ্যে একটি সুদীর্ঘ কবিতা 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' রচনা করেছিল। রাতারাতি কয়েক হাজার কপি ছেপে দু'একদিন পর লালদিঘির ময়দানে বিশাল জনসভায় তা পাঠ করা হয়। তার একটি কপি আমার মেজ ভাইয়ের মাধ্যমে আমার হাতে এল। সুচরিতদা এসে বলল, মাহবুবের অবস্থা ভাল নয়। তার কবিতা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাকে পাহারা দেয়ার জন্য বাড়িতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। একটু সুস্থ হলেই তাকে জেলে নিয়ে যাওয়া হবে। মাহবুব তাদের মূল বাড়ির পাশে একটি স্বতন্ত্র বাড়ির দোতলায় থাকতো। একদিন আমার মা সুচরিতদার সাথে আমাকে নিয়ে মাহবুবকে দেখতে গেলেন। সুস্থ হয়ে উঠলেই তাকে

পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে। উৎকণ্ঠা এবং অনিদ্রায় আমি অস্থির। কীভাবে তার দিন কাটবে, কোথায় তাকে রাখবে, এসব ভাবতে ভাবতে আমি এক অনিশ্চয়তার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হলাম। কয়েকদিন পরে জানতে পারলাম একটু সুস্থ হয়ে উঠলে বোরখা পরে পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে মাহবুব বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় এবং আমার মেজ ভাইয়ের সহায়তায় আত্মগোপনে চলে যায়। অনেকদিন তার কোন খবর না পেয়ে আমি মানসিকভাবে ভীষণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়লাম। একদিন মেজ ভাইয়ের মাধ্যমে একটি চিরকুট পেয়ে আশ্বস্ত হলাম সে নিরাপদে আছে।

সিদ্ধান্ত নিলেন বড় ভাই

এই অনিশ্চয়তার পরিপ্রেক্ষিতে পারিবারিক বৈঠক বসল, বিশেষ করে বড় ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনার জন্য। বড় ভাই চট্টগ্রাম কলেজের প্রফেসর হাবিবুর রহমান ছিলেন আমাদের অভিভাবক। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির কৃতী ছাত্র। আগেই বলেছি, তখনকার দিনে মুসলমানদের মধ্যে এম.এ পাসের সংখ্যা ছিল নগণ্য। বড় ভাই ছিলেন সংস্কৃতিমনস্ক একজন রুচিবান মানুষ। আমার বিয়ের কথা পাকাপাকি হওয়ার পর তিনি আমাকে বলেছিলেন, প্রকাশনা উৎসবে মাহবুবের সম্পাদিত 'সীমান্ত'-এর প্রথম কপি কিন্তু আমিই কিনেছিলাম। সাহিত্য এবং গান-বাজনার প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ সবসময় দেখেছি। তিনি প্রথমে গঙ্গাপদ আচার্য পরে সৌরিন্দ্রমোহন দাশগুপ্তের (চুলুবাবু) কাছে সেতার শিখতেন। কলেজের যেকোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মুখ্য ভূমিকা পালন করতেন। আমি আর জুবলী, দুই বোনকে নাচ-গান করার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দিতেন। মনে আছে আমরা যখন খুব ছোট, তখনও তিনি কলেজ অনুষ্ঠানে আমাদের দিয়ে গান গাওয়াতেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় আমাদের বাড়িতেও মাঝে মধ্যে গানের আসর হতো। পরিবারের অভ্যন্তরে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে তোলার জন্য তিনি সব সময় সচেষ্ট থাকতেন। পরিবারের যেকোন ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। আমার বিয়ের প্রস্তাবের কথা আব্বা প্রথমেই তাঁকে জানিয়েছিলেন। তিনি তাঁর মতামত দেয়ার জন্য কিছুদিন সময় নিলেন।

ইতোমধ্যে নদীতে অনেক জল গড়িয়ে গেল। আমি এবং মাহবুব, আমরা পরস্পরের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট। বড় ভাই তখন চট্টগ্রাম কলেজ হোস্টেলে থাকেন। আজকালকার মতো তখন ঘরে ঘরে টেলিফোন ছিল না। আমাদের বাসায় বা বড় ভাইয়ের বাসায় কোথাও টেলিফোন ছিল না। তাই এদিকে কি ঘটছে তা অন্যদিকে রোজ খবর যেতনা। একদিন আমার বিয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার আলোচনা শুরু হলো। বড় ভাইয়ের মতামত জানার জন্য সকলে উৎসুক হয়ে রইল। সকলের কথা শোনার পর বড় ভাই বললেন, এই প্রসঙ্গে আমি অনেক চিন্তা করেছি। মাহবুব অত্যন্ত মেধাবী এবং আমার প্রিয় ছাত্র। কিন্তু সে সক্রিয়ভাবে বাম রাজনীতির সাথে যুক্ত, ভবিষ্যতে জেলে যেতে পারে। এরূপ অনিশ্চয়তার মধ্যে আমার বোনকে তার সাথে বিয়ে দেয়া আমি সমর্থন করতে পারি না। একথা শুনে আব্বা বিমর্ষ হয়ে পড়েন। মেজ ভাই এবং মা আমার মানসিক অবস্থার কথা চিন্তা করে এই সঙ্কট কিভাবে উত্তীর্ণ হওয়া যায় সেই

চিন্তায় উদ্বিগ্ন। বার বার বড় ভাইয়ের কাছে গিয়ে তাঁকে কিভাবে রাজি করানো যায় তার জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন। এক পর্যায়ে তাঁকে বলা হলো, আমি মাহবুবকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে চাই না। এমন সময় বড় ভাই মাহবুবকে একদিন তাঁর বাসায় ডেকে পাঠালেন। তাদের দু'জনের মধ্যে প্রায় কয়েক ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা হয়। তিনি আমার মনের অবস্থা উপলব্ধি করে এবং আমার মায়ের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে অবশেষে বিয়ের পক্ষে মত দেন। বড় ভাইয়ের কলেজস্থ বাসায় বিয়ের পাকা কথা হবার দিন ধার্য হলো। কিন্তু আরেক সঙ্কট দেখা দিলো বিয়ের কাবিনের মোহরানা নিয়ে। মাহবুবের মুরব্বিরা পাঁচ হাজার টাকা কাবিন দেয়ার প্রস্তাব করলো। আমার আব্বা এবং বড় ভাই দশ হাজার টাকার কমে রাজি হবেন না। এই অবস্থায় বিয়ে প্রায় ভেঙে যাওয়ার উপক্রম। তখনকার দিনে (১৯৫২), এমনকি এখনও, আমাদের দেশে কত তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে বিয়ে ভেঙে যায়। আমার মা বিচলিত হয়ে আমার মতামত চাইলেন। কাবিন যদি এক টাকাও হয়, আমার বিয়ে এখানেই হবে। যদি এ বিয়ে ভেঙে যায়, তবে আমাকে আর কোনদিন বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করো না, এই বলে আমি মায়ের বুকে মুখ রেখে সেদিন ভীষণভাবে কেঁদেছিলাম। মা মাহবুবকে ডেকে পাঠালেন। মাহবুব মাকে আশ্বস্ত করেছিল সেদিন। পরে দু'দিকের প্রস্তাবের মাঝামাঝি সাড়ে সাত হাজার টাকায় কাবিন নির্ধারিত করে বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেল। তার পরেও নতুন সঙ্কট। দুর্ভাগ্যবশত একদিন সিনেমা হলে মাহবুবের মামি আমাকে দেখে ফেলেন। তাঁদের বাড়িতে সকলে ফরসা এবং সুন্দর। তার মধ্যে আমি কালো। এই কালো মেয়েকে আমাদের পরিবারে বউ করে আনলে মোটেই মানাবে না– এই বলে মামি বেঁকে বসলেন। মাহবুব ভীষণ চিন্তিত হয়ে সুচরিতদার স্মরণাপন্ন হয়। পরে দুই বন্ধু কিভাবে মামির সম্মতি আদায় করেছিল জানিনা। হয়তো মাহবুবের সুদৃঢ় আগ্রহের কথা ভেবে তিনি রাজি হয়েছিলেন। কারণ মামি মাহবুবকে খুবই স্নেহ করতেন।

eBanglaLibrary.com
Pioneer in village based website

এত ঝড় ঝাপটার মধ্যে ম্যাট্রিক পরীক্ষা হয়ে গেল। প্রথম বিভাগে পাসও করলাম। পরীক্ষা শেষ হতেই মাহবুবের বিরুদ্ধে হুলিয়া থাকার কারণে সংক্ষিপ্তভাবে আমাদের আক্‌দ হয়ে গেল। আক্‌দ অনুষ্ঠানে মাহবুবদের পক্ষ থেকে আশীর্বাদ করতে এসেছিলেন তার নানা শেখ রফিউদ্দীন সিদ্দিকী, নূর আহমদ চেয়ারম্যান (চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটি), দুলাভাই দেলোয়ার হোসেন এবং আরো অনেক গণ্যমান্য অতিথি। কিন্তু তাদের সকলেই ছিলেন পুরুষ। পাকা কথায় মহিলা অতিথি আসার রীতি তখনো আমাদের দেশে চালু হয়নি। তখনকার দিনে রফিউদ্দীন সিদ্দিকী ছিলেন চট্টগ্রামের একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, বিত্তবান এবং রেয়াজউদ্দীন বাজারের মালিক। তিনি ছিলেন মাহবুবের মামির পিতা, মাহবুবের পিতৃসম মামা আহমদ সাগীর চৌধুরীর শ্বশুর। আক্‌দের দিন আমার আব্বা রফিউদ্দীন সিদ্দিকীর হাতে আমাকে তুলে দিয়ে বলেছিলেন– আমি আপনাদের কাছ থেকে আর কিছুই চাইনা, আমার মেয়ের একমাত্র ইচ্ছা এম.এ পাস করা। আমাকে কথা দেন, তাকে আপনারা উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ দেবেন। নানা এই ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আশ্বস্ত করেন। শ্বশুরকুলের সকলে অবাক হয়েছিল সেদিন আব্বার কথা শুনে। তাঁরা মনে করেছিলেন বিয়ের সময় মেয়ের জন্য কত ভরি সোনার

অলংকার দেয়া হবে ইত্যাদি আব্বা জানতে চাইবেন। সেই সময় কনেপক্ষ বরপক্ষের সঙ্গে দেনা-পাওনা নিয়ে দর কষাকষি করতো। প্রাধান্য পেত কনেপক্ষ। আজকাল এই সংস্কৃতি সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়ে সমাজে যৌতুক প্রথা চালু হয়েছে। ফলে মেয়েরা পণ্যে পরিণত হয় এবং তাদেরকে নানা ধরণের নির্যাতনের শিকার হতে হয়।

বিয়ের অনুষ্ঠান ও আমার নেক্‌লেস

মাহবুব আত্মগোপন অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে আবার আমাদের মধ্যে ফিরে এলো। ১০ অক্টোবর (১৯৫২) কলেজ হোস্টেলে আমাদের বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উভয় পক্ষের আমন্ত্রিত আত্মীয়স্বজন এবং গণ্যমান্য ব্যক্তি থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের রাজনীতিবিদ, সংস্কৃতিবান ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। তখন যদিও বর্ষাকাল ছিল না, সেদিন সারাদিন মুষলধারে বৃষ্টি পড়েছিল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ এবং বৃষ্টির সুর যেন আমার মনের বেদনার কথা বলছিল। আমাকে মা-বাবার লালিত আশ্রয় ছেড়ে চলে যেতে হবে অন্য জগতে। সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি থামল। মোটর শোভাযাত্রা সহকারে ব্যান্ড বাজিয়ে বরযাত্রী আসতে শুরু করলো। বহুলোকের সমাগম হয়েছিল সেদিন। বিয়ে উপলক্ষে দেশ বিদেশ থেকে বহু শুভেচ্ছা বাণী এসেছিল মাহবুবের কাছে। শুভেচ্ছা পাঠিয়েছিলেন উদয় শঙ্কর, অমলা শঙ্কর, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, আবুল ফজল, সুফিয়া কামাল, আবদুল গনি হাজারী, শওকত ওসমান, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সর্দার জয়েনউদ্দীন, নূরজাহান মুরশিদ, সাইদুল হাসান, সুচরিত চৌধুরী এবং আরো অনেকে। এই শুভেচ্ছা সংবলিত একটি সংকলন বের করেছিলেন 'সীমান্ত' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক সুচরিত চৌধুরী এবং মাসিক 'উদয়ন' পত্রিকার সম্পাদক রুহুল আমীন নিজামী। এর প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন তৎকালীন 'সীমান্ত' পত্রিকায় কর্মরত পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত শিল্পী বিজন চৌধুরী। কলেজের ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে হোস্টেল বিল্ডিং, মঞ্চ ইত্যাদি সাজিয়েছিলেন এবং নিজেরাই খাবার পরিবেশন করেছিলেন। মাহবুবের গ্রামের বাড়ি গহিরা থেকে বাস ভর্তি লোক এসেছিল। মামার বাড়ির পক্ষ থেকে এসেছিলেন ছোট মামা লুৎফে আহমদ চৌধুরী এবং অন্যান্য মামাতো ভাইবোনরা। মনে পড়ে শ্বশুর বাড়ির পক্ষে মামি খুরশীদ জাহান বেগম এবং আমাদের পক্ষে আব্বার নামে প্রথাসিদ্ধ চিঠি ছাপানো হয়েছিল। এছাড়া শ্বেত কপোত আঁকা আরেকটি নিমন্ত্রণপত্র মাহবুব এবং আমার যুগ্ম নামে ছাপানো হয়েছিল। এই রকম একটা অভিনব বিয়ের চিঠি দেখে সকলে অবাক হয়েছিল। যদিও এখানে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। এসব নতুন আইডিয়া মাহবুবের মাথাতেই আসতো।

আমার বিয়েতে প্রচুর উপহার সামগ্রী পেয়েছিলাম। লন্ডন থেকে সাইদুল হাসান (একাত্তরের শহীদ) এবং ফরিদা হাসান পাঠিয়েছিলেন পলরবসন ও অন্যান্য বিখ্যাত গায়ক-গায়িকাদের অনেকগুলো রেকর্ড। মাহবুবের বিশেষ ভাল লেগেছিল প্রান্তিক নবনাট্য সংঘের তরফ থেকে কলিম ভাইয়ের দেয়া হাওয়ার্ড ফাষ্টের ফ্রিডম-রোড,

Pioneer in village based website

স্পার্টাকাস, রোমা রঁল্যার I Will Not Rest ইত্যাদি। এতগুলো মূল্যবান উপহার সামগ্রীর মধ্যে মাহবুবের এই গ্রন্থপ্রীতি দেখে তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল। স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানের ফটো তোলার দায়িত্ব নিয়েছিলেন চট্টগ্রামের নাট্যশিল্পী সুদক্ষ ফটোগ্রাফার সেজ ভাইয়ের বন্ধু মাহবুব হাসান। অনেক ফটো তোলা হয়েছিল। কিন্তু হয়তো কোন যান্ত্রিক কারণে একটা ফটোও ঠিকমত ওঠেনি। এভাবে আমরা বঞ্চিত হলাম জীবনের এই বিশেষ দিনের স্মৃতি থেকে।

আমাকে সাজাবার জন্য প্রচুর শাড়ি গহনা দিয়েছিল শ্বশুরবাড়ি থেকে। মিষ্টিও এনেছিল অনেক। জিনিস গাড়ি থেকে নামছে তো নামছেই, তা আর যেন শেষ হয়না। এত শাড়ি গহনা দেখে আমার আত্মীয় স্বজনরা বিস্মিত হয়েছিলেন। যথারীতি আপ্যায়নের মধ্য দিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ হতে চট্টগ্রামের রেওয়াজ অনুযায়ী রাত প্রায় তিনটা বাজলো। এবার আমার বিদায়ের পালা। আমার মা ক্রন্দনরত অবস্থায় আমাকে মামির হাতে তুলে দিলেন। আমাকে কোলে করে নিয়ে একটি সেভ্রলেট গাড়ির পেছনের সিটে বসিয়ে দেয়া হলো। আমার একপাশে মামি ও তাঁর ছোট ছেলে মোর্শেদ এবং অন্যপাশে আমার ননদ সারওয়ার বসেছিল। মাহবুব একই গাড়িতে সামনের সিটে। প্রথমবার বৌকে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় কনে আর বরকে একসাথে বসানোর সংস্কৃতি তখনও গড়ে ওঠেনি। বৌকে শ্বাশুরির পাশে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো। আমাদের গাড়ি ছেড়ে দিল। হোস্টেলে কান্নার রোল উঠল। ভোররাতের দিকে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে পৌছলাম।

নদীর একূল ভাঙে ওকূল গড়ে। আমার জীবনেও এলো ওকূল গড়ার আহবান। ভয় পেলাম, পারবোতো গড়ে তুলতে? সেদিন মাহবুবের আশীর্বাদ চেয়েছিলাম একটি চিঠির মাধ্যমে। লিখেছিলাম, যে পথে অগ্রসর হয়েছি, সে পথের বন্ধুরতাকে যেন মসৃণ করে তুলতে পারি, এই প্রার্থনা করো ।

আমার অনুপস্থিতি ছোটবোন জুবলী কিছুতেই মেনে নিতে পারলোনা। আমার বিয়ের দিন থেকে তার ভীষণ জ্বর। যতদিন আমাদের বাড়িতে আমি ফিরে আসিনি ততদিন সে অসুস্থ ছিল। আমরা একে অন্যকে ছাড়া থাকবো, একথা কোনদিন ভাবতে পারতাম না। সময়ে মানুষের সব কিছু সহ্য হয়ে যায়। ক্রমে আমাকে ছাড়া জীবনে সে অভ্যস্থ হয়ে উঠলো।

বিয়ের পরের দিন বিকেলে মাহবুব এসে সবচেয়ে ভারি গহনা সোনার নেকলেসটি আমার কাছ থেকে নিয়ে গেল। সেই গলার হারটির কী হলো, কোথায় গেলো, তা আর কোনদিন তাকে জিগ্যেস করিনি। আমাদের বাড়িতে যখন এক সপ্তাহ পর ফিরে গেলাম, আত্মীয়রা যথারীতি আমার অলঙ্কার দেখতে চাইলো। তখন মা আমার বড় নেকলেসটি দেখাতে বললেন। সেই নেকলেসটি যে মাহবুব নিয়ে গেছে, তা আর মা'কে জানতে দিলাম না। বললাম, ওটা অনেক ভারি, তাই আনিনি। শ্বশুর বাড়িতে ফিরে যাওয়ার পর মামিও অনেকবার ওই নেকলেসের কথা আমাকে জিগ্যেস করেন। আমি কোন সদুত্তর দিতে পারিনি। বিয়ের প্রায় পনেরো বছর পরে একজন বন্ধুর মুখে শুনেছিলাম আমার হারটি মাহবুব বিয়ে উপলক্ষে তার রাজনৈতিক দলের ফান্ডে জমা দিয়েছিল।

মাহবুব চার বছর বয়সে মা'কে হারায়। বাবাকে হারিয়েছে দশ বছর বয়সে। ছোটবেলায় গ্রামে কখনো জেঠাইমার কাছে, কখনো নানার বাড়িতে তার সময় কেটেছে। এমনি টানাপোড়েনের মধ্যে থেকে সে একদিন শহরে চলে গেল তার মেজমামা আহমদ সাগীর চৌধুরীর কাছে। তখন মামার কোন নিজস্ব বাসভবন ছিল না। তিনি লালদিঘির পশ্চিম পাড়ে নিজের প্রতিষ্ঠিত জুবিলী ওভারসিজ ব্যাংকের পেছনে ভাড়াটে বাসায় পরিবার নিয়ে থাকতেন। তাঁর স্ত্রী চট্টগ্রামের ধনাঢ্য এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি শেখ রফিউদ্দীন সিদ্দিকীর কন্যা। মাহবুব মামা-মামির প্রশ্রয়ে বড় হয়ে উঠতে লাগল। পরবর্তীকালে এনায়েত বাজারে মামা বাড়ি তৈরি করেন। ১৯৪৯ সালে মামার অকালমৃত্যু হলে মাহবুবকে অতি অল্প বয়সে তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য, বিশেষ করে চট্টগ্রামে খুরশীদ মহল ও কলকাতায় নির্মীয়মান সিনেমা হল অঞ্জনের হাল ধরতে হয়। মামি মাহবুবকে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসতেন এবং তার ওপর অনেকটা নির্ভরশীলও ছিলেন। আমি মামিকে মাতৃসম শ্রদ্ধা করতাম এবং তিনিও আমাকে পুত্রবধুর মতো স্নেহ করতেন। আমার বিয়ের পর আমাকে এনায়েত বাজারে তাঁদের বাড়িতে তোলা হয়।

বিশাল এলাকা। বাড়ি সেগুন কাঠের বেড়া এবং টিনের ছাউনি দিয়ে তৈরি। পাশে বিরাট একটি দোতলা বাড়ি তৈরি হচ্ছিল। দক্ষিণ দিকে একটি দ্বিতল পাকা-পুরোনো বাড়ি। এই বাড়ির দোতলায় মাহবুব থাকতো। উল্লেখ্য, ঐ বাড়িতে রোগ শয্যায় মাহবুব তার বিখ্যাত একুশের প্রথম কবিতা "কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি" রচনা করে। মামার বড় মেয়ে আখতার জাহান আপা গুল-এ-জার স্কুলে আমার এক ক্লাস ওপরে পড়তো। আমার বিয়ের বছরখানেক আগে তার বিয়ে হয় দেলোয়ার হোসেনের সাথে। তারা নন্দনকাননে একটি একতলা বাড়িতে থাকতো। সপ্তাহে একবার বাপের বাড়ি আসতো। আখতার আপা মাহবুবের সবচেয়ে প্রিয় বোন। আমারও একজন শুভাকাঙ্খী। আজ সে পৃথিবীতে নেই। কিন্তু তার দেয়া শাড়িগুলো আমার আলমারিতে গোছানো আছে। প্রতি ঈদে সে আমাকে শাড়ি উপহার দিতো। দুলাভাই দেলোয়ার হোসেন এখনো সেই ট্রেডিশন বজায় রেখেছেন এবং ভাবির মর্যাদায় আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। তিনি, জাহেদ ভাই, মোকাম্মেল মামা এবং মাহবুব আমাদের বাড়িতে মাঝে মধ্যে আড্ডায় বসেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুল সম্পর্কিত আলোচনাতেই চার বন্ধু বেশিরভাগ সময় ব্যয় করেন। দেলোয়ার দুলাভাই একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। নিজ গ্রামে পিতার নামে বেলায়েত হোসেন বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই বয়সেও (৭৯) স্কুলের উন্নয়নের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। সেদিন দেখতে গিয়ে উপলব্ধি করলাম এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী স্কুল। টাংগাইলের দেলদুয়ার থানায় নাল্লাপাড়া গ্রামে এই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় পনেরো'শ। এখানে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ার সাথে সাথে উপার্জনের পথও যেন খুঁজে পায় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদের হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়া হয় যেন তা বাস্তব জীবনে ব্যবহার করতে পারে। তাদের কর্মক্ষেত্র কেবলমাত্র স্কুলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

তারা সামাজিক কার্যকলাপের সাথেও সম্পৃক্ত। এমনকি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ও এই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা দুর্দশাগ্রস্থ মানুষকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করে। তাদের মধ্যে সম্প্রীতি, প্রাণচাঞ্চল্য এবং তাদের লেখাপড়ার মান দেখে মনে হলো সদিচ্ছা থাকলে অজপাড়াগাঁয়েও এরকম আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব।

যাহোক, আখতার আপার ছোটভাই, আমার প্রিয় দেবর জাহেদ আসগর চৌধুরী থাকতো আমার পাশের ঘরে। সে তখন চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুলে নবম শ্রেণীর ছাত্র। তার সাথে আমি গল্প করে কিছু সময় কাটাতাম। মাঝে মাঝে সুচরিতদা এসে আমাকে সঙ্গ দিত। মাহবুবকে অধিকাংশ সময় কাছে পেতাম না। সে খুরশীদ মহল এবং অন্যান্য কাজকর্ম সেরে রোজ রাত বারোটা-একটার দিকে বাসায় ফিরতো। রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য সে গ্রাম-গ্রামান্তরে চলে যেত। কোন কোন দিন রাতেও ফিরতো না। একাকীত্ব জীবনে আমি মামিকে সাংসারিক কাজে সহায়তা করতাম এবং তাঁর দ্বিতীয় মেয়ে সারওয়ার জাহানের সাথে গল্প গুজব করে সময় কাটাতাম। ও তখন নন্দনকানন স্কুলের ছাত্রী। মাহবুবের রাজনৈতিক কাজ কর্মের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। আবার গান শুনতেও খুব পছন্দ করত। খুরশীদ মহলে হিন্দী ছবি দেখে এসেই সেই গানগুলো রেডিওগ্রামে বাজাতো। সারাদিন ধরে আমরা গান শুনতাম।

তাদের বাড়িতে দু'তিনটি গাড়ি ছিল। আমি গাড়ি করে কলেজে যেতাম। কোন দিন গাড়ি না থাকলে রিকশায় যেতাম। এ বাড়ির বউ হয়ে রিকশা চড়ে কলেজে যাওয়া মামি মোটেই পছন্দ করতেন না। তাই অনেক সময় আমাকে ক্লাসে অনুপস্থিত থাকতে হতো। তিনি প্রায় বলতেন, মেয়েদের বেশি লেখাপড়া করার দরকার নেই। এ বাড়ি ছিল একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। মামির সীমিত কজন আত্মীয়স্বজন ছাড়া আর কারো বাড়িতে তাদের যাতায়াতও ছিল না। তাঁরা বাস করতেন এক ক্ষুদ্র সামাজিক গন্ডীর মধ্যে। একমাত্র সিনেমায় যাওয়া-আসা ছাড়া তাদের আর কোন বিনোদন ছিল না বললেই চলে। চলমান সংস্কৃতি থেকে তারা ছিল বিচ্ছিন্ন। ওই বদ্ধ পরিবেশে আমি আহত পাখির মতো ছটফট করতাম। আর আমার ডায়রি ভরে উঠতো আমার কান্না, বেদনা এবং নিজেকে গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয়ে।

সেদিন বইয়ের শেলফ থেকে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW) পুস্তিকাটি খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ পেয়ে গেলাম পঞ্চাশ বছর আগের লেখা আমার সেই পুরাতন ডায়রি। ভাবতে ভালো লাগলো, ওই বয়সে আমি কি করে নারীর ক্ষমতায়নের কথা এমন গভীরভাবে অনুভব করেছিলাম।

ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে কলেজে পড়ছি। বয়স তখন সতেরো বছর। পাঠ্য বইয়ের বাইরের জগতে তেমন আনাগোনা আমার ছিল না, রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতা, গল্প, নাটক এবং শরৎচন্দ্রের কিছু উপন্যাস ছাড়া। তাই বিয়ের পর মাহবুবকে বলেছিলাম— আমাকে গড়ে তোলার দায়িত্ব তোমার।

সেই সময়ের মানসিকতার প্রতিফলন হিসেবে আমার ডায়রির কয়েকটি পাতা এখানে হুবহু তুলে দিলাম।

Chuadanga.com
Pioneer in village based website

এনায়েত বাজার, চট্টগ্রাম
২৯.১.৫৩ সাল

আজ ম্যাকসিম গোর্কির 'পৃথিবীর পথে' বইখানা শেষ করলাম। বেশ লাগলো। বইটি গোর্কির জীবনের কতগুলো অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি নিয়ে লেখা। এর সহজ সরল কথাগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট করে ফুটে উঠেছে। আত্মজীবনের স্মৃতি নির্বিবাদে লিখে গেছে গোর্কি। তার প্রতিটি ছত্রে ফুটেছে তখনকার রুশ সমাজের স্পষ্ট রূপটি। কত নগ্ন রূপ ছিল সে সমাজের— কত কদর্য্য ছিল। নারীদের কতোখানি অত্যাচার সহ্য করতে হতো— তাদের উপর কতোখানি ব্যভিচার চলতো, তার বর্ণনা পাওয়া যায় গোর্কির 'পৃথিবীর পথে' বইটিতে। পুরুষের চোখে মেয়েরা ছিল কেবল উপভোগের বস্তু। নারীরাও যে শিক্ষিতা হতে পারে, সমাজ যে তাদের দ্বারা উপকার পেতে পারে, একথা তখনকার রুশেরা কল্পনাই করতে পারতোনা। ছেলেদেরও শিক্ষিত হতে দেয়ার চেষ্টা কারো ছিল না। যারা নিজের চেষ্টায় পড়তে চাইতো তাদের বলা হতো নাস্তিক। বইয়ের নাম শুনলে তারা আঁৎকে উঠতো। এরকম সমাজে সর্বহারা গোর্কি জেগে উঠলো দারুণ তেজ নিয়ে, মনোবল নিয়ে— সমাজের কদর্যতার বিরুদ্ধে বিপ্লবী হয়ে। সমাজের যত পঙ্কিলতাকে তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করলেন— যা সুন্দর, যা সত্য তাকে গ্রহণ করলেন।

পৃথিবীর পথের পরিসমাপ্তি করলেন তিনি শপথ নিয়ে— অধ্যয়ণের শপথ। বললেন— "নিজের জন্য আমাকে কিছু একটা করতেই হবে, নতুবা ধ্বংস হয়ে যাবো।"

গোর্কির এ কথাটি আমার মনে অত্যন্ত বেশি দাগ কেটেছে। মনে হচ্ছে যেন আশ্বাসের বাণী শুনতে পেলাম। নিজের জন্য নিজেকেই করতে হয়— কেউ করেনা। নির্জীব হয়ে বাঁচতে আর পাচ্ছিনা। চারিদিকে নিরাশ হয়ে ফিরছি। পৃথিবীর কিছুর সংগে নিজেকে যেন খাপ খাওয়াতে পাচ্ছিনা। তাই বড় কষ্ট পাই। সব শক্তি হারিয়ে ফেলছি। এখনও নিঃশেষ হয়ে যাইনি। তবে তাকে ঠিক পথে চালিয়ে নেয়ার কান্ডারী নেই। আগে বিশ্বাস করতাম যার হাতে নিজেকে তুলে দিয়েছি, সেই আমাকে গড়বে। কারণ প্রথম দিনেই আমাকে গড়ে তোলার দায়িত্ব তাকে দিয়েছিলাম আমি। তার কাছে স্বীকার করেছিলাম আমি কিছুই জানিনা— বড় কাঁচা। সে জোরালো শক্তি দিয়ে আমায় বলেছিলো— "পাকা মাল চাইনি বুলবুল, কাঁচা মালই চেয়েছিলাম, নিজের হাতে, নিজের মনের মতো করে তাকে গড়বো— তাকে আমার চেয়েও বড় করবো।" আনন্দে সেদিন আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম— কতো স্বপ্ন দেখেছিলাম। ভেবেছিলাম আমরা দু'জন সুস্থ সংসারী না হয়ে হবো অন্যরকম। অন্যান্যদের মতো আমি কেবল উপভোগের বস্তু নয়— সকল ক্ষেত্রে আমি হবো তার বন্ধু, তার সহযোগী। কিন্তু আজ ? আজ আমি একজন সংসারী ছাড়া কিছু নয়। আমার কাজ শুধু সংসার চালিয়ে যাওয়া। সংসারের একঘেয়েমি আর সহ্য করতে পাচ্ছিনা— তাই মনের দিক থেকে এত বেশি দুর্বল হয়ে যাচ্ছি দিন দিন। এমনি নিষ্প্রাণ হয়ে মানুষ বাঁচতে পারে কি ? বাঁচবার পথ খুঁজে পাইনা আমি। কেমন করে মানুষকে বাঁচতে হয়— তাও যেন ভুলে যাচ্ছি। মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। মাহবুব তোমার কাছে কৈফিয়ৎ চাই, কেনো তুমি আমার দায়িত্ব নিয়েছিলে?

আমাকে কেবল স্ত্রী করে রেখেছো— আমি বন্ধু হতে চেয়েছিলাম, তুমি করলেনা। আমার মনটা বড় ছোট হয়ে আছে। কারো কাছে আমি তোমার স্ত্রী বা বন্ধু বলে পরিচয় দিতে লজ্জা পাই কারণ পাছে তোমার দৈন্য ফুটে উঠে— তারা আমাকে চিনে ফেলবে— তাতে আমার সম্মানের হানি হবে— কারণ তোমার স্ত্রী হতে যতটুকু যোগ্যতা প্রয়োজন ততটুকু আমার নেই। তাই আমি শান্তি পাইনা। এবার ভাবছি "নিজের জন্য আমাকে কিছু করতেই হবে নতুবা ধ্বংস হয়ে যাবো।" এটা ভেবে আশ্বস্ত হলাম, শক্তি পেলাম মনে আবার। তাই গোর্কির 'পৃথিবীর পথে' বইখানাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কারণ সে নৈরাশ্যের মাঝে আলোর সন্ধান দিয়েছে আমাকে।

এনায়েত বাজার, চট্টগ্রাম
২১শে ফেব্রুয়ারি, ৫৩ সাল

মাহবুব,

কত বড় কথা তুমি আমায় বললে। বললে, আমি তোমাকে পেছনের দিকে টানছি। আশ্চর্য্য, তুমি আমার মনের কথা আজো বোঝনা। তোমায় পেছনের দিকে টানার চেষ্টা কোনদিন করিনি— করবোনা। যদি কোনদিন কোন ভুল মুহূর্তে তোমার প্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াই, তবে সেদিন আমায় শাস্তি দিও— কঠোরতম শাস্তি।

তুমি দেশের কাজে পা বাড়িয়েছো— এটা আমার সৌভাগ্য। নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থকে বড় করে না দেখে মানুষের স্বার্থকে বড় করে দেখেছো— এও আমার সৌভাগ্য। এজন্য আমি মনে মনে দারুণ শান্তি পাই। ক্ষুদ্র গন্ডীর মাঝে বেঁধে রাখতে আমি চাইনা— গৃহমুখী করতে তোমায় চাইনা— তুমি বিশ্বমুখী হও— বিশ্বের মানুষের জন্য লড়াই কর।

Pioneering village based website

এনায়েত বাজার, চট্টগ্রাম
১লা মার্চ, ১৯৫৩ সাল

আজ আমার বহুদিনের একটি প্রতীক্ষিত দিনের সংগে সাক্ষাৎ হলো। আজকের এই দিনটিকে বহুদিন থেকে কামনা করছিলাম। আজ তুমি আমায় শিখিয়ে দিলে কি আমার পড়তে হবে। শুধু মুখে বলে দিলেনা, লিখেও দিলে। তোমার কাছ হতে এই চেয়েছিলাম মাহবুব। এতদিন দাওনি বলে মনে মনে খুবই দুঃখ পেতাম— তোমার সংগে অভিমান করতাম কিন্তু মুখটা আমার কথা কইতে চায়না। তোমার সংগে অভিমান করতাম এজন্য আমি নিজে থেকে চেয়ে নেবো কেন, তোমার কেন কোন আগ্রহ নেই আমাকে শেখাবার— আমাকে গড়বার। তোমার হাতে তোমার মনের মতো করে গড়বো— এ একটি বিরাট আমার আশা ছিলো। অথচ তুমি আমার এ আশাকে সফল করার জন্য কোন আগ্রহ দেখাওনি কোনদিন— তাই কাঁদতামও, তাই রাগও করতাম, দুঃখও পেতাম। অথচ তোমার বুলু এতবেশী মুখচোরা। সে কোনদিন তোমার কাছে প্রকাশ করেনি তার মনের এ বিরাট আশাটা। তাই তুমি বুঝতে পারবেনা তোমার কাছ হতে

জানবার, তোমার কাছ হতে শিখবার তার কতো বেশি আগ্রহ। আমার এ আগ্রহের মূল্য জানিনা তোমার কাছ হতে পাবো কিনা কোনদিন।

সেদিন ভীষণ খুশি হয়েছিলাম। মাহবুব আমাকে বিভিন্ন বইয়ের নাম দিয়ে একটা পাঠ্যক্রম তৈরি করে দিয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে ইতিহাসের ধারা, সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস, মানব সমাজ, জওহরলাল নেহেরুর বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ, রবীন্দ্রনাথের কালান্তর, দেবী প্রসাদের চার পা থেকে দু'পা এবং পৃথিবীর ইতিহাস ইত্যাদি পড়তে দিয়েছিল। এই বইগুলো আমার এতই কঠিন মনে হতো যে এসব বোঝার জন্য প্রত্যেকটা কয়েকবার পড়তাম। মাহবুবের স্মরণাপন্ন হতে হতো প্রায়ই। যদিও তাকে পাওয়া খুব সহজসাধ্য ছিল না।

সব বইগুলো পড়েছিলাম কিনা মনে পড়ছেনা। তবে নিঃসন্দেহে চেষ্টা করেছিলাম। পরবর্তী জীবনে দেশে-বিদেশে সমাজ বিজ্ঞান পড়তে গিয়ে এই বইগুলোর প্রতিপাদ্য বিষয় আমার বিশেষ কাজে লেগেছিল।

এনায়েত বাজার, চট্টগ্রাম
২২শে এপ্রিল ১৯৫৩ সাল

পৃথিবীতে বেঁচে থাকলে মেয়ে পুরুষ সকলকে স্বাধীন হওয়া উচিত। স্বাধীন কেবল চলাফেরার দিক দিয়ে বা মনের দিক দিয়ে নয়, স্বাধীন টাকা পয়সার দিক দিয়েও হতে হবে। সাধারণত আমাদের দেশের স্ত্রীরা টাকার দিক দিয়ে স্বাধীন তবে সে টাকা তাদের নিজেদের শ্রম দিয়ে উপার্জন নয়— সে টাকা তাদের স্বামীর শ্রম দিয়ে উপার্জন। কিন্তু তা দিয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন হওয়া যায়না কারণ, সে টাকা খরচ করতে একটা সংকোচ থেকে যায়। কারণ তারা মনে করে— 'আমাদেরও হাত পা আছে, আমাদেরও শ্রম করার শক্তি আছে, কিন্তু আমরা তা করিনা— তাই নিজেকে স্বামীর কাছে বিরাট একটা বোঝা বলে মনে করি। তাই তাদের টাকা খরচ করতে বা তাদের কাছে থেকে টাকা চাইতে আমাদের এত সংকোচ।'

এই বোধ আমার জন্মেছিল একটি বিশেষ কারণে। তখন মাহবুবদের ম্যানেজার প্রতি মাসে আমাকে খরচের টাকা দিত। তার কাছ থেকে এই টাকা কয়েকবার চেয়ে নিতে হতো। মাহবুব এই ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকতো। সে মনে করতো প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে আমাকে টাকা দেয়ার জন্য তার নির্দেশ তাদের ম্যানেজার মেনে চলে। কিন্তু বাস্তবে তা হতোনা। আমার বারবার চাইতে হতো। এই ব্যাপারে আমার প্রতিক্রিয়া তাকে জানতে দিইনি কোনদিন। তখনই উপলব্ধি করেছিলাম— মেয়েদের স্বাধীনভাবে রোজগার করার প্রয়োজন আছে।

আমার যন্ত্রনার বোঝা ডায়রিতে ব্যক্ত করে মনকে হালকা করার চেষ্টা করতাম। এবং চেষ্টা করতাম মাহবুবের মাতৃসম মামির সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার।

মামি ও আমার মধ্যে এত ভালো সম্পর্ক দেখে আত্মীয়রা এবং ঐ বাড়ির কর্মচারীদের মধ্যে অনেকে ক্রমশ ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ

আমার বিরুদ্ধে মামিকে উস্কে দিয়ে তাঁর সহানুভূতি আদায় করার চেষ্টা করে। তিনি অত্যন্ত সরল প্রকৃতির ছিলেন, যে যা বলত সবই বিশ্বাস করতেন। একবার এক তোষামোদকারী আত্মীয়া এবং এক কর্মচারি মামির মাথায় ঢুকিয়ে দিল যে আমি নাকি তাঁদের মেরে ফেলার জন্য যাদু-টোনা করেছি। এই মর্মে একদিন সিঁড়ির নিচ থেকে একটি তাবিজও তোলা হলো। আমি বিস্ময়ে হতবাক। এই সময় আমাকে কঠোর ধৈর্যের পরিচয় দিতে হয়। এর সঙ্গে উল্লেখ করতে চাই আমাদের গ্রামে-গঞ্জেও যাদু-টোনা করার প্রচলন আছে। এটা এক ধরনের ঠক্‌বাজি। তাবিজ তোলার নাম দিয়ে ধনাঢ্য পরিবারের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা আদায় করার কৌশল। তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশের সুযোগ নিয়ে এক ধরণের টাউটরা এসব কার্যকলাপে নিয়োজিত হয়। এসব কুসংস্কারের প্রতি আমাদের কোন প্রকার আস্থা ছিল না। আমাদের অবস্থা ছিল একান্ত মধ্যবিত্তের। কঠিন নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে আমাদের থাকতে হতো। মায়ের উপদেশ ছিল, সব সময় শ্বশুরবাড়ির মুরব্বিদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং ছোটদের প্রতি স্নেহশীল থাকবে। আমার মা আমার প্রকৃত শিক্ষক ছিলেন। মানুষের জীবনে মায়ের অবদান কেউ অস্বীকার করতে পারেনা। মা আমাকে প্রায়ই বলতেন, যে কোন কঠিন কাজে ধৈর্য হারাবেনা। মনে শক্তি সঞ্চয় করবে। আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে। তিনি অবশ্যই সাহায্য করবেন। মা মনেপ্রাণে ধার্মিক ছিলেন কিন্তু কখনো তাঁর মধ্যে গোঁড়ামী দেখিনি। তাঁকে একজন প্রগতিশীল মা বললেও বেশি বলা হবেনা। এর প্রমাণ আমরা জীবনে বহুবার পেয়েছি।

শ্বশুরবাড়ির কথায় ফিরে আসি। তখন সবে ফজলুল হক-ভাসানী এবং সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচন লড়াই করার উদ্দেশ্যে। মাহবুব ছিল চট্টগ্রাম জেলা যুক্তফ্রন্ট কর্মী শিবিরের আহ্বায়ক এবং মামির বাবা রফিউদ্দিন সিদ্দিকী ছিলেন যুক্তফ্রন্টের প্রতিপক্ষ মুসলিম লীগের প্রার্থী। এই সময় মাহবুবকে রফিউদ্দীন সিদ্দিকীর ছেলে সাইফুদ্দীন সিদ্দিকী এবং মামি নির্দেশ দিলেন মুসলিম লীগের পক্ষে তাঁদের বাবার জন্য প্রচারণায় নামতে। যদিও মানুষ হিসেবে নানা রফিউদ্দীন সিদ্দিকীকে তাঁর অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য মাহবুব সবসময় শ্রদ্ধার চোখে দেখতো কিন্তু নানার জন্য নিজের আদর্শ বিসর্জ্জন দেয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। একদিকে তাবিজ তোলার ঘটনা, অন্যদিকে রাজনৈতিক আদর্শ, এই দুই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মাহবুব বিনীতভাবে মামির নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করে। এতে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাতে মাহবুবের এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না। এক বছর শ্বশুরবাড়িতে বাস করার পর আমার মেজ ভাইয়ের সহায়তায় আমরা কদমমোবারকে একটা ছোট্ট বাসায় চলে গেলাম।

এখন এসব ঘটনা আমার কাছে একেবারে মূল্যহীন। কারো প্রতি বিদ্বেষ বশত বা কোন ক্ষোভের কারণে এসব লিখিনি। কেবল তখনকার দিনের সামাজিক চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। মামি এখন ইহজগতে নেই। তাঁকে আল্লাহ স্বর্গবাসী করুন। বর্তমানে তাঁদের সকলের সঙ্গে আমার প্রীতির সম্পর্ক।

বিপন্ন সময়

কদমমোবারকে বিপন্ন সময়

কদমমোবারকের ছোট্ট বাড়িটি যদিও পাকা ছিল তাতে বিদ্যুৎ এবং পানির ব্যবস্থা ছিল না। এরকম অস্বাস্থ্যকর ঘরে থাকতে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম না। আমার মেয়ের বয়স তখন কয়েক মাস। কাজের লোক ছিল না। মাহবুবের বন্ধু মাসিক উদয়ন পত্রিকার সম্পাদক রুহুল আমিন নিজামী 'সীমান্ত' অফিস থেকে বাদশা বলে একজন কাজের ছেলে পাঠিয়েছিল। সে এবং আমি কোনমতে ছোট্ট সংসার সামলাতাম। তখন যুক্তফ্রন্টের যুগ। রাজনৈতিক কর্মীদের প্রায় খাওয়াতে হতো। প্রতিদিন প্রচুর কর্মী আসতো মাহবুবের কাছে। তাদের আপ্যায়ন করতে হতো। মাহবুব তখন গণতন্ত্রী দলের জেলা কমিটির সম্পাদক। মফিজুল ইসলাম এবং মাহবুবের কয়েকজন বন্ধু 'সীমান্ত' অফিসে থাকতেন। তারা প্রায়ই এসে আমাদের বাসায় আড্ডা দিতেন। আরো আসতেন প্রফেসর আহসাব উদ্দীন। তিনি সদ্য কুমিল্লা কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাঁশখালীর নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রার্থী হয়েছেন। একদিন বিরাট এক মাছ নিয়ে আসলেন মিরসরাইর জনাব মাহফুজুল হক। তিনিও মিরসরাই এলাকা থেকে নির্বাচনী প্রার্থী। বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় বক্তৃতা দেয়ার জন্য মাহবুবকে নিয়ে টানাটানি। তার এই ব্যস্ততার জন্য আমি এখানে এসেও আবার নিঃসঙ্গ হয়ে গেলাম। ভাগ্যিস দু'জন প্রতিবেশীকে বন্ধু হিসেবে পাই। একজন সাজেদা চৌধুরী, সদ্য বিবাহিতা। অন্যজন আই.সি.আই'র একজন কর্মকর্তা আমজাদ হোসেনের স্ত্রী ডলি। দু'জনের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতালাম। উভয়ে আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং মাহবুবের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অবগত। সেই থেকে সাজেদার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক অব্যাহত আছে। এভাবে তার সাথে আমার ছোট বোন জুবলীরও প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সাজেদা এবং তার স্বামী গোলাম আকবর চৌধুরী, দু'জনেই জুবলীর গানের অনুরাগী। সাজেদার মেয়ে শ্যামা, ছেলে সাজেদ আকবর এবং তার স্ত্রী চমৎকার রবীন্দ্রসংগীত গায়। যখনি বলি তারা এসে আমাদের গান শোনায়।

আমাদের কদমমোবারক বাসার পেছনে থাকতেন ডাক্তার মাসুদ খান। তার ছোট ছেলে আমার মেয়েকে মুন্নি বলে ডাকত। সেই থেকে তার নাম হয়ে গেল মুন্নি। মাহবুবের মামি আদর করে নাম রেখেছিলেন সাফিনা। আমাদের কত সাধ ছিল বাংলায়

একটি সুন্দর সংক্ষিপ্ত নাম রাখব। তার বাবা কত ছেলেমেয়ের নামকরণ করেছে। সীমান্ত, প্রান্তিক, কৃষ্টিকেন্দ্র, অন্বেষা ইত্যাদি তারই দেয়া নাম।

একবার মুন্নির ভীষণ ডায়রিয়া হয়। রক্ত পায়খানা করতে করতে সে প্রায় মুমূর্ষু হয়ে পড়লো। তার বাবা তখন কক্সবাজারে ব্যবসার কাজে ব্যস্ত। মেয়ের সিরিয়াস অবস্থা জানিয়ে তাকে টেলিগ্রাম করা হলো। তখন কোন পাবলিক টেলিফোনের ব্যবস্থা ছিল না। আত্মীয়স্বজন এবং আশেপাশের লোকেরা আমার মেয়েকে দেখতে এলো। প্রায় শেষ অবস্থা। রাত বারোটায় পেছনের বাড়ি থেকে ডা. মাসুদকে আনা হলো। তিনি বললেন, একটি নতুন ওষুধ সম্প্রতি বাজারে এসেছে। যদি এটা আজ রাতের মধ্যে খাওয়ানো যায় তাহলে হয়তো তাকে বাঁচানো সম্ভব হতে পারে। লালদিঘির পশ্চিম পাড়ে আমার মেজ ভাইয়ের মডেল ড্রাগ স্টোর নামে একটি ফার্মেসি ছিল। সেখানে কাজ করত আমার জেঠাতো ভাই মাহমুদ বন্দা। তাকে ডেকে পাঠানো হলো। বলা হলো, যেকোন মূল্যে এই ওষুধ যোগাড় করে আনতে হবে। তিনি বহু কষ্ট করে রাত দু'টোর দিকে একটি দোকান জোর করে খুলিয়ে ওষুধটি জোগাড় করে আনলেন। ভোররাত থেকে মুন্নিকে এই ওষুধ খাওয়ানো শুরু হলো। এই সময় কক্সবাজার থেকে তার বাবা ফিরে এলো এবং মেয়ের অবস্থা দেখে খুবই ঘাবড়ে গেল। দুপুরে আরেক ডোজ দেয়ার পর তার অবস্থার কিছুটা উন্নতি দেখা গেল। চোখ খুলে মেয়ে আমার দিকে তাকালো। মনে হলো আমি হারানো মেয়েকে ফিরে পেলাম। বিকেলে ডাক্তার মাসুদ এসে তাকে দেখে আমাদের অভয় দিয়ে বললেন, ওষুধ কাজ করেছে। এ যাত্রা আপনার মেয়ে আশা করি বেঁচে গেছে। তাকে খুব সতর্কতার সঙ্গে পরিচর্যা করবেন। আল্লাহ আমাদেরকে একটি ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে রক্ষা করলেন।

Ghurati.com
Pioneer in village based website

আমরা এনায়েত বাজার থেকে আসার পর বেশ আর্থিক সংকটে ছিলাম। আমাদের এই দুঃসময়ে মাহবুবের বন্ধুরা নানাভাবে সাহায্য করে। এই সময় মাহবুবের এক উর্দুভাষী বন্ধু ফিল্ম ইকুপমেন্টের জেনারেল ম্যানেজার রিজভী পাঁচ হাজার টাকা মাহবুবের হাতে দিয়ে বললেন, এ টাকা আপনাকে সাহায্য হিসেবে দিচ্ছি না, আপনি বিব্রতবোধ করবেন না। আপনি আমাদের বারোটা সিনেমা মেশিন বিক্রির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আপনাকে কমিশন দিলে অনেক টাকা দিতে হতো। অথচ প্রতিদানে আপনি এক পয়সাও আমাদের কাছ থেকে নেননি। তিনি আরো বললেন, কক্সবাজারে আমি আপনার নামে একটি সিনেমা মেশিন কিস্তিতে দিতে মনস্থ করেছি। প্রতি মাসে তার ভাড়া আসবে পাঁচ হাজার টাকা। এর জন্য ভাড়াটিয়াও আমি ঠিক করে রেখেছি। এই বলে তিনি একটি এগ্রিমেন্ট মাহবুবের হাতে দিয়ে সই করতে বললেন। এটা যথার্থভাবে সই করে মাহবুব বলল, রাজনৈতিক কারণে তার পক্ষে এই দায়িত্ব নেয়া সম্ভব হবে কিনা সে সম্পর্কে তার সংশয় আছে। রিজভী তাকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'Take me as your friend, don't worry, I shall look after your family'. ৯২-ক-ধারা জারি হওয়ার পর মাহবুব যখন আত্মগোপনে চলে গেল, সেই দীর্ঘ তের মাস রিজভী আমাকে নিয়মিত সাহায্য করেছে যেন আমার কোন আর্থিক কষ্ট না হয়। এ রকম বন্ধু সাধারণত দুর্লভ। করুণাময় যেন আমাদের সাহায্যার্থে তাঁকে পাঠিয়েছিলেন।

এই সময় মাহবুব যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীদের পক্ষে প্রচার অভিযানে চট্টগ্রাম শহর, বাঁশখালী, হাটহাজারী, সিতাকুন্ড, রাউজান, মিরসরাই, ফটিকছরি, রাঙ্গুনীয়া, সাতকানিয়া প্রভৃতি নির্বাচনী এলাকায় এমনভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠল যে বাসায় এসে আমাদের সাথে কথা বলার সময়ও তার ছিল না। আমিও যুক্তফ্রন্টের নারী প্রার্থী তফতুন্নেসা আজীমের পক্ষে ভোট সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শহরের বিভিন্ন এলাকায় নারী সমিতির কর্মীদের সাথে প্রচারণায় নামলাম।

দেশব্যাপী যুক্তফ্রন্টের পক্ষে তুমুল আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী সকলে একুশদফার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হলো। ১৯৫৪ সালের ৮ থেকে ১২ই মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুলভাবে জয়লাভ করে। স্বতন্ত্র নির্বাচনী প্রথায় যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি মুসলিম নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে ২২৩টি আসন লাভ করে। মুসলিমলীগ পেয়েছিল মাত্র নয়টি আসন। স্বতন্ত্রপ্রার্থী পেয়েছিলো পাঁচটি। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিল নৌকা। নৌকা নিয়ে দেশব্যাপী যুক্তফ্রন্টের বিজয় উৎসব উদযাপিত হয়। হাজার হাজার লোক বিজয় মিছিলে অংশ গ্রহণ করে। ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা। যুক্তফ্রন্টকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য পাকিস্তানের শাসক চক্রের প্ররোচনায় আদমজীতে এবং কর্ণফুলী পেপার মিলে বাঙালি-অবাঙালির মধ্যে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা সংঘঠিত হয়। এই অজুহাতে ৩০ মে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল পূর্ব বাংলায় ৯২-ক-ধারা প্রবর্তন করে জারি করলো কেন্দ্রীয় শাসন। চৌধুরী খালিকুজ্জামানের স্থলে পাকিস্তানের দেশরক্ষা সচিব মেজর জেনারেল ইস্কান্দর মীর্জা গভর্নর হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে আসেন। শুরু হয় রাজনৈতিক নির্যাতন। শত শত কর্মীকে কারাবন্দী করা হয়। অনেকে আত্মগোপনে চলে যায়। আদমজী এবং কর্ণফুলী মিলকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা যাতে সর্বত্র ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য মাহবুব ও তার সহকর্মীরা ৩০ মে শান্তি কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির সম্মেলন কক্ষে একটি সভা আহবান করে। সেখানে সভা চলা কালে রেডিওতে ৯২-ক-ধারা প্রবর্তনের ঘোষণা প্রচার করা হয়। রেডিওতে খবর শুনে আমার মেজ ভাই লুৎফর রহমান ছুটে আসে আমাদের কদম মোবারকের বাসায়। মেজ ভাই বললেন, দেশে ৯২-ক-ধারা জারি হয়েছে। মাহবুব কোথায়, তাকে আজকেই হয়তো গ্রেফতার করতে পারে। তাকে এখনি আত্মগোপনে চলে যেতে হবে। মাহবুব তখন মিউনিসিপ্যাল অফিসে মিটিং করছে। মেজ ভাই তৎক্ষণাৎ সেখানে গিয়ে তাকে মিটিং থেকে বের করে তদানীন্তন সিভিল সার্জন আমার দুলাভাই ডাক্তার আলতাফ উদ্দীনের বাসায় নিয়ে গেলেন। সেখানে দুলাভাই এবং খুকু আপা (আমার বড় ভাবির বোন) অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভীত না হয়ে দু'দিন মাহবুবকে সমাদরে আশ্রয় দেন। তৃতীয় দিন একটি টেক্সি করে মাহবুব অন্যত্র আত্মগোপনে চলে যায়।

পরদিন ভোরে পুলিশ আমাদের কদমমোবারকের বাসা ঘিরে ফেলে। মাহবুবকে না পেয়ে তার দীর্ঘ দিনের ডাইরি, কয়েকটি গ্রন্থের পান্ডুলিপি, সীমান্ত পুনঃপ্রকাশের জন্য ক্রয় করা ষোল রিম সাদা কাগজ বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়। উল্লেখ্য, ১৯৪৭ সালের

নভেম্বর, ১৩৫৪-র কার্তিক মাসে 'সীমান্ত' মাসিক পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। শেষ সংখ্যা বের হয় ১৯৫২ সালে। পত্রিকার সব সংখ্যা এখন আর কারো সংগ্রহে নেই। বিভিন্ন সূত্র থেকে মাত্র তেরটি সংখ্যা জোগাড় করেছি। এর একটি সংকলন অনুজপ্রতিম ড. ইসরাইল খান এবং আমার যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। নতুবা এই অমূল্য সম্পদ ইতিহাস থেকে হয়তো হারিয়ে যাবে।

মুন্নি ও আমাকে আব্বা আগের রাতে রুমঘাটা নিয়ে গিয়েছিলেন। বাসায় ছিল একজন কাজের লোক। পুলিশ চলে যাওয়ার পর ছেলেটি এসে খবর দিল। আব্বা গরুরগাড়ি করে আমাদের সব আসবাবপত্র এবং মাহবুবের সংগৃহীত বইপত্র রুমঘাটা নিয়ে এলেন। সেই থেকে আবার আমার একাকীত্ব জীবন শুরু হয়। আব্বার তত্ত্বাবধানে আমরা রুমঘাটা আমার বাপের বাড়িতে আশ্রয় নিলাম।

নিজের কথা বলতে গিয়ে অনেক সময় স্বামীর কথা বেশি বলে ফেলেছি। আগেই বলেছি জীবন জ্যামিতিক ছকে এগোয়না। এর ভাষা আছে, ছন্দ আছে, গতি আছে। আবার একেবারে বন্ধনহীন চলে। কখনো এ গতি মন্থর, কখনো দ্রুত। একে শব্দের যাদুতে বন্দি করতে পারে জীবনশিল্পী। আমি জীবনশিল্পী নই। তবে সুদীর্ঘ জীবনের অধিকারী। বিয়ের পর মেয়েদের জীবন স্বামীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে অভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। নিজের কথা বলতে গিয়ে তার বিশালত্বের ছায়ায় আমি কখনো কখনো হারিয়ে গেছি। তাই মাঝে মাঝে আমার কথা আমাদের উভয়ের কথা হয়ে উঠেছে।

Chunati.com
Pioneer in village based website

দুর্দিনে পিত্রালয়ে

দেওয়ান বাজারের ওপর দিয়ে নওয়াব সিরাজদ্দৌলা রোড সোজা চলে গেছে চকবাজারের দিকে। এর মাঝামাঝি যে গলিটি পুবদিকে চলে গেছে তার নাম শুকুর আলী মুনসেফ লেইন। আগেই বলেছি শুকুর আলী মুনসেফ ছিলেন আমার প্রপিতামহ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ব্রিটিশের অধীনে তিনি চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় মুনসেফ হিসেবে দীর্ঘদিন নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে শাসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে কয়েকটি আইনগত বিষয়ে মত পার্থক্যের কারণে তিনি পদত্যাগ করেন।

এই এলাকা রুমঘাটা নামে পরিচিত। এর শেষ প্রান্তে আমাদের পূর্বপুরুষের জমিতে আমার বাপের বাড়ি। এখানে যারা বাস করে তারা প্রত্যেকে পরস্পরের আত্মীয়। ছোটবেলা থেকে আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টিত হয়ে আমরা এখানে বসবাস করে আসছি। এখানে আমার শিকড়। বিয়ের প্রায় দু'বছর পরে ঘটনার অভিঘাতে আবার রুমঘাটার মাটিতে ফিরে এলাম। আব্বা তখন অবসরপ্রাপ্ত ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রার। বড় ভাই করাচীতে প্ল্যানিং কমিশনের উর্ধতন কর্মকর্তা। মেজ ভাই বি.কম. পাস করে ওষুধের ব্যবসা করেন। সেজ ভাই এবং ছোট ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। বড় দুলাভাই অধ্যাপক সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরী বড় আপাকে নিয়ে চন্দনপুরায় কলেজ কোয়াটারে বাস করেন। মেজ আপার স্বামী দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক আবদুল ওয়ালী সপরিবারে খুলনায় থাকেন। ছোট বোন জুবলী চট্টগ্রাম কলেজে পড়ে।

আমার এই দুঃসহ জীবনে মা বাবাই তখন আমার একমাত্র সহায়। বাড়িতে থাকে মেজ ভাই, ভাবি আর জুবলী। তাদের নিয়ে আমার সময় কাটে। মাঝে মাঝে আমার মামাতো বোন সাদু এবং খালাতো বোন রোকেয়া এসে আমাকে সঙ্গ দেয়। এই পটভূমিতে আমি চিন্তা করে দেখলাম নিজের পায়ে দাঁড়ানো ছাড়া আমার কোন গত্যন্তর নেই। মাহবুবের আত্মগোপন অবস্থায় তাকে পুলিশ যেকোন সময় ধরে নিয়ে যেতে পারে। যদিও আমি মা-বাবা, ভাই-বোন পরিবেষ্টিত, আমার মনে একটুও শান্তি নেই। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে স্থির করলাম আমার লেখাপড়া অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে। এদিকে কলেজ থেকে দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির জন্য আমার নাম কাটা গেছে। কিন্তু পরীক্ষা আমার দিতেই হবে। তাই অনেক কষ্টে আমার এক মামাতো ভাই হেমায়েত উদ্দিন খানের সাহায্যে ঢাকা থেকে ফরম আনিয়ে পুনরায় আমার নাম নিবন্ধীকরণ করার ব্যবস্থা হলো। আমি আই.এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি শুরু করলাম। তখনও আঞ্চলিক অর্থাৎ ঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহী, খুলনা বোর্ড ইত্যাদি গঠিত হয় নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আমাকে আই.এ. পরীক্ষা দিতে হয়। আমি তখন শারীরিক এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। আমার মেয়ে মুন্নি ছোট। আমাকে ঘরের কাজে সাহায্য করার জন্য মা আমাদের বাড়ির একজন পুরোনো কাজের লোক আইয়ুবকে দিয়ে দিলেন। এতে আমার লেখাপড়ার জন্য কিছুটা সাহায্য হলো। মাঝে মাঝে উড়ো খবর আসে, মাহবুবকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। তাতে বিচলিত হয়ে পড়ি। সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। নিবিষ্ট চিত্তে পড়াশুনা করতে পারি না। এর মধ্যে প্রায় প্রতিদিন ভোরে পুলিশ এসে আমাদের বাড়ি ঘিরে ফেলে। মাহবুব কোথায় জানতে চায়। আমাদের ঘুম থেকে তুলে মশারি উল্টিয়ে ঘরময় তল্লাসি চালায়। বইপত্র তচনচ করে। একদিন পুলিশের এক ঊর্ধতন কর্মকর্তা এসে আব্বার কাছে জানতে চায় মাহবুব কোথায়। তাকে আত্মসমর্পন করাতে না পারলে আব্বার পেনশন বন্ধ করে দেবে বলে ধমকায়। আব্বা উত্তরে বললেন, শক্তি থাকলে আমার পেনশন বন্ধ করুন, মাহবুব কোথায় আছে আমি জানিনা।

এর মধ্যে একদিন মাহবুব তার এক ভগ্নিপতিকে দিয়ে আমার কাছে একটি চিঠি পাঠালো। তাতে লেখা ছিল, আমাকে এবং মেয়েকে শেষবারের মতো দেখতে চায়। সে বর্তমান আশ্রয় ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাবে। তার সাথে আর জীবনে কোনদিন দেখা না-ও হতে পারে। আমি যেন মুন্নিকে নিয়ে এই ভগ্নিপতির সঙ্গে সেদিনই তার সাথে দেখা করার জন্য রওনা হই। এই খবর পেয়ে আব্বা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বললেন, আমাকে অনুসরণ করে পুলিশ সেখানে যাবে এবং মাহবুবকে ধরে ফেলবে। তিনি বারবার নিষেধ করলেন আমি যেন এই ঝুঁকি নিয়ে না যাই। কিন্তু এক্ষেত্রে আব্বার আদেশ পালন করতে পারিনি। যাওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত হয়ে গেলাম। অন্যনোপায় হয়ে আব্বা বোরখা পড়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন যেন আমাকে কেউ চিনতে না পারে।

তখন ভরা বর্ষা। সেদিন আঝোরে বৃষ্টি পড়ছিল। এর মধ্যে রওনা হয়ে গেলাম। সকাল দশটা। মা আমাকে বিদায় দিলেন। রুমঘাটা থেকে ঘোড়ার গাড়ি করে চাকতাই এসে কর্ণফুলী নদীতে সাম্পানে উঠলাম। সমুদ্রে উত্তাল ঢেউ। তার মধ্যে আমাদের নৌকা ঢেউয়ের তালে তালে একবার ডুবছে আবার ভেসে উঠছে। মেয়েকে কোলে নিয়ে

আমি যেন পানির মধ্যে ভেসে চলেছি। আমার ভয়-ভীতি কোথায় উবে গেছে। অধীর অপেক্ষায় ক্ষণ গুণছি। যেদিকে চোখ যায় সব পানি আর পানি। ক্রমে কর্ণফুলীর সেই ভয়ঙ্কর যাত্রা শেষে আমাদের নৌকা ছোট নদীতে প্রবেশ করলো। তারপর কদলপুর গ্রামে পৌঁছলাম। কতখানি পথ পাড়ি দিতে হয়েছিল মনে পড়ছে না। সন্ধ্যা ছয়টার দিকে আমার ননদের বাড়ির পেছনের উঠোন দিয়ে আমাদের নৌকা ভিড়লো। আমার ননদ মনোয়ারা তার অন্তর নিংড়ানো মমতা দিয়ে আমাকে সযত্নে নৌকা থেকে নামালো। মাটির দেয়াল, টিনের ছাউনি দেয়া ঘর। পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে মেঝে, মাটি দিয়ে লেপা। প্রদীপ জ্বলছে মিট মিট করে। আমার অবুঝ মনে আর তর সইছেনা, কখন তাকে দেখবো। বারান্দা পার হয়ে ঘরে ঢুকতেই মাহবুব এগিয়ে এলো। এক অসহ্য বেদনায় মন কেঁদে উঠল। তার মুখে দাড়ি। পরনে লুঙ্গী। গায়ে গেঞ্জি। এ যেন অন্য কেউ, মাহবুব নয়। মুন্নি বাবাকে চিনতে পারলোনা। বাবা যতই তাকে ডাকে সে দু'পা পেছনে চলে যায়। হঠাৎ মাহবুবের মুখটা বিষণ্ন হয়ে গেল। নিজের ওপর অভিমান করে বলল, আমার মেয়ে আমাকে চেনেনা, এর চেয়ে বড় দুঃখ জীবনে আর কি হতে পারে।

দেখতে দেখতে সাতদিন কেটে গেলো। শহরে ফিরে যাওয়ার দিন ঘনিয়ে এলো। তাকে অনুরোধ করলাম, যেখানেই থাক না কেন আমি যেন নিয়মিত খবর পাই। নিজেকে এক সাগর চোখের জলে ভাসিয়ে বিদায় নিলাম।

শহরে ফিরে এসে মন দিয়ে লেখাপড়া শুরু করলাম। আই.এ. পরীক্ষার দিন ঘনিয়ে এসেছে। মুন্নি আমার মায়ের সাথেই বেশি সময় কাটায়। একদিন পড়তে বসে আমার ইকনমিকস্-এর নোট খাতা খুঁজে পাইনা। সম্ভাব্য সব জায়গায় খুঁজেছি। তখন আবার নতুন করে নোট করারও সময় ছিল না। মহা সমস্যায় পড়ে গেলাম। অগত্যা আর সময় নষ্ট না করে পাঠ্য বই থেকে প্রয়োজনীয় অংশগুলো পড়তে শুরু করলাম। চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে আমার পরীক্ষার সিট পড়েছে। নিজের কলেজে বসে পরীক্ষা দিতে পারবো ভেবে স্বস্তিবোধ করলাম। প্রথম দিন ইংরেজি পরীক্ষা। ভোরবেলা উঠে পড়তে বসেছি। আমার মেয়ে তখনো বিছানায় অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ন'টায় কলেজের পথে রিকশা করে রওনা হতে হবে। হঠাৎ খবর পেলাম মাহবুব ধরা পড়েছে। হাত থেকে আমার বইগুলো পড়ে গেল। চোখের পানি আমার পড়ার টেবিলে গড়িয়ে পড়লো। আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। এবার বুঝি আর পরীক্ষা দেয়া হলো না। ঘন্টাখানেক পর আবার খবর এলো, মাহবুব ভালো আছে। আগের সংবাদটি ভুল। আবার বই পত্র কুড়িয়ে নিলাম। মনকে শক্ত করে পরীক্ষা দিতে চলে গেলাম। এভাবে দোদুল্যমান অবস্থায় পরীক্ষাপর্ব শেষ করলাম। কিছুদিন পর আমার বিছানার তোশক শুকোতে দেয়ার সময় দেখলাম আমার ইকনমিকস্-এর সেই নোট খাতাটি পালঙ্কের ওপর পড়ে আছে। এই কাজটা কে করলো খোঁজ করতে গিয়ে জানলাম, আমার অতি আদরের মেয়ে সেই নোট খাতাটি তোশকের নিচে লুকিয়ে রেখেছিল। তাকে জিগ্যেস করাতে তার ভাঙা ভাঙা ভাষায় বললো, তুমি যে আমার সঙ্গে খেলনা, তাই তোমার বই লুকিয়েছি।

তার এই কথায় আমার এক বিরাট শিক্ষা হলো। তাকে যে আমি দিনের পর দিন অবহেলা করেছি। সঙ্গ দিইনি। মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত করেছি। মায়ের নিত্য সাহচর্য সন্তানের জন্য অপরিহার্য। মায়ের স্থান কেউ পূরণ করতে পারে না। জীবনযুদ্ধে সংগ্রাম

করতে গিয়ে নারীকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। সন্তানকে যতটা সময় দেয়া দরকার তা অনেক সময় হয়ে ওঠেনা। এই আমোঘ সত্যকে সামনে রেখে আমাদের পথ চলতে হয়। বাবা-মা দু'জনের ভূমিকাই সন্তানকে সুষমভাবে মানুষ করার জন্য অপরিহার্য। কারণ একে অপরের পরিপূরক। নতুন করে এই সত্যকে আবার উপলব্ধি করলাম। তিন মাস পর পরীক্ষার ফল বের হলো। দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেছি। এর জন্য দুঃখিত হইনি মোটেই। মনে হলো পাস করেছি, এই আমার জন্য যথেষ্ট।

দীর্ঘ দিন পর মাহবুবের ওপর থেকে হুলিয়া প্রত্যাহার করা হয়। সে আত্মগোপন অবস্থা থেকে ঘরে ফিরল। তার বন্ধু বান্ধব, অনুরাগী এবং শুভানুধ্যায়ীরা তার সাথে দেখা করার জন্য আমাদের বাসায় ভিড় করতে লাগলো। একদিন এলেন মাহবুবের বন্ধু আজিজুস সামাদ। তিনি তখন চট্টগ্রামস্থ প্রুডেনসিয়াল ইনসিওরেন্স কোম্পানির প্রধান কর্মকর্তা। ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে এসে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী ফওজিয়া সামাদ প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। এক পর্য্যায়ে আজিজুস সামাদ কৃষ্টিকেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সেই থেকে সামাদ ভাই এবং ভাবি আমাদের শুভানুধ্যায়ী এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার অগ্রজের স্থান দখল করে আছেন। সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে আমরা পরস্পরের বন্ধু। তাঁদের ছেলে মেয়েরাও আমাকে আপন খালার মতো ভালোবাসে। মাহবুব তাদের খুব প্রিয় চাচা। তৌহিদ তার চাচাকে অনুসরণ করে ছোটবেলায় সিনেমা হলের মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখতো। তৌহিদ সামাদ এখন একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি। বর্তমানে সামাদ ভাই বাংলাদেশ জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানীর চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। তাঁর কোন বোন নাই। তাই তিনি এবং ভাবি আমাকে আপন বোনের মর্যাদায় স্নেহসিক্ত করে রাখেন। সামাদ ভাই শুধু স্নেহপ্রবণ নন, তাঁর বন্ধুবাৎসল্য অত্যন্ত প্রবল।

Pioneer in village based website

আগের কথায় ফিরে আসি। একদিন সামাদ ভাই এসে মাহবুবকে তাঁর কোম্পানিতে যোগ দেয়ার জন্য আহবান জানালেন। কিন্তু মাহবুব প্রথমে এই প্রস্তাবে সম্মত হলোনা কারণ রাজনীতি করার দিকেই তার ঝোঁক ছিল প্রবল। অবশেষে সামাদ ভাইয়ের অনুরোধে রোজ এক ঘন্টা করে সময় ব্যয় করতে রাজি হলো। তাঁর অসাধারণ ধৈর্য এবং মাহবুবের জনপ্রিয়তার কারণে প্রথম বছরেই সে বিরাট সাফল্য অর্জন করলো। কোম্পানি থেকে তাকে গাড়ি দেয়া হলো। এখনো আমার মনে আছে একটি কালো প্রিফেক্ট গাড়ি। গাড়িটির নম্বর ছিল চট্টগ্রাম-১৫০৪। এনায়েত বাজার থেকে চলে আসার পর এটিই ছিল আমাদের প্রথম গাড়ি। বীমা ব্যবসার সাথে সাথে মাহবুব অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্য করে বেশ কিছু পুঁজি সঞ্চয় করলো। এই টাকা থেকে ৬০ নম্বর দেওয়ান বাজারে জমি কেনা হলো। তার একাংশে একটা ছোট্ট বাড়ি তৈরি করা হয়। রুমঘাটা বাপেরবাড়ি ছেড়ে আমরা নিজের বাড়িতে চলে এলাম।

কৃষ্টি কেন্দ্রের জন্ম

৯২-ক ধারা জারি হওয়ার পর রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মীদের ওপর সরকারি নির্যাতনের ফলে অনেকে দেশত্যাগ করেন। প্রান্তিক নবনাট্য সংঘের সভাপতি কবিয়াল

রমেশ শীল, কণ্ঠশিল্পী অচিন্ত্য চক্রবর্তী এবং আরো বহু কর্মী কারাগারে বন্দি হন। অনেকে আত্মগোপনে চলে যান। সুদীর্ঘ তের মাস পর হুলিয়া প্রত্যাহার হলে মাহবুবসহ তাদের অনেকে ঘরে ফিরলেন বটে কিন্তু প্রান্তিকের সভাপতি রমেশ শীল এবং বিশিষ্ট শিল্পী অচিন্ত্য চক্রবর্তী জেল থেকে ছাড়া পেলেন না। রাজনৈতিক গগনের কালো মেঘ তখনো কাটেনি। মাহবুব সংস্কৃতি কর্মী ও শিল্পীদের সঙ্গে আলোচনায় বসল। প্রান্তিককে পুনরুজ্জীবিত করার প্রশ্নে তেমন কেউ সায় দিলো না। প্রান্তিক নবনাট্য সংঘের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য আমাদের বাড়ির নাম রাখা হয় 'প্রান্তিক'। এই পরিবেশে সবাই নতুন নামে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠার তাগিদ অনুভব করলেন। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে মাহবুবের নামে একটি আবেদনপত্র প্রকাশ করা হয়। তারই ভিত্তিতে আসকার দীঘির পশ্চিম পাড়স্থ বদিউস সালামের বাসভবনে শিল্পী, সাহিত্যিক এবং সংস্কৃতি-কর্মীদের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। তাতে দীর্ঘ আলোচনার পর আবুল ফজল এবং এবনে গোলাম নবীকে যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক করে ১৯৫৬ সালে চট্টগ্রাম কৃষ্টিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৬-১৯৫৭ সালে যাঁরা কৃষ্টিকেন্দ্রের কার্যকরী পরিষদে ছিলেন নিচে তাঁদের নাম উল্লেখ করলাম।

এস.এ. জামান, ফওজিয়া সামাদ এবং বদিউস সালাম, সহ-সভাপতি। আমিনুল ইসলাম সহ-সম্পাদক। তারাপদ ঘোষ কোষাধ্যক্ষ। আলি ইমাম, খৃষ্টফার রোজরিও, এ.কে. মান্নান, গোপাল ভট্টাচার্য, আবদুল্লাহ আল মামুন চৌধুরী এবং দীননাথ সেন ছিলেন বিভিন্ন বিভাগীয় সম্পাদক। এছাড়া কমিটির সদস্য ছিলেন মাহবুব উল আলম চৌধুরী, চিরঞ্জীব দাশ শর্মা, বিলকিস নাসিরউদ্দীন, মাহবুব হাসান, জওশন আরা রহমান, নাসির উদ্দীন, সুধীর তালুকদার ও সুধাংশু ভট্টাচার্য (সূত্র : মাহবুব হাসান সম্পাদিত 'চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন, প্রগতিশীল ধারা ; পৃষ্ঠা-৪৬)।

Chhuti.com



Chuadati.com
Pioneer in village based website

বিয়ের স্যুভিনিয়রের প্রচ্ছদ, শিল্পী বিজন চৌধুরীর আঁকা, ১৯৫২



কলেজ ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ, শিল্পী চিত্ত প্রসাদের আঁকা

CHITTAGONG COLLEGE STUDENTS UNION 1955-56



Pioneer in village based website

Sitting : Ila Mohsin (Secy. Girls' C.R), Jowshanara Rahman (Magazine Secy.) Prof. F. Karim (Social & Excursion), Prof. H. Hossain (Athletic), Prof. C. R. Baisittha (Variety), Prof. J. Ahmad (Vice-President), Principal S. Z. Chowdhury (President), Dr. S. M. Bhattacharyya (Treasurer), Prof. S. Karim (Common Room), Prof. A. Hossain (Magazine), Prof. A. Sultan (Debate & Speech), Mr. Saiful Alam (General Secy).
Standing : R.Hakim (2nd year Sc.), A. Z. M. Sayem (Secy. Debate & Speech), I. A. Khan (Secy. Social & Excursion), N. Hossain (4th year Sc.), F. Haq (II year Sc.), M. Islam (1st year Arts), P.K. Das Gas Gupta (Secy. Variety), M. S. Uddin (Secy. Drama), M. Karim (Secy. Athletic), A. Hamid (Secy. C. R.), A. Kalam (4th year Sc.), A. Rauf (2nd year Arts), Md. Alamgir (2nd year Arts)

ছোটদের **রবীন্দ্রজয়ন্তী সংসদের** উদ্যোগে



Chunati.com
Pioneer in village based website

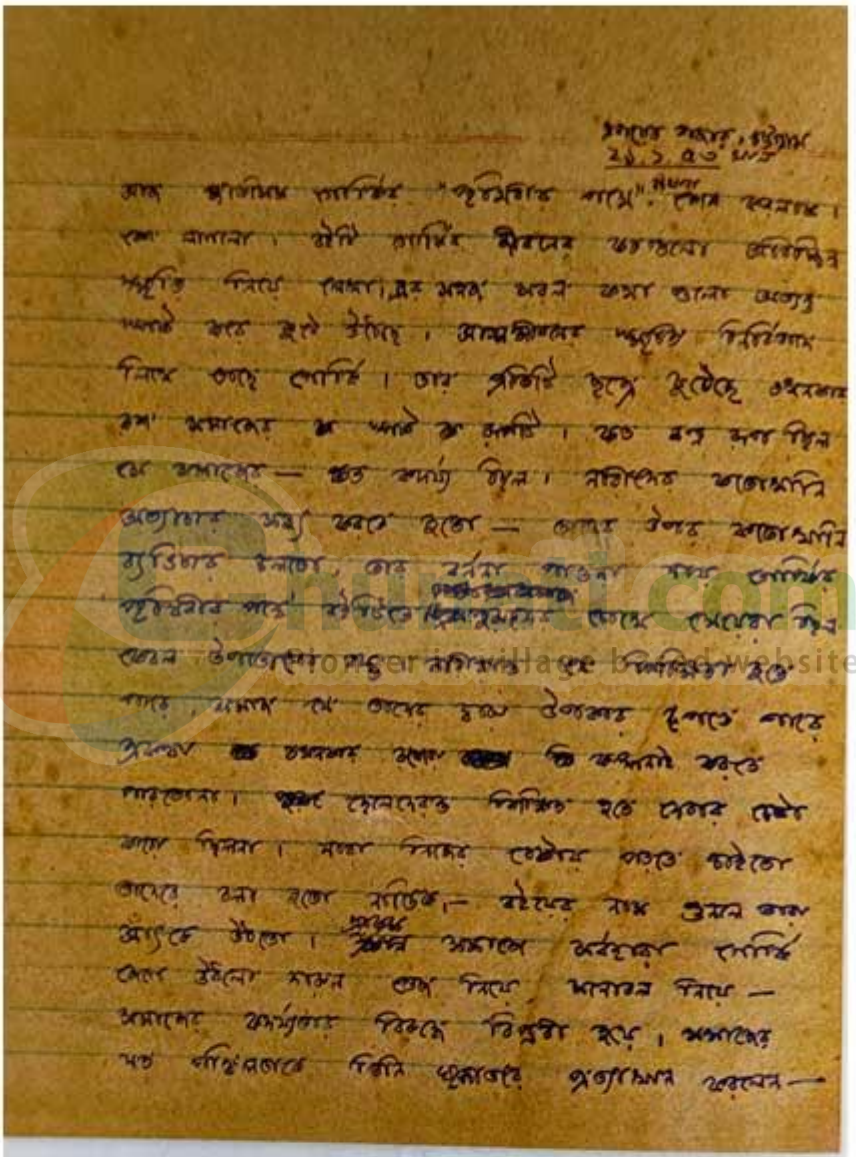
স্থান— মুসলিম ইনষ্টিটিউট মিলনায়তন
৩০শে বৈশাখ, ১৩৭৩ বাংলা
সন্ধ্যা ৭টা
১৪ই মে, ১৯৬৬ ইং

"কেন আমায় পাক বাঁধো বাঁধ
তাহার পানে নজর এত কেন
পাখার মত ছেড়ে দাও বুকে
সবার আমি এক বয়সী জেনো।"

ছোটদের রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব, স্মাভিনিয়রের প্রচ্ছদ, ১৯৬৬



চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিটে রবীন্দ্র জয়ন্তী
মুন্নি কোরাস গানে নেতৃত্ব দিচ্ছে, ১৯ মে ১৯৬৬



আমার ডায়েরির পাতা

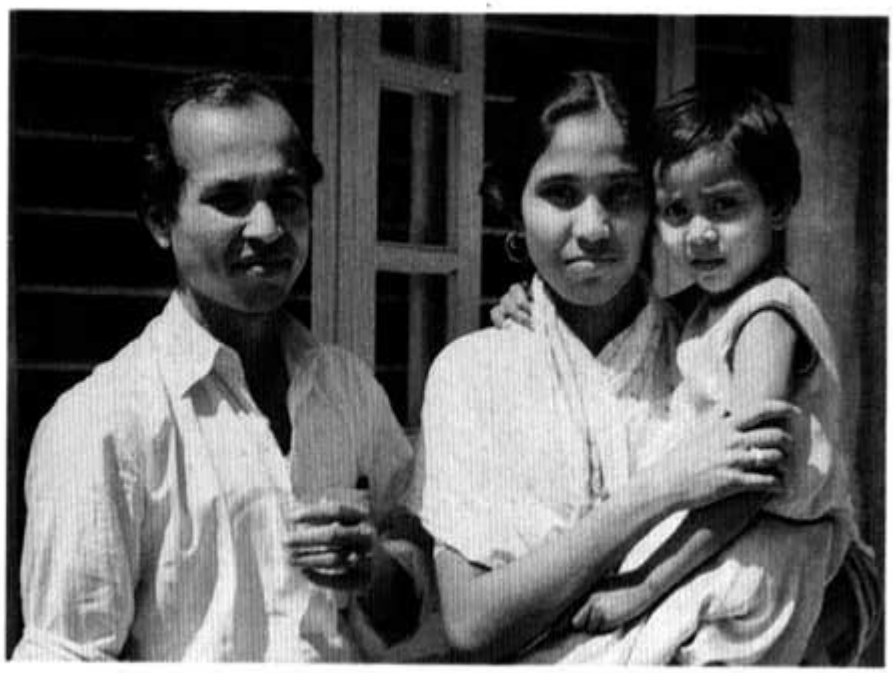


মেয়ে মুন্নি, যখন আমি ওয়েলিংটনে পাঠরত

Chunati.com
Pioneer in village based website



দেওয়ান বাজার বাড়ির উঠোনে মুন্নি ও আমি



দেওয়ান বাজার বাড়ির সামনে মাহবুব ও আমার কোলে মুন্নি

Chunati.com
Pioneer in village based website



সুচরিত চৌধুরীর সাথে আমার দুই নাতি উত্তরার বাড়িতে

কলেজ জীবন

মেয়েরা বিচ্ছিন্ন দ্বীপবাসি

১৯৫২ সালে ম্যাট্রিক পাস করে যখন চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে ভর্তি হলাম তখন পুরো কলেজে মেয়েদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। সাতান্ন সালেই হাজার খানেক ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে প্রথম থেকে চতুর্থ বর্ষ পর্যন্ত আমরা ছিলাম এক শতেরও কম। কলেজের মূল দালানটি ছিল পর্তুগীজ স্থাপত্য রীতিতে তৈরি। মোটা দেয়াল। প্রশস্ত বারান্দা। পূর্বদিকে প্রিন্সিপালের রুম এবং কলেজ অফিস। শিক্ষকদের কক্ষটি ছিল প্রিন্সিপাল-এর অফিস সংলগ্ন পশ্চিম দিকে। ছেলেদের কমনরুম পূর্বদিকে মূল দালান থেকে কিছু দূরে, চওড়া, লম্বা বেড়ার ঘরে অবস্থিত। সেখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতো। কলেজ এলাকা জুড়ে ছিল প্রচুর লিচু, নিম, পেয়ারা আর সুপারি গাছ। পূবদিকে ছিল নতুন সাইন্স বিল্ডিং। কলেজের নিজস্ব কোন ক্যাফেটেরিয়া ছিল না। চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী গনি বেকারির কাছাকাছি একটা চায়ের দোকান ছিল। সেখানে ছেলেরা আড্ডা দিত এবং চা খেত। মেয়েদের জন্য কোন সুব্যবস্থা ছিল না। প্রয়োজনবোধে কলেজের বেয়ারা গিয়ে দূর থেকে আমাদের জন্য চা-নাশতা নিয়ে আসতো। কলেজের এবং ছেলেদের হোস্টেলের মাঝখানে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছিল জনবসতি। পরবর্তীকালে বসতি তুলে দিয়ে এই এলাকাও কলেজ ক্যাম্পাসের অন্তর্ভুক্ত হয়। মেয়েদের জন্য কোন হোস্টেল ছিল না। এখনও বোধহয় নেই। ছোট্ট একখানা টিনের ছাউনির বেড়াঘরে ছিল মেয়েদের কমনরুম। আমাদের আড্ডার স্থল। ক্লাস শুরু হওয়ার ঘন্টা পড়লে আমরা পর্দার আড়ালে দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতাম। কমনরুমের সামনে মূল দালানের বারান্দা দিয়ে সাধারণত আমাদের প্রফেসর ক্লাসরুমে যেতেন। পর্দার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখতাম কখন তিনি আসছেন। তাঁকে অনুসরণ করে আমরা ক্লাসে ঢুকতাম। আবার ক্লাস শেষ হলে তাঁর সাথে সারিবদ্ধভাবে বের হয়ে আমাদের কমনরুমে চলে যেতাম। ক্লাসে প্রথম দুটি বেঞ্চে আমরা বসতাম। আমাদের পেছনের বেঞ্চ গুলিতে ছেলেরা বসতো। তাদের সাথে আমাদের কোন রকম যোগাযোগ বা কথাবার্তা হতো না। আমরা যেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের অধিবাসি, এমন মনোভাব বিরাজ করত সবার মধ্যে।

যদিও মেয়েদের মধ্যে তেমন পর্দানসিন কেউ ছিল না; কিন্তু ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশাও কলেজের নিয়ম বিরুদ্ধ ছিল। বিবাহিত হওয়াতে আমার কিছুটা স্বাধীনতা

Pioneer in village development

ছিল। মাহবুবের স্ত্রী বলে আমাকে ছেলেরা ভাবি বলে ডাকতো। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তাদের সঙ্গে যোগ দিতেও আমার কোন বাধা বিপত্তি ছিল না।

চট্টগ্রাম থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত কমলেশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'অন্তরীপ' বিজয় দিবস সংখ্যায় এ সম্পর্কে কিছু তথ্য জানতে পারলাম। তাতে কল্পতরু সেনগুপ্ত চট্টগ্রামের ছাত্র আন্দোলন ও তার প্রেক্ষাপট বলতে গিয়ে লিখেছেন, চট্টগ্রাম কলেজে তখন (১৯২১-১৯২২) ছাত্রীদের প্রবেশাধিকার ছিল না। ছাত্রীদের ভর্তি হওয়ার অধিকার নিয়ে অনেক দেন-দরবার, অভিযোগ, কাগজে লেখালেখি ইত্যাদি করতে হয়েছে। প্রথম ছাত্রী যিনি ভর্তি হয়েছিলেন তিনি চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার কে.সিদে'র কন্যা। তাঁর বসার আসন নিয়েও সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, তিনি আলাদা জায়গায় বসবেন, না স্বতন্ত্র বসবেন। শেষ পর্যন্ত অধ্যাপকের প্ল্যাটফর্মের নিচে স্বতন্ত্র চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। উপরন্তু তিনি এক শ্রেনীর ছাত্রদের টিটকারীতেও অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। পরবর্তী ছাত্রী সামসুজ্জোহা নাহার মুসলমান সমাজ থেকে প্রথম ছাত্রী ভর্তি হলেন। তাঁকেও কম লাঞ্চনার মুখোমুখি যে হতে হয়নি তা নয়। তাঁকে বোরখা পড়ার জন্য পীড়াপীড়ি করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ঘোড়ার গাড়ির সামনে পর্দা ঝুলিয়ে কলেজে যেতে হতো।

১৮৬৯ সালে চট্টগ্রাম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে এক বছর পর বন্ধ হয়ে যায়। পরে ১৮৭১ সালে মীরসরাই থানার ধুম নিবাসী রায়বাহাদুর গোলকচন্দ্র রায়ের অর্থানুকূল্যে পুনরায় চালু হয়। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন জে.সি বোস (কলেজ রেকর্ডস : A Handbook of Chittagong College, Chittagong 1966)।

চট্টগ্রাম কলেজের ঐতিহ্য বিস্ময়কর। এখানে ইংরেজ অধ্যক্ষ ছাড়াও পদ্মিনীভূষণ রুদ্র, অপূর্ব চন্দ, জনার্দন চক্রবর্তী, আবু হেনা, বাচ্চু মিঞা, যোগেশচন্দ্র সিংহের মতো অসাধারণ পন্ডিত ব্যক্তিরা অধ্যাপনা করে গেছেন। আমরা পেয়েছিলাম জহুরুল ইসলাম, ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, শামসুজ্জামান চৌধুরীর মতো কৃতী অধ্যক্ষ। তাঁরাও নিজ নিজ ক্ষেত্রে ছিলেন সুপন্ডিত এবং বিদগ্ধ। আরো পেয়েছিলাম সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরী, আবুল ফজল, চিত্তরঞ্জন বৈশিষ্ঠ, ইদ্রিস আলী, হাবিবুর রহমান, রেহান শরিফ, মোজাফফর আহম্মদ, ফেরদৌস খান, আহমদ হোসেন, জালালউদ্দীন আহমদ, আবু সুফিয়ান, এস.এম ভট্টাচার্য, আব্দুল করিম, এম. ইউ আহমদের মতো জ্ঞানী-গুণী শিক্ষকের সাহচর্য। তাঁদের পঠনভঙ্গি, অসাধারণ জ্ঞানের পরিধি এবং চিত্তের উদারতা দেখে আমরা মুগ্ধ হতাম। তাঁদের স্নেহের পরশে এবং ব্যক্তিগত আচরণে আমরা এতই বিমুগ্ধ ছিলাম যে কোনদিন ক্লাসে ক্লান্তি অনুভব করতাম না। মোতাহের হোসেন চৌধুরী যখন আমাদের ঘন ঘন কবিতা উদ্ধৃত করে বিচিত্র প্রবন্ধ পড়াতেন, আমরা যেন তাঁর সঙ্গে নন্দনলোকে প্রবেশ করতাম। একদিন আকাশ ছিল মেঘে ভরা। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছিল। তিনি ক্লাসে ঢুকেই কোন কথা না বলে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। আকাশে মেঘের দিকে তাকিয়ে যেন কোথায় হারিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, আজ তোমাদের পড়াবোনা। রবীন্দ্রনাথের মেঘের পরে মেঘ জমেছে ..... এমন দিনে তারে বলা যায়..... এ দু'টি গান কবিতার মতো আবৃত্তি করে আমাদের

শোনালেন। তারপর ছুটি দিয়ে দিলেন। আমরা সেদিন তাঁর সাথে একাত্ম হয়ে অনুভব করেছিলাম প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য। আমরাও তখন প্রকৃতির প্রেমে মত্ত। মোতাহের হোসেন চৌধুরীর বাচনভঙ্গি এবং উচ্চারণ এত আকর্ষণীয় ছিল যে আমরা প্রাত্যহিক জীবনে তা অনুকরণ করার চেষ্টা করতাম। এমনিভাবে তৈরি হয়েছিল আমাদের মানসলোক। মোজাফফর আহমদ ছিলেন ইংরেজী সাহিত্যের কৃতী ছাত্র। তিনি শেকসপীয়র পড়াবার সময় রবীন্দ্রনাথের কবিতার উদ্বৃতি দিয়ে আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন। ভোলা যায় কি সে সব দিনের কথা, ইদ্রিস আলীর কথা, যিনি নাটকীয় ভঙ্গিতে বাংলা সাহিত্য পড়াতেন। রেহান শরীফ এবং হাবিবুর রহমান অর্থনীতির মতো একটি নীরস বিষয়কে নিজেদের প্রকাশভঙ্গির গুণে সহজ, সরল এবং সরস করে তুলতেন। বড় ভাই প্রফেসর হাবিবুর রহমানকে বেশিদিন পাইনি। আমি প্রথম বর্ষে থাকতেই তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের প্ল্যানিং কমিশনে চাকরি নিয়ে করাচি চলে যান।

তিপান্ন-চুয়ান্ন সালে ঢাকায় ছাত্র ইউনিয়নের শাখা হিসেবে ছাত্রী সংসদ গঠিত হয়। এই মর্মে ছাত্রী সংসদের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক সন্‌জীদা খাতুন ঢাকা থেকে আমাকে কয়েকটি চিঠি লেখেন। চট্টগ্রামে ছাত্রী সংসদ গঠনের জন্য তিনি কয়েকবারই অনুরোধ জানান। এই ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য চট্টগ্রামে আসেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভানেত্রী সুফিয়া খাতুন। তাঁর উপস্থিতিতে আমাকে আহ্বায়ক করে চট্টগ্রাম জেলা ছাত্রী সংসদের একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। একাজ কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর দেশে ৯২-ক ধারা জারি হওয়ায় অস্থিতিশীল অবস্থার মধ্যে আমরা ঝিমিয়ে পড়ি। ১৯৫৭ সালের শেষের দিকে পুর্বপাকিস্তান ছাত্রী সংসদের চট্টগ্রাম শাখা গঠিত হয়। এই গঠন প্রক্রিয়ায় ডিসেম্বর মাসে চট্টগ্রাম কলেজে অনুষ্ঠিত হয় একটি ছাত্রী সম্মেলন। চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকে প্রায় হাজার খানেক ছাত্রী এতে যোগদান করে। এটি ছিল তৎকালীন চট্টগ্রামের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ঢাকা থেকে এসেছিলেন যথাক্রমে বেগম সুফিয়া কামাল ও সামসুন্নাহার মাহমুদ। এই সম্মেলন আয়োজনের ব্যাপারে আমাকে যারা সহায়তা করেছিলেন, তারা হলেন তদানীন্তন জেলা প্রশাসকের স্ত্রী জেরীনা রশীদ, আপোয়া চট্টগ্রাম জেলা শাখার সভাপতি ফাতেমা সালাম, সাজেদা চৌধুরী (পরবর্তীতে মন্ত্রী) এবং হোসনে আরা মাক্কি (ছায়ানটের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য)। বিশেষ করে সরকারি হামলা থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম জেরীনা রশীদের সুদৃঢ় পৃষ্ঠপোষকতার ফলে। ছাত্রী সংসদের কেন্দ্রীয় নেতা সুফিয়া খানম ও কামরুন্নাহার লাইলী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে আমাকে সভাপতি এবং খালেদা বেগমকে সম্পাদক নির্বাচিত করে ছাত্রী সংসদের চট্টগ্রাম জেলা কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলন আয়োজিত দেশাত্মবোধক গান এবং নৃত্য সংবলিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গানে এবং নাচে অংশগ্রহণ করে এই অনুষ্ঠানকে যারা উপভোগ্য করে তুলেছিল, তাদের মধ্যে কয়েকটি নাম মনে পড়ছে। জাহানারা জুবলী, রিজিয়া বেগম রুনু, শিখা গুহ, বন্দনা চক্রবর্তী, মায়া ভট্টাচার্য, চিন্ময়ী, মনোয়ারা বেনু, যুথী পারিয়াল, শাহেদা খানম সাদু এবং আরো অনেকে। পরবর্তীকালে তাদের অনেকে প্রতিষ্ঠিত শিল্পী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে।

তখন কলেজ সংসদ গঠিত হতো গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচনের মাধ্যমে। এর সাফল্য নির্ভর করত ব্যক্তিগত কৃতিত্ব, মেধাগত যোগ্যতা এবং পরিচয়ের ওপর। চট্টগ্রাম কলেজে রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠান শুরু হয় সম্ভবত ১৯৫৫ সাল থেকে। এই সময় চট্টগ্রাম কলেজে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গঠিত হয় সম্মিলিত ছাত্র প্রগতি সংঘ, সংক্ষেপে ইউ.এস.পি.পি। এর পতাকা তলে সমবেত হয়েছিল অসম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি-সম্পন্ন সব ছাত্র-ছাত্রী। এদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন আবদুল্লাহ আল হারুন, সফিউল আলম, আবদুস সোবহান, এমদাদুল ইসলাম, আবদুল হাই, মুহাম্মদ ইউনূস, আবদুস শাকুর, দীননাথ সেন, বিমলেন্দু বড়ুয়া, পরিমল ভট্টাচার্য প্রমুখ। আমাদের প্রতিপক্ষ ছিল মাহবুব কবির চৌধুরীর নেতৃত্বে তমদ্দুনপন্থী স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন।

নির্বাচনে আমরা জয়ী হলে কলেজ সংসদ গঠন করা হয়। সফিউল আলম (বর্তমানে চট্টগ্রামের খ্যাতিমান এডভোকেট) সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৫-১৯৫৬ সালে ২৮ সদস্য বিশিষ্ট চট্টগ্রাম কলেজ ছাত্র সংসদে নির্বাচিত হয় দুইজন মেয়ে। ইলা মহসিন, মহিলা কমনরুমের বিভাগীয় সম্পাদক এবং আমি, কলেজ বার্ষিকী সম্পাদক। তখন পর্যন্ত নির্বাচিত সহ-সভাপতি পদের সৃষ্টি হয়নি। কলেজের সহ-অধ্যক্ষই থাকতেন ছাত্র পরিষদের সহ-সভাপতি। চট্টগ্রাম কলেজ প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী পুনর্মিলনীতে (১৯৯১) স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সফিউল আলম লিখেছেন, ইউ.এস.পি.পি. পরিচালিত পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্নের পরিষদ চট্টগ্রাম কলেজের ইতিহাসে এক নতুন বর্ণাঢ্য জীবনধারা সূচনার কালরূপে চিহ্নিত। শিক্ষা-সংস্কৃতি, আর মনন-চর্চার প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা সুদূরপ্রসারী কর্মকান্ডের স্বাক্ষর রেখেছিলাম।

Pioneer in village based website

আমার সম্পাদনায় ১৯৫৫-১৯৫৬ সালে কলেজ বার্ষিকীর প্রথম বাংলা নামকরণ করা হয় "অন্বেষা"। এই নামটি দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছিল আমার স্বামী। এর প্রচ্ছদে ছাপাবার জন্য ভারতের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী চিত্ত প্রসাদের আঁকা ছবিও সংগ্রহ করে দিয়েছিল সে। দীর্ঘকাল ধরে নিয়মিতভাবে কলেজ বার্ষিকী প্রকাশিত হয়ে আসছিল এবং তার প্রচ্ছদে ইংরেজিতে লেখা হতো Chittagong Government College Magazine. উল্লেখ্য ১৯৪৭-১৯৪৮ সালের কলেজ বার্ষিকী সম্পাদনা করেছিলেন একজন ছাত্রী, নাম কৃষ্ণা চক্রবর্তী। এদিক দিয়ে চট্টগ্রাম কলেজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে বলা যায়।

অন্বেষার সম্পাদনা পরিষদ কমিটি গঠিত হয়েছিল ১৫ জন সদস্য নিয়ে। এর মধ্যে শফিউল আলম, মুহাম্মদ ইউনূস, সুকুমার শীল, পরিমল ভট্টাচার্য, রুহিয়া খানম, সিরাজদ্দৌলা চৌধুরী এবং মোহাম্মদ ইয়াছিন চৌধুরী সদস্য হিসেবে আমাকে সব সময় সহযোগিতা করেন। আমি একই বছরে অন্বেষার দুটি সংখ্যা প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছিলাম (এপ্রিল এবং নভেম্বর ১৯৫৬)। এপ্রিল সংখ্যার মুখবন্ধে সামসুজ্জামান চৌধুরী, আমাদের প্রিন্সিপ্যাল এবং কলেজ সংসদের সভাপতি লেখেন— এবার কলেজ বার্ষিকী 'অন্বেষা' নাম নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। ছাত্রদের মধ্যে এ সন্ধানী-বৃত্তি বলবৎ থাকবে, আমি একান্তভাবে তাই আশা করি (২৫শে মার্চ, ১৯৫৬)। এই সময় ইউ.এস.পি.পির মুখপত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে সাপ্তাহিক দু'পাতা। প্রথম দিকে এর

যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন মুহাম্মদ ইউনূস (গ্রামীণ বাংকের প্রতিষ্ঠাতা) এবং আমি। পরবর্তীতে ইউনূস ভাই এককভাবে এর সম্পাদনা করেন। এতে আমাদের নানাভাবে সহায়তা করেন আবদুস শাকুর (ঔপন্যাসিক) এবং দীননাথ সেন (কলকাতা রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং নাট্যকার)। তখন ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদদের স্মরণে চট্টগ্রাম কলেজ শহীদ স্মৃতি পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। শহীদ মিনারও নির্মাণ হয় ওই সময়।

দেশে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে এবং এরই প্রভাবে জনসাধারণের মধ্যে অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়। এর ফলশ্রুতিতে আমাদের কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আসে এক নবজাগরণের জোয়ার। আমরা একের পর এক কর্মসূচি গ্রহণ করতে থাকি। এক পর্যায়ে চট্টগ্রাম কলেজ প্রাঙ্গনে ১৯৫৬ সালের ২৬ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর তিনদিন ব্যাপী এক বিরাট আন্তঃকলেজ সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রামের বিভিন্ন কলেজ থেকে প্রায় দেড়'শ প্রতিনিধি এতে যোগদান করে।

আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল সামসুজ্জামান চৌধুরী, দর্শন শাস্ত্রে কৃতী ছাত্র, আপনভোলা। সর্ব প্রথম বক্তা হিসেবে প্রধান অতিথির ভাষণ দিয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন করার কথা ছিল তাঁর। এই মর্মে তাঁর অভিভাষণটিও তৈরি করে দেয়া হয়েছিল। তিনি সময়মত না আসায় আবুল ফজলের সভাপতিত্বে কনফারেন্স শুরু হয়ে যায়। অতিথি বক্তা হিসেবে মাহবুব উল আলম চৌধুরী যখন মাননীয় সভাপতি এবং আমার ভাই ও বোনেরা বলে সম্বোধন করলো, তখন আবুল ফজল দাঁড়িয়ে বললেন, একজন বাদে, এখানে তার স্ত্রী উপস্থিত– এই বলে তিনি হাস্যরসের অবতারণা করলেন। সবাই একযোগে হেসে উঠল। এভাবে কলেজ জীবনে আমরা অনেক মজার মজার ঘটনা উপভোগ করেছি। সামসুজ্জামান অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্বে এসে উপস্থিত হন এবং তাঁর লিখিত ভাষণটি পাঠ করেন। ভাষণে শেষ কথাটি ছিল, এই বলে আমি সম্মেলন শুরু করলাম। তিনি এতই আপনভোলা যে শেষ বাক্যটি বাদ দিয়ে পড়ার কথাও খেয়াল করেননি। অনুষ্ঠানের শেষে তিনি 'শুরু' করার কথা বলায় সেদিন সকলে ভীষণভাবে পুলকিত হয়েছিল। তিনি নিজেও সকলের সঙ্গে এই আনন্দমুখর মুহূর্তটি উপভোগ করেন।

Shuddhi.com
Pioneer in village based website

এই সম্মেলন ছিল আমাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি হিসেবে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। অনেকগুলো মূল্যবান প্রস্তাবের মধ্যে একটি এখানে তুলে ধরা হলো যাতে আমাদের সম্মেলনের চরিত্র স্পষ্টভাবে বোঝা যায় :

> স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘ ন'বছর পরও আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বরঞ্চ আমাদের শিক্ষাকে দিন দিন সংকুচিত, ব্যয়বহুল, ও ঘোরালো করা হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদ প্রবর্তিত আমলাতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও বিরাজমান। এখনও আমাদের কারিগরি ও বুনিয়াদি শিক্ষার সন্তোষ-জনক কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। আজও আমাদের দেশের শতকরা ৮৬.২ জন লোক নিরক্ষর। তাই এই সম্মেলন দেশের বর্তমান নৈর্ব্যক্তিক ও সংকুচিত শিক্ষার আমূল সংস্কার করে দেশে ব্যাপক গণ, কারিগরি ও বুনিয়াদি শিক্ষার

প্রসারের জন্যে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা তৈরি এবং তাহা অবিলম্বে কার্যকরী করার দাবি জানাচ্ছে।

ভাবতে অবাক লাগে পাকিস্তানী নির্যাতন, জেল, জুলুম উপেক্ষা করে আমরা তখন কী করে এ ধরণের দুঃসাহসী প্রস্তাব গ্রহণ করতে পেরেছিলাম। এই সাহসের ভিত্তি ছিল আমাদের মধ্যে দৃঢ়তর ঐক্য এবং সৌভ্রাতৃত্ব।

চড়ের মূল্য সাতচল্লিশ হাজার টাকা

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর আহ্বানে ১৯৫৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি কাগমারীতে আফ্রো-এশিয়ান সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মাহবুবের কাছে শুনেছি এখানে পূর্ব বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবী ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছিলেন প্রফেসর হুমায়ুন কবির, তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল, রাধারানী দেবী, কাজী আবদুল ওদুদ প্রমুখ। চট্টগ্রাম থেকে মাহবুবের নেতৃত্বে এক বিরাট শিল্পী বাহিনী ঐ সম্মেলনে যোগদান করে। তাদের মধ্যে ছিলেন কবিয়াল রমেশ শীল, ফনী বড়ুয়া, রায় গোপাল, অচিন্ত্য চক্রবর্তী, হরিপাল, নাসির উদ্দীন, দীননাথ সেন, আবুল হাসনাত, এমদাদুল ইসলাম ও মাহবুব হাসান। এরা সবাই কৃষ্টিকেন্দ্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। তখন ট্রেনে খাওয়া-দাওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। যাবার একদিন আগে রিহার্সেল শেষে মাহবুব আমাকে বললো, ট্রেনে খাবারের কোন আয়োজন নেই। পঞ্চাশজনের জন্য তোমাকে খাবার তৈরি করে দিতে হবে। আমার মনে আছে সারা রাত জেগে তাদের জন্য রুটি তৈরি এবং খাবার রান্না করে দিতে হয়েছিল আমাকে।

মাহবুবের এই ধরণের তাৎক্ষণিক দাবি মিটাতে গিয়ে মাঝে মাঝে আমি হাঁপিয়ে উঠতাম। সে এসব বুঝতে চাইতো না। হঠাৎ দশজনের মতো সহকর্মী নিয়ে এসে বলতো, তারা দুপুরে খাবে। আবার কোন কোন সময় রিহার্সেল শেষে প্রায় দশ-পনেরো জনকে খাওয়াতে হতো। এ প্রয়োজন মেটাতে আমার যে কত কষ্ট হয় সেই বোধ তার ছিল না। ভাবপ্রবণতা এবং সহকর্মীদের প্রতি প্রগাঢ় মমত্ববোধ তার কাছে সবসময় প্রাধান্য পেত।

একদিকে স্বামীর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা, তার বন্ধু-বান্ধবদের আপ্যায়ন, সামাজিকতা, অন্যদিকে আমার লেখাপড়া, ছাত্রী সংসদের দায়িত্ব, ঘর-সংসার এবং আমাদের একমাত্র কন্যা শিশুর পরিচর্যা, এত রকমের কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে আমি হিমশিম খেয়ে যেতাম। নারীদের ভাগ্যই এই। তারা নিজের অজান্তে অবস্থার শিকার হয়ে পড়ে। এই টানাপোড়েনের মধ্যে আমি বি.এ পাস করলাম। স্বপ্ন নিয়ে মানুষ বাঁচে। এই উত্থান-পতনের মধ্যেও আমি আমার শান্তিনিকেতনে পড়ার স্বপ্নকে লালন করেছিলাম। মাহবুবের কলকাতাবাসী এক বন্ধুর মাধ্যমে আমার ভর্তির আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাও পাকা হয়ে গিয়েছিল।

এই সময় আব্বা একদিন আমাকে বললেন, স্থানীয় বেসরকারি গুল-এ-জার বেগম স্কুলে বি.এ পাস শিক্ষিকা দরকার, আমি যেন সেখানে দরখাস্ত করি। উল্লেখ্য, আব্বা তখন গুল-এ-জার বেগম বালিকা বিদ্যালয়ের অবৈতনিক জেনারেল সেক্রেটারি।

Pioneering village based website

সেখানে শিক্ষকতা করলাম প্রায় দশ মাস। এর মধ্যে মাস দু'য়েকের জন্য একবার প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিশেষ একটি ঘটনার সম্মুখীন হলাম। তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের টেস্ট পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। তার মধ্যে প্রায় সাত-আটজন অকৃতকার্য হয়। সাপ্তাহিক ছুটির দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার বারান্দায় কয়েক ঝুড়ি ফল, বিস্কুট, কেক ইত্যাদি। একজন পুরুষ ও একজন মহিলা বসার ঘরে আমার সঙ্গে দেখা করার অপেক্ষায়। আমার দারোয়ান আইয়ুবের কাছে খবর পেলাম তারা একজন অকৃতকার্য ছাত্রীর পিতা-মাতা। পাথরঘাটা থেকে এসেছে আমার সাথে দেখা করার জন্য। উদ্দেশ্য বোঝার বাকি থাকলোনা। তাদের মেয়েকে পরীক্ষায় পাস করিয়ে দেয়া। মনে মনে ভীষণ রাগ হলো। কিন্তু এসব সমস্যার সম্মুখীন একদিন হতেই হবে। সাহস করে বসার ঘরে যেতেই তাদের অনুনয়-বিনয় শুরু হয়ে গেল। তাদের বোঝাতে চেষ্টা করলাম এই মেয়ে পাস করার উপযুক্ত নয়। সে কিছুতেই ম্যাট্রিক পাস করতে পারবেনা। তাকে টেস্ট পরীক্ষায় পাস করানো বৃথা। তারা কিছুতেই মানবেন না। আমাকে অনুরোধ করে বললেন, পাস না করলেও কোন অসুবিধা নেই। আমাদের মেয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে এই কথা সকলকে বলতে চাই, কারণ এতে তাকে বিয়ে দিতে সুবিধা হবে। এই অপরিণত বয়স্ক মেয়েটাকে বিয়ে দেয়াটাই প্রধান উদ্দেশ্য। তাকে উচ্চ শিক্ষা দেয়ার কোন আগ্রহ তাদের মধ্যে ছিল না। এই কথা বুঝতে পেরে আমার মনটা বিষণ্নতায় ভরে গেল। এক পর্যায়ে তারা আমাকে স্কুলের উন্নয়নের জন্য পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দেয়ারও প্রস্তাব করলেন। তখনকার দিনে এর মূল্য অনেক এবং স্কুলের জন্য এর প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু চাঁদার জন্য নিজের মূল্যবোধ বিসর্জন দেয়া যায় না। আমি বিনয়ের সাথে তাদের প্রত্যাখ্যান করলাম এবং তাদেরকে বিদায় জানালাম।

এর মধ্যে অনেকদিন গড়িয়ে গেল। মাহবুব ব্যবসা বাণিজ্য এবং বীমা কোম্পানিতে কাজ করে বেশ কিছু অর্থ সঞ্চয়ে সমর্থ হয়। আগেই বলেছি এই টাকা থেকে দেওয়ান বাজারে একটা জমি কেনা হয়েছিল। সেখানে ছোট্ট একটি বাড়িও তৈরি করা হয়। একদিন ওর ছোট মামা এল.এ চৌধুরী এসে প্রস্তাব দিলেন সি.এন্ড.বি ত্রিশ লক্ষ ইট সাপ্লাই নেয়ার জন্য টেন্ডার আহ্বান করেছে। এই কাজ অত্যন্ত লাভজনক হবে। ইট সাপ্লাই দিতে হবে চট্টগ্রাম থেকে সাতাশ মাইল দূরে শিয়ালবুক্কাতে। এসব কাজে অনভিজ্ঞ মাহবুব তাঁর সঙ্গে পার্টনারশিপে এই কাজ করার জন্য সম্মত হয়। শিয়ালবুক্কায় যথারীতি ব্রিকফিল্ডের জায়গা কিনে ইটকাটা-পোড়ানোর কাজও শুরু হয়ে গেল। এই সময়ে কাগমারী সম্মেলনে পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি, SEATO, বাগদাদ চুক্তি এবং পূর্ব বাংলার স্বায়ত্বশাসন নিয়ে সোহ্‌রাওয়ার্দীর সঙ্গে মওলানা ভাসানীর তীব্র মতানৈক্য দেখা দেয়। এবং ভাসানী এক পর্যায়ে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি আসসালামু-আলাইকুম উচ্চারণ করেন। এর প্রতিক্রিয়ায় দৈনিক ইত্তেফাকে মওলানা ভাসানীকে নিয়ে নানা ধরণের অরুচিকর বক্তব্য প্রকাশ করা হয়। একদিন সি.এন্ড.বি-র সেকশন অফিসার ঐ রাজনৈতিক বক্তব্যে প্রভাবিত হয়ে মওলানা ভাসানীর প্রতি অশ্রদ্ধাপূর্ণ এবং কুৎসিত মন্তব্য করে ফেলে মাহবুবের সামনে। সে এতে উত্তেজিত হয়ে সেকশান অফিসারের

গালে সজোরে একটি চড় বসিয়ে দেয়। ফলে সেকশন অফিসার তাদের ব্রিকফিল্ডে কয়লা সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। বৃষ্টিতে প্রায় ত্রিশ লক্ষ কাঁচা ইট ভিজে মাটিতে মিশে যায়। আমরা সম্মুখীন হই বিরাট এক আর্থিক বিপর্যয়ের। ব্রিকফিল্ড করতে মোটা অংকের টাকা ধার করতে হয়েছিল। এ টাকা পরিশোধ করার জন্য বিক্রি করতে হয় আমাদের বাড়ির আশেপাশের জমি। এতেও যখন ধার শোধ হলোনা দুঃশ্চিন্তায় মাহবুব অসুস্থ হয়ে পড়ল। তখন আমার সমস্ত গয়না তার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলাম, যদি আমরা বেঁচে থাকি জীবনে গয়নার অভাব হবেনা। আমার কাছে গয়নার চাইতে তোমার সম্মান রক্ষা করা অনেক বেশি মূল্যবান। এ গয়না বিক্রি করে ধার শোধ করা হয়। এভাবে রাজনৈতিক কারণে একটি চড়ের মূল্য দিতে হয়েছিল তখনকার দিনে প্রায় সাতচল্লিশ হাজার টাকা।

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক আইন জারি হলে মাহবুব আবার আত্মগোপনে চলে যায়। আমার জীবনের আকাশ আবার মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। সাথে সাথে শুরু হয় আমার সংগ্রামী জীবন। এই আবর্তের মাঝে আমি ঘুরতে থাকলাম। শান্তি নিকেতনে যাওয়া আর হলো না। এভাবে একটি স্বপ্নের সমাধি হলো। মানুষের জীবন নদীর স্রোতের মতো। কখন কোথায় কিভাবে বাঁক নেয়, ঘটনার অভিঘাতে সমস্ত জীবনটাই পাল্টে যায় মানুষ নিজেই তা জানে না। আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল *শান্তি-নিকেতন* থেকে বাংলায় এম.এ পাস করে শিক্ষকতা করবো। কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি অবশেষে হয়ে গেলাম পেশাদার সমাজকর্মী। স্বপ্নভঙ্গের পর যে পেশায় আমি এলাম তাতে আমার কোন খেদ নেই। বরঞ্চ সামাজিক অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে আমার সাধ্যমতো এই ক্ষেত্রে কাজ করার চেষ্টা করেছি।

Gramati.com
Pioneer in village based website

বাসায় নবীনদের আড্ডা

৬০ দেওয়ান বাজার আমাদের বাসাটি ছিল বুদ্ধিদীপ্ত তরুণদের একটি মনোরম আড্ডার জায়গা। এখানে সাহিত্য-সংস্কৃতি, সমাজ-উন্নয়ন, রাজনীতি বিষয়ে উৎসাহী ব্যক্তিরা আসতেন। এর মধ্যে নবীনেরা ছিল খুবই প্রাণবন্ত। তাদের নিয়ে আমাদের একটি বিশেষ জগৎ ছিল। প্রায়ই বিকেলে আমরা জোর আড্ডায় বসতাম। এতে থাকতো সুচরিতদা, সফিউল আলম, মামুন ভাই, হারুন ভাই, ইউনূস ভাই, আবদুস শাকুর, এমদাদুল ইসলাম, দীননাথ সেন, সোবহান, সুধাংশু ভট্টাচার্য (একাত্তরের শহীদ) আবদুল হাই, কাজী ফরিদ প্রমুখ। এমদাদ ভাই সব সময় গুরুগম্ভীরভাবে মাহবুবের সাথে রাজনীতির কথা আলোচনা করতেন। মাহবুরের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র। বাম ঘেঁষা সেই এমদাদ এখন চট্টগ্রামের একজন প্রতিষ্ঠিত এডভোকেট। ধীরস্থির প্রকৃতির মানুষ সফি ভাই চমৎকার বক্তৃতা দিতেন। কলেজ সংসদে নির্বাচিত জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি হাতে নিয়েছিলেন। তার সঙ্গে কাজ করতে খুবই আনন্দ পেতাম তার নির্মল হাসি এবং সুমিষ্ট ব্যবহারের জন্য। আজকাল দীননাথের কথা বিশেষ করে মনে পড়ে। কলেজ ম্যাগাজিন প্রকাশের সময় একসাথে কাজ করতে গিয়ে তার সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় পাই। প্রায়ই আমাদের বাসায়

আসতো। কৃষ্টিকেন্দ্রের নাটক বিভাগের দায়িত্বে ছিল। চমৎকার অভিনয় করতো। চট্টগ্রাম কলেজের পাট গুটিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যে অধ্যয়নরত অবস্থায় কলকাতা চলে যায় (১৯৫৯)। এখনো চট্টগ্রামকে ভুলতে পারেনি। মাঝে মাঝে চিঠি লিখে আমাদের খবর জানার জন্য উদগ্রীব থাকে। তার চিঠিগুলো কবিতার মতো। হাতের লেখা মুক্তাক্ষরের মতো ঝকঝকে। আঁকে চমৎকার। তাকে আমরা ভুলতে পারি না। এই আড্ডায় আরেকজন আমাদের বিশেষ আনন্দ দিতো, চিত্ত বিশ্বাস। মামুন ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, বাড়ি গহিরা। মার্শাল ল' হওয়ার পর কলকাতা চলে যায়। বহু বছর পর (১৯৮০) বাংলাদেশে ফিরে এসেছিল। ঢাকায় আমাদের বাসায় অনেকদিন ছিল।

আমার ভাগ্নে চৌধুরী জহুরুল হক তখন কিশোর। এই বয়সেই সাহিত্যের প্রতি তার দারুণ আগ্রহ দেখেছি। কয়েকটি ছোট গল্প এবং কবিতা লিখে এনে প্রায়ই আমাকে পড়ে শোনাতো এবং সংশোধন করে দিতে বলতো। এই ব্যাপারে তাকে আমি সব সময় উৎসাহ দিতাম। এখন সে আমাকে অতিক্রম করে বহুদূর এগিয়ে গেছে। বর্তমানে একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক, গ্রন্থ প্রণেতা। সম্প্রতি মাহবুবের 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' এই কবিতার মূল পুস্তিকা সে উদ্ধার করেছে এবং 'প্রসঙ্গ : একুশের প্রথম কবিতা' শিরোনামে নব্বই পৃষ্ঠার একটি গবেষণামূলক বই প্রকাশ করেছে। বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের কৃতী অধ্যাপক। এখনো সে কৃতজ্ঞতাভরে পুরোনো দিনের কথা স্মরণ করে।

এই প্রসঙ্গে কলেজ জীবনের পরেও আমাদের বাসায় ইউনূস ভাইয়ের নিয়মিত আসা যাওয়ার কথা মনে পড়ে। ইউনূস ভাই এসেই 'পিয়াজুর' (ডালের বড়া) অর্ডার দিতেন। পিয়াজু, মুড়িভাজা এবং চানাচুর খেতে খেতে আমরা দারুণ আড্ডায় মেতে উঠতাম। এতে গান-বাজনা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, হাস্য-কৌতুক থেকে শুরু করে কিছুই বাদ যেতনা। ইউনূস ভাই এবং মামুন ভাইয়ের হাস্য রসের চুটকি ছিল এই আড্ডার প্রধান আকর্ষণ। তারা অবিরাম মজার মজার গল্প বলে যেত। আর আমরা প্রাণ উজাড় করে হাসতাম।

এক সন্ধ্যায় আমরা গল্প করছিলাম। শুনতে পেলাম একজন ভিখারি বারান্দার দরজায় টোকা দিয়ে বারবার বলছিল 'ওবা দুয়া খরাত দ'না,' (বাবা দু'মুঠো খয়রাত দাও)। আমার মেয়ে মুন্নি দৌড়ে এসে বলল, আম্মা, ভিখারি নয়, ইউনূস মামা। আমরা সকলে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লাম। তাঁকে কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠানের মঞ্চেও এই ধরনের হাস্যরসের অভিনয় করতে দেখেছি। মুন্নিকে তিনি খুবই ভালোবাসতেন। তিনি আসলেই মুন্নি তার কোল জুড়ে বসতো। ইউনূস ভাই তাকে নানা ধরনের হাসির গল্প শোনাতেন। এখনো মুন্নি অতীতের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে প্রায়ই ইউনূস মামার পিয়াজু খাওয়ার কথা স্মরণ করে। এই সূত্রে জামাই ইশতিয়াক এবং আমার দুই নাতি ইখতিসাদ ও ইবতিসামেরও তিনি অত্যন্ত প্রিয়।

মনে পড়ে মার্শাল ল' জারি (অক্টোবর ১৯৫৮) হওয়ার পর পরই চট্টগ্রামের তৎকালীন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন কৃষ্টিকেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে মাহবুব একটি অরাজনৈতিক সাহিত্য সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং প্রায়ই আমাকে বলতো— ইউনূসকে সম্পাদক করে একটা সংগঠন করতে পারলে ভালো

Pioneer in village based website

হতো। এই মর্মে, আমাদের আড্ডা শেষে একদিন তাঁর সাথে মাহবুব দীর্ঘ আলোচনা করে। তিনিও রাজি হলেন। আবুল ফজলকে সভাপতি এবং মুহাম্মদ ইউনূসকে সম্পাদক করে গঠন করা হলো চট্টগ্রাম সাহিত্য পরিষদ। এর সকল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের রিহার্সেল আমার বাসাতেই হতো। এই পরিষদের উদ্যোগে গঠিত হয় রমেশ শীল সংবর্ধনা সংসদ। এরও সম্পাদক ছিলেন মুহাম্মদ ইউনূস। ১৯৬৪ সালে ১০ এপ্রিল মুসলিম ইনস্টিটিউটে প্রবাদপ্রতিম কবিয়াল রমেশ শীলকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। এই উপলক্ষে তার সম্পাদনায় সংবর্ধনা সংসদের পক্ষ থেকে 'লোকগীতি' নামে রমেশ শীলের গান এবং ছড়া সংবলিত ১১৮ পৃষ্ঠার একটি সংকলন প্রকাশ করা হয়।

ইউনূস ভাইয়ের সাথে নানা বিষয়ে বিশেষ করে সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে প্রায়ই মাহবুবকে আলোচনা করতে দেখতাম। মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে নানা বিষয়ে বিতর্ক হতেও দেখেছি। কিন্তু কোন দিন মনান্তর হতে দেখিনি। তখনকার দিনের এই সব মূল্যবোধ আজকাল বিরল। প্রধানত এর অভাবের কারণেই আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বা পলিটিক্যাল কালচার গড়ে উঠছেনা বলে আমার ধারণা।

Chunati.com
Pioneer in village based website

সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে

ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন

৩ এপ্রিল, ১৯৫৪ সাল। পূর্ব পাকিস্তানে এ.কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এই নতুন পরিবেশে ২৩ থেকে ২৭ এপ্রিল ঢাকায় কার্জন হলে পাঁচদিনব্যাপী সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকী। উদ্বোধন করেছিলেন ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। চট্টগ্রাম থেকে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আবুল ফজলকে করা হয়েছিল কথাসাহিত্য শাখার সভাপতি। তিনি তাঁর ভাষণের এক জায়গায় বলেছিলেন, আমার কাছে আরাফাতের ময়দান থেকে পল্টনের মাঠ অধিকতর প্রত্যক্ষ। ভাষণের এক পর্যায়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর ভাষণ অন্যকে পড়তে হয়েছিল। কবীর চৌধুরী তখন চট্টগ্রামে চাকরিরত। তিনি আমাদের একজন সুহৃদ এবং পারিবারিক বন্ধু। মাহবুব তাঁকে অগ্রজের মতো শ্রদ্ধা করে। তিনি ও তাঁর স্ত্রী মেহের কবীরও আমাদের সঙ্গে এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি নাটক বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তাঁর অনুজ মুনীর চৌধুরী। শওকত ওসমান কী প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন মনে পড়ছেনা। 'সাহিত্যে সমাজ চেতনা' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেছিল মাহবুব উল আলম চৌধুরী। বয়োকনিষ্ঠ আনিসুজ্জামান এবং রফিকুল ইসলামকে প্রায় মঞ্চে দেখেছি, কখনো ঘোষক, কখনো উপস্থাপক, কখনো ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত থাকতে। আমার সেজ ভাই শাহাবুদ্দীনের বন্ধু হিসেবে এই সময় রফিকুল ইসলামের সাথে পরিচয় হয়।

সম্মেলনের উদ্যোক্তারা পূর্ব বাংলার ১০৮ জন সাহিত্যিক এবং শিল্পীর স্বাক্ষর সংবলিত একটি আবেদনপত্র প্রচার করেন। সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশের জন্য পূর্ব বাংলার শিল্পী-সাহিত্যিকদের ব্যাপকতম ঐক্য প্রতিষ্ঠা করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। জাতীয় প্রগতি, বিশ্ব শান্তি, সৃষ্টি-ক্ষমতাকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করা, বাংলা সাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যকে প্রবাহমান ধারায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সব রকম বিকৃতি, কুসংস্কার, কুপমন্ডুকতা এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও সম্প্রদায়গত বিভেদের বিরুদ্ধে মানবতার আদর্শকে উচ্চে তুলে ধরা ছিল এই সম্মেলনের মূলনীতি। এতে বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় চার শতাধিক প্রতিনিধি যোগ দেন। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী প্রতিনিধিও এতে ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছিলেন মনোজ বসু, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, রাধারানী দেবী এবং দীপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়।

Pioneer in village based Website

সম্মেলনে সব চাইতে অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি যোগদান করেন চট্টগ্রাম জেলা থেকে। মাহবুব উল আলম চৌধুরীর নেতৃত্বে (দ্রষ্টব্য : ১. কবীর চৌধুরী : নাইবা হলো পারে যাওয়া, পৃষ্ঠা-৬৫। ২. কলিম শরাফী : অভিনন্দন, পৃষ্ঠা-২৬।) শতাধিক শিল্পী-সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিকর্মী এতে অংশগ্রহণ করেন। পনেরজনের মতো নারীও এই দলে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর মধ্যে যাদের নাম মনে পড়ছে তারা হলেন— ফওজিয়া সামাদ, কামেলা শরাফী, মালেকা আজীম, জাহানারা (জুবলী), হোসনে আরা মাক্কি, দীপ্তি খাস্ত গীর, সুপ্তি খাস্তগীর, মনি ইমাম, বেবী, মুন্নি, খালেদা রহমান। আমিও তাদের সঙ্গে ছিলাম। পুরুষদের মধ্যে যাদের নাম মনে আছে তাঁরা হলেন— কলিম শরাফী, সুচরিত চৌধুরী, চিরঞ্জীব দাশ শর্মা, হরিপাল, মাহবুব হাসান, দীননাথ সেন, এ.কে. মান্নান, গোপাল বিশ্বাস, গোপাল ভট্টাচার্য, অচিন্ত্য চক্রবর্তী, নাসির উদ্দিন, শঙ্কর দাশগুপ্ত, নিত্য গোপাল দত্ত, আমিনূল ইসলাম, অরুণ গুহ, সুধাংশু ভট্টাচার্য, মলয়ঘোষ দস্তিদার, লক্ষ্মীকান্ত দত্ত, রমেন মজুমদার, রণজিৎ শর্মা, পরিতোষ হাজারী, অনিল মিত্র, সাদেক নবী, ওবায়েদ জায়গীরদার, বেলাল মোহাম্মদ, এয়ার মোহাম্মদ প্রমুখ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত চট্টগ্রামের দেবপ্রিয় বড়ুয়া, মৃণাল দস্তিদার, আবু মোহাম্মদ শাহাবুদ্দীন এবং আরো কয়েকজন চট্টগ্রাম দলে যোগ দিয়েছিলেন।

আমাদের অনুষ্ঠানসূচিতে ছিল— চট্টগ্রামের বিখ্যাত প্রান্তিক নবনাট্য সংঘের প্রযোজনায় এবং কলিম শরাফী ও চিরঞ্জীব দাশ শর্মার পরিচালনায় প্রায় অর্ধশত শিল্পীর সম্মিলিত কণ্ঠের গণসঙ্গীত। কলিম শরাফীর পরিচালনায় 'বিভাব' ও 'অরুণোদয়ের পথে' নাটিকা, শঙ্কর দাশগুপ্ত ও নিত্যগোপাল দত্তের (পরবর্তীকালে সত্যজিৎ রায়ের সহকারি) যৌথ পরিচালনায় এবং সুচরিত চৌধুরীর সুরারোপিত গীতিনাট্য 'শিল্পীর নবজন্ম' এবং লোকনৃত্য 'মলকাবানু'। এছাড়া চট্টগ্রামের রেলওয়ে শিল্পীসংঘ 'ছেঁড়াতার' নাটক এবং একটি ছায়ানাট্য পরিবেশন করে। আমাদের পলরবসন নামে খ্যাত হরিপালের দরাজ গলার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে যখন চট্টগ্রামের বিশাল শিল্পীগোষ্ঠী সলিল চৌধুরীর সেই 'যুদ্ধ না শান্তি' বিখ্যাত গান গেয়ে উঠলো তখন শ্রোতাদের মধ্যে কী দারুণ উৎসাহ। শ্রোতারাও এর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়েছিল 'আর যুদ্ধ নয়, আর নয় শিশুদের মায়েদের কান্না, আরনা-আরনা-আরনা .....। কে ভুলতে পারে সেই গান, 'ও আলোর পথ যাত্রী', 'ঝন্‌ঝা ঝড় মৃত্যু দূর্বিপাক' 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা আজ জেগেছে সেই জনতা'। কলিম শরাফীর নেতৃত্বে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের নবজীবনের গান 'না না না মানব না মানব না, শত মৃত্যুরে কিনে নেব প্রাণপণে, ভয়ের রাজ্যে থাকবো না' ... প্রভৃতি গান কী দারুণ আবেগ এবং উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। সেই স্মৃতি আমার মনে অক্ষয় হয়ে আছে। জীবনে প্রথম এত বড় সম্মেলনে সকলের সাথে কণ্ঠ মেলাবার সুযোগ পেয়ে এখনও প্রভূত গৌরব অনুভব করি। হরিপালের একক কণ্ঠের গান 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে'.... কিম্বা জাহানারার 'আজ বাংলার বুকে দারুণ হাহাকার' ... এসব গানের সুরের মূর্ছনা এখনো কানে বাজে। রাত্রে কবিয়াল রমেশ শীল, ফনী বড়ুয়া এবং রায়গোপালের কবিগান খুবই উপভোগ্য হয়েছিল।

এই অনুষ্ঠান নিখুঁতভাবে পরিবেশনার লক্ষ্যে চট্টগ্রামে শওকত ওসমানের বাসায় দীর্ঘদিন আমরা মহড়া দিয়েছিলাম। শওকত ওসমান আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় শওকত

Pioneer in Village Based Website

ভাই। মাহবুবকে তিনি ছোট ভাইয়ের মতো স্নেহ করতেন। এক সময় তিনি চট্টগ্রামে মাহবুব সম্পাদিত মাসিক 'সীমান্ত'-এর সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। চট্টগ্রামে সকল সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের একজন অগ্রদূত, তিনি ছিলেন আমাদের অতি কাছের মানুষ। শওকত ভাইয়ের বাসা ছিল চন্দনপুরায় একটি গলির শেষ প্রান্তে। অনেক গাছপালা পরিবেষ্টিত। গেইটে ছিল ঝুমকা-ফুলের লতা। তাতে অসংখ্য ফুল। এর মৃদু গন্ধে আমাদের গানের রিহার্সেল আরো উপভোগ্য হতো। রিহার্সেল শেষে ফিরে যাওয়ার সময় আমরা প্রায়ই দু'একটা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে যাওয়ার লোভ সামলাতে পারতাম না। শিল্পীদের মধ্যে কঠিন শৃঙ্খলাবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা এবং সহমর্মিতার লক্ষ্যে সেদিন কলিম ভাইয়ের সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় পেয়েছিলাম। তিনি যে কত বড় প্রশিক্ষক এটা যারা তাঁর কাছে গান শিখেছেন তারাই উপলব্ধি করতে পারবেন।

প্রতিদিন রিহার্সেল শেষে রাত দশটার দিকে আমরা সকলে একসাথে পায়ে হেঁটে চন্দনপুরা থেকে দেওয়ান বাজারের রাস্তা বেয়ে নিজেদের বাসায় ফিরে যেতাম। সে যেন একটা উৎসব-মুখর পরিবেশ। আমরা নানা রকম আনন্দ-গল্প করতে করতে হাঁটতাম। ঢাকায় গিয়ে কে কোথায় থাকবো, সম্মেলন শেষে কে কি করবো ইত্যাদি আলোচনা করতে করতে আমরা সকলে কল্পনার জগতে চলে যেতাম। এভাবে রোজ পথ চলতে চলতে মাক্কি আপার সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়। তার সাথে প্রথম পরিচয় হয়েছিল চট্টগ্রাম নারী সমিতিতে, কিন্তু তখনো তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। এই রিহার্সেলের মাধ্যমে আমাদের বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়। মাক্কি আপার স্বামী সাবের আহমদ চৌধুরী বদলি হয়ে যাওয়ার পরও আমরা যখনি ঢাকায় যেতাম, ওদের বাসায় থাকতাম। আর মাক্কি আপারাও চাটগাঁ এলে নিজের ভাইবোনের বাসায় না উঠে আমাদের সাথে থাকতো। ক্রমে আমার বন্ধুত্বের সীমানা ছাড়িয়ে মাক্কি আপা আমার স্বামী মাহবুবেরও বন্ধু হলো। মাক্কি আপার গুণগ্রাহী এবং বন্ধুর সংখ্যা অগণিত। তবে তার বন্ধুত্বের সীমার মধ্যে প্রবেশ করতে পারতো খুবই নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ। যাদের একবার বন্ধু বলে গ্রহণ করতো তাদের জন্য যেকোন ত্যাগ স্বীকারে সে ছিল অদ্বিতীয়। প্রতিটি বন্ধুর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিত। তাই তার বন্ধুরাও তাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো।

সম্মেলনের কথায় ফিরে আসি। একদিন অনুষ্ঠান শেষে ঢাকা এবং পশ্চিম বাংলার শিল্পী সাহিত্যিকেরা ছুটে এসে প্রান্তিকের এই কৃতিত্বের জন্য কলিমভাই এবং মাহবুবকে একে একে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানাতে লাগলেন। এক পর্যায়ে মাহবুব তাঁদের সঙ্গে চট্টগ্রামের শিল্পী ও প্রতিনিধিদের পরিচয় করিয়ে দিতে শুরু করলো। মেয়েদের মধ্য থেকে মাক্কি আপা এবং আরো দু'একজনকে পরিচয় করিয়ে দিলো। আমি বাদ পড়ে গেলাম। আমার দারুণ অভিমান হলো। এই সময় রবীন্দ্রনাথের সেই গানের লাইনটি মনে পড়ল 'তোমার প্রেমে আঘাত আছে, নাইকো অবহেলা।' তাতেই সান্ত্বনা পেলাম। এই বেদনা পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত হবার পথে আমাকে প্রচুর শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে।

বাড়িতে পয়লা বৈশাখ

পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান আমরা নিজেদের মধ্যে ঘরোয়াভাবে শুরু করি দেওয়ান বাজারে আমাদের বাড়ির পেছনের উঠোনে (১৯৬৬)। খুব ভোরে সকলে চলে আসতো।

Chittali.com
Pioneer in village based website

আন্দরকিল্লা থেকে আসতেন বেলা হক, আবদুল হক, ফ্যানসি, রুমী, সানি। পাথরঘাটা থেকে তারাপদ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, পুতুল রানী দাশ এবং তাঁদের ছেলে মেয়েরা, বানী দাশ এবং তার ছেলেমেয়েরা, শিখারানী দাশ ও নিখিলরঞ্জন দাশ, সদরঘাট থেকে কামাল এ খান এবং কিশোয়ার, রুমঘাটা থেকে হুসনুন্নাহার, লুৎফর রহমান, শাহাবুদ্দীন, স্বপন, নওশাদ ও সেবু। দেওয়ান বাজার থেকে মেজবাহউদ্দীন জঙ্গী এবং সেজবাবু। আমাদের পাড়া থেকে কৃষ্ণগোপাল সেন, মীরা সেন, সমীরন রায় এবং তার ছেলে মেয়েরা। দেখতে দেখতে লোকের ভিড়ে আমাদের উঠোন ভরে যেত।

উষালগ্নে সুচরিতদার বাঁশী বাদনের মধ্য দিয়ে পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান শুরু হতো। তারপর সকলে মিলে 'এসো হে বৈশাখ এসো এসো' এই গান গেয়ে আমরা বছরের প্রথম দিনকে বরণ করতাম। চমৎকার আবৃত্তি করতেন চিত্তরঞ্জন দাশ। পর পর অনেকগুলো একক ও সম্মিলিত গানের শেষে পরিবেশন করা হতো লুচি-তরকারি। পুতুল রানী এতে আমাকে সহায়তা করতেন। রোদ তীব্র হয়ে ওঠার আগেই আমাদের অনুষ্ঠান শেষ হতো। আমাদের পয়লা বৈশাখ উদযাপন অনুষ্ঠানে একদিন ঘটনাক্রমে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর মুনীর চৌধুরী। তিনি মাহবুবের বহু পুরোনো বন্ধু। ঢাকা থেকে বিশেষ কাজে চট্টগ্রাম এসেছিলেন। সেবার আমাদের বাসায় উঠেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে সদরঘাটে বাঁশপাড়া চৌধুরী বাড়িতে প্রতি বছর পয়লা বৈশাখের প্রীতিভোজের কথা। বিনোদ'দা ও বৌদি অতি যত্নসহকারে অসংখ্য অতিথিকে আপ্যায়ন করতেন লুচি-তরকারি, মাছ-ভাত, দই-মিষ্টি দিয়ে। তাঁরা আজ আর পৃথিবীতে নেই। নেই তারাপদ ঘোষ, জামানভাই, নবী ভাই, হাসান ইমাম, আলী ইমাম যাঁরা ছিলেন সকল প্রকার সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের পৃষ্ঠপোষক।

এই পয়লা বৈশাখকে কেন্দ্র করে ছোটদের একটি শিল্পী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এর প্রেক্ষিতে রবীন্দ্র জন্মোৎসব করার উদ্দেশ্যে ছোটদের রবীন্দ্রজয়ন্তী সংসদ নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়। তারাপদ ঘোষকে সভাপতি, সাফিনা মাহবুব মুন্নিকে সম্পাদক এবং শীলা দাশ ও সাদেক সাইফুর রহমান স্বপনকে যুগ্ম-সম্পাদক করা হয়। এছাড়া এর সদস্য ছিল ফ্যানসি হক, সিতারা সাত্তার, রানা মল্লিক, শর্মিলা দাশ, শাহদীন মালিক (বর্তমানে খ্যাতনামা এডভোকেট) ও দীনা জাহেদ। তারাপদ ঘোষ বয়সে প্রবীণ হলেও ছোটদের ঘোষকাকা হিসেবে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। মুসলিম ইনষ্টিটিউট মিলনায়তনে ৩০ বৈশাখ, ১৩৭৩ বাংলা, ১৪ মে ১৯৬৬ এই সংসদের উদ্যোগে রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপিত হয়। এই উপলক্ষে দুই পৃষ্ঠার একটা ফোল্ডার ছাপানো হয়েছিল। লাল রঙে রঞ্জিত এই ফোল্ডারটি ডিজাইন করেছিলেন আমার ননদ সেলিমার স্বামী প্রখ্যাত শিল্পী সাবিহউল আলম। ফোল্ডারের তথ্য অনুযায়ী এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের উনিশটি গান পরিবেশিত হয়। এর মধ্যে কয়েকটি গানের নৃত্যরূপও দেয়া হয়। সম্মিলিত গানে হারমোনিয়াম বাজিয়ে লীড দিয়েছিল সাফিনা মাহবুব মুন্নি। ধারা বর্ণনায় ছিল রাণা মল্লিক ও মুনতাসির মামুন (বর্তমানে বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও কলাম লেখক)। আবৃত্তি করেছিল উদয় শঙ্কর। তবলা সঙ্গতে ছিল গৌর শঙ্কর। গানে এবং নাচে প্রায় সত্তর জন শিশুশিল্পী অংশগ্রহণ করে। ফ্যানসি হক, শর্মিলা দাশ, সাফিনা মাহবুব মুন্নি, কিশোওয়ার

কামাল, শীলা দাশ, মুনতাসির মামুন, দীনা জাহেদ, জয়শ্রী দাশ, স্মৃতি, সেবু, চন্দন, কাকলি, শিপ্রা, ফাল্গুনি, স্বপন, শামদানী, সানি, সব্যসাচী এবং আরো অনেকে সেদিন গান এবং নাচে অংশগ্রহণ করে প্রচুর প্রশংসা লাভ করে। জেলা প্রশাসক কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মনসুর আহমেদ (বিশিষ্ট ছোট গল্প লেখক) রিহার্সেল এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ছোটদের উৎসাহিত করেছিলেন। সেদিনের সেই শিশু শিল্পীরা আজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাদের স্মরণ করি এবং সকলের মঙ্গল কামনা করি।

সম্পূর্ণভাবে ছোটদের দ্বারা পরিচালিত হয় বলে এই অনুষ্ঠান সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গান শিখিয়েছিলেন চিরঞ্জীব দাশ শর্মা। নাচ শিখিয়েছিলেন চুনী সেন ও অনিল্ কুমার মিত্র। রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতিসহ অনেকগুলো পোস্টার দিয়ে হল ঘরটিকে সুসজ্জিত করা হয়েছিল। সুভিনিয়রে লাল রঙের লোগো এঁকে শিশুদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন সাবিহউল আলম। এখনো চোখের সামনে ভাসছে লাল কৃষ্ণচূড়া এবং সবুজ পাতায় ভরা বাঁশের বেড়া দিয়ে সাজানো মঞ্চের পেছনটা। মাঝখানে রবীন্দ্রনাথের এক বিশাল প্রতিকৃতি। আমাদের বন্ধু কৃষ্ণগোপাল সেন সারাদিন খেটে মঞ্চের প্রেক্ষাপট সাজিয়েছিলেন। গান, নাচ, মঞ্চসজ্জা, দেয়ালের লিখন, সংস্কৃতিবান ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি সবকিছু মিলে একটা অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন।

এর ফলশ্রুতিতে 'সূচনা' নামে ছোটদের একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গঠিত হয়। 'সূচনা' নামটি দিয়েছিল মাহবুব। তারাপদ ঘোষকে সভাপতি এবং মেজবাহউদ্দীন জঙ্গীকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়। উল্লেখিত শিশুদের মধ্যে অনেকে এই সংগঠনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। পরবর্তীতে তারা একুশে ফেব্রুয়ারি, পয়লা বৈশাখ ইত্যাদি উদ্‌যাপন করে।

Ghuari.com
Pioneer in village based website

এরূপ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে মুহাম্মদ জাহাঙ্গীরের সাথে মুন্নিদের বন্ধুত্ব হয়। জাহাঙ্গীর যদিও তার সিনিয়র ছিল, মুন্নি তাদের সঙ্গে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতো। সেই সুবাদে সে আমাদের বাসায় প্রায়ই আসতো। তখন থেকেই তার উন্নত শিল্পবোধ এবং সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় পাই। ক্রমে আমাদের সঙ্গেও তার হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমাকে ভাবি ডাকতে শুরু করলো। ঢাকায় এসেও সে আমাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছে। জাহাঙ্গীর আজ প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক এবং টেলিভিশনের খ্যাতনামা উপস্থাপক।

পরবর্তীকালে তৎকালীন চিটাগাং ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান খান শামসুর রহমানকে (জনসন নামে পরিচিত) সভাপতি এবং মাহবুব উল আলম চৌধুরীকে সম্পাদক করে ব্যাপক ভিত্তিতে নববর্ষ উদযাপন সংসদ গঠিত হয়। এই সম্পর্কিত আমার পুরোনো ফাইলে একটি পেপার কাটিং পেলাম। এর কিছুটা অংশ এখানে তুলে ধরলাম। এই সংসদের প্রথম বর্ষপুর্তি অনুষ্ঠান উদযাপন করা হয় ২৪ এপ্রিল, ১৯৬৭। মুসলিম ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে। উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. এ.আর মল্লিক। এতে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও অতুল প্রসাদের গান এবং গণ সঙ্গীতসহ মোট ত্রিশটি গান পরিবেশিত হয়। গেয়েছিলেন ননী দত্ত, হরি প্রসন্ন পাল,

প্রণোদিত বড়ুয়া, চমন আফরোজ, শেফালী ঘোষ, শিখারাণী দাশ, সাফিনা মাহবুব মুন্নি। এরপর শুরু হয় চিরঞ্জীব দাশ শর্মার পরিচালনায় 'এসো হে বৈশাখ' গীতিনকশা। এতে কণ্ঠ দেন ননী দত্ত, প্রণোদিত বড়ুয়া, অজয়, সিতারা সাত্তার, রুমী হক, রাজিয়া শাহীদ, সাফিনা মাহবুব মুন্নি, রায় বাবু, রথিন, শিখারানী দাশ ও শেফালী ঘোষ। ধারা বর্ণনায় ছিলেন মনসুর আহমেদ, এডভোকেট চিত্তরঞ্জন দাশ, চমন আফরোজ ও প্রণোদিত বড়ুয়া। সবশেষে কৃষকদের ফসল তোলার আনন্দের ওপর ভিত্তি করে রচিত নৃত্যনাট্য 'সোনালি ফসল' মঞ্চস্থ করা হয়। এতে অংশগ্রহণ করে জার নিগার, সিতারা সাত্তার, ফ্যানসি হক, জয়শ্রী বড়ুয়া, আলপনা, শিরিন আজমত ও শিলা দাশ। নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন চুনী সেন ও অনিল মিত্র। মনে পড়ে খান শামসুর রহমান কালিদাসের কাব্য থেকে সংস্কৃত ভাষায় একটি উপভোগ্য আবৃত্তি পরিবেশন করেছিলেন।

এই সংসদের উদ্যোগে প্রতি বছর পয়লা বৈশাখ উৎযাপন করা হতো। ১৯৭০ এর এপ্রিল মাসে এই সংসদ থেকে শেষবারের মতো পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপিত হয়।

এই উপলক্ষে রিহার্সেল হতো আমাদের বাড়ি এবং জেবা রশীদ চৌধুরীর বাসায়। জেবার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ শিল্প মেলায়। তার স্বামী মতিউর রহমান ছিলেন কনজারভেটর অফ ফরেস্ট। তিনি ছিলেন একজন আদর্শবান পুরুষ এবং সততার প্রতীক। জেবা অত্যন্ত বিনয়ী, কর্মঠ এবং আধুনিক মনের অধিকারী। পুরোনো গানের একজন অনুরাগী। চট্টগ্রামে টেলিগ্রাফ অফিসের পাশে টিলার ওপর অবস্থিত তাদের বাসায় মাঝে মাঝে আমাদের গানের আসর বসতো। এই সময় তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। আসরের শেষে আমরা সকলে দারুণ আড্ডা জমাতাম। মনে পড়ে সেখানে উপস্থিত থাকতেন তৎকালীন জেলা প্রশাসক মোকাম্মেল হক, ডা. কামাল এ খান, ইঞ্জিনিয়ার মনজুর আহমদ, রিজিয়া শাহীদ, বাবলু, শিরিন হক, শাহীদ এবং আরো অনেকে। কোন কোন দিন পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া হঠাৎ করে আমরা চলে যেতাম পতেঙ্গা সমুদ্র তীরে। গাড়িতে সবাই মিলে গান করতাম। শুনতাম মনজুরের অপূর্ব কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীত 'সঘন গহন রাত্রি ঝরিছে শ্রাবণ ধারা'। তার সাথে আমরা সবাই গলা মিলাতাম। জেবা ও মাহবুব পুরোনো দিনের গান গেয়ে আমাদের স্মৃতিতে ঢেউ তুলতো। গভীর রাত পর্যন্ত আমরা সমুদ্রের পাড়ে বসে স্মৃতিচারণ করতাম। মাঝে মাঝে মোকাম্মেল হক যাকে আমরা শালুমামা বলে ডাকি, সুরেলা কণ্ঠে গাইতেন 'বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিলে'।

আনন্দের কথা দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বাংলা 'বর্ষ-বিদায় ও বর্ষ-বরণ সম্মিলন পরিষদের' উদ্যোগে আবুল মোমেনের নেতৃতে চট্টগ্রাম শিল্পকলা একাডেমীতে এবং দৈনিক 'পূর্বকোণ'-এর বার্তা সম্পাদক নাসিরউদ্দীন চৌধুরী ও আহমেদ ইকবাল হায়দারের নেতৃত্বে ডি. সি পাহাড়ের নিচে প্রতি বছর বিপুল উৎসাহে পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপন করা হয়।

Chhuti.com
Pioneer in village based website

কতিপয় শ্রদ্ধেয় সুহৃদ

মাহবুবের বন্ধুবৃত্তের পরিধি বিশাল। ঢাকা, কলকাতা, যেখানেই যাই তার দু'একজন বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ কথা বলার পরই বোঝা যায় তাঁরা এককালে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এমন কিছু বন্ধুর সাথে ক্রমে আমারও আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাঁদের কয়েকজনকে ঘিরে আমার কিছু স্মৃতির অবতারণা করলাম।

শিখার চিঠি

আমাদের বিয়ে উপলক্ষে কলকাতায় অনেককে নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছিল। তার মধ্যে একজন ছিল মাহবুবের ছোটবেলার বন্ধু পঞ্চশিখা সরকার। তার কথা মাহবুবের মুখে আমি অনেক শুনেছি। তাদের পরিবারের সঙ্গে মাহবুবের ছিল নিবিড় সম্পর্ক। মাহবুব তার মাকে মা বলে ডাকতো। সে এই মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিল অফুরন্ত স্নেহ-ভালোবাসা। তিনি তার এক হারানো সন্তানের স্মৃতিকে ধরে রাখার উদ্দেশে অকৃত্রিম স্নেহে মাহবুবকে ডাকতেন হারাধন। ঐ বাড়ির সকলে তাকে হারাধন কিংবা হারানদা বলে ডাকতো। পঞ্চশিখা শুধু ডাকতো কবি বলে। ছোটবেলা থেকে তাদের দু'জনের মধ্যে যে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল তা দীর্ঘকাল স্থায়ী ছিল। সে মাহবুবকে নিয়মিত চিঠি লিখতো। তারা চট্টগ্রাম শহরে পাথরঘাটায় ষোড়শী কটেজে থাকতো। দেশ ভাগের পরেই কলকাতা চলে যায়। এই পরিবারের সান্নিধ্যে এসে মাহবুবের মধ্যে অসম্প্রদায়িক প্রগতিশীল চিন্তাধারার সূচনা হয়। এদের অনুপ্রেরণায় সে সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক চর্চায় উদ্দীপিত হয়। তাই কোনদিন এ পরিবারকে সে ভুলতে পারেনি। আমাদের বিয়ের আগে সে আমাকে শিখার সঙ্গে তার আন্তরিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছিল। তার চিঠিগুলো আমাকে পড়তে দিয়েছিল এবং বলেছিল প্রয়োজনবোধে পুড়িয়ে ফেলতে। আমি চিঠিগুলো একে একে পড়লাম। কাব্যিক ভাষা, মার্জিত রুচির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলাম। চিঠিগুলি সযত্নে রেখে দিলাম। কিন্তু মনের গভীরে এই উদারতার স্থান ছিল না। ভালোবাসার ক্ষেত্রে মানুষ বড় বেশি স্বার্থপর। সেখানে কারো ভাগ বসানোকে কেউ মেনে নিতে পারেনা। ভালোবাসার ধন অন্যকে বিলিয়ে দেয়া যায়না।

যাহোক, বিয়েতে আমরা উভয়ে শিখাকে আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণপত্র ছাড়াও আসার জন্য অনুরোধ করে একটি চিঠি দিয়েছিলাম। উত্তরে সে আমাকে লিখেছিল, তোমার

সুন্দর লিপিখানি পেলুম। মনে খুব স্বস্তি পেলুম দু'জনার চমৎকার মিলন হবে এ আশ্বাস পেয়ে। তোমার শুভদিনের শুভক্ষণে আমার উপস্থিতি কামনা করেছ। আমারও বাসনা ছিল কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য হয়ে উঠলো না। আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইল। যার কল্যাণে তোমার সাথে পরিচয়, তাকে জানাই শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ।

মাহবুবকে লিখলো :

প্রিয় কবি,

ভীষণ ভাল লাগলো কাল যখন শ্বেত কপোত বুকে করে নিয়ে এলো শুভদিনের সুসংবাদ। নিজেকে ধন্য মনে করলুম। হাজার হাজার লোক যা পেলো, আমিও তাদের মধ্যে একজন। তাই ভাবছি অত লোকের উপস্থিতিতে হয়ত আমার অনুপস্থিতি পড়ে যাবে ঢাকা। যাক বিধাতার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি যেন তোমরা সুখী হও। ফুলের মতো সুন্দর হোক তোমাদের জীবন। কক্ষণও যেন কিছুর জন্যে অভাব অনুভব না কর। পরম আনন্দ ও সুখের মধ্যে যেন তোমাদের নতুন জীবন শুরু ও শেষ হয়। এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। তুমি হয়তো ভাবছো দূরে বসে কেবল প্রার্থনা জানালে, আসলে নাতো? আমি ভাবছি, যদি আমি আসি হয়তোবা কোন অঘটন, কোন অশান্তির কারণ হয়ে উঠি! আমার মতো অভাগার কোন শুভ কাজে উপস্থিত থাকতে নেই। আমার প্রাণ ভরা প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইল।

চিঠি দু'টি আমার আনন্দের সাগরে তুমুল ঢেউয়ের ঝড় তুলল। বাইরে যত স্বাভাবিকভাবে এগুলোকে গ্রহণ করতে চেষ্টা করি ভেতরে ততই এক অব্যক্ত বেদনায় আমি ক্লান্তি অনুভব করি। কোনভাবে মাহবুবের সঙ্গে সহজ হতে পারি না। অথচ তাকে আমার মনের কথা বলতেও পারি না, পাছে সে আমাকে সঙ্কীর্ণমনা ভেবে ভুল বোঝে। তখনই মনে হয়েছিল স্বামী সবসময় বন্ধু হয়না। বন্ধু সে, যাকে জীবনের সব কথা খুলে বলা যায়। তখন আমার এমন কোন বন্ধু ছিল না। রবীন্দ্রনাথের গানের কয়টি লাইন মনে পড়লো :

তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে।
যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নব প্রেমজালে
...তবু মনে রেখো।

মনে হলো এটা বুঝি শিখারই কথা। আমাদের জীবনে রবীন্দ্রনাথই বড় সান্ত্বনা। সুখে-দুখে, আনন্দ-বেদনায়, প্রেমে-বিরহে, মিলনে-বিচ্ছেদে তিনি আমাদের সহায়। নিজেকে রবীন্দ্ররুচির অন্তর্গত করে মনের শক্তি সঞ্চয়ের জন্য প্রচুর রবীন্দ্রসঙ্গীত আর রবীন্দ্র-রচনা পাঠে মগ্ন হলাম।

আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে মাহবুব হঠাৎ করে শিখার কাছে চিঠি লেখা বন্ধ করে দিলো। শিখা আমাদের কাছে নিয়মিত চিঠি লিখে লিখে ক্লান্ত হয়ে অবশেষে লিখলো—

প্রিয় কবি,

বুলবুলের কাছে চেয়ে পাঠিয়েছি তার একটি ছবি আর জানতে চেয়েছি তার নতুন জগতের কাহিনী। এখনো আসেনি উত্তর। আমার লেখা পেয়ে বোধহয় তোমার আজকাল ভালো লাগেনা। তাই আমায় আজকাল আর লেখ না। আমারও ভালো লাগেনা একটুখানি তোমাকে বিরক্ত না করে : যেদিন তোমার বিরক্তি সীমায় ঠেকবে— সেদিন হয়তো আমারও ভালো লাগার শেষ হবে।

এই চিঠি পেয়ে তার প্রতি সহানুভূতিতে আমার মনটা ভরে গেল।

এর মধ্যে প্রায় বিশ বছর কেটে গেছে। আমাদের জীবনে অনেক উত্থান-পতন হয়েছে। নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর আমি আর মাহবুব ১৯৭৩ সালে লন্ডন যাওয়ার পথে কলকাতায় গ্রান্ড হোটেলে একদিন ছিলাম। তখন মাহবুবের পুরোনো বন্ধু বৈদ্যনাথ মিত্র আমাদের সাথে দেখা করার জন্য হোটেলে এসেছিলেন। উল্লেখ্য, পাকিস্তান সরকার মাহবুবের পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করেছিল। ফলে সুদীর্ঘ উনিশ বছর সে দেশের বাইরে যেতে পারেনি। এতদিন পর বৈদ্যনাথকে পেয়ে সে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। কথা প্রসঙ্গে শিখা পরিবারের খবরাখবর নিতে গিয়ে জানতে পারলো মাত্র দু'মাস আগে একটি কন্যাসন্তান জন্ম দিয়ে শিখা পরলোকগমন করেছে। এ খবর জেনে মাহবুব বিষণ্ন হয়ে পড়লো।

ইংরেজ বন্ধু রবার্ট ক্রস

লন্ডনে গিয়ে আর একটি দুঃসংবাদে মাহবুব দুঃসহ বেদনায় কাতর হয়ে পড়লো। ১৯৪৪-১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রবার্ট ক্রস নামে এক তরুণ ইংরেজ যুবক রাজকীয় বিমান বাহিনীতে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট হিসেবে ছিলেন। মাহবুব তখন কিশোর। রবার্ট ক্রস তাকে সাম্যবাদী রাজনীতিতে দীক্ষা দিয়েছিলেন এবং ইংরেজি সাহিত্যের প্রচুর বইপত্র পড়তে দিয়ে তাকে প্রগতিশীল ভাবধারায় আগ্রহী করে তুলেছিলেন। এছাড়া মাহবুবদের পারিবারিক আর্থিক উন্নতির মূলেও ছিল এই রবার্ট ক্রস। তার সঙ্গে দীর্ঘকাল মাহবুবের পত্র-যোগাযোগ ছিল। এক সময় সে তার ঠিকানা হারিয়ে ফেলায় চিঠিপত্র লেখায় বিঘ্ন ঘটে। কিন্তু স্মৃতি থেকে সে কোনদিন রবার্ট ক্রসকে মুছে যেতে দেয় নি। আমাকে প্রায়ই তাঁর কথা বলত। বলত, কিভাবে তিনি মাহবুবের জীবনে রূপান্তর ঘটিয়েছেন। আমরা যখন লন্ডনে, তখন একদিন তাঁর ঠিকানা সংগ্রহের জন্য রয়েল এয়ারফোর্স হেড কোয়ার্টারে উপস্থিত হই। রিসেপশনে গিয়ে আমাদের অভিপ্রায়ের কথা জানাই এবং বলি রবার্ট ক্রস সাইথহ্যামটনের অধিবাসী। তাঁরা বললেন, রবার্ট ক্রসকে একটি চিঠি লিখে আমরা যেন রেখে যাই। তাঁরা তা পৌঁছিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবেন। দিন দশেক না যেতেই এয়ারফোর্স থেকে একটি চিঠি এলো। মাহবুব এটা রবার্ট ক্রসের চিঠি মনে করে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। খুলে দেখল, মাত্র কয়েক মাস আগে তিনি মারা গেছেন।

দু'টি মৃত্যুর নাটকীয় আকস্মিকতায় মাহবুব একেবারে ভেঙে পড়লো। এগারো মাসের ভ্রমণে ইউরোপের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে আমরা গেলাম বটে কিন্তু তার এই মানসিক অবস্থার জন্য পুরাপুরি উপভোগ করতে পারিনি।

মানুষের জীবন জ্যামিতিক ধারায় চলে না। জীবন নদীর বাঁকে বাঁকে থাকে বহু দুঃখ-বেদনার স্মৃতি কথা, বহু নাটকীয় আকস্মিকতা। আমরা জীবনে বহুবার এ ধরনের আকস্মিকতায় আক্রান্ত হয়েছি। ভেঙেছি বহুবার, আবার জেগেছিও। গ্যাটের বিখ্যাত ফাউস্ট গ্রন্থের কবিতা Build It Again এর মতো।

যে মাধুরী গেল অন্তর্হিত হয়ে
যে সৌন্দর্য গেল মৃত্যুর মাঝে তলিয়ে
আবার তুমি গড়ে তোল তাকে
হে পৃথিবীর মানব সন্তান
আবার গড়ে তোল পৃথিবীকে
গড়ো তাকে আরো মহত্তর করে...

জীবনের কথা ভাষায় বলা যায়। কিন্তু প্রেমের কথা বলতে লাগে সুর। সুর সাধনায় আমি সিদ্ধ নই। আমার ভালোবাসার কথা, প্রেমের কথা আমি ভাষায় বলেছি। আমার ভাষায় দৈন্য আছে। দৈন্য নেই আমার প্রেমে। তাই আমার প্রেম কখনো সাদামাটা, কখনো দ্বন্দ্বমুখর, কখনো গভীর। লুইকানের ত্রিভুজাকৃতি আমাদের এই প্রেমের মধ্যখানে মাহবুব, দুই বাহুর দুই প্রান্তে শিখা আর আমি। আমি আমার প্রেমে শিখার কণ্ঠস্বর শুনে মাঝে মাঝে আঁতকে উঠি। বলতে আজ দ্বিধা নেই শিখা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বন্ধু। তবে আমাদের মধ্যে পার্থক্য হলো, সে মানুষকে দেবতা বানিয়েছে, আমি দেবতাকে বানিয়েছি মানুষ। এই পার্থক্য নিয়েও আমরা পরস্পরের মর্মসঙ্গী। তাই তার চিঠিগুলো আমি এখনো সযত্নে রেখে দিয়েছি। এ আমার বিনয় নয়। একান্ত হৃদয়ানুভূতি, আকাশ যার সাক্ষী।

আর রবার্ট ব্রুস, শিখার মতো তাকেও আমি জীবনে চোখে দেখিনি, শুধু তার বাঁশি শুনেছি। যিনি তার স্বদেশ থেকে বহুদূরে অবস্থিত এই বাংলাদেশে তার প্রতি নিবিষ্টচিত্ত এক অনুরাগী রেখে গেছেন— আমার স্বামী। তাঁর নবজন্মের জন্য সদা সর্বদা শ্রদ্ধাভরে তার নাম উচ্চারণ করে। মাঝে মাঝে নিভৃতে দু'ফোটা চোখের জল ফেলে তাকে স্মরণ করে।

নিরভিমান বৈদ্যনাথ মিত্র

আজ শুধু মাহবুবের বন্ধু নয়, আমারও বন্ধু। দূরবর্তী কলকাতায় থাকেন। অকৃতদার, একা। দূরবর্তী হয়েও তিনি আমাদের অনেক নিকটবর্তী মানুষ। উত্তর না পেয়েও প্রায় প্রতিমাসে আমাদের চিঠি লেখেন। উত্তর না পাওয়ার জন্য তার মধ্যে কোন ক্ষোভের সঞ্চার হতে দেখিনি। এমন নিরাভিমান বন্ধু সততই বিরল। তার টানেই আজকাল কলকাতায় যাই। তিনি আমাদের খবরের অপেক্ষায় নিরন্তর উদ্বিগ্ন থাকেন। যেমন

Bhunati.com
Pioneer in Village Based Website

রাজস্থানে জয়পুরের অদূরে আমাদের সড়ক দুর্ঘটনার খবর শুনে তিনি দারুণভাবে কাতর হয়ে পড়েছিলেন।

চট্টগ্রামে বৈদ্যনাথের সঙ্গে (১৯৪২) মাহবুব এক সময় অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান ছাত্র কংগ্রেসের কর্মী ছিল। বৈদ্যনাথ কংগ্রেস ও কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন চট্টগ্রাম জেলা ছাত্র কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। দেশ বিভাগের পর কলকাতা চলে যান। সেখানে প্রাদেশিক প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির দপ্তর-সম্পাদক হিসেবে দীর্ঘদিন দেশের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের জন্য তিনি বন্দি জীবন যাপন করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমরা ওপারে যেতে পারিনি। দেশের ভেতরে দুঃসহ জীবন যাপন করেছি। ওই সময় নাকি বৈদ্যনাথ বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরে মাহবুবকে পাগলের মতো খুঁজে বেড়িয়েছে। মাহবুবের বন্ধুভাগ্য ঈর্ষান্বিত হওয়ার মতো। পঞ্চাশ বছর আগের বন্ধুরা এখনো কলকাতায় গেলে আমাদের ঘিরে থাকে।

অগ্রজপ্রতিম সুচরিত চৌধুরী

এখনো বন্ধুদের টানে আমরা প্রতি বছর কলকাতা যাই। এই যাত্রায় আমাদের সঙ্গী হতেন সুচরিত চৌধুরী। তিনি আজ প্রয়াত। প্রতিনিয়ত তার কথা মনে পড়ে। তিনি শুধু মাহবুবের চিরকালের বন্ধু ছিল না, ছিলেন আমার অগ্রজপ্রতিম, আমার বিয়ের সেতু-বন্ধন রচনাকারী। তিনি চিরকাল আমাকে আপন ছোট বোনের মতো ভালোবেসেছেন। আমাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী। তিনি ছিলেন এক মহান শিল্পী। প্রতিষ্ঠিত লেখক। চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ছিলেন মাহবুবের অন্যতম সঙ্গী। ঢাকায় এসে প্রতি বছর প্রায় মাস খানেকের মতো থাকতেন আমাদের কাছে উত্তরার বাসায়। সকালে ওঠে নিয়মিত রোজ একঘন্টা বাঁশিতে রেওয়াজ করতেন। আজ তিনি নেই। মনে হয় তিনি যেই ঘরে থাকতেন সেখানে তাঁর সুরের ধ্বনি প্রতিনিয়ত বাজছে। আমাদের বাসায় সুচরিতদার জন্য নির্ধারিত কক্ষটি এখন শূন্যতায় ভরা। দুই বন্ধু মিলে মাঝে মাঝে টেলিভিশনে পুরোনো ছায়াছবি দেখে কাঁদতেন। একবার শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' পড়ে দু'জনকে কাঁদতে দেখে আমার নাতিরা অবাক। বই পড়ে কাউকে কাঁদতে তারা কখনো দেখেনি। বড় কাউকেও দেখেনি ছোটদের বন্ধু হতে। তিনি ছিলেন আমার নাতিদেরও বন্ধু। দুই নাতির প্রিয় বাঁশি নানা। মজার মজার গল্প বলে তাদের মাতিয়ে রাখতেন। তিনি মারা গেছেন বেশ কয়েক বছর পার হয়ে গেছে। কিন্তু তার স্মৃতিময় সীমান্তের (আমাদের বাড়ির নাম) নীল কক্ষে এসে আমার নাতিরা এখনো বলে ওঠে— বাঁশি নানা, তুমি কোথায়।

সাংবাদিক দেবপ্রিয় বড়ুয়া

নামটি যেমন তেমনি তিনি মাহবুবের প্রিয় বন্ধু। ডি. পি বড়ুয়া নামে পরিচিত। তাঁদের দু'জনের পরিচয় কলেজ জীবন থেকে। চট্টগ্রাম কলেজে যখন দেবপ্রিয় পড়তেন, তখন থেকে। কলেজের মেধাবী ছাত্র ছিলেন তিনি। মাহবুবের কাছে প্রায়ই তাঁর গল্প শুনতাম।

Ghorati.com
Pioneer in village based website

চট্টগ্রামে যে সমস্ত সংগঠন এবং আন্দোলনের শীর্ষস্থানে মাহবুব ছিল, দেবপ্রিয় ছিলেন সব সময় তার সহযোদ্ধা। 'সীমান্ত' পত্রিকায় লিখতেন। মাহবুব তার বাড়িতে যে সংস্কৃতি বৈঠকের আয়োজন করতো সেখানেও তিনি নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। এই বৈঠককে কেন্দ্র করে 'সীমান্ত'-এর একটা লেখক গোষ্ঠী তৈরি করার উদ্দেশ্যে মাহবুব নিয়মিত এর আয়োজন করতো। এখানে উপস্থিত থাকতেন সাহিত্য-সংস্কৃতি অনুরাগীরা। এভাবে দু'জনের মধ্যে গড়ে ওঠে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় মাহবুব বিভিন্ন কাজে প্রায়ই ঢাকা যেতো। দেবপ্রিয়ের সাথে ঢাকা হলে থাকতো। আত্মীয়-স্বজনের বাসায় কিংবা হোটেলে উঠতো না। দু'জনে গল্প করে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাতো। শুনেছি বড়ুয়ার রুমে ঢাকার নবীন লেখক এবং ছাত্র নেতাদের আড্ডা বসতো। সেখানেই তাঁদের অনেকের সাথে মাহবুবের পরিচয়। কবি শামসুর রাহমান, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দিন আল-আজাদ, সাদেক খান প্রমুখ ছিলেন এই আড্ডার অন্তর্ভুক্ত।

আমার স্বামীর এমন ঘনিষ্ঠ বন্ধু কিন্তু তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয় বহু বছর পর ঢাকায়। আমাদের উত্তরার বাড়িতে কোন একটি ডিনারে মাহবুব তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিল। সেই থেকে আমি তাঁর ভাবির আসনে অধিষ্ঠিত হলাম। তিনি তখন বংলাদেশে সংবাদ সংস্থার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এবং চীফ্ এডিটর। তারপর থেকে তাঁর সঙ্গে আমি প্রায়ই যোগাযোগ করতাম ইউনিসেফের বিভিন্ন কাজে। ১৯৯৩ সালে এশিয়া প্যাসিফিক অন চাইলড রাইটস্ সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্য ইউনিসেফ থেকে বাংলাদেশ ডেলিগেশনের সদস্য হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে গিয়েছিলেন। এই দলে আরো ছিলেন নূরুজ্জামান ফারুকী এবং আমার আর এক স্নেহভাজন আস্মা আব্বাসী। আস্মার বলার ভঙ্গি চমৎকার। ঢাকা লেডিস ক্লাবের পয়লা বৈশাখ অনুষ্ঠানে উপস্থাপকের ভূমিকায় তার সুললিত কণ্ঠের কথাগুলো শোনার জন্য আমরা আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করি। যেমন তার স্বামী মোস্তফা জামান আব্বাসীর লোক-সঙ্গীতের দরাজ গলার সুর, তেমনি আস্মার মধুর কণ্ঠের অনাবিল কথাগুলো। দুজনের জুড়ি অপূর্ব।

অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার ব্যাপারে দলগত ব্রিফিং এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতার জন্য বড়ুয়া প্রায়ই ইউনিসেফে আসতেন। এভাবে তাঁর সঙ্গে আমারও প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাঁর সাথে আবার ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ হলো আমি ইউনিসেফ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর। National Plan of Action For Children, 1997-2002 প্রণয়নের সময় বড়ুয়াকে আমরা কনসালটেন্ট্ হিসেবে নিলাম ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন সেক্টরে সাহায্য করার জন্য। তিনি তখন বি.এস.এস থেকে অবসরপ্রাপ্ত। এই কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর আরেকটি দিক উদ্ঘাটিত হয়। শিশুদের জন্য বিশেষ করে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং অঙ্গীকার, তাঁর বক্তব্য এবং লেখনীর মধ্য দিয়ে এতো স্পষ্টভাবে ফুটে উঠতো যে মনে হতো পাঁচ বছরের পরিকল্পনায় যা লেখা হচ্ছে তা তিনি এখনি সম্পন্ন করতে উদগ্রীব। আসলে তিনি একজন মানবতাবাদী। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে এর আভাস

Bhumati.com Pioneer in village based website

পাওয়া যায়। মাহবুব প্রায়ই তাঁর কথা স্মরণ করে। আমাকে দুই বন্ধুর গল্প শোনায়। তাঁর সাথে আমাদের নিয়মিতভাবে ফোনে কথা হয়, যদিও সাক্ষাৎ হয় অনেক দিনের ব্যবধানে।

চট্টগ্রামে প্রফেসর মফিজুল ইসলাম

মাহবুবের আরেক বন্ধু ছিলেন প্রফেসর মফিজুল ইসলাম। তিনি আমাদের চট্টগ্রামের বাড়িতে অসুস্থ অবস্থায় বেশ কিছুদিন ছিলেন। ওই সময় আমি তাঁকে রোজ রান্না করে খাওয়াতাম। তিনি আমাকে উদাত্ত স্বরে ভাবি বলে ডাকতেন। তাঁর প্রাণখোলা হাসির কথা ভোলা যায় না। মনে হতো অন্তর উজাড় করে দিচ্ছেন। মেধাবী ছিলেন কিন্তু জ্ঞানের অহঙ্কার কোন সময় করতেন না। তাঁকে কোন দিন কারো সম্পর্কে ঈর্ষান্বিত হতে দেখিনি। বাঙালিদের মধ্যে এই অসাধারণ গুণের অধিকারী লোক খুব কম দেখা যায়। তিনি বন্ধুদেরকে সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে পরিচয় করিয়ে দিতে ভালোবাসতেন। মফিজুল ইসলামের বাড়ি কুমিল্লা হলেও তার যৌবনকাল কেটেছে চট্টগ্রামে। শিক্ষকতা দিয়ে জীবন শুরু। শিক্ষক থাকাকালে প্রাইভেটে এম.এ পরীক্ষা দিয়ে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। এক সময় ছাত্রলীগ করতেন। পরবর্তীতে প্রগতিশীল আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। 'সীমান্ত' অফিসে থাকতেন। মাহবুবের দিবারাত্রির বন্ধু। পরবর্তীকালে কুমিল্লায় একজন খ্যাতনামা এডভোকেট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি আজ প্রয়াত।

Chhunati.com
Pioneer in village based website

সুহৃদ জাহেদ হোসেন

জাহেদ হোসেন মাহবুব এবং আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সুসময়ে এবং দুঃসময়ে আমাদের নির্ভরশীল বন্ধু। তাঁর জ্ঞানের পরিধি এত বিস্তৃত যে তাঁর সঙ্গে যে কোন বিষয়ে আলাপ করা যায়। মাহবুবের সঙ্গে রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, সঙ্গীত বিষয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দু'জনে আলোচনা করতে দেখেছি। তাঁর সঙ্গে মাহবুব খুব স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। জাহেদভাই পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর। তিনি শেকসপিয়ার, গ্যাটে, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে নজরুল, জীবনানন্দ দাশের কবিতা এই বয়সে (৭৫) অনর্গল মুখস্থ বলতে পারেন। আলোচনার মধ্যে তিনি কখনো কখনো উত্তেজিত হয়ে পড়েন। কিন্তু আমার সঙ্গে উচ্চস্বরে কথা বলার অবকাশ দেইনা। তিনি আমার উপদেষ্টা। যে কোন ইনফরমেশন দরকার হলে আমি টেলিফোনের সাহায্যে মুহূর্তের মাঝে সে খবর তাঁর কাছ থেকে পেয়ে যাই। এই ব্যাপারে কোনদিন ব্যতিক্রম হয়নি। তাই তাঁকে আমি এনসাইক্লোপিডিয়া ডাকি।

চট্টগ্রামের কৃতী সন্তান আহসাবউদ্দীন

চট্টগ্রামের কৃতী সন্তান প্রফেসর আহসাবউদ্দীন আহমদ পেশায় ছিলেন একজন ইংরেজি সাহিত্যের বিদগ্ধ অধ্যাপক। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপনা থেকে ইস্তফা দিয়ে

তিনি যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং বাঁশখালী থানা থেকে প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। মূলত তিনি একজন সার্থক রম্য-রচনাকার। তাঁর মতো ত্যাগী, সাহসী এবং সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত রাজনীতিবিদ সচরাচর চোখে পড়েনা। জীবনের বহু সুযোগ-সুবিধা এবং প্রলোভনের হাতছানিকে উপেক্ষা করে তিনি কৃষক-শ্রমিকের স্বার্থে জেল-জুলুম এবং শাসক শ্রেনীর নির্যাতন সহ্য করেছিলেন। ১৯৫২ সালে কুমিল্লায় যে পূর্ব পাকিস্তান সংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তিনি ছিলেন তার অন্যতম প্রধান সংগঠক। ওই সময়ে অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম এবং মাহবুব উল আলম চৌধুরীর সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর তিনি সর্বহারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। সারা জীবন ঐ সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। আদর করে বুলবুল (আমার ডাক নাম) ডেকে আমার কাছে কিছু চাওয়ার সেই কৌতুক প্রিয় মানুষটি আর পৃথিবীতে নেই। মৃত্যুর মাত্র এক সপ্তাহ আগে তিনি আমাদের উত্তরার বাড়িতে সারাদিন কাটিয়ে গেলেন। দুপুরে আমরা একসাথে খেলাম। আনন্দ-বেদনার কথা বলতে বলতে আমরা পুরোনো দিনে ফিরে গিয়েছিলাম। এমন মহৎ, নিঃস্বার্থ মানুষ কি আর কখনো জন্মাবে? বাঁশখালীতে এখনও তাঁর নাম শুনলে হিন্দু-মুসলমান, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাঁর উদ্দেশ্যে কপালে হাত ঠেকিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে।

তাঁর সঙ্গে আমার আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিল। তাঁর ছোটভাই ডাক্তার আহমদ আলী আমার মামাতো বোন লায়লা আপার স্বামী। সেই সুবাদে তিনি সবসময় আমার কাছে নিঃসঙ্কোচে তাঁর ছোট খাটো প্রয়োজনের কথা জানাতেন। মাহবুবকে অভিযুক্ত করে বলতেন, রাজনীতিতে আমাকে নামিয়ে তিনি এখন সুখে সংসার করছেন। তার জন্য নিয়মিত খাজনা না দিলে আমার চলবে কি করে।

Bhumati.com
Pioneer in village based website

মানবতাবাদী শরদিন্দু দস্তিদার

শরদিন্দু দস্তিদারের মতো এমন অমায়িক, জ্ঞানী-গুণী, নিরহঙ্কারী মানুষ জীবনে খুব কম দেখেছি। চট্টগ্রামে এক ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর জেঠতুতো ভাই অর্ধেন্দু দস্তিদার জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে (১৯৩০) সরাসরি যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। তাঁর অগ্রজ হেমেন্দু দস্তিদারও ঐ যুদ্ধে শরিক ছিলেন। তাঁর জেঠতুতো ভাই পূর্নেন্দু দস্তিদার এবং সুখেন্দু দস্তিদার চট্টগ্রামের বাম রাজনীতির কিংবদন্তি পুরুষ। চট্টগ্রামে আমাদের ৬০ দেওয়ান বাজারের বাড়ি সংলগ্ন পেছনের বাসায় থাকতেন পূর্নেন্দু দস্তিদার। আমাদের পেছনের উঠোন থেকে প্রায়ই তাঁদের জানালা দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে মাহবুবকে আলাপ আলোচনা করতে দেখতাম। প্রায়ই জানালা দিয়ে দেখতাম তিনি কিছু না কিছু লিখছেন।

শরদিন্দু দস্তিদার দীর্ঘকাল আত্মগোপন অবস্থায় কাটিয়েছেন। ওই সময় বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার জন্য প্রায় মধ্যরাতে আমাদের বাসায় আসতেন। তাঁকে কিছু

খাবার কথা বললেই তিনি আমার অসুবিধার কথা চিন্তা করে খেতে চাইতেন না। কিন্তু তাঁর চেহারা দেখেই আমি বুঝতে পারতাম তিনি অভুক্ত। তাঁকে জোর করে খাওয়াতে হতো। নারীদের প্রতি তাঁকে বরাবরই শ্রদ্ধাশীল দেখেছি। নারী সমিতি এবং ছাত্রী সংসদের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আমার যেসব আলোচনা হতো তাতে মনে হতো কারো ওপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দেয়ার নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁকে সব সময় দেখেছি একজন মানবতাবাদী হিসেবে। বোধকরি এই কারণেই তাঁকে আমি বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করি। তাঁর দুই খন্ডে প্রকাশিত 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে আমার কথা অনেক স্থানে উল্লেখ করেছেন। তিনি স্নেহভরে কোথাও আমাকে জওশন আরা বুলবুল, আবার কোথাও জোস্না আরা বলে উল্লেখ করেছেন। এই বইতে তিনি চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ইতিহাস চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। বইটি পড়তে পড়তে আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করলাম তিনি আমাকে কত স্নেহ করতেন।

শ্রদ্ধাভাজন কল্পতরু সেনগুপ্ত

মার্জিত রুচি, বিনয়ী আচার ব্যবহার এবং মার্কসীয় দর্শনে দীক্ষিত কল্পতরু সেনগুপ্ত ছিলেন মাহবুবকে বামপন্থী আন্দোলনে সম্পৃক্ত করার মহানায়ক। তিনি পঞ্চাশ দশকের প্রথম দিকে আত্মগোপন অবস্থায় কলকাতা চলে যান। প্রতি বছর আমরা কলকাতা গেলেই তিনি হোটেলে আমাদের দেখতে আসতেন। একবার আমাদের বিদায় দিতে দমদম এয়ারপোর্টে এসেছিলেন। ঘন্টাখানেক আমাদের সঙ্গে ছিলেন। গল্প করতে গিয়ে চট্টগ্রামের পুরোনো স্মৃতি বারবার স্মরণ করছিলেন। আমার বড় ভাই প্রফেসর হাবিবুর রহমান তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। মাহবুবের মামা আহমদ সাগীর চৌধুরী একজন অসম্প্রদায়িক ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁদের পার্টিকে নিয়মিত চাঁদা দিতেন, এসব কথা গর্বভরে উল্লেখ করেছিলেন। স্মৃতির ভারে তাঁর গলা ধরে আসছিল। দেখলাম, দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার বেদনা কী ভীষণভাবে তাকে এখনো দগ্ধ করে। তিনি আমাদের কাছে নিয়মিত চিঠি লিখতেন। সহযোদ্ধা হিসেবে মাহবুবকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থটি 'স্মৃতির সময় : সময়ের স্মৃতি' আমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তাতে নিজের হাতে লিখেছেন— 'অগ্রপথিক মাহবুব উল আলম চৌধুরীকে ১৪০৭ বঙ্গাব্দের প্রথম দিনে অভিনন্দন।' এই বইতে তিনি পাকিস্তানের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে মাহবুবের সাহসী ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। বোধকরি এই কারণেই বইটা আমার স্কুল জীবনের শিক্ষক আরতী দত্তের হাতে পাঠিয়েছিলেন যেন তা অবশ্যই আমরা পাই। অশীতিপর আরতীদি নিজে উত্তরার বাসায় এসে বইটি আমাদের হাতে পৌঁছে দেন। ২০০৩ সালের এপ্রিল মাসে মাহবুবের চিকিৎসার জন্য আমরা যখন কলকাতা যাই, তখন তিনি খুবই অসুস্থ। উভয়ে টেলিফোনে অনেকক্ষণ কথা বলেন। দু'জনেই অসুস্থ বলে সেবার তাঁর সাথে দেখা করতে পারিনি। সেদিন বুঝিনি, তাঁকে আর কোনদিন দেখবো না। কিছুদিন পরই তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি আমৃত্যু দেশ সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। ব্রিটিশ বিরোধী এবং পাকিস্তানের স্বৈরাচার বিরোধী

Chunati.com
Pioneer in Village based website

আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত। পশ্চিমবঙ্গে লেখক, সাংবাদিক এবং নজরুল গবেষক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাসে তিনি সপরিবারে ঢাকা এসেছিলেন। একদিন আমাদের উত্তরার বাড়িতে তাঁদের মধ্যাহ্নভোজে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। সেদিন একটা বিশেষ জরুরি কাজে আমাকে ঢাকার বাইরে যেতে হয়েছিল। আমার এই অনিচ্ছাকৃত অনুপস্থিতি তিনি অত্যন্ত ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে গ্রহণ করেছিলেন। এই মর্মে কলকাতা ফিরে গিয়ে আমার কাছে তাঁর ৮ নভেম্বরের চিঠিতে লেখেন :

> ..... আমার সুদীর্ঘ জীবন পথে অনেকের সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়েছে। তাঁদের মধ্যে আপনাদের দু'জনের কথা সর্বদাই আমার মনে আছে। বন্ধু মাহবুবের বীরত্বপূর্ণ কর্মকান্ডের কথা যখন বলি তখন শ্রোতারাও অনুপ্রাণিত হয়। আপনারা বর্তমানে আর্থিক দিক থেকে উচ্চ পর্যায়ে রয়েছেন, সাধারণত এই পর্যায়ে থাকলে অনেকে অতীতকে ভুলে যায়, পুরাতন দিনের মূল্য দিতে চায়না। কিন্তু কমরেড মাহবুব যেভাবে অতীত দিনের জন্য গর্ববোধ করেন তা বুঝে আমি আরো শ্রদ্ধান্বিত হয়েছি। তাঁর এই বলিষ্ঠ মানসিকতায় আপনার অবদান আছে, এটা অনুভব করি। নতুবা এককভাবে তিনি তাঁর বিশ্বাস ও জীবন দর্শন রক্ষা করতে পারতেন কিনা কে জানে। ফিরে এসে আপনাকে অদর্শনের জন্য আমার ঢাকা ভ্রমণে অপূর্ণতা বোধ করেছি। তাই চিঠি লেখার কর্তব্য অনুভব করলাম।

তাঁর এই চিঠিতে আমি হৃদয়ের স্পর্শ পেয়েছি। আমাকে তিনি নিরপেক্ষভাবে দেখতে চেষ্টা করেছেন। মাহবুবের অনেক বন্ধু অভিযোগের সুরে বলেন, তার (মাহবুব) দীর্ঘ নীরবতার জন্য আমিই দায়ী । তারা আরও বলেন, বহুদিন ধরে সে লেখেনা। কবিতা লেখেনা। কোন সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেনা। আমার নিজের কাছেও প্রশ্ন, আসলে কি তাই ? তার এই নিষ্ক্রিয়তার জন্য কি আমিই দায়ী ?

জীবনের ধারাবাহিকতায় অনেক চড়াই-উৎরাই পার হতে হয়। এতে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই অবদান থাকে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কারো অবদান কম-বেশি হতে পারে। এখানে পারসেনটেইজ কষা যায় না। কল্পতরু সেনগুপ্তের মতো একজন বড় মাপের মানুষ বন্ধু হিসেবে আমার মতো একজন সাধারণ ব্যক্তিকে যেভাবে মূল্যায়ন করেছেন তাতে আমি অভিভূত হয়েছি।

গোপাল বিশ্বাসের বিয়ে

গোপাল বিশ্বাসের সঙ্গে আমাদের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। প্রায় প্রতিদিন আমাদের বাসায় আসতেন। তিনি এতই আপানভোলা ছিলেন যে অনেক সময় আমাদের সামনে দিয়ে হেঁটে বেড রুমে চলে যেতেন এবং সেখানে আমাদের খুঁজে না পেয়ে আবার বসার ঘরে ফিরে এসে জিগ্যেস করতেন— তোমরা কি এখানে? তিনি চমৎকার ছোট গল্প লিখতেন।

চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তিনি একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর ছোট গল্পের কোন বই প্রকাশিত হয়নি। পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি হলে তিনি দেশত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে যান।

তার দেশপ্রেম এতই তীব্র ছিল যে ব্যক্তিগত প্রেমকে তিনি উপেক্ষা করতেন। হঠাৎ একদিন মাসিক 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় 'শকুন্তলা' বলে তাঁর একটি প্রেমের গল্প প্রকাশিত হয়। দেখে আমরা সবাই অবাক। গোপালদার মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হলো কী করে, এই নিয়ে আমাদের সার্কেলে ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেল। একদিন তিনি খুলেই বললেন তার প্রেমের কাহিনী। ফিরিঙ্গি বাজারে শ্যামচরণ কবিরাজের ছাদে এক সময় সাহিত্য বৈঠক বসতো। ওই কবিরাজ ভবনে বাস করত তার বান্ধবী অর্চনা। অর্চনা সাহিত্য বৈঠকের জন্য পাটি আর সতরঞ্চি জোগাতো। মাঝে মধ্যে মুড়ি-মুড়কি দিয়ে আপ্যায়নও করতো। এই বৈঠককে উপলক্ষ করে ওদের বাসায় গোপালদার যাতায়াত। তিনি অর্চনাকে বিভিন্ন বইপত্র পড়তে দিতেন। সাহিত্যচর্চায় উৎসাহ যোগাতেন। এভাবে ঘনিষ্ঠতা, ঘনিষ্ঠতা থেকে বন্ধুত্ব, বন্ধুত্ব থেকে প্রেম। কিন্তু অর্চনার মা-বাবা ছিলেন রক্ষণশীল। গোপালদা একেতো রাজনীতি করতেন, তদুপরি জাতে অর্চনাদের চেয়ে একধাপ নিচে। ফলে স্বাভাবিক গতিতে পরিণয় সম্ভব নয় জেনে তারা গোপনে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। এক পর্যায়ে আমার সাহায্য প্রার্থনা করেন।

আমাদের বাসার কাছে ফাতেমা জিন্নাহ গার্লস স্কুলে অর্চনা শিক্ষকতা করতো। মাঝে মাঝে আমাদের বাসায় আসতো আর আমাকে বুলবুল আপা বলে ডাকতো। চট্টগ্রামে গোপনে বিয়ে করা সম্ভব হবে না ভেবে স্থির করা হয় ঢাকায় বিয়ে হবে, সাংবাদিক সন্তোষ গুপ্তের বাসায়। গোপালদা কয়েকদিন আগে ঢাকায় চলে গেলেন। আমাকে দায়িত্ব দিয়ে গেলেন অর্চনাকে ঢাকা পাঠাবার। একদিন অর্চনা সকালে এসে তার ছোট্ট বাক্সটি আমার বাসায় রেখে স্কুলে চলে গেল। দুপুর একটার দিকে স্কুল থেকে এলে আমি তাকে নিয়ে আমাদের গাড়ি করে রেল ষ্টেশনে চলে যাই এবং অত্যন্ত সন্তর্পণে তাকে ট্রেনে তুলে দিই। অর্চনা ভয়ে মাথায় ঘোমটা দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে যাত্রীদের মধ্যে মিশে গেল। ট্রেন ছেড়ে দিলো। আমি বাসায় ফিরলাম। সন্ধ্যার দিকে অর্চনার ছোট ভাই স্বপন চৌধুরী তার খোঁজে এসেছিল। আমি কিছুই না জানার ভান করে তাকে বিদায় করলাম। পরে মাহবুব ঢাকায় টেলিফোন করে জেনেছিল সন্তোষ গুপ্তের বাসায় যথারীতি তাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। অর্চনাকে সম্প্রদান করেন তার বড় ভাই আশীষ চৌধুরী। তিনি তখন ঢাকায় আর্ট কলেজে পড়তেন।

সপ্তাহ দুয়েক পর শ্যামচরণ কবিরাজের ছাদে অর্চনার মা-বাবা তাদের বিয়ের এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেখানে আমন্ত্রিত হয়ে আমরা গিয়ে দেখি অর্চনা ইতোমধ্যে বিয়ের সব ঘটনা ফাঁস করে দিয়েছে। সকলে আমাকে দেখার জন্য উদগ্রীব। আমি যে অর্চনাকে ট্রেনে তুলে দিয়েছি তা তারা ইতোমধ্যে জেনে গেছে। অনুষ্ঠানে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম অনেকগুলো চোখ আমার দিকে কৌতুহলী দৃষ্টিতে চেয়ে পরস্পরকে বলছে, ইনি কি অর্চনাকে ট্রেনে তুলে দিয়েছিলেন ? হৈ চৈ আনন্দের মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

কলকাতা চলে যাওয়ার পর অনেকদিন তাদের সাথে কোন যোগাযোগ ছিল না। একদিন দুপুরে মাহবুব ঘুমাচ্ছিল। আমাদের শোবার ঘরের জানালার শিক ধরে কয়েকটি ছোট্ট মেয়ে পাখির মতো কিচির মিচির করে ডাকছিল, কাকু কাকু! মাহবুবের ঘুম ভেঙে গেল। জেগে ওঠে বসার ঘরে গিয়ে দেখলো অর্চনা বসে আছে। একদিন আগে সে কলকাতা থেকে এসেছে। এ মেয়েগুলো তাদের সন্তান। গোপালদা ভিসা পায়নি বলে আসতে পারেনি।

এভাবে রাজনৈতিক ক্রীড়াচক্রে আমাদের কত প্রতিভা যে অকালে ঝরে পড়েছে, কতজন যে উদ্বাস্তু শিবিরে প্রাণ হারিয়েছে তার হিসাব কেউ রাখেনি। গোপালদার মতো অসাধারণ একজন গল্প লেখক এভাবে সময়ের গর্ভে হারিয়ে গেলেন।

বন্ধুবৎসল হাসনাত আবদুল হাই

আমাদের প্রিয় হাসনাত ভাই। পেশায় একজন কর্মব্যস্ত সিভিল সার্ভিসের লোক হয়েও বহু উপন্যাস, ছোট গল্প এবং প্রবন্ধ সাহিত্যের জনক। পেইনটিংস-এর একজন উঁচু দরের সমজদার। সল্পালাপী, বন্ধু বৎসল হাসনাত ভাই একজন দৃঢ়চেতা, কর্মিষ্ঠ এবং সাহসী পুরুষ। লেখায় তাঁর কোন ক্লান্তি নেই। মাহবুবের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতার পরিচয় পাই তাঁর 'সময়' এবং 'নবীর নৌকা' উপন্যাস দু'টি মাহবুবকে উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে। দীর্ঘ বিরতিতে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হলেও তার স্মরণের সীমার মধ্যে আমরা থাকি।

হাসনাত ভাই যখন কুমিল্লায় বার্ড এর পরিচালক, তখন আমরা ইউনিসেফ থেকে প্রথম নারী দশকের প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে সেখানে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন করি (১৯৮৫)। এর সার্বিক দায়িত্বে ছিলাম আমি। এতে নিউইয়র্ক থেকে ইউনিসেফের নারী উন্নয়ন কর্মসূচির প্রধান নাদিয়া ইউসেফ এবং আরো প্রায় এগারটি দেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। একদিন বার্ড-এর একজন কর্মকর্তা আমাদের এক বিদেশী নারী অংশগ্রহণকারীর সঙ্গে আশোভন ব্যবহার করেন। এই খবর শুনেই হাসনাত ভাই তৎক্ষনাৎ নাদিয়া ইউসেফের কাছে ক্ষমা চেয়ে একটা চিঠি পাঠান। এবং সেই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

সেদিন তাঁর এই দৃষ্টান্তমূলক আচরণে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। উচ্চ পদে আসীন ব্যক্তিদের কাছ থেকে এই রকম নমনীয় আচরণে আমরা অভ্যস্ত নই। সাধারণত সরকারি উচ্চ পর্যায়ের লোকেরা কারো কাছে নতি স্বীকার করতে দেখা যায়না। হাসনাত ভাইয়ের কঠিন খোলসের অন্তরালে বাস করে একজন পরিশীলিত মানুষ।

শিল্পী কামরুল হাসান

সম্প্রতি কামরুল ভাই উত্তরায় একটি ভাড়া-বাড়িতে বসবাস শুরু করেছেন। একদিন খুব ভোরে আমি অফিসে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। এমন সময় আমার দারোয়ান ওসমান এসে জানালো কামরুল হাসান নামে এক ব্যক্তি মাহবুবের সঙ্গে দেখা করতে চান। ওপর থেকে উঁকি মেরে দেখলাম ইনি শিল্পী কামরুল হাসান। দারোয়ানের বাধা

অগ্রাহ্য করে একটি লাঠি হাতে উপরে চলে এলেন। আর দরজায় টোকা দিয়ে বললেন, তাড়াতাড়ি ওঠে আসুন। আমরা একসাথে মর্নিং ওয়াকে যাবো। সকালে এতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকলে কি দেশ উদ্ধার করা যায়? এইভাবে মাহবুব এবং কামরুল ভাই রোজ প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে যেতেন। ফিরে এসে চা খেতে খেতে দু'জনে অনেকক্ষণ গল্পগুজবে মেতে থাকতেন। আমাদের বাড়ি তাঁর খুব পছন্দ ছিল। তিনি আমাদের বাড়ির দেয়ালে একটি বড় মুর‍্যাল এঁকে দেয়ার জন্য জায়গা নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। মাঝে মাঝে ভাবি সে শূন্যস্থান কে পূরণ করবে?

একদিন তিনি মাহবুবকে বললেন, আমার জন্য উত্তরায় একটা প্লট দেখুন। আর আপনার জামাইকে দিয়ে একটা বাড়ির নক্শা করিয়ে দেন। এখানে উল্লেখ করতে হয় যে দেশ বিভাগের আগে মাহবুব কলকাতা থেকে কামরুল হাসান, খালেদ চৌধুরী, খাজা শফিক আহমেদ, হাবিবুল্লাহ খান প্রমুখ শিল্পীদের দিয়ে চট্টগ্রামে তাদের নিজস্ব খুরশীদমহল সিনেমা হলে বেশ কিছু মুর‍্যাল চিত্র অঙ্কন করায়। এইসব ছিল তৎকালীন (১৯৪৪) পূর্ব বাংলার প্রথম মুর‍্যাল চিত্র। সেই থেকে মাহবুবের সঙ্গে কামরুল ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। এই দাবি নিয়ে তিনি প্রায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বহু কথা-কাহিনী, সুখ-দুঃখের গল্প বলে যেতেন। বলতেন, উত্তরাকে আমরা বাঙালি সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসেবে গড়ে তুলবো। আমাকে শিঘ্রই একটা বাড়ি তৈরি করিয়ে দেন। আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তার শেষ প্রান্তে অদূরে একটি বটগাছ দেখিয়ে বলতেন, এখানে আমরা প্রতি বছর পয়লা বৈশাখ, একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন করব। আজ তিনি নেই। সেই বটগাছের ছায়ায় বসে মাঝে মাঝে আমরা তাঁর কথা স্মরণ করি। বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে আমাদের হৃদয়। বাংলাদেশে কি আরেকজন প্রতিবাদী কামরুল হাসান জন্ম নেবে ?

Pioneer in Village based Website

চাকরি জীবনের শুরু

স্বল্প সংখ্যক গ্রাজুয়েট মেয়ে

পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে সমাজকল্যাণ বিভাগ কয়েকটি জেলায় শহর সমাজকল্যাণ প্রকল্প (ইউ.সি.ডি) স্থাপন করে। সেখানে পুরুষ কর্মকর্তা দিয়ে কাজ চলছিল। এক পর্যায়ে প্রত্যেকটি প্রকল্পে একজন করে নারী অফিসার নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এর ফলে বিভিন্ন জেলার জন্য কয়েকজন নারী অফিসার রিক্রুট করা হয়। আমি চট্টগ্রামের অধিবাসী। এই সুবাদে আমাকে চট্টগ্রামে পোস্টিং দেয়া হয়।

সে এক মজার কাহিনী। একদিন ভোরে আকস্মিকভাবে সজোরে টোকা শুনে দরজা খুলতেই দেখলাম মনোয়ার আহমদ, সমাজকল্যাণ অফিসার। হাতে একটি টেলিগ্রাম। বললেন, আপনাকে ঢাকা যেতে হবে ইন্টারভিউ দেয়ার জন্য। এই টেলিগ্রাম ঢাকা থেকে এসেছে আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কথাটা শুনে খুব খুশি হলাম। আবার কিভাবে ইন্টারভিউ দেব, এই ভয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় আমার মনটা দোদুল্যমান। সেই মুহূর্তে ভাবলাম অনেক সৌভাগ্যবানদের মধ্যে আমি একজন। চট্টগ্রামে এত নারীর মধ্যে আমাকেই বাছাই করা হলো। আসলে ব্যাপারটা ভিন্ন। বি.এ পাস করার পর আমি তদানীন্তন পাকিস্তান ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশনে একবার ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার পোস্টের জন্য। তখন বি.এ পাস মেয়েদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত নগণ্য, বিশেষ করে চট্টগ্রামে। আজকের দিনে কত নারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যরত। কত উচ্চ ডিগ্রিধারী নারী চাকরির আশায় অপেক্ষমাণ। একটি শূন্যপদের জন্য অনেক দরখাস্ত পাওয়া যায়। এতে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার সুযোগ থাকে এবং উপযুক্ত জনকে নিয়োগ করা সম্ভব হয়। কিন্তু পঞ্চাশ দশকে সেই পরিস্থিতি ছিল অন্যরকম। ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশনে একটা পোস্টের জন্য হয়তো আমি একজনই দরখাস্ত করেছিলাম পূর্ব পাকিস্তান থেকে।

যথারীতি চট্টগ্রাম আরবান কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এক নম্বর প্রজেক্টে যোগদান করলাম ১৯৬০ সালের ৪ জানুয়ারি। মনোয়ার আহমদ সিলেট বদলি হয়ে গেল। তখন এই অফিসে আমরা তিনজন অফিসার, আমি, আওরঙ্গজেব এবং মাহবুবর রহমান। দু'জন পুরুষ ও একজন নারী। এছাড়া তিনজন পুরুষ এবং তিনজন নারী, মোট ছয়জন মহল্লা পর্যায়ের কর্মীও ছিল।

চাকরি জীবনের শুরু

স্বল্প সংখ্যক গ্রাজুয়েট মেয়ে

পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে সমাজকল্যাণ বিভাগ কয়েকটি জেলায় শহর সমাজকল্যাণ প্রকল্প (ইউ.সি.ডি) স্থাপন করে। সেখানে পুরুষ কর্মকর্তা দিয়ে কাজ চলছিল। এক পর্যায়ে প্রত্যেকটি প্রকল্পে একজন করে নারী অফিসার নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এর ফলে বিভিন্ন জেলার জন্য কয়েকজন নারী অফিসার রিক্রুট করা হয়। আমি চট্টগ্রামের অধিবাসী। এই সুবাদে আমাকে চট্টগ্রামে পোস্টিং দেয়া হয়।

সে এক মজার কাহিনী। একদিন ভোরে আকস্মিকভাবে সজোরে টোকা শুনে দরজা খুলতেই দেখলাম মনোয়ার আহমদ, সমাজকল্যাণ অফিসার। হাতে একটি টেলিগ্রাম। বললেন, আপনাকে ঢাকা যেতে হবে ইন্টারভিউ দেয়ার জন্য। এই টেলিগ্রাম ঢাকা থেকে এসেছে আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কথাটা শুনে খুব খুশি হলাম। আবার কিভাবে ইন্টারভিউ দেব, এই ভয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় আমার মনটা দোদুল্যমান। সেই মুহূর্তে ভাবলাম অনেক সৌভাগ্যবানদের মধ্যে আমি একজন। চট্টগ্রামে এত নারীর মধ্যে আমাকেই বাছাই করা হলো। আসলে ব্যাপারটা ভিন্ন। বি.এ পাস করার পর আমি তদানীন্তন পাকিস্তান ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশনে একবার ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার পোস্টের জন্য। তখন বি.এ পাস মেয়েদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত নগণ্য, বিশেষ করে চট্টগ্রামে। আজকের দিনে কত নারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যরত। কত উচ্চ ডিগ্রিধারী নারী চাকরির আশায় অপেক্ষমাণ। একটি শূন্যপদের জন্য অনেক দরখাস্ত পাওয়া যায়। এতে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার সুযোগ থাকে এবং উপযুক্ত জনকে নিয়োগ করা সম্ভব হয়। কিন্তু পঞ্চাশ দশকে সেই পরিস্থিতি ছিল অন্যরকম। ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশনে একটা পোস্টের জন্য হয়তো আমি একজনই দরখাস্ত করেছিলাম পূর্ব পাকিস্তান থেকে।

যথারীতি চট্টগ্রাম আরবান কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এক নম্বর প্রজেক্টে যোগদান করলাম ১৯৬০ সালের ৪ জানুয়ারি। মনোয়ার আহমদ সিলেট বদলি হয়ে গেল। তখন এই অফিসে আমরা তিনজন অফিসার, আমি, আওরঙ্গজেব এবং মাহবুবর রহমান। দু'জন পুরুষ ও একজন নারী। এছাড়া তিনজন পুরুষ এবং তিনজন নারী, মোট ছয়জন মহল্লা পর্যায়ের কর্মীও ছিল।

একটি চেয়ার দখল

চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল অফিসের নিচতলায় পেছনের করিডোরে ছোট্ট একটা বসার জায়গা। অফিস বলা যায় না। যখন সকলে অফিসে আসতো, তখন দাঁড়াবার জায়গাও পাওয়া যেত না। এর মধ্যে একখানা ছোট্ট টেবিল আর দু'টো চেয়ার। তিনজন অফিসার একসাথে অফিসে এলে একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। ফাইল বা কাগজপত্র রাখার কোন জায়গা ছিল না। টেবিলের একটা ছোট্ট ড্রয়ারে হাজিরা খাতা ইত্যাদি রাখা হতো। বিশেষ জরুরি কাগজ আমাদের ব্যাগে করে রোজ বাসায় নিয়ে যেতাম। অফিসের সিল থাকতো আমাদের ব্যাগে। অর্থাৎ আমাদের ব্যাগগুলোই ছিল মিনি-অফিস।

সকাল দশটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত সরকারি সূচিমতো অফিসের সময়। প্রায়ই সকালে অফিসে গিয়ে দেখতাম আমার দু'জন পুরুষ সহকর্মী অফিসার দু'টি চেয়ারে বসে আছেন। আমি বসার জন্য জায়গা নেই। দাঁড়িয়েই কাজ শুরু করে দিতাম। কোন সময় মিউনিসিপ্যালটির পিয়ন আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দয়া করে একখানা চেয়ার এনে দিত। আবার তাদের দরকার হলে আমার চেয়ারটা নিয়ে যেত। এভাবে চলতে লাগলো।

বিভিন্ন কাজে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা যেমন জেলা প্রশাসক, পাবলিক হেলথের ইঞ্জিনিয়ার, রেডিওর রিজিওনাল ডিরেক্টর প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের সাথে আমাদের সংযোগ রাখতে হতো। এছাড়া শিল্পপতি এ.কে খান, প্রখ্যাত সমাজ কর্মী ও.আর নিজাম, বাদশা মিঞা চৌধুরী, জয়নুল আবেদীন চৌধুরী, আলিমুল্লা চৌধুরী, ফজল করিম, চট্টগ্রাম শহরের এ সকল গণ্যমান্য ব্যক্তির সাহায্যও সবসময় চাইতে হতো। তাঁদের কাছ থেকে বিভিন্ন মহল্লার অধিবাসীদের জন্য নানা ধরণের কাজ আদায় করতে হতো। সমাজ-কল্যাণের এটাই প্রথম প্রকল্প। সুতরাং একে সাফল্যমন্ডিত করতেই হবে। এই ব্রত নিয়ে সকলে আপ্রাণ চেষ্টায় রত ছিলাম। এসব কাজের জন্য আমাদের অফিসে একটা জিপ গাড়ি দেয়া হয়েছিল। আমার বাড়ি চট্টগ্রাম এবং পারিবারিক সম্পর্ক ও সামাজিক অবস্থানের জন্য লোকজনের সঙ্গে সংযোগ রাখার কাজটা আমাকেই করতে হতো বেশি। কিন্তু অফিসের জিপ গাড়িটা প্রায়ই ব্যবহার করা হতো আমার দু'জন পুরুষ সহকর্মী দ্বারা। বোধ করি তাদের ধারণা ছিল অফিসের যেকোন সুযোগ সুবিধা ভোগ করার অধিকার আগে পুরুষ অফিসারদের। তারপর নারীর স্থান।

অফিসের পরিস্থিতি ক্রমশ আমার জন্য বিরক্তিকর হয়ে উঠলো। দাঁড়িয়ে থেকে টেবিলে ঝুঁকে কাজ করা আর আমার ভালো লাগলো না। মনে মনে অবসন্ন বোধ করলাম। অপমান বোধ করলাম। কিন্তু আমার পুরুষ সহকর্মীদের সাথে এই ব্যাপারে আলোচনা করার সাহস তখনো অর্জন করতে পারিনি। বিষণ্ন মনে স্বামীর কাছে সারাদিনের বর্ণনা দিতাম। মাহবুব বলতো, সাহস সঞ্চয় করো। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রাম করতে হয়। নারী হিসেবে এই সংগ্রাম তোমার জন্য আরো কঠিন হতে পারে। হাল ছেড়ে দিওনা। অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে এই পরিস্থিতি একদিন মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে। তখন আমার বয়স ছিল কম। এসব কথা ভাল করে বুঝতে চাইতাম না। ক্রমে ক্রমে অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে চলতে শুরু করলাম।

ভাবতে শিখলাম অনেকের সাথে এক সঙ্গে কাজ করতে হলে নিজের ধৈর্যের ভান্ডারকে বিশেষভাবে প্রসারিত করতে হয়। নারীদের বেলায় তা আরো বেশি প্রযোজ্য। তবে নিজের অধিকার ছাড়বোনা, মনে মনে এই শপথ নিলাম। প্রতিদিন অফিসে গিয়ে যাতে দাঁড়িয়ে থাকতে না হয় এবং এই অপমানজনক অবস্থার যাতে আর মুখাপেক্ষী হতে না হয়, তার জন্য আমি আধ ঘন্টা আগে অফিসে গিয়ে একটি চেয়ার দখল করা শুরু করলাম। সেই চেয়ার আর কোনদিন ছাড়িনি। এভাবেই নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করলাম।

ধীরে ধীরে চট্টগ্রাম শহরে চারটা শহর-সমাজ-উন্নয়ন প্রকল্প শুরু করা হয় এবং চার প্রকল্পের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রকল্পগুলোতে প্রথম সমাজকল্যাণ অফিসার হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন দুই নম্বর প্রকল্পে হোসনে আরা চৌধুরী, তিন নম্বর প্রকল্পে আবুল কালাম, এবং চার নম্বর প্রকল্পে জাহাঙ্গীর হায়দার। সিনিয়র হিসেবে তাদেরকে নেতৃত্ব দেয়ার ভার পড়েছিল আমার ওপর। ওই সময় তাদের মমত্বপূর্ণ সহযোগিতা না পেলে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চ্যালেন্জ গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। ক্রমে প্রতিটি প্রকল্পে একজন নারী ও একজন পুরুষ অফিসার নিয়োগ করা হলো। চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার প্রায় পুরোটাই এই চার প্রকল্পের আওতায় এলো।

জামালখান বস্তি এলাকায়

১৯৬১ সালের শেষের দিকে চট্টগ্রামে যে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় হয় তার পরবর্তী পূনর্বাসন কাজে আমরা বেশ কিছু কর্মসূচি হাতে নিই। তার মধ্যে আমাদের একটি বিশেষ দায়িত্ব ছিল অন্য সংগঠনের সঙ্গে সমন্বয় করে, তাদের সম্পদ ব্যবহার করে ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত মানুষকে পুনর্বাসনে সাহায্য করা। একদিন ঢাকা হেড অফিস থেকে নির্দেশ পেলাম CARE-এর একটি টিম চট্টগ্রামে আসবে এবং তারা ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত কোন বস্তি এলাকায় শিশুদের জন্য শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করতে আগ্রহী। এই কর্মসূচিতে আমরা যেন তাদের সাথে কাজ করি এবং সঠিক বস্তি নির্বাচনে সাহায্য করি।

শহর সমাজকল্যাণ প্রকল্প থেকে বেশ কিছুদিন ধরে আমরা চেষ্টা করছিলাম জামালখান বস্তি এলাকায় কিছু কাজ করার জন্য। CARE-এর এই প্রস্তাবে আমরা কিছুটা আশান্বিত হলাম। এই টিমকে নিয়ে জামালখান বস্তি এলাকায় গেলাম। তখন বিকাল প্রায় চারটা। দিনের শেষে বস্তিবাসীরা তাদের ছোট্ট ঝুপড়ির দাওয়ায় আড্ডায় বসে অবসর বিনোদন করছিল। আমাদের আগমন দেখে বেশ কয়েকজনের একদল লোক এগিয়ে এসে জানতে চাইল আমরা কারা, কেন এসেছি ইত্যাদি। আমরা স্ব-স্ব পরিচয় দিলাম। অভ্যর্থনা জানিয়ে তাদের ঘরের দাওয়ায় একটি পাটি বিছিয়ে আমাদের বসতে দিল। তখন এই বস্তি এলাকায় শিশুদের জন্য একটা শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের ইচ্ছার কথা জানালাম। ভেবেছিলাম এই খবর পেলে তারা খুশি হবে। কিন্তু লক্ষ্য করলাম মুহূর্তের মাঝে তাদের চেহারায় পরিবর্তন। তারা বিমর্ষ মুখে বিড় বিড় করে কি যেন বলতে চাইছে কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে রূঢ় কথা বলে আমাদের তাড়িয়ে দিতেও পারছে না।

Ghurnati.com
Pioneer in village based website

তাদের অস্বস্তি দেখে বুঝতে পারলাম আমরা ঠিক সময়ে আসিনি। তাই একবার শেষ চেষ্টা করার জন্য বললাম, আপনাদের কোন অসুবিধা থাকলে নিঃসঙ্কোচে বলতে পারেন, আমরা আপনাদের সাথে পরিচিত হতে এসেছি। শিক্ষাকেন্দ্র না হলেও আপনাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতে পারি। এবার তারা কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো এবং বললো, আমরা সরকারি লোককে বিশ্বাস করি না। তারা আমাদের এই বস্তি এলাকা অনেকবার পরিদর্শন করেছে। আমাদেরকে অনেক আশার কথা শুনিয়েছে। অনেকবার নানা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনদিন কথা দিয়ে কথা রাখেনি। আপনাদের কাছ থেকে আমরা কিছুই আশা করি না।

তাদের কথা শুনে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। মনে পড়ল মিসেস হুইটনের কথা। আমরা যখন সমাজকল্যাণ ইনষ্টিটিউটে এম.এ প্রথম বর্ষে পড়ি, তখন আমাদের বেশ কিছু উচুঁ মাপের শিক্ষক ছিলেন। মিসেস হুইটন তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি আমাদের বলতেন— কমিউনিটিতে গিয়ে কোনদিন কোন কমিটমেন্ট করা উচিত নয়। কারণ কথা দিয়ে যদি কথা রাখা না যায় তাহলে লোকদের বিশ্বাস হারাতে হয়। একবার বিশ্বাস হারালে জীবনে আর কোনদিন সে বিশ্বাস পুনঃস্থাপন করা যায়না।

কিছুক্ষণ পর তাদের কুশল কামনা করে এবং আবার আসার ইচ্ছা জানিয়ে আমরা বিদায় নিলাম। বাসায় ফিরে গিয়ে চিন্তা করলাম গভীরভাবে, কি করে এই বস্তিবাসীদের মাঝে সমাজকল্যাণ বিভাগের ওপর আস্থা ফিরিয়ে আনা যায়। পরের দিন আবার গেলাম। কোন কাজের কথা না বলে তাদের সাথে কুশল বিনিময় করে চলে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, এমন সময় একজন মাঝারি বয়সের লোক এসে তাদের এলাকায় খাবার পানির অভাবের কথা জানালেন। বিশেষ করে মেয়েদের কষ্টের কথা। বললেন, রাস্তার ওপারে গিয়ে অনেক দূর থেকে খাবার পানি বহুকষ্টে মেয়েরা বহন করে আনে। তারপর আমাকে জিগ্যেস করলেন, তাদের বস্তিতে একটা টিউবওয়েল বসাবার ব্যবস্থা করা যায় কিনা। হাঁ বাচক কোন উত্তর দেয়ার সাহস আমার হলোনা কারণ তারা আগেই বলেছে সরকারি লোককে বিশ্বাস করেনা। আমি শুধু বললাম, এই এলাকার জন্য টিউবওয়েল বসানো অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু সমাজকল্যাণ বিভাগের একাজ করার কোন ক্ষমতা নেই। তবুও আমরা মনে রাখবো এখানকার মানুষের অসুবিধার কথা, খাবার পানির অভাবের কথা। যদি কোনদিন আমাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব হয় তাহলে চেষ্টা করবো।

এর কোন বিহিত না করে চুপ করে থাকতে নিজেকে অপরাধি মনে হলো। চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির চিফ ইঞ্জিনিয়ার ইব্রাহীম খানের কাছে গিয়ে এই ঘটনাটি বিশদভাবে বর্ণনা করলাম। তিনি আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, একটি টিউবওয়েল খনন করার ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন কিন্তু তার প্ল্যাটফরম স্থানীয় লোকরা নিজের টাকায় করতে হবে। অন্য একটি এলাকায় টিউবওয়েল দিয়ে সেটা ছয় মাসের মধ্যে কি করে চুরি হয়ে গেল তার দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বললেন, এখানেও যদি তাদের অংশীদারিত্ব না থাকে তাহলে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে পারে। সুতরাং তাদের নিজের কিছু টাকা খরচ করতে হবে এবং তার অংশীদার হতে হবে।

অবাক হয়ে তার কথাগুলো শুনলাম। সমাজকল্যাণে এম.এ পড়ার সময় কমিউনিটি পার্টিসিপেশনের কথা কতবার পড়েছি কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই প্রথম। এম.এ. প্রথম বর্ষ পরীক্ষা দিয়ে ১৯৬১ সালের শেষ দিকে মাত্র মাঠে নেমেছি কাজ করতে। মনে মনে ভাবলাম, থিউরি আর প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডের মধ্যে কত ব্যবধান। থিউরিতে পড়লেও তা পরিষ্কারভাবে বোধগম্য হয় না যদি প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে কাজ করা না হয়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করা না যায়। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কথা থেকে কমিউনিটি পার্টিসিপেশন সম্পর্কে ধারণাটা আমার কাছে স্পষ্ট হলো। পাঠ্য পুস্তক থেকে অনেক কিছু জানা যায় কিন্তু মাঠ থেকে বা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই প্রকৃত শিক্ষা হয়।

সপ্তাহখানেক পর আমি পুনরায় জামালখান বস্তি এলাকায় গিয়ে সেই একই লোকের সঙ্গে দাওয়ায় বসে কথা বললাম। আস্তে আস্তে টিউবওয়েল প্রসঙ্গে আসলাম। তাঁর কাছে জানতে চাইলাম যদি সেখানে খাবার পানির অভাব পূরনের জন্য টিউবওয়েল বসানো সম্ভব হয়, তাহলে পাকা প্ল্যাটফরমটা তাদের নিজের টাকায় তৈরি করার কোন উপায় বের করা যায় কিনা। তিনি তাদের দরিদ্রাবস্থার কথা আবার মনে করিয়ে দিয়ে বললেন, তাদের পক্ষে এক পয়সাও দেয়া সম্ভব নয়। আমি তাকে ভাই সম্বোধন করে বললাম, প্রতি রবিবার সাপ্তাহিক এক টাকা করে প্রত্যেক পরিবারের কাছ থেকে চাঁদা নিলে হয়তো মাস দু'য়েকের মধ্যে প্ল্যাটফরম তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব হতে পারে। তাকে এই ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করতে বলে আমি বিদায় নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এমন সময় তিনি হিসাব করে বললেন, সপ্তাহে একটাকা করে চাঁদা দিতে কেউ হয়তো আপত্তি করবে না। এ পাড়ায় দু'শো পরিবার আছে। সপ্তাহে দু'শো টাকা হলে দুমাসে অর্থাৎ আট সপ্তাহে ষোল'শ টাকা উঠবে। তা দিয়ে প্ল্যাটফরম তৈরি হতে পারে। মুহূর্তের মাঝে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আমি তাকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে পরামর্শ দিয়ে বললাম, শিঘ্রই মিউনিসিপ্যালিটিতে গিয়ে আমরাও সাধ্যমত চেষ্টা করবো। তাকে কথা দিতে ভয় পেলাম— যদি আমার ওপর বিশ্বাস হারায়, তবে কোনদিন আর সমাজকল্যাণ বিভাগকে সামনে এগিয়ে নিতে পারবো না। শহর সমাজকল্যাণ প্রকল্পের পুরো এলাকায় এই খবর ছড়িয়ে পড়বে যদি আমি অকৃতকার্য হই। সদ্য পাস করে কাজ করতে এসেছি বলে আমাদের মধ্যে একটা দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। যেমন করে হোক এই প্রকল্পের পরিকল্পিত কর্মসূচি অর্জন করতেই হবে— এই সঙ্কল্পে আমরা সকলে যেন প্রদীপ্ত। আমাদের এম.এ প্রথম বর্ষের প্রশিক্ষণ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যেন প্রত্যেকে এক একটা ইস্পাতের মতো প্রত্যয় নিয়ে বের হয়েছিলাম কাজ করার জন্য। সেই দৃঢ় প্রত্যয়ের জন্য জামালখান বস্তিতে টিউবওয়েল বসলো। তাদের খাবার পানির সমস্যা মিটলো। তাদের নিজের পয়সায় প্ল্যাটফরম তৈরি হলো এবং তার অংশীদারিত্ব নিয়ে তারা গর্ববোধ করার সুযোগ পেলো।

এর মধ্যে অনেক বছর গড়িয়ে গেলো। আমি তখন চট্টগ্রাম ডিভিশনের এসিসটেন্ট ডাইরেক্টর। ১৯৭০ এর প্রথম দিকে। একদিন জামালখান বস্তিতে গিয়ে সেই বিশেষ লোকটার খবর জিগ্যেস করতেই তিনি এসে আমাকে স্বাগত জানিয়ে বললেন, টিউবওয়েলটা দেয়াতে পাড়ার সকলের জন্য খুবই উপকার হয়েছে বিশেষ করে

Pioneer in village based website

মেয়েদের খুব সুবিধা হয়েছে। তাদের আর দূর থেকে পানি বয়ে আনতে হয়না। বলতে বলতে দু'তিনজন নারী বের হয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, যখনি টিউবওয়েল থেকে পানি আনতে যাই তখনই তোমাকে স্মরণ করি আর আশীর্বাদ করি।

আমি আনন্দে অভিভূত হলাম। আর ভাবলাম আমার সামান্য প্রচেষ্টার ফল কতগুলো মানুষের কাজে লাগলো। জীবনে যেন এরকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা দিয়ে আরো অনেক মানুষের উপকার করতে পারি। জীবন সংগ্রামে যেন ক্লান্ত হয়ে না পড়ি। করুণাময় যেন আমাকে সেই ধৈর্য এবং সাহস সঞ্চয় করতে সাহায্য করেন।

সুইপারদের সম্পর্কে ধারণা পরিবর্তন

ঝাউতলা সুইপার কলোনিতে নারী ও শিশু কল্যাণ কর্মসূচি দেখার জন্য গিয়েছিলাম। তখন চট্টগ্রাম শহরে সার্ভিস ল্যাট্রিন প্রচলিত ছিল। এই কলোনির সুইপাররা পায়খানা পরিষ্কার করতো রোজ সকালে। স্বভাবত ছোটবেলা থেকে তাদের প্রতি আমাদের একটা অবজ্ঞার ভাব ছিল। কলোনিতে মেয়েদের সভা শেষ করে বাড়ি ফিরবো, ঠিক এই সময় তারা আমাকে চা খেতে অনুরোধ করলো। সুইপার কলোনিতে কিছু খাওয়ার কথা কোনদিন ভাবতেও পারিনি। তাই এই প্রস্তাবে বেশ কিছুটা ইতস্তত বোধ করলাম। কিভাবে এই খাবার থেকে রক্ষা পেতে পারি, এই চিন্তায় মনে মনে অস্থির হয়ে উঠলাম। আবার তারা যেন আমার অস্থিরতার বিন্দুমাত্রও আভাস না পায়, সেদিকেও আমাকে যথেষ্ট খেয়াল রাখতে হলো। যদি তাদের দেয়া খাবার না খাই তাহলে আমার ওপর তাদের বিশ্বাস ভঙ্গ হবে। তাদের সঙ্গে কাজ করতে হলে তাদের আস্থাভাজন হতে হবে ইত্যাদি ভাবতে ভাবতে অত্যন্ত দোদুল্যমান অবস্থায় তাদের বাসার ভেতর ঢুকলাম। দেখলাম একটা টিনের বাসনে কয়েকটা চাঁপাকলা। বললাম, আমি চা খাই না। আমাকে একটা কলা খেতে দিলে খুশি হবো। আমাদের চিরাচরিত সংস্কার থেকে উর্ধে উঠতে পারলাম না। তাদের বানানো চা খেতে মন চাইলোনা। তাই কলা খাওয়ার প্রস্তাব করলাম। মিউনিসিপ্যালিটির দেয়া দুই রুমের ছোট্ট ইটের দেয়াল দেয়া ঘর। মাটির লেপা মেঝে। ঘরের ভেতরটা ঝকঝকে পরিষ্কার। সামান্য আসবাব- পত্র, অত্যন্ত গোছানো। ঘরের ভেতরের পরিচ্ছন্ন পরিবেশ দেখে বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। একপাশে রান্নার সরঞ্জাম। ডেকচি-পাতিল খুবই পরিষ্কার। সুইপারদের সম্পর্কে আমার চিরকালের ধারণা পাল্টে গেল। তাদের জীবনযাত্রার মান আমাদের চিরাচরিত ধারণার অনেক উর্ধে। সেই মুহূর্তে আবার নতুন করে উপলব্ধি করলাম, তারাও মানুষ। আমাদের মাঝেই তাদের বাস। আমাদের মতো তাদেরও স্নেহ-মায়া-মমতা আছে। একে উপেক্ষা করা আমার মতো একজন পেশাদার সমাজকর্মীর জন্য পাপতুল্য। মনে মনে অনুতপ্ত হলাম নিজের অজ্ঞতার জন্য। তাদের সঙ্গে গল্প করলাম। কীভাবে তাদের এবং শিশুদের যত্ন নেয়া প্রয়োজন, শিশুদের গড়ে তোলার ব্যাপারে মা ও বাবার ভূমিকা ইত্যাদি নিয়ে বেশ দীর্ঘ আলোচনা শেষে বাড়ি ফিরলাম।

Marketed by Village based Website

আমার পেশা, না সন্তান

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। ঘরে ঢুকেই দেখলাম আমার একমাত্র শিশুকন্যা ভীষণভাবে কাঁদছে মায়ের জন্য। সারাদিন সে আমাকে দেখেনি। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মায়ের কোমল স্পর্শ থেকে সে বঞ্চিত। হঠাৎ আমার চৈতন্য হলো। মনের মধ্যে এক বিরাট দ্বন্দ্বের ঢেউ উঠলো। আমি অন্য শিশুদের উন্নয়নের জন্য এতো সময় ব্যয় করছি, অথচ নিজের শিশুকে অবহেলা করেই চলেছি। আমার পেশা, না আমার সন্তান, কোন্‌টাকে বেশি প্রাধান্য দেয়া উচিত? এই প্রশ্নের মুখোমুখি অনেকেরই হতে হয় কর্ম জীবনে। আবার এই দুই ধারার মাঝে সামঞ্জস্য টেনে পথচলা বেশ কঠিন। আমি আমার শিশুকে অবহেলা করি। এই উপলব্ধি যখন থেকে আমার হলো, তখন থেকেই আমি ও মাহবুব আমার মেয়ের প্রতি সচেতনভাবে যত্নবান হতে শুরু করলাম। এই ব্যাপারে আমরা প্রায়ই আলোচনা করতাম। মা-বাবার প্রাত্যহিক আদর-যত্ন-স্নেহ-ভালোবাসা থেকে আমার শিশুকে বঞ্চিত করার অধিকার আমাদের নেই। তার জন্য আমার বেশ কিছুটা সময় ব্যয় করতেই হবে। একথাগুলো বারবার নিজের মনে আওড়াতাম। তার বাবা আমার শূন্যস্থান পূরণ করার লক্ষ্যে মেয়ের প্রতি আরো বেশি যত্নবান হয়ে উঠলো। কিন্তু শিশুর জন্য মা ও বাবা উভয়ের ভূমিকাইতো গুরুত্বপূর্ণ। একে অপরের পরিপূরক। শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য আরো প্রয়োজন মা-বাবার মধ্যে বন্ধুসুলভ ব্যবহার। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকলে পরিবারের যেকোন সমস্যা মোকাবলা করা সম্ভব। এভাবে সমঝোতার মাধ্যমে আমরা জীবনে অনেক কঠিন সময় উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়েছি। আমরা আদর্শ দম্পতি ছিলাম, একথা আমি বলবো না। তবে দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্বসূলভ সম্পর্ক বরাবরই ছিল। আমাদের মধ্যেও তর্ক-বিতর্ক, দ্বিমত পোষণ ইত্যাদি হতো। সাংসারিক বিষয়ে, আমার আত্মীয়স্বজনের রাজনৈতিক আদর্শ নিয়ে, এমনকি টাকা পয়সা ব্যয় সম্পর্কেও অনেক সময় ঝগড়া-বিবাদ হতো। তবে একথা সত্যি যে যতদিন আমি লেখাপড়া শিখে জ্ঞান অর্জন করতে পারিনি এবং নিজে রোজগার করতে পারিনি, ততদিন আমার আত্মশক্তির ভিত ছিল অত্যন্ত দুর্বল। সাহস করে মাথা উঁচু করে কথা বলতে পারতাম না। নিজে শক্তি সঞ্চয় করে যখন যুক্তিপূর্ণ কথা বলা শুরু করলাম, তখন মনোযোগ সহকারে তা শোনার জন্য মাহবুবের চেষ্টার অন্ত থাকতো না।

শাড়ির আঁচলের নিচে চারটি ডিম

সঠিক সাল বা তারিখ মনে পড়ছে না। কয়েক বছরের জন্য আমি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা সমাজকল্যাণ অফিসার হিসেবে কাজ করেছি। মেডিকেল কলেজের সুপারিনটেনডেন্ট একটা ছোট্ট রুমে আমাদের অফিস করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সমাজকল্যাণ যদিও সরকারি বিভাগ, গোড়ার দিকে এর ভিত্তি তেমন সুদৃঢ় ছিল না। তাছাড়া সমাজকল্যাণকে প্রফেশনাল কাজ হিসেবে গ্রহণ করার মতো তখনও মানুষের মনোভাব গড়ে ওঠেনি। তখন আমাদেরকে মেডিকেল সোস্যাল ওয়ার্কার পদবি

দিয়ে সরকারি দুই নম্বর গ্যাজেটেড অফিসারের পজিশন দেয়া হলেও, সমাজকর্ম করার জন্য তেমন কোন সুযোগ-সুবিধা দেয়া হতো না। নিজেদের চেষ্টায় চাঁদা তুলে ফান্ডের ব্যবস্থা করা, টাকা পয়সার হিসাব রাখা, একই সঙ্গে দরিদ্র রোগীদের সেবা করা সবই আমাদের করতে হতো। সরকার টাকা দেবেনা। নিয়ম অনুযায়ী সরকারি অফিসার চাঁদা তুলতে পারবে না। তাহলে কিভাবে রোগীদের সাহায্য করি। শুধু মুখের কথা দিয়ে রোগীকে সাহায্য করা যায় না। একাজে বিভিন্ন ধরণের রোগীর সাক্ষাৎ পেয়েছি। কেউ টাকার অভাবে ওষুধ কিনতে পারছে না। কেউ রক্ত কিনতে পারছে না। কেউ এক কাপড়ে হসপিটালে ভর্তি হয়। কেউ বাড়িতে অসুস্থ বাচ্চা ফেলে আসে, তাই বাড়ি যাওয়ার জন্য সব সময় ছটফট করে। কেউ খাবার নেই বলে বাড়ি যেতেই চায়না, ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ করতে চাই যে চট্টগ্রামে প্রথম মেডিকেল সোস্যাল ওয়ার্কার হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিল আকছিরুন্নেসা। এসব দরিদ্র রোগীকে কিভাবে আর্থিক সাহায্য দেয়া যায় এই নিয়ে আলোচনা করার জন্য সে প্রায়ই আমার বাসায় আসতো। তখন আমি এক নম্বর শহর সমাজকল্যাণ প্রকল্পের অফিসার এবং চট্টগ্রাম ডিভিশন অফিসের ইনচার্জ। অনেক চিন্তা ভাবনার পর আমরা পূর্ব পাকিস্তানের সর্বপ্রথম পেসেন্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটি গঠন করলাম চট্টগ্রামে। এ ব্যাপারে আকছিরুন্নেসার উদ্যোগকে প্রশংসার সঙ্গে স্মরণ করি। এই কমিটির প্রথম মেম্বার-সেক্রেটারি ছিল আকছিরুন্নেসা। চট্টগ্রামে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এর সদস্য করা হয়। তাদের মধ্যে একজনকে চেয়ারম্যান (নাম মনে পড়ছে না) এবং হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্টকে (মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল) চিফ পেট্রোন করা হয়। পেসেন্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির মাধ্যমে সামান্য অর্থ সংগ্রহ করে দরিদ্র রোগীদের সাহায্য করা হতো। ক্রমশ দেশের সব চিকিৎসা সমাজকল্যাণ প্রকল্পে এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা হয়।

Pathagar.com
A Project of Making Village Based website

এই সময়ের কিছু আনন্দঘন মুহূর্তের কথা মনে পড়ছে। একদিন আমি অফিস রুমে বসে কাজ করছিলাম। দরজার দিকে তাকাতেই দেখলাম পর্দার আড়ালে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে কিন্তু সাহস পাচ্ছেনা, পাছে আমি কিছু মনে করি। উঠে গিয়ে দেখলাম, ময়লা শাড়ী পরা একজন নারী। তাকে চিনতে অসুবিধা হলো না। বছর খানেক আগে সে হাসপাতালে অসুস্থ অবস্থায় ছিল। সেই সময় তার সাথে পরিচয়। পেসেন্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটি থেকে আমরা তাকে সামান্য সাহায্য করেছিলাম। তাকে রুমের ভেতরে নিয়ে এলাম। বসার জন্য চেয়ারটা টেনে দিলাম। সে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়েই থাকলো। কিছুতেই বসলোনা। শুধু বললো, তোমাকে দেখতে এসেছি। তার সাথে শাড়ির আঁচলের তলে সযত্নে লুকিয়ে রাখা চারটি মুরগীর ডিম বের করে অনেকটা সঙ্কোচের সুরে আমাকে দিলো আর বললো, আমার পোষা মুরগীর ডিম, কাউকে খেতে না দিয়ে আমি তোমার জন্য এনেছি। তুমি যদি আমাকে ওষুধ কিনে দিয়ে সাহায্য না করতে হয়তো আমি মরে যেতাম। তোমার কথা প্রায়ই মনে পড়ে, তাই তোমাকে দেখতে এলাম।

মুহূর্তের মাঝে অন্য জগতে হারিয়ে গেলাম। তার কাছ থেকে ডিমগুলো নিয়ে সযত্নে রাখলাম। আর ভাবলাম এ আমার লাখ টাকার পুরস্কার। আমার কাজের স্বীকৃতি।

মানুষের সেবার মাঝে যে এত স্বর্গীয় আনন্দ তা বোধ করি আগে উপলব্ধি করিনি। তারপর নিজেকে কোন রকমে সামলে নিয়ে তাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে মাঝে মাঝে বেড়াতে আসতে বললাম এবং পঁচিশটা টাকা তার হাতে দিয়ে বাচ্চাদের জন্য কিছু কিনে নিয়ে যেতে বললাম।

এই ডিমের মূল্য দেয়া সম্ভব নয়। তার মূল্য আমার কাছে অশেষ। এই উপহার টাকা দিয়ে মাপা যায়না।

আবারও কন্যা সন্তান

গাইনি ওয়ার্ডে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম। মোটামুটি সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন নারী অঝোরে কাঁদছিল। নিজেকে সমাজকর্মী বলে পরিচয় দিয়ে তার কান্নার কারণ জানতে চাইলাম। প্রায় ঘন্টাখানেক চেষ্টার পর তার মুখ খুলল। বলল, তার স্বামী তাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করে যাওয়ার সময় বলেছে, এবার যদি কন্যা সন্তান হয়, তাহলে তাকে আর বাড়িতে নিয়ে যাবে না। এটা তার চতুর্থ সন্তান। এর আগে পর পর তিনটি মেয়ে। রাতদিন সে চিন্তায় অস্থির। যদি কন্যা সন্তান এবারো হয়, তাহলে তার কি পরিণতি হবে ?

এই অবস্থায় তাকে কি বলে সান্ত্বনা দিতে পারি ভেবে পাচ্ছিলাম না। যে কয়দিন সে ছিল রোজ তার কাছে আমার যেতে হতো, তাকে কিছুটা মানসিক শান্তি দেয়ার জন্য। সেই করুণ মুহূর্তটি একদিন এলো। তার আবারও একটি কন্যা সন্তান হয়। প্রথমে খবরটা শুনে সে অজ্ঞান হয়ে যায়। তারপর যখন জ্ঞান ফিরে আসে, আমাকে কানে কানে বলল, তার স্বামীকে যেন বলা হয় তার একটি মৃত কন্যা সন্তান হয়েছে এবং তার অনুরোধে মৃত সন্তানটিকে দাফন করা হয়ে গেছে। তার মেয়ে শিশুটিকে যেন কোথায়ও লুকিয়ে রাখা হয় অথবা কাউকে পোষ্য দেয়া হয়। এই কথা বলতে বলতে সে আবার জ্ঞান হারাল। সে জ্ঞান আর ফিরে আসলো না। সে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেল।

কি অপরাধ করেছিল এই অসহায় নারী? কেন তাকে এভাবে জীবন দিতে হলো ? কন্যা শিশুটিকে তারা কেন পৃথিবীতে আনলো? কেন সে মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার মর্যাদা পেলো না? এই অমানবিক দৃশ্য মনে পড়লে এখনো সমস্ত শরীর শিহরে ওঠে। মনে প্রশ্ন জাগে— এত বছর পর আজও কি মেয়ে শিশুদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়েছে? চারিদিকে এত হাঁকডাক, এত শোরগোল, সার্ক কন্যা শিশু ডিকেড ঘোষণা ইত্যাদি করে তাদের জন্য অনেক কর্মসূচি আমরা গ্রহণ করেছি। আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় তাদের অবস্থানের কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু তাদের মৌলিক অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। এখনও মেয়ে শিশু হলে পরিবারে সকলের মন খারাপ হয়ে যায়। কিছুদিন আগে (ডিসেম্বর ২০০০) আমার এক শিক্ষিত আত্মীয়ের পরিবারে একটি মেয়ে শিশুর জন্ম হয়েছে। এটি তার দ্বিতীয় সন্তান এবং প্রথমটিও মেয়ে। দ্বিতীয় বাচ্চাটি হওয়ার আগে তার দাদি বলেছিলেন, এবার একটি নাতি অর্থাৎ ছেলে চাই। যদি নাতনি হয় তবে আমি আত্মহত্যা করব। নাতনি অর্থাৎ, মেয়ে যখন হয়েই গেলো, ভাগ্যের পরিহাস বলে একে অগত্যা মেনে নিলেন। এই প্রসঙ্গে আমার দারোয়ান ওসমানের কথা

মনে পড়লো। তার প্রথম সন্তান মেয়ে। দ্বিতীয় সন্তান একটি ছেলে পাওয়ার আশায় সে অনেক রকম আনুষ্ঠানিকতাও করেছে, যদিও এগুলো কুসংস্কার। এর মধ্যে একদিন বাংলা সংবাদ পত্রে সে পড়েছে, মেয়ে শিশু জন্ম দেয়ার জন্য পিতাই দায়ী, মাতার কোন ভূমিকা এতে নেই। আমার কাছে সে দ্বিতীয়বার যাচাই করেছিল একথা সত্যি কিনা। এভাবে এর সত্যতা সম্পর্কে সে নিশ্চিত হয়। তার যখন দ্বিতীয় কন্যা সন্তান জন্মালো আমাদের বাসায় মিষ্টি বিতরণ করে সকলকে সংবাদটি পরিবেশন করেছিল।

নারীরা নিজের অজান্তেই পিতৃতান্ত্রিক সমাজের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে লালন করে। তাদের আমি দোষ দিই না। এই দোষে আমরা সকলে আক্রান্ত। মেয়ে শিশুর প্রতি এই অবজ্ঞা আমাদের সমাজ থেকে কবে দূর হবে ? মেয়েরা যখন রোজগার করে সম্পদ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, বিদ্যা অর্জন করে নিজেকে ক্ষমতায়ন করতে পারবে, নিজের অধিকার আদায় করতে পারবে, তখনই মেয়ে শিশুদের এই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। এই লক্ষ্যে কিছু কিছু পরিবর্তনের সূচনা হলেও, এই রোগ থেকে মুক্তি পেতে মনে হয় আরো কয়েক যুগ লেগে যাবে। কবে এই কালো রাত্রির পরিসমাপ্তি ঘটবে, এই প্রত্যাশা নিয়ে বেঁচে আছি।

চট্টগ্রামে আপোয়া

আমি যখন সমাজকল্যাণ বিভাগের অধীনে এক নম্বর শহর সমাজকল্যাণ প্রকল্পের অফিসার পদে নিযুক্ত হই (১৯৬০) তখন All Pakistan Women's Association (APWA)-এর চট্টগ্রাম জেলা শাখার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই সময় ফাতেমা সালাম আপোয়ার সভাপতি এবং রোকেয়া ইউসুফ সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে যাদের নাম মনে পড়ে তারা হলেন মিসেস নুরুল ইসলাম, রওশন জাহান, মিসেস সিরাজ, সাজেদা চৌধুরী, মিসেস করিম, মেহের কবীর, নুরুন্নাহার জহুর প্রমুখ।

আপোয়ার প্রতি প্রগতিশীল মহলের দৃষ্টি প্রসন্ন ছিল না। কিন্তু এদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে আমি দেখলাম নারীদের কল্যাণমূলক কাজে তারা নিজেদের নিয়োজিত রেখে একটি সামাজিক আন্দোলনের সূচনা করতে সচেষ্ট আছেন। সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে তাদের এই প্রয়াসকে অবহেলা করার অর্থ হবে একটি ভ্রান্তিপূর্ণ পদক্ষেপ। এই ব্যাপারে আমি কোন ধরণের গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দিতে চাইনি। আমি তাদের কাজের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করে বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছি। আপোয়া ছিল প্রধানত উচ্চবিত্তদের একটি নারী সংগঠন। হাল্‌কা ধরণের কার্যকলাপের মধ্যে তারা নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে পছন্দ করতো। গতানুগতিক সেলাই শিক্ষা এবং বিনোদনমূলক কার্যকলাপ ছিল তাদের প্রধান কর্মসূচি। বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রে নিজেদের কার্যকলাপ সম্প্রসারিত করে সাধারণ নারীদের সংগঠনে টেনে আনার লক্ষ্যে ফাতেমা সালাম বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এর আগে সাধারণত আপোয়া আমলা এবং উচ্চবিত্তের পত্নীদের আধিপত্যে পরিচালিত হতো। তিনি এই বাঁধ ভাঙার আয়োজন করায় আমরা তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে

কাজ করতে পেরেছি। এই সংগঠনে যোগদানের ব্যাপারে মাহবুবের সংগে আমার প্রায়ই তর্ক-বিতর্ক হতো। তার মতে আপোয়া সাধারণ মানুষের কোন কল্যাণ সাধন করতে পারে না। আসলে এটা এক ধরণের গোঁড়ামি। মাহবুবেরা এই ধরণের সেকটেরিয়া-নিজমের উর্ধে উঠতে পারেনি, তাই সমাজের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে তাদের আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করতে পারেনি বলে আমার বিশ্বাস।

এই ধরণের গোঁড়ামিতে আমি বিশ্বাস করতাম না। আপোয়া কোন বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান ছিল না। কাজেই তাদের কাছ থেকে প্রগতিশীল কর্মসূচি আশা করা নিরর্থক। আমরা তাদের সঙ্গে কাজ করে আপোয়াকে সাধারণ মানুষের মাঝে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছি। তাদেরকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে বয়কট করলে যা অর্জন করা গেছে তাও হতো না। পরবর্তীকালে ফাতেমা সালামের নেতৃত্বে এর কার্যকলাপকে প্রসারিত করে গরিব মেয়েদের জন্য বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, লাইব্রেরি, সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্র, মেয়েদের জন্য একটি স্কুল, (বর্তমানে বাওয়া স্কুল), চিকিৎসা কেন্দ্র, অনাথ শিশুদের জন্য একটি শিশুসদন ইত্যাদি স্থাপন করা হয়। এই সময় আমার সঙ্গে সমাজকল্যাণমূলক কাজ করতো কামরুন্নাহার জাফর (পরবর্তীতে মন্ত্রী)। তাদের জামালখানের বাড়িটা আমরা সমাজকল্যাণ বিভাগীয় অফিসের জন্য ভাড়া নিয়েছিলাম। কামরুন্নাহার সকাল দশটা থেকে নিয়মিতভাবে আমার অফিসে এসে বসে থাকতো। বলতো, আপা, আপনার কাছ থেকে কাজ শিখতে চাই। তার কাজ শেখার আগ্রহ দেখে অবাক হতাম। প্রতিটি ফাইলে আমরা কিভাবে নোট লিখি, কিভাবে তার কার্যকরী ব্যবস্থা নিই, ইত্যাদি সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করতো। তার স্বামী ডা. জাফর মারা যাওয়ার পর থেকে সে খুব নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। তখন আমার সাথে তার সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়।

Photo in Image based Website

বছর দুয়েকের জন্য আমি বাওয়া শিশুসদনের জেনারেল সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পেয়েছিলাম। ১৯৭৫ সালে ঢাকা বদলি হলে নিশ্চিন্তমনে আমি কামরুন্নাহারের হাতে এই দায়িত্ব অর্পণ করে চলে আসি। এই কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে বেসরকারি শিশু সদনের কার্যকলাপ সম্পর্কিত নানা রকম বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করি, যা সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে পরবর্তীকালে আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে।

সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ইনস্টিটিউটে

১৯৬০ সালে চট্টগ্রামে চাকরিতে যোগদানের পর শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পে মাস দশেক কাজ করলাম। এর মধ্যে একদিন ঢাকার কেন্দ্রীয় অফিস থেকে নির্দেশ এলো সমাজকল্যাণে এম.এ. পড়ার জন্য আমাকে ঢাকা যেতে হবে। প্রাথমিকভাবে এক বছর সেখানে থাকতে হবে। আমাদের উপদেষ্টা ড. সালে-এল-ডিন-আব্‌দ্ এই পরিকল্পনা করেছেন। কাজেই এ থেকে আমাদের রেহাই নেই। আবার আমার শিশুকন্যা এবং মাহবুবের কাছ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে জীবনযাপন করতে হবে ভেবে মনটা বিষণ্নতায় ভরে গেল। আগেই বলেছি মাহবুবের রাজনৈতিক কর্ম জীবনের কারণে অতীতে অনেকবার তার কাছ থেকে দূরে থাকতে হয়েছে। এই একাকীত্ব জীবন আর ভালো লাগছিল না।

অবশেষে ঢাকায় এলাম। সমাজকল্যাণ কলেজে এম.এ প্রথম বর্ষে ভর্তি হলাম। এই কলেজ অর্থাৎ বর্তমান ইনস্টিটিউট অফ সোস্যাল ওয়ার্ক তখন ১৭১/১ নম্বর শান্তিনগরে একটি দোতলা বাড়িতে ছিল।

ড. আব্দ্ ছিলেন মিশরের নাগরিক। জাতিসংঘের তরফ থেকে নিয়োজিত শহর সমাজকল্যাণ প্রকল্পের উপদেষ্টা। নারী উন্নয়নের জন্য তিনি একজন নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি। তাঁরই বিশেষ প্রচেষ্টায় চল্লিশ জন ছাত্রী নিয়ে এম.এ প্রথম বর্ষ পড়ার জন্য একটি স্পেশাল গ্রুপ তৈরি করা হয়। এর মধ্যে বশিরা বারী যুথী গোপীবাগে, আয়শা নোমান মোহাম্মদপুরে, সেলিমা সিলেটে, সালমা শহীদ ডলি যশোরে এবং আমি চট্টগ্রামে কর্মরত ছিলাম। অন্যরা সফল কৃতকার্যতা সাপেক্ষে সমাজকল্যাণে চাকরি পাওয়ার কথা। এই সময় বিভিন্ন জেলায় প্রতিটি শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পে সমমর্যাদাসম্পন্ন একজন পুরুষ এবং একজন নারী অফিসার নিয়োগ করার সরকারি সিদ্ধান্তও ছিল। নন-ট্রেডিশনাল পেশায় নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণে বোধ করি সমাজকল্যাণ বিভাগ অগ্রণী। সমাজকল্যাণ কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্রদের দ্বারা শূন্য পদগুলো পুরণ করা যদিও সম্ভব ছিল, তখন প্রয়োজন মতো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীর অভাব ছিল। এই প্রেক্ষিতে চল্লিশজন ছাত্রী নিয়ে স্পেশাল গ্রুপ তৈরি করে তাদেরকে পেশাগত সমাজ কর্মে প্রশিক্ষণ দেয়ার মতো ড. আরদের এই সিদ্ধান্তকে একটি দূরদর্শী এবং সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ বলা যায়। এর ফলে এতজন নারী একই সঙ্গে পেশাগত সমাজকল্যাণের পাট নিয়ে অফিসার হিসেবে চাকরি ক্ষেত্রে প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে এদের পদচারণা যে মৃদু কম্পন তুলেছিল তার যথার্থতা তখন বুঝতে পারিনি। ধীরে ধীরে উপলব্ধি করলাম এও এক ধরণের নীরব বিপ্লব। আর কিছু না হোক এর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচিতে নারীদের একত্র করা সম্ভব হয়েছিল। এটা তখনকার দিনে তাদের অগ্রগতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তখনকার সামাজিক ও রাজনৈতিক হতাশার মধ্যে এই আন্দোলন ছিল একটি আলোকবর্তিকা।

তখন পেশাগত সমাজকর্ম বা প্রফেশনাল সোস্যাল ওয়ার্কের কোন কনসেপ্ট ছিল না বললেই চলে। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোর লক্ষ্য ছিল প্রধানত কল্যাণমুখী কার্যক্রম। সাধারণত উচ্চবিত্তদের মধ্যে সমাজসেবা করার একটা প্রবণতা দেখা যেত। বন্যা, খরা, সাইক্লোন, মহামারী প্রভৃতি সাময়িক দুর্যোগে তারা ত্রাণভিত্তিক সমাজসেবায় এগিয়ে আসতেন। আবার দরিদ্র শিশুদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য মধ্যবিত্তদেরকেও বিশেষ কর্মসূচি নিতে দেখেছি। তবে মনে হয় এগুলো চাহিদার ভিত্তিতে সুপরিকল্পিতভাবে করা হতো না। ফলে তারা সমাজসেবা করতেন ঠিকই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার কোন স্থায়ী প্রভাব সমাজে অনুভূত হতো না। এগুলো বেশির ভাগই ক্ষণস্থায়ী এবং স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্ম ছিল। পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে ষাটের দশকে সমাজকল্যাণ দপ্তর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ সমাজকল্যাণ কলেজের বিশেষ প্রচেষ্টায় পেশাগত সমাজকল্যাণ কর্মকান্ডের কনসেপ্ট ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। পেশাগত দক্ষতা নিয়ে উচ্চ শিক্ষিত এবং সমাজ কর্মে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী এবং পুরুষ তখন থেকে পেশাগত সমাজকর্মে যোগ দেয়। মিসেস সায়রা আহমদ, হুসনা বানু খানম

Pioneer in village based website

(রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী), দৌলতুন্নেসা (প্রাক্তন এম.এল.এ), কাজী শামসুন, নুরুল ইসলাম খান, এম. এ রসুল তাঁরা সকলে আমাদের পূর্বসূরি। তাঁরা বিভিন্ন সময় আমাদের পেশাগত সমাজ কর্মের পাট দিতেন।

আগের কথায় ফিরে আসি। ড. আবৃদ্ চলে গেলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন ড. রোজনার। তিনি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট বিশেষজ্ঞ। এখনো মনে পড়ে তাঁর কাছ থেকে শিখেছিলাম কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের মূল কথা। তৃণমূল পর্যায়ে নেতৃত্ব বিকাশ করা । প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা। নির্ধারিত কমিউনিটিতে কি কি সম্পদ আছে, তা চিহ্নিত করা। সেই সম্পদগুলো কাজে লাগিয়ে কমিউনিটির যথাসম্ভব উন্নয়ন করা। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মসূচি তৈরি এবং পরিকল্পিতভাবে তা প্রয়োগ করা। নিয়মিতভাবে এসব কর্মসূচি পর্যলোচনা করা এবং এই পর্যালোচনায় কমিউনিটির লোকদের অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দেয়া ইত্যাদি। তখন এসবকে নেহাৎ তত্ত্বকথা বা থিউরি বলে মনে হতো। পরবর্তীকালে মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে বুঝতে পারলাম এর গুরুত্ব।

আমি, সেলিমা ও হাসনাহেনা জেলী সপ্তাহে দু'দিন লালবাগে ফিল্ড ওয়ার্ক করতাম। আজাদ মুসলিম ক্লাব লালবাগের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান। সেখানে লাইব্রেরি, শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং দরিদ্র নারীদের সেলাই শিক্ষা দেয়া হতো। আমরা দিলারা জামানের (বর্তমানে প্রখ্যাত টি.ভি. অভিনেত্রী) সাথে সংস্কৃতি-সন্ধ্যার আয়োজন করতাম। দরিদ্র পরিবারের শিশুরা তাতে অংশগ্রহণ করতো। পাড়ায় দরিদ্র নারীদের সংগঠিত করে সেলাই শিক্ষা দেয়া হতো। এই সময় আমাদের ফিল্ড ওয়ার্ক সুপারভাইজার ছিলেন দৌলতুন্নেসা আপা। যখন কোন পরিদর্শক আসতো আমরা বিভিন্ন বাসা থেকে নানা রকম হাতের কাজ করা জিনিসপত্র যোগাড় করে আনতাম এবং এগুলো সাজিয়ে রাখতাম। নারী সদস্যরা তৈরি করেছে বলে বলতাম। আসলে সেলাই ক্লাসে সদস্যরা যা তৈরি করতো তা অত্যন্ত নিম্নমানের। অতি উৎসাহবশত এই নিম্নমানের জিনিসের সাথে আমরা অন্যদের কাছ থেকে ধার করা উন্নতমানের হস্তশিল্পও দেখিয়ে দিতাম। এতে একদিকে মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগতাম, অন্যদিকে মনে হতো এগুলো দেখে দেখে দরিদ্র নারীরা উৎসাহ পাবে। তারাও উন্নতমানের হস্তশিল্প তৈরি করার জন্য প্রণোদিত হবে। দরিদ্র নারীদের তাদের নিজস্ব সাংসারিক কাজ থেকে বের করে এনে সেলাই শিক্ষার নামে কিছুক্ষণ একসাথে সংবদ্ধ করে রাখাও সেই সময় তাদের প্রগতির একধাপ বলে মনে হতো।

ফিল্ড ওয়ার্ক পর্যালোচনা করার জন্য আমাদের শিক্ষকদের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক হতো। একদিকে যেমন ভয় পেতাম অন্যদিকে তাঁদের সাথে আমাদের হৃদ্যতাও ছিল। ফিল্ড ওয়ার্ক করার সময় প্রতি পদক্ষেপে উপলব্ধি করতাম, যা আমরা থিউরিতে পড়ি তা বাস্তব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা কঠিন ব্যাপার। থিউরি এবং প্র্যাকটিস, এই দুয়ের মধ্যে বেশ ব্যবধান রয়েছে। এখানে আমাদের চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হতো। নানা রকম মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগতে হতো। পেশাগত সমাজকর্মী হিসেবে নিজস্ব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়

Ghorati.com
Pioneer in village based website

করে এবং নীতি বিসর্জন না দিয়ে, আমাদেরকে এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে হতো।

প্রফেসর ওলালিউল্লাহ আমাদের পড়াতেন সমাজ কর্ম পদ্ধতি বা সোস্যাল ওয়ার্ক মেথড। মিসেস হুইটন পড়াতেন কেইজ ওয়ার্ক। রশীদুর রেজা ফারুকী সদ্য পাস করে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছেন। ডাক্তার মর্তুজা পড়াতেন শরীরতত্ত্ব। তাঁর জ্ঞানের পরিধি এতই বিশাল ছিল যে শরীরতত্ত্ব পড়াতে গিয়েও শেকসপীয়র-রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ শুধু টেনে আনতেন না, এইসব সৃষ্টির পেছনে যে সামাজিক প্রেক্ষাপট তাও বিশ্লেষণ করে এই নীরস বিষয়টিকে উপভোগ্য করে তুলতেন। তিনি আমাদের মধ্যে শরীরতত্ত্ব বিষয় সম্পর্কে যে ভিত তৈরি করে দিয়েছিলেন তার মর্ম বুঝতে পারলাম যখন আমি ওয়েলিংটনে ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটিতে পড়তে গেলাম। প্রথমবার বিদেশে গিয়ে সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতিতে পড়াশোনা করতে রীতিমত হিমশিম খেতে হয়েছিল আমাকে। কিন্তু শরীরতত্ত্ব বিষয়ে মনে হলো আমি এগিয়ে আছি।

ডা. মর্তুজার কথা স্মরণ করলে মনটা বিষাদে পূর্ণ হয়ে ওঠে। আমি ও আমার বন্ধু জেলী একদিন পড়াশোনার ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য তাঁর বাসায় গিয়েছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টারে বারান্দাগুলো বেশ প্রশস্ত। তারই এক কোনায় তাঁর স্টাডি টেবিল এবং অনেক বই এলোমেলো ভাবে রাখা। আমরা যখন আলোচনায় ব্যস্ত , পর্দার আড়ালে কোন একজন নারীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। আমরা ইতস্তত করে জিগ্যেস করলাম তাঁর বাসায় কোন মেহমান এসেছেন কিনা এবং আমরা এই অসময়ে এসে তাঁর জন্য কোন অসুবিধা সৃষ্টি করলাম কিনা। তিনি অকপটে বললেন, তাঁর বাবা মারা যাবার পর সৎ মা ছোট ভাই-বোনদের নিয়ে কোথাও যাওয়ার জায়গা ছিল না। তাই তাঁর বাসায় নিয়ে এসেছেন। ডা. মর্তুজা আরো বললেন, সৎমা বাল্যবিবাহের শিকার। বাবার সাথে তার বয়সের প্রচুর ব্যবধান ছিল। এজন্য সৎ মায়ের প্রতি তাঁর একটা বিশেষ সহানুভূতি আছে। ভাই বোনরা লেখাপড়া করছে। তাঁর বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন নিজের মাসিক বেতনের অর্ধেক নিয়মিতভাবে বাবার কাছে পাঠাতেন। এইভাবে তাদের সংসার চলতো। আমরা এম.এ. প্রথম বর্ষ পড়ার সময় একদিন ডা. মর্তুজা আমাদের একটি করুণ কাহিনী শুনিয়েছিলেন। সেই কথাগুলো মনে পড়ে গেল। তিনি যখন কলকাতায় ডাক্তারি পড়তেন, তার বাবার কাছ থেকে কোন সাহায্য নিতেন না। সৎ মা তার সঙ্গে সহযোগিতা করতেন না। তিনি তাকে পড়ার খরচ দেয়া পছন্দ করতেন না। এই কারণে তিনি বাবার কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য না নেয়াই শ্রেয় মনে করতেন। তিনি কলকাতা মেডিকেলে নিয়মিতভাবে নিজের রক্ত বিক্রি করে পড়ার খরচ চালাতেন।

যখন দেখলাম তাঁর সেই সৎ মায়ের দায়িত্ব এবং সৎ ভাই-বোনদের মানুষ করার সম্পূর্ণ ভার নিজেই বহন করছেন, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এলো। মানুষ এমন উদার হতে পারলে পৃথিবীতে বেঁচে থাকা অনেক সুখকর হতো। তিনি ছিলেন একজন সমাজ সচেতন এবং দৃঢ়চেতা মানুষ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার উষালগ্নে অনেক বুদ্ধি-জীবীর সঙ্গে তাকেও নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

Ghumati.com
Pioneer in village based website

সোস্যাল ওয়েলফেয়ার কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন প্রফেসর আহমদউল্লা। তিনি পরবর্তীকালে একটা বিরাট উপকার করেছিলেন। বিদেশ থেকে ফিরে এসে আমি চট্টগ্রামে কর্মরত। এম. এ ফাইনাল পরীক্ষা দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম। আবার এক বছরের জন্য ঢাকা এসে সমাজকল্যাণ কলেজে লেখাপড়া করার জন্য সরকারি অনুমতি পাওয়ার কোন সম্ভাবনাও ছিল না। আমি ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে সোস্যাল সাইন্স-এ ডিগ্রি নিয়ে এসেছি এই কারণ দেখিয়ে প্রফেসর আহমদউল্লা আমাকে মাত্র তিন মাস ক্লাস করে এম.এ পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি লাভে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর এই সাহায্য ব্যতীত আমার এম.এ ডিগ্রি নেয়া হয়তো সম্ভব হতো না। একথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। এই সময় এম. এ মোমেন ও হাফিজুল ইসলামের সাথে আমাদের হৃদ্যতা হয়। মোমেন আমাদের গ্রুপ-ওয়ার্ক পড়াতেন। মনে পড়ে, জেলীও আমার সাথে এম. এ পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আমি ও জেলী প্রায়ই মোমেনের কাছে পড়তে যেতাম। সেই থেকে তিনি আমাদের প্রিয় মোমেন ভাই।

সব ছাপিয়ে স্নেহ-মায়া-মমতা

এম.এ পড়ার সময় (১৯৬০-১৯৬১) স্পেশাল গ্রুপের মেয়েদের জন্য আমাদের কেন্দ্রীয় অফিসের কাছে হাটখোলায় একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে হোস্টেলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভোরবেলা আমরা সকলে রিকশা করে কলেজে যেতাম। বিকেলে ফিরে এসে বন্ধুরা দারুণ আড্ডায় মেতে উঠতাম। গৌরী, দীপ্তিও আমাদের সাথে পড়তো। আমরা কলেজ থেকে এসে প্রায়ই দেখতাম দীপ্তি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কামাল লোহানীর জন্য। তারা দু'জনের মধ্যে গভীর প্রেম। লোহানী ভাই আসলে আমরা সবাই তার সাথে গল্প জুড়ে দিতাম। তখন হোস্টেলে সকলে আমাকে বুলবুল আপা বলে ডাকতো। সেই সুবাদে আমি এখনও লোহানী ভাইয়ের বুলবুল আপা। এই সময় হাসনাহেনা জেলী, সুলতানা হাসিনা রোজী, এদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সেলিমা, যুথী আর আমি চট্টগ্রাম কলেজে পড়তাম। এই সুবাদে আগে থেকেই বন্ধু ছিলাম। এর মধ্যে আমি এবং জেলী বিবাহিত বলে সকলের উপর সর্দারী করতাম। জেলী দেখতে লাবণ্যময়ী এবং সুন্দরী। রান্না এবং সেলাইতে তাকে কেউ হার মানাতে পারতোনা। মাসিক ভোজের দিন জেলীর রান্না মোরগ-পোলাও খাবার জন্য আমরা সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম। জেলী, সেলিমা আর আমি এক রুমে থাকতাম। প্রায়ই আমরা সেলিমাকে বিয়ে দেয়ার জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করতাম। একদিন জেলী একটা মজার খবর দিলো। সেলিমা ফারুকী স্যারের সাথে নৌকা করে ফিল্ড ওয়ার্কে গেছে। আমরা তখনই কল্পনা করে ফেললাম যদি ফারুকীর সাথে সেলিমার বিয়ে হয় তাহলে খুব ভালো হবে। নাটকীয় মনে হলেও আমাদের এ কল্পনা বাস্তবে পরিণত হয়। সেলিমা এবং ফারুকী পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়। বহু বছর ওয়াশিংটন থাকার পর ফারুকী বিশ্ব ব্যাংকের কর্মকর্তা হিসেবে দু'বছরের জন্য ঢাকায় পোস্টেড। বছর দুই আগে (নভেম্বর ২০০০) বারিধারার বাসায় সেলিমা একদিন পেশাদার সমাজকর্মীদের দাওয়াত দিয়ে আপ্যায়ন

করে। সেই আনন্দভরা সন্ধ্যায় আমরা যেন চল্লিশ বছর আগের হোস্টেল জীবনে ফিরে গেলাম। সেদিনের সুখ-স্মৃতির সাগরে সকলে ডুব দিলাম।

স্পেশাল গ্রুপে পড়ার সময় আমাদের সাথে এম. এ রেগুলার কোর্সেও প্রায় পঞ্চাশ জনের মতো ছাত্র-ছাত্রী ছিল। যদিও এই কোর্সে ছাত্রীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে নগণ্য। নিয়মিত কোর্সে পশ্চিম পকিস্তান থেকে কয়েকজন এক্সচেইঞ্জ প্রোগ্রামে পড়তে এসেছিল। এদের মধ্যে ইয়াসমিন এবং রিয়াজের কথা বিশেষ করে মনে পড়ে। তারা প্রায়ই আমাদের সঙ্গে গল্প করতে আসতো। বাংলা গান শুনতে পছন্দ করতো। বাংলা ভাষা শেখার এবং বলার জন্য তাদের চেষ্টার অন্ত ছিল না। রিয়াজ ছোটবেলায় মা'কে হারিয়েছে। বড় বোনের আদর যত্নে মানুষ। এই স্নেহের বন্ধন ছেড়ে বহুদূরে ঢাকায় বসে সে প্রায়ই মন খারাপ করতো। এই করুণ কাহিনী শুনে তার প্রতি সহানুভূতিতে আমাদের মনটা ভরে যেতো। তার এই শূণ্য স্থান পূরণ করার জন্য আমাকে বড় বোনের মতো আপা ডাকতে শুরু করলো। ক্রমে আমাদের পরিবারের সাথেও তার একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মাহবুবকে দুলাভাই ডাকতো। আমার মেয়ে মুন্নিকে আপন ভাগ্নির মতো স্নেহ করতো। ছুটির সময় চাটগাঁয়ে আমাদের কাছে বেড়াতে যেত। তারপর কে কোথায় ছিটিয়ে গেছি। বহু বছর পর ১৯৭৫ সালে আমি হাওয়াই থেকে প্রশিক্ষণ শেষে ফেরার পথে সিঙ্গাপুরে তার সাথে দেখা। রিয়াজ তখন কেনাডা থেকে পি.এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করে সিঙ্গাপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যোসিওলজি বিভাগে অধ্যাপনায় রত। তারপর দু'একবার বাংলাদেশে এসেছে। তার সাথে শেষ দেখা ১৯৭৯ সালে আমাদের ধানমন্ডির বাসায়। এরপর মেঘের মতো সে কোথায় মিলিয়ে গেছে। তাকে আর দেখিনি। আমার আর এক বন্ধু সিঙ্গাপুরবাসী মেহেরাজ জাহানের মাধ্যমে জানতে পারলাম রিয়াজ এখন অষ্ট্রেলিয়ার কোন বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যা'লয়ে অধ্যাপনা করে। স্নেহ মায়া-মমতার সম্পর্ক ভৌগোলিক পরিসীমার উর্ধে।

আগের কথায় ফিরে আসি। ১৯৬১ সালের মাঝামাঝি এম. এ প্রথম বর্ষের পরীক্ষা শেষে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে ফিরে গেলাম। নিজ কর্মক্ষেত্রে এক নম্বার ইউ.সি.ডি প্রজেক্টে আবার কাজে যোগ দিলাম। দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করতে লাগলাম। যেদিন পরীক্ষার ফল বের হয়, আমার আব্বা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে ডায়রি লিখলেন, আমার মেয়েদের মধ্যে বুলবুলই প্রথম এম.এ পাস করলো। তার জন্য একটা টি-পার্টির আয়োজন করতে হবে। এটাই আব্বার ডায়রির শেষ লেখা। তাঁর বহু বছরের মোটা বইয়ের মতো ডায়রির এখানেই সমাপ্তি। সেই পার্টি আর হয়নি। আগষ্ট মাসের ৩১ তারিখ (১৯৬১) আমাদের শোক সাগরে ভাসিয়ে আব্বা পরপারে চলে গেলেন। আমার লেখাপড়া এবং সাফল্য দেখার জন্য তিনি খুবই উদগ্রীব ছিলেন। আমাকে ঘিরে তাঁর প্রত্যাশারও অন্ত ছিল না। অথচ জীবনের বিভিন্ন স্তরে আমার সাফল্যজনক অগ্রগতি তিনি দেখে যেতে পারলেন না। এই দুঃখ আমাকে এখনো পীড়া দেয়।

Shimanti.com
Pioneer in village based website

প্রথম বিদেশ যাত্রা

তরুণীর একা বিদেশ যাত্রা

১৯৬৪ সাল। আমি তখন চট্টগ্রামে এক নম্বর শহর সমাজকল্যাণ প্রকল্প অফিসার। সরকার আমাকে কলম্বো প্ল্যান স্কলারশিপ নিয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য নিউজিল্যান্ড যাওয়ার মনোনয়ন দিয়েছে। আমি আনন্দে আত্মহারা। এত ছোট অফিসার এত বড় সুযোগ পাবো তা কোনদিন ভাবতে পারিনি। আত্মীয়স্বজন এবং পরিচিতদের মধ্যে বোধ করি চট্টগ্রাম থেকে আমিই প্রথম নারী এই সুযোগ পেলাম। পিতৃকূল ও শ্বশুর কূলের সকলে খুব খুশি। কিন্তু ঘর-সংসার, স্বামী, শিশুকন্যা সব ফেলে বিশেষ করে এত কম বয়সী একজন মেয়ে একা (তখন আমার বয়স ২৮ বছরের মতো) দু'বছরের জন্য সুদূর নিউজিল্যান্ড যাবে, এটা মন থেকে অনেকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। কেউ কেউ না যাওয়ার পরামর্শ দিলো। বললো, দু'বছর আমার অনুপস্থিতিতে আমার মেয়ে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। আবার কেউ বললো, মানুষের জীবন একটা, যে সময় একবার হারিয়ে যায়, তা আর ফিরে পাওয়া যায়না। আমি আশা-নিরাশার সাগরে নিপতিত হলাম।

কী করে আমার প্রাণপ্রিয় শিশুকন্যাকে ফেলে দুটি বছর থাকবো? কী করে মায়ের সযত্ন স্নেহ ছেড়ে সে এত দীর্ঘ সময় অতিপাত করবে? যে সময়টা মা'কে অত্যন্ত প্রয়োজন সেই সময় তার কাছে আমি থাকবো না। এ যেন এক রকম নিষ্ঠুরতা। অকুল সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আমার মনের ভেতর তোলপাড় খেল অসংখ্য প্রশ্ন। এই সময় যে দু'জনের সহযোগিতা ও সমর্থন পেয়ে আমি শক্তি সঞ্চয় করলাম, তাঁরা হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় মা এবং আমার প্রিয় স্বামী। যা না হলে আমার পেশাগত জীবনের ধারা হয়তো অন্যদিকে প্রবাহিত হতো। আব্বা বেঁচে থাকলে সেই সময় হয়তো মহীরুহের মতো আমার মাথার ওপর তিনিও অবস্থান নিতেন। তিনি ছিলেন আমাদের পথ প্রদর্শক। তাঁর নির্দেশনা না পেলে হয়তো আমার মতো একজন সাধারণ মেয়ে জীবনে এভাবে এগিয়ে যেতে পারতাম না।

আমার এই অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসানের লক্ষ্যে মাহবুবকে অনুরোধ করেছিলাম সে যেন আমার হয়ে এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি নিয়ে দেয়। আমার বারবার অনুনয় সত্ত্বেও সে বললো, তোমার সিদ্ধান্ত তুমি নিজেই নেয়া উচিত। আমি নারী হিসেবে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী যা দেখেছি, তা হলো পরিবারে সবসময় যে কোন প্রধান সিদ্ধান্ত পুরুষরাই নিয়ে থাকে।

প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে মাহবুব আমাকে বুঝিয়ে দিলো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যার জীবন-সংক্রান্ত, তার নিজেরই গ্রহণ করা উচিত। তার এই প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি এবং দূরদর্শিতা আমার পেশাগত জীবনের উন্নয়নে যে অত্যন্ত সহায়ক হবে, এর গুরুত্ব তখন আমার অপরিপক্ক মন উপলব্ধি করতে পারেনি।

নিউজিল্যান্ড যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এলো। একদিন আমার মেয়ে মুন্নি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, আম্মা, তুমি কাঁদবে না। তুমি বিদেশে যাও। আমি আব্বুর সাথে থাকতে পারবো। তুমি যাওয়ার সময় আমিও কাঁদবো না। আমি অবাক হলাম। এই ছোট্ট মেয়েটির মধ্যে এত উপলব্ধি কেমন করে এলো যে মাকে তার নিশ্চয়তা দেয়া দরকার। সেদিন তার এই সাহসিক সমর্থন আমাকে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। বুঝতে পারলাম পরিবারের যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে শিশুদেরও একটা বিশেষ ভূমিকা থাকে।

মার্চ মাসের ৪ তারিখ যাওয়ার দিন ধার্য হলো। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় এসে আজিমপুরে আমার বন্ধু মাক্কি আপার বাসায় উঠলাম। যাওয়ার আগের দিন রাতে গানের আসরের আয়োজন করেছিল মাক্কি আপা। শিল্পী ফাহমিদা খাতুন, জাহেদুর রহিম এবং আরো অনেকে সেদিন গান গেয়েছিল অনেক রাত পর্যন্ত। মাক্কি আপার এই আন্তরিক বিদায় সংবর্ধনা কোনদিন ভুলবো না। সব বন্ধুদের জন্য সে ছিল নিবেদিতপ্রাণ। তার স্নেহ-ভালোবাসা এবং রস গল্প দিয়ে সকলকে মাতিয়ে রাখতো। পরদিন সকাল দশটায় আমার প্লেইন উড়ে গেল। আমার মেয়ে তার কথা রেখেছিল। বিদায় নেয়ার সময় সে কাঁদেনি একটুও। আমার চোখের পানি শুকোবার আগেই কলকাতা পৌছে গেলাম। সেখান থেকে গেলাম সিঙ্গাপুর। প্লেইনের কিছু যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য সেখানে বেশ কয়েক ঘন্টা দেরি হলো। অবশেষে নির্ধারিত সময়ের পরের দিন সিড্‌নি হয়ে ওয়েলিংটনে পৌছলাম। এই সুদীর্ঘ পথ কিভাবে কাটলো জানি না। শুধু এতটুকু মনে পড়ে, সারাটা পথ আমার দু'চোখ পানি সিক্ত হয়ে বোধকরি আকাশে তার চিহ্ন রেখেছে।

ওয়েলিংটন এয়ারপোর্টে এসে নামলো আমাদের বিমান। বিশাল বিমান বন্দর। অসংখ্য যাত্রী। প্রথম বিদেশ যাত্রার অভিজ্ঞতা, উন্মাদনা সব মিলে কিছুটা নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। স্টেট ডিপার্টমেন্টের দু'জন মহিলা এসে আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে গেল পাহাড়ের গা ঘেঁষে অবস্থিত ছোট্ট একটি গেস্ট হাউজে। ওয়েলিংটনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপরূপ। পাহাড় আর সমুদ্র ঘেরা পুরো শহরটা। যেকোন পাহাড় চূড়ায় উঠলেই সমুদ্র দেখা যায়। পাহাড়ের গায়ে গায়ে ছবির মতো ছোট ছোট বাড়ি। সেরকম একটা বাড়িতে আমার গেস্ট হাউজ। চারদিকে সবুজ গাছের সমারোহ, যেন তাদের শীতল ছায়ার নিচে আমরা আশ্রিত। দিন কেটে গেল। সন্ধ্যা সাতটার দিকে খাওয়ার পালা শেষ করে শুয়ে পড়লাম। রাত ঘনিয়ে এল। প্রচন্ড শীত। সারারাত বাতাসের শব্দে এবং জানালার কাঁপুনিতে ঘুম হয়নি। মনে হলো সাইক্লোন হচ্ছে। খুব অসহায় বোধ করলাম। ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে চট্টগ্রামের সাইক্লোনের কথা মনে পড়লো। ঝড়ের রাতে আমি, মাহবুব ও মুন্নি খাবার টেবিলের নিচে আশ্রয় নিয়ে সারারাত কাটিয়েছিলাম। ভয়ে ভয়ে রাত কাটলো। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সব কিছু ঠিক আছে।

ওয়েলিংটনের আবহাওয়াই এরকম। সবসময় ঝড়ের মতো ঠান্ডা বাতাস বইতে থাকে আর বাতাসে পাতার মর্মর শব্দ। ধীরে ধীরে এই আবহাওয়ার সাথে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম।

প্রফেসর মিনের মহানুভবতা

পরের দিন রোববার। আমার হোস্ট পরিবার মিস্টার এবং মিসেস উইলিয়ামস্ এসে আমাকে নিয়ে গেল। অনেক দূর আকাঁ-বাঁকা পথে ড্রাইভ করে একটি পাহাড়ের অর্ধপথে তাদের বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামল। বাড়ির প্রবেশ পথে ছোট্ট গোলাপ বাগান। নানা রংয়ের গোলাপ ফুটে আছে। রেই (মিসেস উইলিয়ামস) নিজের হাতে সযত্নে এই বাগানটি করেছে। বসার ঘরে বিরাট এক কাচের জানালা। ডাইনিং টেবিলে বসে এই জানালা দিয়ে তাকিয়ে আকাশ, পাহাড়, সমুদ্রের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেয়া যায়। একপাশে আমার বেডরুম। সকালে কিভাবে নিজের ব্রেকফাস্ট তৈরি করবো, ইলেকট্রিক ওভেন ব্যবহার করবো, কাপড় ধোয়ার মেশিন ব্যবহার করবো, ইত্যাদি শিখিয়ে দিল রেই। জীবনে প্রথম ওয়াশিং মেশিন দেখলাম। আমাদের দেশে তখনও এসব চালু হয়নি। সম্পূর্ণ নতুন এবং ভিন্ন পরিবেশে কিভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে চলতে হয় তার কৌশল আয়ত্ব করলাম ধীরে ধীরে উইলিয়ামস্ পরিবারের সহায়তায়। বোধ করি এই কারণেই বিদেশ থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রীকে প্রথমে ছোট পরিবারে রাখা হয়।

পরের দিন সোমবার সকালে রেই আমাকে নিয়ে গেল ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটিতে। পাহাড়ের ভেতর দিয়ে, বিভিন্ন যানবাহন ব্যবহার করে, এক ধরণের অভিনব পথ বেয়ে স্কুল অফ সোস্যাল সাইন্স-এ পৌছলাম। স্কুল সেক্রেটারি বেটি আমাকে প্রফেসর মিনের কাছে নিয়ে গেল। সৌম্য মূর্ত্তির চেহারা, একমাথা সাদা চুল, কালো সুট পরিহিত প্রফেসর মিন সোস্যাল সাইন্স ফ্যাকালটির হেড। আমাদের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী প্রফেসরকে দেখে আমি মুখ নিচু করে টেবিলের অন্য পাশে জড়োসড়ো হয়ে বসলাম। তিনি আমাকে বললেন, Come to my side of the table. I don't want this gap between the teacher and student. We must work as friends. মুগ্ধ হয়ে তাঁর কথাগুলো শুনলাম। মনে মনে উপলব্ধি করলাম ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে আসলেই কোন ব্যবধান প্রয়োজন নেই। এরূপ অনুকূল পরিবেশে ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক বেশি শেখার সুযোগ পায়। এতে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে একটা আন্তরিক সৌহার্দ্যের সৃষ্টি হয়। স্যোসাল সাইন্স কোর্সে সম্ভবত বিশজন ছাত্র ছিল। তার মধ্যে ছাত্রী ছিল মাত্র চার জন। আমাদের মধ্যে একজন মাওরি ছিল। তার সঙ্গে আমরা একদিন তাদের বাৎসরিক অনুষ্ঠান দেখতে গিয়েছিলাম। প্রায় একশ জন মাওরি, নারী-পুরুষ, নিজস্ব পোষাকে সজ্জিত, এক সঙ্গে স্টেজে ওঠে যখন নেচে নেচে গান গাইল তখন মনে হলো স্বর্গ থেকে সুরের ধারা ভেসে আসছে। কি অপূর্ব তাদের কণ্ঠস্বর এবং নাচের ছন্দ। পৃথিবীর বহু দেশে আদিবাসীরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে। কিন্তু নিউজিল্যান্ডে মাওরিদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য নানা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তাদের শিক্ষা, চাকরি ইত্যাদির জন্য বিশেষ কোটা নির্ধারিত রয়েছে। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, সঙ্গীত এবং পোষাক-পরিচ্ছদ যাতে বিলুপ্ত না হয় এদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। তাদের জন্য সরকার মাওরি

ওয়েলফেয়ার বিভাগও খুলেছে। দু'বছর ওখানে কোন রেসিয়েলিজম বা বর্ণবাদ দেখিনি। কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতাও চোখে পড়েনি।

আগেই বলেছি ওয়েলিংটন পুরো শহরটাই প্রায় পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। তারই একটাতে ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি। অনেকগুলো বিল্ডিংয়ে বিস্তৃত। পাহাড়ের অপর প্রান্তে একটা পৃথক বিল্ডিয়ে স্কুল অফ সোস্যাল সাইন্স। আমাদের স্পেশাল ক্লাস গুলো যেমন সাইকলজি, ফিজিওলজি, সোস্যাল ওয়ার্ক ইত্যাদি এই বিল্ডিংয়েই হতো। কিন্তু সোসিওলজির ক্লাস করতে যেতাম ইউনিভার্সিটির প্রধান বিল্ডিংয়ে। বিরাট ক্লাস রুমের মধ্যে কয়েকশত ছাত্র-ছাত্রী। প্রফেসররা প্রায়ই মাইক্রোফোন ব্যবহার করতেন যাতে সকলে শুনতে পায়। ক্লাস শেষে সমুদ্রের স্রোতের মতো যখন সকলে হল থেকে বের হয়ে আসতো, তখন রীতিমত মনে শঙ্কা জাগতো, গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারবো কিনা। দু'একবার যে পথ হারাইনি তা নয়। এ ব্যাপারে ডেইজি আমাকে খুবই সাহায্য করতো। সে আমার ক্লাসে পড়তো। আইরিশ মেয়ে নিউজিল্যান্ডে পড়তে এসেছে। প্রথমদিকে নতুন পরিবেশে লেখাপড়ার ব্যাপকতা, বিভিন্ন পদ্ধতি এবং প্রচুর চাপে আমি মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে পড়তাম। ডেইজি সবসময় বই দিয়ে, নিজের তৈরি নোট দিয়ে সাহায্য করতো। এছাড়া যখনই প্রয়োজন শিক্ষকরা বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে কোনদিন কুণ্ঠাবোধ করেন নি। ছাত্র তৈরি করার জন্য তাদের প্রচেষ্টা এবং অধ্যবসায় সত্যিই অনুকরণীয়।

প্রফেসর মিনের মতো জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিত্বের কথা কোনদিন ভুলবো না। তিনি সারাক্ষণ বইয়ের সমুদ্রে ডুবে থাকতেন। তাঁর রুমে ফ্লোর থেকে ছাদ পর্যন্ত শেল্‌ফ ভরা বইয়ের পাহাড়। তাঁর লাইব্রেরিতে পুরাতন কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত সোস্যাল সাইন্সের সব রকম বইয়ের সমাহার। একদিনের কথা মনে পড়ল। আমার একটা এসাইনমেন্ট জমা দিতে হবে সাত দিনের মধ্যে। এর জন্য আমার প্রায় বিশটা বইয়ের বিভিন্ন চ্যাপটার পড়তে হবে। কিন্তু ইউনিভার্সিটির প্রধান লাইব্রেরিতে সে বইগুলো পেলাম না। অন্য ছাত্ররা নিয়ে গেছে। আমি মহাসঙ্কটাপন্ন। এর মার্কস্ আমার পরীক্ষায় যোগ করা হবে। এমন মানসিক অবস্থায় টি-রুমে প্রফেসর মিনের সাথে দেখা। তাঁকে আমার সমস্যার কথা বললাম। নিমেষের মাঝে আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর লাইব্রেরিতে। নিজে সিড়ি বেয়ে দেয়ালের সর্বোচ্চ তাক পর্যন্ত উঠলেন। প্রায় ত্রিশটার মতো বই বের করে আমাকে বললেন, এ বইগুলো তুমি নিয়ে যাও। পড়া শেষ হলে ফেরৎ দিও। তারপর তাঁর সেক্রেটারিকে নির্দেশ দিলেন এগুলো যেন গাড়ি করে আমার হোস্টেলে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

একজন ছাত্রের জন্য এতটা মূল্যবান সময় শুধু ব্যয় করলেন না, সাথে যাতায়াতের সমস্যা ইত্যাদিও তাঁর চক্ষু এড়ালো না। তাঁদের কাছে একজন ছাত্রের জীবন অনেক মূল্যবান ও প্রতিশ্রুতিময়। ছাত্রদের সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধা দেয়ার প্রতি শিক্ষকদের এই আন্তরিকতা এবং কর্তব্যপরায়ণতা সাধারণত চোখে পড়ে না। আসলে মানুষ গড়ার কারিগর যাদের বলা হয়, ঐ দেশের শিক্ষকদের মধ্যে তার পরিচয় পেলাম। আমাদের সঙ্গে তাদের তফাৎটা কত মৌলিক তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করলাম। এদেশে এখনও

Shuvashi.com
Pioneer in village based website

ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার জের চলছে। প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিতে ছাত্র এবং শিক্ষকদের মাঝে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে থাকে। অবশ্য তাঁরা বেশির ভাগই পরিবেশ এবং অবস্থার শিকার।

দেশ থেকে প্রথম চিঠি

দেশ ছাড়ার পর থেকে বাড়িতে সকলে কেমন আছে, আমার মেয়ের কীভাবে সময় কাটছে, বৃদ্ধ মা কেমন আছে ইত্যাদি খবরের জন্য প্রতি মুহূর্তে উদ্বিগ্ন থাকতাম। তখন টেলিফোন ব্যবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। কয়েকদিন অপেক্ষা করেও একবার ফোন করা সম্ভব হতোনা। টেলিগ্রামও সময় মতো পৌঁছার নিশ্চয়তা ছিল না। তাই চিঠিই ছিল যোগাযোগের একমাত্র উপায়। প্রতিদিন ক্লাস শেষে ইউনিভার্সিটি থেকে বাসায় ফেরার পথে প্রথমে তিন মিনিট পায়ে হাঁটা, তারপর পাহাড়ের ভেতর দিয়ে ক্যাবল কারে ঝুলতে ঝুলতে যখন আমার নির্ধারিত স্টেশনে পৌঁছতাম, তখন থেকে মনের মাঝে আশার বাসা বাঁধতাম। আজ হয়তো দেশ থেকে একটা চিঠি পাবো। একশ আটটা সিঁড়ি ডিঙিয়ে যখন বাসায় পৌঁছতাম, নিমেষের মাঝে আমার পড়ার টেবিলে ছুটে যেতাম। দিন যায়। মাস যায়। আমার ব্যাকুল প্রতীক্ষার কোন উত্তর নেই। প্রায় ছয় সপ্তাহ অতিক্রম হওয়ার পর একদিন বাসায় ঢুকতেই রেই আমাকে একটা নীল এরোগ্রাম হাতে দিয়ে বললো, তোমার দেশ থেকে এসেছে।

আমি আনন্দে, বিস্ময়ে চিঠিখানা একান্তভাবে খুললাম। তাতে লেখা ছিলো— আমরা ভালো। তোমার সাথে দেখা করার জন্য বিজয়লক্ষ্মী কলকাতা এয়ারপোর্টে এসেছিল। সে পৌঁছবার কয়েক মিনিট আগে তোমার প্লেইন ছেড়ে গেছে। তোমার সাথে দেখা হয়নি বলে সে মনে খুব দুঃখ পেয়েছে। তাকে একটা চিঠি লিখো, সে খুব খুশি হবে।

আমার ভালোবাসা রইল। তোমার মঙ্গল কামনায়।

একসপ্তাহ পর আরো একটি চিঠি। তাতে দেশের তথ্য সংবলিত দু'টি নিউজ পেপার কাটিং। লিখেছে, তোমার কাজে লাগতে পারে। আশা করি ভালো আছো।

চিঠিগুলি লিখেছে মাহবুব, আমার স্বামী। পেয়ে খুবই হতাশ হলাম। আমার প্রত্যাশিত কোন খবর তাতে নেই। আমার অনুপস্থিতিতে তারা কীভাবে দিন যাপন করছে তার কোন বর্ণনা নেই। আমার মেয়ের কোন খবর নেই। শুধু বিজয়লক্ষ্মীর খবর। রাগে, অভিমানে আমার মনটা ভারাক্রান্ত। এভাবে বেদনাময় কয়েকটি দিন কেটে গেল। তারপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করতে গিয়ে মনে হলো, আসলে মাহবুব একজন কবি। যে মুহূর্তে যা তার মনে দোলা দেয়, তা-ই সে ভাষায় ধরে রাখে। এইভাবে অসংখ্য চিরকুটে তার ছোট ছোট কবিতা লেখার প্রবণতা আমি সবসময় লক্ষ্য করেছি। বিজয়লক্ষ্মী আমাদের স্কুল জীবনের বন্ধু। আমি সুদীর্ঘ সময়ের জন্য বিদেশ চলে যাওয়ার সংবাদ শুনে সে বিচলিত হয়ে আমাদের কাছে কয়েকটা চিঠি লিখেছিল কলকাতা থেকে। তাই তার আন্তরিকতাপূর্ণ চিঠি হয়তো মাহবুবকে বিষণ্নময় আনন্দ দিয়েছে। তারই বহিঃপ্রকাশ হয়েছে হয়তো আমার কাছে লেখা চিঠিতে। যেখানে মনের স্পর্শ পায় সেখানেই মাহবুবের আনাগোনা।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে বিজয়লক্ষ্মী প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতো। আমরা তাকে নিয়ে বেড়াতে যেতাম। কোন সময় পতেঙ্গা সমুদ্র তীরে অথবা কাপ্তাই, রাঙ্গামাটির পাহাড়ে। পথে একসঙ্গে গান গাইতাম। আমার ছোটবোন জুবলীর সাথে পড়তো বলে আমাকে বুলবুলদি এবং মাহবুবকে দুলাভাই ডাকতো। ক্রমে দুলাভাইয়ের সাথে তার আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কলকাতা চলে যাওয়ার পরও সে নিয়মিত চিঠি লিখতো। ছুটিতে এলে আমাদের সঙ্গেই অনেক সময় কাটাতো। আবার ফিরে যাওয়ার সময় আমাদের গাড়ি করে তাকে বিমানবন্দরে পৌছে দিতাম। বিজয়লক্ষ্মী সুন্দর আধ্যাত্মিক গান গাইতো। বিমানবন্দরে যাওয়ার সময় মাহবুব এবং সে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতো সারা পথে। একবার তাকে পৌছে দিতে গিয়েছিলাম আমি আর মাহবুব। বিজয়লক্ষ্মীর জন্য মাহবুবের হাতে ছিল বেলফুলের মালা। তার হাতে হাত রেখে গান করতে করতে দু'জনে এগিয়ে চলল বিমানের দিকে-

মনে কি দ্বিধা রেখে গেলে চলে সেই দিন ভরা সাঁঝে,
যেতে যেতে দুয়ার হতে কি ভেবে ফিরালে মুখখানি....

এভাবে গানের সুরে তাকে বিদায় দিলো মাহবুব। উল্লেখ্য, ওই সময় চট্টগ্রামের মতো ছোট্ট বিমান বন্দরে যাত্রীকে উঠিয়ে দেয়ার জন্য বিমানের কাছাকাছি যাওয়া যেত। আমি বারান্দায় চেয়ারে বসেছিলাম একা। দেখলাম ফেরার পথে মাহবুবের বিষণ্ন চেহারা। বন্ধুর জন্য বেদনাহত।

নীরবে অনুভব করলাম তাদের দু'জনের প্রীতিপূর্ণ বন্ধুত্ব। আমার মনের গভীরে ক্ষণিকের জন্য বেদনার ঢেউ উঠলেও, আবার নিজেকে সামলে নিলাম। মাহবুবকে আঘাত দিতে চাইনি কোনদিন। তার স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসার স্বচ্ছতা আমার কাছে সুন্দর। সে কোনদিন আমাকে না জানিয়ে কারো সঙ্গে আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক করেনি। তাকে যারা ভালবাসে তারা আমাকেও ভালোবাসে।

মাহবুবের আর এক স্নেহভাজন অথচ বান্ধবীর কথা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে। নাম স্মৃতিকণা দাশ। ডাক নাম লক্ষ্মী। এবার বিজয়লক্ষ্মী নয়, শুধু লক্ষ্মী। নাচে-গানে পারদর্শী। সুন্দর গড়ন, টানা টানা বড় চোখ তার নৃত্যশিল্পী হওয়ার সহায়ক ছিল। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি মিশরকুমারী, রবীন্দ্রনাথের শ্যামা এবং চিত্রাঙ্গদায় নাম-ভূমিকায় অভিনয় করে সে চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে একটি বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছিল। মাহবুব তাকে খুবই স্নেহ করতো। তার শিল্পী জীবন গড়ে তোলার পেছনে মাহবুবের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। এভাবে চট্টগ্রামে বহু শিল্পী তৈরি করতে তার অবদান এখনো অনেকে কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করে।

আমার আক্দ হয়ে যাওয়ার পর মাহবুব একবার রুমঘাটায়, আমাদের বাড়ির উঠোনে রবীন্দ্র জয়ন্তীর আয়োজন করেছিল। এতে জুবলী, সাদু, শিখারানী এবং আমাদের পাড়ার অন্যান্য ছেলেমেয়েরা অংশগ্রহণ করেছিল। আর এসেছিল স্মৃতিকণা লক্ষ্মী। এভাবে তার সাথে আমার প্রথম পরিচয়। তার লাবণ্যময়ী, সুন্দর চেহারা, অপূর্ব গান এবং নাচ দেখে সেদিন মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগলো তখন, যখন

Ghumati.com
Pioneer in village based website

দেখলাম গান নাচ ছেড়ে সে মাহবুবের পাশে বসে গল্প করতে বেশি মনোযোগী। আমার প্রতি যেন সে ঈর্ষান্বিত, এমন ভাব চোখে মুখে। এ দৃশ্য কয়েকবার আমার চোখ এড়ায়নি। তখন আমি মাহবুবের প্রেমে মত্ত। সারাক্ষণ তাকে আকড়ে ধরে থাকতে চাই। তাকে ঘিরেই তখন আমার জগৎ। কোন কাজে আমি মাহবুবের কাছ ছাড়া হলেই দেখতাম লক্ষ্মী তার পাশের আসন দখল করে আছে। যদিও মাহবুব সারাক্ষণ প্রোগ্রাম নিয়ে ব্যস্ত, কি করে একটা নিখুঁত ফাংশন করা যায় সেদিকেই তার দৃষ্টি ছিল বরাবর। আমি মনে মনে অত্যন্ত দুঃখ পেলাম। লক্ষ্মীর ওপর বিরক্তিবোধ করলাম। মনে হলো মেয়েটা খুব স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর। সেই বেদনাময় মুহূর্তগুলো এখনো মনে বাজে। সেদিন রাতে মুখ খুলেছিলাম। মাহবুবকে বলেছিলাম, লক্ষ্মীর এরকম অমার্জিত ব্যবহার আমার মোটেই ভালো লাগেনি। তোমার এই বন্ধুকে আমার একটুও পছন্দ হয়নি। অন্য বন্ধুরা কতো মার্জিত। মাহবুব বলেছিল, লক্ষ্মী একজন প্রতিভাবান মেয়ে। তাকে একজন শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই আমার উদ্দেশ্য। এর বেশি কিছু নয়। তবে এক সময় সে আমাকে তার বন্ধুদের মাধ্যমে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিল। এবং বলেছিল সে আমাকে গভীরভাবে ভালোবাসে। তাকে আমি অত্যন্ত স্নেহ করি। তার প্রতিভার যথাযথ বিকাশ চাই, তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবো ; এই কথা বলেছিলাম সেদিন তাকে।

আমি মনে কষ্ট পাব ভেবে মাহবুব ক্রমে তার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিলো। লক্ষ্মীও কোথায় হারিয়ে গেল। তার সাথে আর আমাদের দেখা হয়নি।

বহুদিন পর তাকে দেখলাম মাদারবারী মিউনিসিপ্যাল প্রাইমারি স্কুলে, শিক্ষক হিসেবে। চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালটির চেয়ারম্যান ফজল করিমের সাথে আমি ওই স্কুল পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। তখন আমি সমাজকল্যাণ অফিসার। কপালে সিঁদুর পরা লক্ষ্মী আমাকে দেখে কথা বললো না। নিমেষের মাঝে মেঘে ঢেকে গেল তার অপূর্ব সুন্দর চেহারা। সেদিন তার জন্য ব্যথিত হয়েছিলাম। কী দুর্জয় অভিমানে সে মুখ ফিরিয়েছিল।

তারপর জানি না তার খবর। দীর্ঘদিন কোন যোগাযোগ ছিল না। আমি ইউনিসেফে চাকরিতে থাকাকালে হঠাৎ একদিন লক্ষ্মী মাহবুবের অফিসে আসে। স্বামী, পুত্র-কন্যাসহ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর নাকি সে ভারতের ত্রিপুরা অঞ্চলে চলে গিয়েছিল। সেখানে দারুণ আর্থিক দুরাবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। এই করুণ কাহিনী শুনে আমরা উভয়ে তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ি। মাঝে মাঝে এসে মাহবুবের কাছ থেকে কিছু আর্থিক সাহায্য নিয়ে যেতো। এক পর্যায়ে সে আমাদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং অর্থানুকূল্যে ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার প্রস্তাব দেয়। এত বড় দায়িত্ব নেয়া সম্ভব নয় ভেবে এতে আমরা একমত হতে পারিনি। তবে তাকে যথাসাধ্য অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। সে অর্থ-সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে মাহবুবকে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখে ঢাকা থেকে চলে যায়। তারপর তার আর খোঁজ নেই। বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেও তার খবর পাইনি। মাহবুবের কাছে শুনেছি দারিদ্রের কষাঘাতে এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে ভুগে সে নাকি কঙ্কালসার হয়ে গেছে। তাকে দেখে চেনা যায়না। তার লাবণ্য হারিয়ে ফেলেছে। আমি তাকে এ অবস্থায় দেখিনি যদিও। আর হয়তো দেখতে পাবো না

Pioneer in village based website

কোনদিন। আমরা দু'জন, আমি আর মাহবুব মাঝে মধ্যে তার স্মৃতিচারণ করি আর তার জন্য নীরব-বেদনা অনুভব করি।

মাহবুব তার অতীতের বান্ধবীদের কথা বিনা দ্বিধায় আমার সঙ্গে আলোচনা করেছে বহুবার। তাদের লেখা চিঠিগুলো কতবার আমাকে পড়ে শুনিয়েছে। এর কিছু কিছু উদ্বৃতিও আমি দিয়েছি এই বইতে। এসব কথা চিন্তা করে মাহবুবের জন্য সহানুভূতিতে আবার আমার মনটা ভরে গেল। আমার প্রবাসকালে তার দু'বছরের একাকীত্ব জীবনের দুর্বিষহ যন্ত্রণার কথা মনে হলো।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের আসল ভিত্তি যদি সুদৃঢ় থাকে, পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ থাকে, সুসংহত বোঝাপড়া থাকে এবং যদি দু'জনেরই মর্যাদাবোধ থাকে, তাহলে অনেক অশান্তির অনল থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। অবশ্য বাস্তব এবং আদর্শ সম্পর্কের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। আমরাও তার ব্যতিক্রম নই। কিন্তু আমরা দু'জনে ভালো-মন্দ মিলিয়ে একে অপরকে গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছি। তাই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিক্ততার মুখোমুখি বহুবার হলেও, আবার তা উত্তীর্ণ হতে পেরেছি। এ ব্যাপারে মাহবুব আমাকে অনেকখানি সাহায্য করেছে। সে আমাকে প্রায়ই মনীষীদের সাহিত্যকর্ম, বিশেষ করে কবিতা পড়ে শোনাতো। রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা এবং জীবনানন্দ দাশের কয়েকটি কবিতা আমাকে বিশেষভাবে স্পর্শ করেছে। 'যে আমারে দেখিবারে পায় অসীম ক্ষমায় ভালমন্দ মিলায়ে সকলি'.... ইত্যাদি বিভিন্ন সময়ে আমাকে প্রবলভাবে প্রভাবান্বিত করেছে।

মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়। ভালোবাসার সীমা-পরিসীমা নেই। অসীম নীল আকাশের মতো প্রসারিত এবং সমুদ্রের মতো গভীর। ভালোবাসার বিচিত্র রূপের বর্ণনা দেয়া আমার মতো একজন অতি সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। বিয়ের পঞ্চাশ বছর পরেও আমরা পরস্পরের আনন্দদানকারী, কঠিনতম সমালোচনাকারী এবং প্রিয়তম বন্ধু। আমি এবং মাহবুব প্রকৃত পক্ষে দু'জনেই নির্মল-সুন্দর ভালোবাসার পূজারী। এটাই বোধ করি আমাদের মাঝে সবচেয়ে বড় মিল। এখানেই আমরা একাত্ম হয়েছি বারবার। জীবনের বেলাভূমিতে এসে এই উপলব্ধি আমার মাঝে আরও প্রগাঢ় হয়েছে।

বাঙালি হিসেবে গর্ববোধ

প্রায় আড়াই মাস পর উইলিয়ামস পরিবার ছেড়ে ইউনিভার্সিটি হোস্টেলে চলে এসেছি। হংকংয়ের অধিবাসী একজন চাইনিজ ছাত্রী লতিফা খান আমার রুম-মেট ছিল। সে ইতিহাসে ডক্টরেট করছিল।

ওই সময় আমি ছাড়া মাত্র দু'জন পূর্ব পাকিস্তানী কমনওয়েলথ স্কলারশিপ নিয়ে ওয়েলিংটনে প্রশিক্ষণরত। সিরাজউদ্দীন এবং হোসেন। আমার যাওয়ার খবর শুনে তারা আমার সাথে দেখা করতে এলেন। সাথে একজন পশ্চিম পাকিস্তানী এবং একজন ইংরাজ, মিস্টার বন্ড নামে পরিচিত। তিনি বেশ বয়স্ক। সত্তর তো হবেই। মাথায় চুল

সব সাদা। চোখে চশমা। ওয়েলিংটনে তিনি একাই বসবাস করেন। একদিন তিনি লতিফা এবং আমাকে একটি চাইনিজ রেস্টুরেন্টে ডিনার খাওয়াতে নিয়ে গেলেন। খাবার অর্ডার দেয়ার সময় বললেন, দু'জন ইন্ডিয়ান গেস্ট আছে। খাবারটা যেন খুবই ঝাল করে তৈরি করা হয়। আমি সংশোধন করে বললাম, আমি পূর্ব পাকিস্তানী (তৎকালীন), ভারতীয় নই। রেস্টুরেন্টের লোকটা খুব অবাক হয়ে জিগ্যেস করলো, পূর্ব পাকিস্তান ভারতের কোন প্রদেশে অবস্থিত? বুঝতে পারলাম, পূর্ব পাকিস্তান বলে পৃথিবীতে কোন জায়গা আছে, সেটা তাদের জানা নেই। এ ধরণের প্রশ্নের অনেকবার মুখোমুখি হয়েছি। এদেশ সম্পর্কে তারা সুপরিচিত নয়। কিন্তু আমাদের কালচারের প্রতি তাদের অগাধ শ্রদ্ধার প্রমাণ পেয়েছি বারবার।

একবার আমাদের হোস্টেলে সিমেস্টার শেষের পার্টি হচ্ছিল। আমার বন্ধুরা ঠিক করলো আমাকে তাদের মতো বিদেশী ড্রেস পরাবে, মদ্যপান করাবে এবং নাচাবে। আমি কিছুতেই রাজি হলামনা শাড়ি ছেড়ে অন্য ড্রেস পরতে। তাতে আমি অভ্যস্তও ছিলাম না। সেদিন আমি গাড় নীল রঙের জামদানী শাড়ি পরেছিলাম। বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও ড্রিঙ্ক করলাম না। অত্যন্ত বিনীতভাবে বললাম, আমাদের দেশে মেয়েরা ড্রিঙ্ক করেনা (তখন করতোনা)। পার্টি শেষে আমাদের হোস্টেলের মেট্রোন মিস হিস্‌লপ্ একটি চমৎকার বক্তৃতা দিলেন। তিনি শাড়িকে গ্রেইসফুল ড্রেস হিসেবে অভিহিত করে বললেন, যারা নিজস্ব সংস্কৃতির শেকড়ের সাথে সম্পৃক্ত এবং স্বীয় মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখে তারা সমৃদ্ধ জাতি। সেদিন বাঙালি হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিতে অত্যন্ত গর্ববোধ করেছিলাম।

এর মধ্যে এক মজার ব্যাপার ঘটে গেল। আমার বন্ধু লতিফাও কোনদিন ড্রিঙ্ক করেনি। এই কথা জানতে পেরে বন্ধুরা তাকে কোকের গ্লাসের মধ্যে বিয়ার ও সেমপেইন মিশিয়ে খাইয়ে দিল। তা প্রথম ডোজ হিসেবে এত বেশি কড়া হয়ে গেলো যে কিছুক্ষণের মধ্যে সে গভীর নিদ্রায় ঢলে পড়লো। তাকে অতি কষ্টে চ্যাংদোলা করে লম্বা সোফার ওপর শুইয়ে দেয়া হলো। সারারাত আর তার ঘুম ভাঙলোনা। এই ঘটনার কথা উল্লেখ করে আমরা প্রায়ই লতিফার সাথে হাসি-ঠাট্টা করতাম। সে বলতো, হংকংয়ে মেয়েদের ড্রিঙ্ক করার ব্যাপারে কোন সংস্কার নেই। কিন্তু সে নিজে খায়না কারণ Filial Piety। মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে সে মদ্যপান থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে। তার মা-বাবা মুসলিম। লতিফা খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল স্কুলে পড়ার সময় তার বন্ধুদের সাথে। ধর্ম পরিবর্তন করা সত্ত্বেও মা-বাবার ধর্মের প্রতি তার অশেষ শ্রদ্ধা। সে যখন তার মা-বাবার কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতো এবং তাদের সাথে তার সুমধুর সম্পর্কের কথা বলতো, তখন মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতাম। বলতো, তার ধর্ম পরিবর্তন সম্পর্কে মা-বাবা কোনদিন কড়া কথা বলেনি। তার স্বাধীনতায় তারা কোনদিন হস্তক্ষেপ করেনি। তাই সেও উপলব্ধি করেছিল, যে মা-বাবা কোনদিন তার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে আঘাত করেনি, মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেনি, সবসময় সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করেছে, তাঁদের প্রতি এবং তাঁদের নির্দেশের প্রতি চিরদিন সে অনুগত থাকবে। তারই প্রমাণ স্বরূপ সে মদ্যপান করেনা। এটাকেই সে Filial Piety বলে।

মাতা-পিতা ও সন্তানের মধ্যে এই বন্ধন বর্তমান সমাজে ক্রমশ বিলুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও সন্তানদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুসুলভ ব্যবহার দিয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব। আমি এতে চির বিশ্বাসী।

ক্রাইষ্টচার্চে : পারাঠা এ জীবন চায় না

ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় প্রথম বর্ষের পরীক্ষা শেষে ফিল্ড ওয়ার্ক করার জন্য আমাকে ক্রাইষ্টচার্চে পাঠানো হয়। নিউজিল্যান্ডের প্রধান দু'টি দ্বীপের মধ্যে দক্ষিণে অবস্থিত ক্রাইষ্টচার্চ। সমুদ্র পথে ভ্রমণ করার জন্য সকলে উৎসাহিত করাতে জাহাজে করে ক্রাইষ্টচার্চের পথে রওনা হলাম। ভোরবেলা জাহাজ তীরে ভিড়ল। জন্ মরিসন এবং মিউরিয়েল মরিসন জাহাজ ঘাট থেকে আমাকে নিয়ে গেল তাদের বাড়িতে, ৩৮ নাম্বার জাজ স্ট্রীটে। বাড়িটি কাঠের তৈরি। সামনে সবুজ লন। উঠোনের সীমানা কাঠের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। তার ওপর নানা রংয়ের বোগেনবেলিয়া ফুটে আছে। এক পাশে মোজামব্রিত্রনথাম, গাড়ো গোলাপি রংএর পুষ্পকুঞ্জ। আরেক পাশে একটি গাছে অসংখ্য লাল-সবুজ আপেল ঝুলছে। তার বেশ কয়েকটা মাটিতে সবুজ ঘাসের ওপর পড়ে আছে। জীবনে এই প্রথম আপেল গাছে ঝুলতে দেখলাম।

মরিসন দম্পতি নিঃসন্তান। কিন্তু তাদের স্নেহের অন্ত ছিল না সকলের প্রতি। আমাকে দশ সপ্তাহ কী আনন্দে এবং স্নেহমন্ডিত পরিবেশে সযত্নে রেখেছিল, তা ভোলা যায় না। আমি চিরকালই ঘুম কাতুরে। সকালে ঘুম থেকে উঠতে প্রায়ই দেরি হয়ে যেতো। জনের অফিসে আমি প্রাকটিক্যাল কাজ করতাম। তাই তার সাথেই অফিসে যেতাম। রোজ ভোরে মিউরিয়েল সকালের বর্ণনা দিতে দিতে দরজায় টোকা দিয়ে আমাকে সযত্নে ঘুম থেকে উঠাতো। তার সেই বর্ণনা মনে হতো কারো সুললিত কণ্ঠের কবিতা শুনছি। সকালে পাখির কূজন শোনা যেতো আমার রুম থেকে। বাগানের এক কোনায় অনেক পাখি দলে দলে এসে বসতো। মিউরিয়েল রোজ বিকেলে একটা ছোট্ট থালাতে খাবার রেখে আসতো পাখিদের জন্য। এরা পোষমানা পাখি নয়। বিশাল আকাশে স্বাধীন তাদের বিচরণ। কিন্তু ঠিকই তারা মিউরিয়েলের ডাকে সাড়া দিতো। রোজই একবার বাগানে এসে তার সযত্নে রাখা খাবার তৃপ্তি ভরে খেয়ে যেতো। ওরা নিশ্চয় মিউরিয়েলের স্নেহ-ভালোবাসার উত্তাপ উপলব্ধি করতো।

ডিনার তৈরি করার সময় সে আমাকে প্রায়ই জিগ্যেস করতো, কী খেতে ইচ্ছা করে আমার। আমার প্রতি এই ধরণের মমত্ববোধ দেখে, সে যা-ই রান্না করতো, আমার ভালো লাগতো। মনে পড়ে প্রথম দিন সে আমাকে জিগ্যেস করেছিল, তোমার জন্য কতখানি ভাত রান্না করবো, এক চামচ না দু'চামচ। আমি অবাক হয়ে তার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে উত্তর দিলাম, তোমার যা খুশি। খাবার যখন টেবিলে পরিবেশন করা হলো তখন বুঝলাম মিউরিয়েলের প্রশ্নের মর্ম। প্রত্যেক খাবারের প্লেটে ম্যাশ্ড পটেটো, গ্রীন লিভস, সালাড, মিট, বয়েল্ড ভেজিটেবল ইত্যাদি। ব্যালান্সড্ ডাইটের একটি নমুনা দেখতে পেলাম। আমার প্লেটের একপাশে টেবিল চামচের দু'চামচ ভাতও দেয়া হয়েছে। আমরা ভেতো বাঙালি। তাই খাবারের মূল্যায়ণ করি

চাউলের গুণগত মান এবং পরিমাণ দিয়ে। সুষম খাদ্যের কথা বই পুস্তকে অনেক পড়েছি, কিন্তু বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা শুরু করলাম নিউজিল্যান্ডে গিয়ে।

এই আড়াই মাস কাজের মধ্য দিয়ে ক্রাইষ্টচার্চের বিভিন্ন অফিস ঘুরেছি। অনেক কেইস-স্টাডি করেছি এবং তাদের বাড়িতেও গিয়েছি। একটা কেইসের কথা ভুলতে পারি না। এক বড় ব্যবসায়ীর চৌদ্দ বছরের মেয়ে পারাঠা। স্কুলে পড়ে। কিন্তু সময় পেলেই সে সপিং সেন্টারে যায় এবং নানা ধরণের প্রসাধন সামগ্রী চুরি করে বাসায় নিয়ে যায়। কয়েকবার ধরা পড়েছে। ছাড়া পেলে পুনরাবৃত্তি করে। এতে বিরক্ত হয়ে তার বাবা তাকে পুলিশে সোপর্দ করেছে। জুভিনাইল কোর্টে তার কেইস চলছিল। একদিন তার কেইস শোনার জন্য কোর্টে গেলাম আমার সুপারভাইজারের সাথে। মেয়েটি কেন চুরি করে তার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বললো, তার বাবা আর মায়ের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল না। দু'জনে প্রায়ই ঝগড়া করতো এবং তার উপলক্ষ ছিল পারাঠা। তার বাসায় থাকতে ভালো লাগতো না। এজন্য প্রায়ই বাসা ছেড়ে বাইরে থাকবার প্রবল ইচ্ছা জাগতো। পারাঠার একটি ছোটবোন ছিল, নাম রীটা। রীটাকে সে খুব ভালোবাসতো। কিন্তু তার মা চাইতো না রীটা পারাঠার সঙ্গে মিশুক। এতে তার মনটা সব সময় ভারাক্রান্ত থাকতো। বিদ্রোহী হয়ে উঠতো। এই মানসিক যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য দোকান থেকে জিনিস চুরি করার মতো অপরাধে লিপ্ত হয়ে সে জেলে যেতেও প্রস্তুত থাকতো।

আসলে পারাঠা তার বাবার আগের স্ত্রীর সন্তান। বাবা-মা'র বিচ্ছেদের পর পারাঠাকে তার মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছে। সে মায়ের স্নেহ কিংবা যত্ন কিছুই পায়নি। পরিবর্তে পেয়েছে বাবার নিষ্ঠুর শাসন এবং সৎ মায়ের অবহেলা ও মানসিক অত্যাচার। প্রতি মুহূর্তে তার প্রসঙ্গ নিয়ে মা-বাবার মধ্যে তর্ক-বিতর্ক। তাদের পারিবারিক এই অশান্তি এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য পারাঠা নিজেকেই দায়ী করে। এ জীবন সে চায়না। সে নিজেকে অবাঞ্ছিত মনে করে। পারাঠা জীবনে স্বাভাবিক পরিবেশ পায়নি। অবজ্ঞা আর নিষ্ঠুর শাসন তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ হতে দেয়নি। তাই প্রতি মুহূর্তে সে হীনমণ্যতায় ভোগে। এর গন্ডি থেকে কোনদিন বের হয়ে আসার সুযোগ পায়নি। বরং সে বিকৃত জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। শিশু-সহায়ক পরিবেশ পেলে তার এই দুর্দশা হয়তো হতো না।

আমরা অনেক সময় শিশুর এই চাহিদার প্রতি মোটেই লক্ষ্য রাখি না। প্রতিটি মা-বাবার প্রতি আমার আবেদন— যে শিশুকে তারা পৃথিবীতে আনে, তার প্রাপ্য অধিকার থেকে যেন তাকে বঞ্চিত করা না হয়। পৃথিবীতে যাকে আনলো, সে শিশু নিষ্পাপ। সে যদি মানুষ হিসেবে তৈরি না হয়, সে দায়িত্ব মা-বাবার, শিশুর নয়।

নিউজিল্যান্ডে নানা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছি। সমাজ বিজ্ঞানে স্নাতোকোত্তর ডিগ্রি পেয়েছি। বহু গুণীজনের সংস্পর্শে এসেছি। সেখানকার শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং জীবন যাপন প্রণালি কাছ থেকে দেখেছি। অনেক কিছু শিখেছি। অনেক বন্ধু পেয়েছি। তাদের হৃদয়ের স্পর্শে সিক্ত হয়েছি। সমুদ্র-পাহাড়-হ্রদের নীলে নিজেকে বারবার হারিয়েছি। এভাবে দু'বছরের সুখ-স্মৃতি নিয়ে ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে অস্ট্রেলিয়া, হংকং এবং চীনের কেন্টনে কয়েকদিন কাটিয়ে দেশে ফিরে এলাম।

কর্মক্ষেত্রে নারী

আমার গাড়ি চালানো বন্ধ

১৯৬৫ সালে ডিসেম্বর মাস। নিউজিল্যান্ড থেকে ফিরে আমার গাড়ি চালাবার প্রবল ইচ্ছা জাগে। সেখানে প্রায় সব মেয়েরাই গাড়ি চালাতে পারে। আর আমাদের দেশে তখন বোধ করি হাতেগোনা দু'য়েক জন চালাতো। তাও ঢাকায়, আর কোথাও নয়। আমি যখন ড্রাইভিং শিখতে চাইলাম, আমার স্বামী বাধা দিলো। কারণ আমি সড়ক-অন্ধ। ও বলতো, আমি গাড়ি চালাতে গিয়ে হারিয়ে যাবো। তবুও জোর করে শিখলাম। আমি যখন চালাতাম, মাহবুব আমার পাশের সিটে বসে থাকতো। একদিন চট্টগ্রাম শহর থেকে গাড়ি চালিয়ে আমার শ্বশুর বাড়ি গহিরা গ্রামে যাচ্ছিলাম। শহর থেকে কিছুদূরে একটি রেলওয়ে ক্রসিং পার হওয়ার সময় হঠাৎ দেখলাম সামনে এক বিরাট ট্রাক প্রবল গতিতে এগিয়ে আমার গাড়ির সামনে চলে এসেছে। আমি পাশ কেটে চলে যাওয়ার সময় আমার গাড়ি একটি রিকশার সাথে ধাক্কা খেলে রিকশাটা উল্টে যায়। তার ভেতরের একজন আরোহীও রাস্তায় পড়ে যায়, যদিও তার কোন আঘাত লাগেনি। রাস্তার ধারে ছোট একটি পানের দোকানে তিন চারজন আড্ডায় মেতে ছিল। যখনি দেখলো একজন মেয়ে গাড়ি চালিয়ে রিকশাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে, তখন তারা অত্যন্ত রেগে গিয়ে আমার গাড়িকে ধাওয়া করলো। আর চিৎকার করে বললো— মেয়েলোক গাড়ি চালাচ্ছে বলে এক্সিডেন্ট হয়েছে। পুরুষ চালালে তা কোনদিন হতোনা। মেয়েরা অলক্ষী। তারা কোন ভাল কাজ করতে পারেনা। আমি জোরে চালিয়ে কোন রকমে তাদের নাগালের বাইরে চলে গেলাম। হাটহাজারীতে এসে মাহবুবের হাতে স্টিয়ারিং দিয়ে দিলাম। আমার স্বামী আর কোনদিন আমাকে গাড়ি চালাতে দেয়নি, পাছে আমি এক্সিডেন্ট করি। পুরুষরাওতো এক্সিডেন্ট করে কিন্তু আমি করেছি বলে মাহবুবের এই অতিরিক্ত সতর্কতার কি কোন প্রয়োজন ছিল ? প্রগতিশীল হয়েও কেন সে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির শিকার হলো?

ড্রাইভার সালেহা

এই প্রসঙ্গে সালেহার কথা মনে পড়লো। আমি তখন ইউনিসেফে চাকরিরত। আমার বাসায় সেদিন একটি ডিনার পার্টি ছিল। বিশ্বব্যাংক, ইউনিসেফ, রয়্যাল ড্যানিস এম্বেসি এবং নেদারল্যান্ড এম্বেসির প্রধানগণসহ অনেক বিদেশী ও দেশী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ

উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের বহন করে এনেছে বিভিন্ন সংস্থার প্রায় ত্রিশটির মতো গাড়ি। কোন একজন অতিথিকে বরণ করার জন্য আমি গেটের বাইরে আসতেই দেখলাম সালেহা গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের গাড়িতে ড্রাইভারের আসনে বসে গান শুনছে এবং অন্য ড্রাইভারদের সাথে গল্প করছে। তার পরিতৃপ্ত চেহারা, মার্জিত আচরণ এবং আত্মবিশ্বাস দেখে চমৎকৃত হলাম। বললাম, আপনাকে দেখে খুব ভালো লাগলো। আপনি নারী ড্রাইভারদের পথ-প্রদর্শক। আশাকরি আরো অনেক নারী এই পেশায় আসবে। তখন আমরা ইউনিসেফে নারী ড্রাইভার রিক্রুট করার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করছিলাম।

আমি ঘরে এসে আমার দারোয়ানকে বললাম, সালেহাকে ঘরের ভেতরে এনে খাবার দিতে। অন্য ড্রাইভারদের সাথে গাড়িতে বসে খাবার খেতে তার হয়তো ভালো নাও লাগতে পারে। দারোয়ান সালেহাকে বাসার ভেতরে আসতে বলতেই সে জবাব দিলো, আমি গাড়িতে বসেই খাবো। আমিও এদের সকলের মতো একজন ড্রাইভার, ওরা গাড়িতে বসে খেতে পারলে, আমি পারবো না কেন।

পার্টি শেষে দারোয়ান আমাকে সালেহার কথা জানালো। সব কথা শুনে মনে হলো— সালেহা আমাদের সামাজিক প্রথা অতিক্রম করে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। মনে মনে তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম আমার চৈতন্য ফিরিয়ে আনার জন্য। আমার মতো একজন উচ্চশিক্ষিতও অবচেতন মনে নারী ও পুরুষের দক্ষতার মাঝে বিরাট ব্যবধান বা প্রাচীর সৃষ্টি করে থাকে। সালেহার এই মনোভাব নারী উন্নয়ন সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গিকে আরো প্রসারিত করে দিলো। অথচ নারী উন্নয়ন নিয়ে আমরা সারাক্ষণ কাজ করছি, প্রশিক্ষণ নিচ্ছি, দিচ্ছিও, লেখাপড়া করছি। মনে হলো সালেহার সচেতনতা নারী উন্নয়নের একটি প্রকৃত উদাহরণ। নিজের কার্যকলাপ সম্পর্কে সে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। সে কেবল উপার্জন করেনা, সেই অর্থ কীভাবে খরচ করবে সে সম্পর্কেও সে যথেষ্ট সজাগ। সালেহার মতো আমাদের সকলকেই বিশ্বাস করতে হবে, বাস্তব জীবনে কাজ করতে হলে প্রত্যেককে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হয়। প্রমাণ করতে হয়, নারীরাও সব কাজ দক্ষতার সঙ্গে করতে পারে যদি সমান সুযোগ পায়।

সালেহা এই পর্যায়ে কেমন করে উপনীত হলো। কেমন করে সে একজন দক্ষ ব্যক্তি হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলো, এখানে সেই পটভূমি টেনে আনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছি। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর উৎসাহ পেয়ে সালেহা পুরুষের সম-দক্ষতা অর্জনের সঙ্কল্প গ্রহণ করে। নারীকে এই পেশায় পুরুষের সমসারিতে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে জাফরুল্লাহ ভাইয়ের ভূমিকা অগ্রণী। তাঁর সমাজ চেতনার ভিত অত্যন্ত শক্ত। কোন এক সময় সমাজভিত্তিক চিন্তা ভাবনায় নিজেকে সমৃদ্ধ করেছিলেন বলে বোধ করি তাঁর প্রতিটি কর্মকান্ডের পেছনে গণমুখী চেতনা কাজ করে। উন্নয়ন কেবল উন্নয়নের জন্য নয় – উন্নয়নের ফল যদি গণমানুষের কাজে না আসে তাহলে সে উন্নয়ন অর্থবহ হয়না বলে তাঁর বিশ্বাস। একথা কাজে রূপান্তরিত করতে তাঁকে সব সময় সচেষ্ট হতে দেখেছি।

জাফরুল্লাহ ভাইয়ের সাথে আমার সুমধুর সম্পর্ক। নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত যে কোন কাজে তার ইতিবাচক সমর্থনের জন্য সব সময় আমি উৎসাহবোধ করেছি। নারী উন্নয়নে

তিনি অঙ্গীকারাবদ্ধ। একথা বিশেষভাবে উপলব্ধি করি যখন গণবিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হিসেবে সভায় যোগদান করি। প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় তিনি বারবার নিশ্চিত হতে চান, এই সিদ্ধান্তের ফলে নারী উন্নয়নে কোন বাধা সৃষ্টি হবে কিনা। আমরা যারা নারী সদস্য আছি তারা মতামত দিলাম কিনা। গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যে কিভাবে অধিক নারী অধ্যাপক নিয়োগ করা যায়, অধিক ছাত্রী ভর্তির জন্য কী কী সুযোগ সুবিধা দেয়া যায়— এসব ব্যাপারেও তিনি অত্যন্ত যত্নবান। এই কথাগুলো তিনি এত সুদৃঢ়ভাবে এবং প্রত্যয় নিয়ে বলেন, মনে হয় তার অন্তরের গভীরতর স্তর থেকে অনাবিলভাবে এগুলো নিঃসারিত হচ্ছে। এখানে মেকী বা অসচ্ছ কিছু নাই।

সালেহার জীবন কাহিনীতে ফিরে আসি। শ্বশুরবাড়ির বিরূপ পরিবেশের জন্য কঠোর বাস্তব জীবনের মোকাবিলা করার প্রত্যয় নিয়ে স্বামীর ঘর পরিত্যাগ করে বাবার বাড়িতে ফিরে এসেছিল সালেহা তিন মাস বয়সের একটি কন্যা শিশু সাথে নিয়ে উনিশ বছর আগে। ভাগ্য উন্নয়নের দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে জাফরুল্লাহ ভাইয়ের উৎসাহে সে সাভারে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কেন্টিনে সামান্য কর্মচারী হিসেবে যোগ দেয়। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে সহায়ক পরিবেশ, শ্রমের মর্যাদা, নারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদি দেখে ক্রমে সালেহার মনে আমূল পরিবর্তন আসে। সে নিজেকে একজন মর্য্যাদাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে ভাবতে শুরু করে। রাতে শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তি হয়। সাইকেল চালানো শেখে। কৃষিকাজে পুরুষের সাথে কাজ করতে শুরু করে। এর আগে সে কোনদিন ভাবতে পারেনি মেয়েরাও ছেলেদের মতো সমান দক্ষতায় কাজ করতে পারে। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ছেলেদের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়ে তার সেই চিরাচরিত ভুল ধারনার সমাপ্তি ঘটলো। তার মনে এক দুর্বার ক্ষমতার সঞ্চার হলো। ক্রমে তার উত্তরণ হলো আরেক পৃথিবীতে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে চলতে চলতে হয়তো সে উপলব্ধি করলো সমাজে নারীদের অবস্থান নিচে রাখার জন্য পুরুষ ও নারীর কর্ম দক্ষতার মধ্যে বিরাট একটি কৃত্রিম দেয়াল সৃষ্টি করা হয়েছে। পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য এই দেয়াল কৃত্রিমভাবে সমাজ তৈরি করেছে। এর কোন নৈতিক ভিত্তি নেই। এর জন্য নারী-পুরুষ কেউই এককভাবে দায়ী নয়, আসলে পুরো সমাজটাই দায়ী। এই কৃত্রিম দেয়াল ভেঙে দেয়া সম্ভব, যদি নারী পুরুষ একসাথে অংগীকারাবদ্ধ হয়।

সালেহা নিজের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। জীবন সংগ্রামে তাকে জয়ী হতেই হবে। সামাজিক প্রতিকূলতার বিরাট সমুদ্র এবং নারী-পুরুষের মাঝে এই ব্যবধান অতিক্রম করার জন্য ধাপে ধাপে এগুতে হবে, এক লাফে সম্ভব নয়। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে অনুকূল পরিবেশ পেয়ে সালেহা অবশেষে ড্রাইভিং শিখল। কিন্তু তখনো মেয়েদের কাজ বলে এটা আমাদের সমাজে স্বীকৃত ছিল না। পেশাদার হিসেবে ড্রাইভিং লাইসেন্স নেয়ার জন্য তাকে তিনবার পরীক্ষা দিতে হয়। পুলিশ পরীক্ষক সালেহার মতো একজন অতি সাধারণ নারীপরীক্ষার্থীকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তৃতীয়বারে বাধ্য হয়ে উত্তীর্ণ করলো। পুলিশ কর্মকর্তা ভাবতেই পারেনি সালেহার মতো একজন মেয়ে পুরুষের সমকক্ষ হয়ে গাড়ি চালাতে পারবে। কিন্তু সালেহার দৃঢ় প্রত্যয় এবং সুনিপুণ ড্রাইভিং কৌশলের কাছে

Chunati.com
Pioneer in Village based Website

পুলিশ পরীক্ষকের চিরদিনের ভুল ধারণা ভেঙে যায়। সালেহা পেশাদার ড্রাইভারের কাজে যোগ দিল গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে। জাফরুল্লাহ সালেহাকে তাঁর নিজের গাড়ি চালাবার কাজে নিযুক্ত করলেন। সালেহা যাতে নির্ভয়ে কাজ করার সুযোগ পায় সেদিকে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। শুধু সালেহা নয়, আরো অনেক মেয়েকে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের আওতায় এনে ড্রাইভিং এবং অন্যান্য অপ্রচলিত পেশায় প্রশিক্ষণ দিয়ে জাফরুল্লাহ তাদেরকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ দেখিয়েছেন। যাহোক, অনেকদিন দক্ষতার সাথে সেখানে কাজ করার পর ১৯৯৫ সালের দিকে ইউনিসেফে সে চাকরি পেল। সালেহা অত্যন্ত সাহসী। সে দূর-দূরান্তরে, গ্রামে গঞ্জে গাড়ি চালিয়ে পুরো বাংলাদেশে কাজ করে। ইউনিসেফে পুরুষ ড্রাইভারদের সাথে তাল মিলিয়ে যে কোন কাজ সম্পন্ন করতে সে দ্বিধাবোধ করে না। সালেহা আমাদের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির সীমানা ছাড়িয়ে অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গেছে।

এ পর্যায়ে আসতে সালেহাকে কেন এত কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হলো ? স্বাভাবিকভাবে এই প্রশ্ন সকলের মনে আসতে পারে। আমাদের মতো পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় উন্নয়নের জন্য সাধারণত পুরুষদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়ে থাকে। এগুলো তাদের জন্য নির্ধারিত বলে প্রচলিত ধারণা। এই মনোভাবে বশবর্তী হয়ে অনেকেই নারীদের পরিবর্তিত ও উন্নততর ভূমিকাকে সহজে গ্রহণ করতে পারেনা। অথচ একটু বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গি সমাজ আরোপিত। পুরুষ ও নারীর মধ্যবর্তী কৃত্রিম দেয়াল ভেঙে দিতে পারলেই আমরা প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মঙ্গল সাধন করবো। একটি পরিবারে নারী এবং পুরুষ উভয়ের ভূমিকা অত্যন্ত মূল্যবান। প্রচলিত সামাজিক অবস্থার মধ্যে নারীদের যা করণীয় বলে আমরা ধরে নিয়ে থাকি, সেগুলো মানুষেরই দেয়া কৃত্রিমভাবে সমাজের সৃষ্টি। সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার অধিকার নারী-পুরুষ সকলেরই, কারণ সকলেই মানুষ। পুরুষ ও নারী সমবেতভাবে উন্মুক্ত মনের সাহায্যে যদি এই ক্ষীণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিসর সম্প্রসারিত করে সামাজিক চেতনার স্তর উন্নততর করতে পারে, তবেই নারী-পুরুষের মধ্যবর্তী কৃত্রিম প্রাচীর ক্রমে বিলুপ্ত হবে। নিজের পরিবারকে গড়ে তুলতে হলে এবং সমাজকে সমৃদ্ধ করতে হলে নারী-পুরুষ উভয়েরই ক্ষমতায়ন দরকার। একথা অনস্বীকার্য। যুগ যুগ ধরে নারীর অবস্থান অনেক পিছিয়ে আছে বলে আজ আমাদের শুধু নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বিশেষভাবে সোচ্চার হতে হয়।

একবার বিশিষ্ট সমাজকর্মী মুনিরা খানের আমন্ত্রণে দিলখুশা ইনার হুইল ক্লাবের দ্বিতীয় অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়েছিলাম। ঢাকার শেরাটন হোটেলে এই অনুষ্ঠানটি হয়েছিল ১৯৯৬ সালের ৬ আগস্ট সন্ধ্যায়। সেদিন ইনার হুইল ক্লাবের সদস্যরা ছাড়াও কয়েকজন পুরুষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন। আমি নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে সালেহার গল্পটি উল্লেখ করেছিলাম। সেদিন গভীর আনন্দ অনুভব করেছিলাম যখন দেখলাম আমার বক্তব্য শেষ হওয়ার সাথে সাথে দু'জন পুরুষ অতিথি (নাম মনে নেই) দারুণ উৎসাহ ভরে ঘোষণা দিলেন, তাঁরা সালেহাকে দেখতে চান এবং তার এই অভিযাত্রার স্বীকৃতি স্বরূপ তাকে পুরস্কৃত করতে চান।

পরবর্তীতে সিরডাপ হলে একটি অনুষ্ঠান করে তাঁরা এই পুরস্কারটি একটি প্রশংসাপত্রসহ সালেহার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তাঁদের এই সচেতন দৃষ্টিভঙ্গিকে সেদিন আমরা সকলে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে অভিনন্দিত করেছিলাম।

মেয়েদের প্রমোশন : নির্দেশ এলোনা

আমি তখন চট্টগ্রামে সমাজকল্যাণ ডিভিশনাল অফিসের ইনচার্জ এবং এক নম্বর শহর সমাজকল্যাণ প্রকল্পের কর্মকর্তা। একদিন ঢাকা থেকে খবর পেলাম শিঘ্রই আমার প্রমোশন হতে যাচ্ছে। অতিরিক্ত পরিচালক আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে লাল কালিতে লেখা একটা চিরকুট পাঠালেন ঢাকা থেকে সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অফিসার আমিনূল ইসলামের মাধ্যমে। বেশ কয়েকটা টেলিফোনও পেলাম এই সুখবরে অভিনন্দন জানিয়ে। মনে মনে আশান্বিত হয়ে উঠলাম। দিন যায়। মাস যায়। সেই প্রমোশনের কোন নির্দেশ আসে না। প্রতীক্ষা করে করে হতাশ হলাম। এর কোন কারণ খুঁজে পেলাম না। তবে কি আমি নারী বলে প্রমোশন পেলাম না ? তবে কি একজন নারীর ডিভিশনাল অফিসার হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার এবং সুচারুরূপে কাজ চালাবার যোগ্যতা নেই বলে প্রশাসন ভেবেছে? তবে কি পুরুষ কর্মকর্তারা একজন নারীকে বস্ হিসেবে মানবেনা বলে ভেবেছে? ডিভিশনাল অফিসের ইনচার্জ হিসেবে অনেক দিন কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করার পরও কেন আমাকে প্রমোশন দেয়া হলো না?

এসব চিন্তা করতে করতে একটা ঘটনার কথা মনে পড়লো। তখন প্রতিবন্ধী শিশুদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম ডিভিশনাল কেন্দ্র, Rehabilitation Centre for Physically Handicapped Children তৈরি করার জন্য সরকার অর্থ বরাদ্দ করেছে। নির্মাণের সময়সীমাও বেঁধে দেয়া হয়েছে। কিন্তু জমি কেনার জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ ছিল না। শর্ত ছিল, এর জন্য প্রয়োজনীয় জমি বিনা অর্থে সংগ্রহ করতে হবে। বারবার চেষ্টা করেও বিনা পয়সায় জমি পাওয়া গেল না। অথচ অর্থ-বছরের বরাদ্দকৃত টাকাও ফেরৎ যাওয়ার উপক্রম। চট্টগ্রামে এই কেন্দ্র স্থাপন করতেই হবে, এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি মরিয়া হয়ে জমির খোঁজ করতে লাগলাম। অবশেষে মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ক্যাপটেন শামসুল ইসলামের সহায়তায় আমি ষোলশহরে একটি জমি বিনামূল্যে যোগাড় করলাম। অতি কষ্টে অল্প সময়ের মধ্যে তা এই কেন্দ্রের নামে রেজিস্ট্রেশন করে নিলাম। চট্টগ্রামের অধিবাসী হওয়ায় বোধ করি এই কাজ সমাধা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

এই কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার জন্য ঢাকা থেকে এসেছিলেন সচিব পর্যায়ের একজন কর্তা ব্যক্তি। তিনি এই অনুষ্ঠানে আমার নাম উল্লেখ করে প্রশংসামূলক মন্তব্য করলেন। ঢাকায় ফিরে গিয়েও তিনি আমাদের পরিচালকের কাছে আমার কাজে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে আমার পদোন্নতির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন। ঢাকা গেলে আমাকে তাঁর সাথে দেখা করতে বলেন। বোধকরি এই সময়েই আমার প্রমোশনের কথা সমাজকল্যাণ বিভাগে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এর মধ্যে অফিসের কাজে

Gnanati.com
Pioneer in village based website

আমি ঢাকা গেলাম। আমাদের পরিচালকের নির্দেশমত সচিবালয়ে সেই উচ্চপদস্থ কর্তা ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। রুমে ঢুকতেই অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে চেয়ার থেকে ওঠে এসে তিনি আমাকে সোফায় বসালেন এবং নিজেও বসলেন। এত উচ্চপদের অধিকারী আমার মতো একজন ক্ষুদ্র অফিসারকে এভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে স্বাগত জানালেন দেখে আমি অবাক হলাম। এই মুহূর্তে আমি ভাবলাম আমাদের দেশেও এরকম বিনয়ী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আছেন, যাঁরা আমাদের আদর্শ হিসেবে পথ প্রদর্শক হতে পারেন।

সমাজকল্যাণের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন বিষয়ে আলোচনা করতে করতে এক পর্যায়ে মনে হলো তিনি আমার আরো নিকটস্থ হওয়ার চেষ্টা করছেন এবং এমন কিছু ঈঙ্গিত করতে চাইছেন, যা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বিধাতা নারীদের এমন একটি ক্ষমতার অধিকারী করেছেন যা পুরুষের অর্থবহ ঈঙ্গিত বুঝে ফেলতে সাহায্য করে। আমি তাড়াহুড়ো করে আমাকে এতক্ষণ সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তার ঈঙ্গিত বুঝিনি এমন ভান করে বিদায় নিলাম।

কর্মক্ষেত্রে নারীকে কত রকম প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। তার দক্ষতা প্রমাণিত করতে হয় পুরুষের চেয়ে দ্বিগুণ। কাজ করতে হয় অনেক বেশি। নানা রকম ঠাট্টা-বিদ্রূপের মুখোমুখিও হতে হয়। চরম ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিতে হয়। এরকম ঘটনা সর্বকালের। সর্বসময়ের। পৃথিবীময় ঘটে থাকে, শুধু আমাদের দেশে নয়। এক বান্ধবীর কাছে শুনেছিলাম বিদেশে পড়ার সময় শেষ মুহূর্তে তাকে পি.এইচ.ডি ডিগ্রি দেয়া হয়নি কারণ তিনি তার সুপারভাইজারের অশোভন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অন্ধ হোক, কুৎসিত হোক, বয়স নির্বিশেষে নারীকে ভোগের সামগ্রী হিসেবে দেখা হয়। পেশাগত কাজ করতে গিয়ে কোন কোন সময় পুরুষের এই দিকটা আমার কাছে উন্মোচিত হয়েছে। নারীকে নানা কৌশল, বুদ্ধি খাটিয়ে এই পরিস্থিতি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হয়। নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজ করতে গিয়ে এই অভিজ্ঞতা বিভিন্ন পরিস্থিতি বিশ্লেষণে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। মনে এখনও প্রশ্ন জাগে এই পরিস্থিতি কি আমরা এখনও কাটিয়ে উঠতে পেরেছি? আমাদের দেশে নারী উন্নয়নে সামগ্রিক চেতনার হার বেড়েছে বৈকি। কিন্তু দৈনিক পত্রিকার পাতা খুললেই যখন নূরজাহান-ইয়াসমিন-সীমাদের দৈহিক নির্যাতনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি অহরহ দেখি তখন নিজেকে খুব অসহায় ভাবি। তবুও নিরাশ হইনা। কারণ বর্ত্তমানে পুরুষ এবং নারী নির্বিশেষে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের ঝড় তুলছে।

আমার কথায় ফিরে আসি। পরবর্তীতেও আমার ন্যায্য প্রমোশনের নির্দেশনামা কোনমতেই পেলাম না। অবশেষে ঢাকা হেড অফিস থেকে আমাকে জানিয়ে দেয়া হলো, এবারে আমার প্রমোশন হলো না। আমাদের আর একজন পুরুষ সহকর্মীর প্রমোশন হয়ে ডিভিশনাল অফিসার হয়েছেন। তখন আমার প্রমোশন না হওয়ার কারণ বুঝতে বাকি রইলোনা। সচিবালয়ের উর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তির মনোরঞ্জনে সাড়া দিইনি বলে আমাকে ন্যায্য অধিকার থেকে এভাবে বঞ্চিত করা হলো।

Chhatri.com
Pioneer in village based website

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার অবতারণা করছি। একবার টোকিয়োতে প্রশিক্ষণরত অবস্থায় এক এশিয়ান সহপাঠীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। তিনি অত্যন্ত মেধাবী এবং সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। তার আচার আচরণে ছিল উন্নত রুচি এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের ছাপ। তার ব্যক্তিত্ব সকলকে আকৃষ্ট করতো। কথাবার্তায় ফুটে উঠত জ্ঞানের স্ফুলিঙ্গ। একদিন দু'জনে বসে পরের দিনের ক্লাসের জন্য এসাইনমেন্ট তৈরি করছিলাম। হঠাৎ সে অবেগতাড়িত হয়ে বললো, তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে। উত্তরে আমি বললাম, তোমাকেও আমি খুব পছন্দ করি। আমাদের এই বন্ধুত্ব সুন্দরভাবে চিরদিন ধরে রাখতে চাই। সে বললো, তোমার মনের মাঝে আমার জন্য একটু স্থান রেখো। তাতে আমি পরিতৃপ্ত থাকবো সারা জীবন। এর বেশি কিছু চাইনা। তারপর আরও দু'সপ্তাহ আমরা একই সাথে প্রশিক্ষণ নিয়েছি। রেস্টুরেন্টে খেয়েছি। টোকিওর বিভিন্ন স্থানে বেড়িয়েছি। কিন্তু সে কোনদিন রুচি-বহির্ভূত আচরণ করেনি। তাই তার স্মৃতি আমার কাছে এখনো অত্যন্ত মধুর।

এই ঘটনাগুলো এখানে অবতারণা করার জন্য আমার মনে অনেক সাহস সঞ্চয় করতে হয়েছে। কেউ কেউ হয়তো ভাবতে পারেন পুরুষদের প্রতি বিদ্বেষবশত আমি এই সবকে এতখানি গুরুত্ব দিয়েছি। আসলে তা নয়। আমার অনেক পুরুষ বন্ধু আছে। তারা সকলেই আমার প্রিয়জন। পুরুষ এবং নারী সকলেইতো মানুষ। তারা পরস্পরের পরিপূরক বলে আমি সব সময় বিশ্বাস করেছি। মানুষ হিসেবে পুরুষ ও নারী যদি পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন তাহলে এ ধরণের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় না। যেকোন পরিস্থিতিকে সুন্দরের দিকে প্রবাহিত করার জন্য প্রয়োজন মার্জিত মূল্যবোধের চর্চা।

Gramnath.com
Pioneer in village based website

পুরুষ সহকর্মীদের আস্থা অর্জন

ক্রমে সমাজকল্যাণ কর্মসূচিতে চারটি আরবান কমিউনিটি প্রকল্প ছাড়াও যুব উন্নয়ন, চিকিৎসা সমাজকল্যাণ, এনজিও রেজিস্ট্রেশন, প্রোবেশন ও আফটার কেয়ার, অন্ধ শিশুদের জন্য ইনটিগ্রেটেড শিক্ষা, শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র ইত্যাদি কর্মসূচি সংযুক্ত হয়। বিভিন্ন সময়ে এসবের অফিসার-ইন-চার্জ হওয়াতে প্রায় প্রতিটি কর্মসূচিতে আমার কিছু কিছু অভিজ্ঞতা ছিল।

অবশেষে একদিন প্রমোশন পেয়ে চট্টগ্রাম ডিভিশনের এসিসটেন্ট ডাইরেক্টর নিযুক্ত হলাম। তখন তদানীন্তন চট্টগ্রাম বিভাগের সকল জেলায় যেমন, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা, সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রামে সমাজকল্যাণের বিভিন্ন অফিসগুলোতে অনেক অফিসার এবং কর্মচারী কর্মরত। চট্টগ্রাম শহরেই প্রায় বারোজনের মতো অফিসার ছিল। ডিভিশনাল অফিসের যেদিন আমি চার্জ নিলাম, সেদিনই চট্টগ্রাম শহরের সব পুরুষ অফিসাররা ঢাকা হেড অফিসে টেলিফোনে জানালো, তারা 'নারী বসের' অধীনে চাকরি করবে না। শর্ত দিলো এই অফিসারকে যেন অন্যত্র বদলি করে দেয়া হয়, নতুবা তারা সকলে একত্রে চাকরি ছেড়ে দেবে। একজন পুরুষ অফিস সহকারি আমার প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে গোপনে এই কথা আমাকে জানালো। মুহূর্তের মাঝে আমার সমস্ত

উৎসাহ নিঃশেষ হয়ে গেলো। দিশেহারা বোধ করলাম। তৎক্ষণাৎ কোন প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে কাঠোরভাবে নিজেকে সংযত করলাম।

থমথমে পরিবেশ। কারো মুখে হাসি নেই। কাজে কারো মনোযোগ নেই। অফিসে আসা-যাওয়া করে কয়েকদিন কেটে গেল। এমন অবস্থায় সময়ক্ষেপণ করাই সবচেয়ে বড় অস্ত্র। এই সময় পরিচয় হয় লেখিকা ফাহমিদা আমীনের সাথে। তার মধুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সকলে আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। তার সাথে বন্ধুত্ব হলো। দু'জনে বসে মনের কথা বলতাম। সুখ-দুঃখের সাথি হলাম। আমার অফিসের এই ক্রিটিক্যাল সময়ে তার নির্মল সান্ত্বনার আশ্বাস পেয়ে নিজেকে সতেজ রাখার চেষ্টা করতাম। একদিন ঝাউতলা তার বাড়িতে খেতে ডেকেছিল। দেখলাম তার ছয় ছেলে বিশেষ সমাদরে আমাদের খাবার পরিবেশন করলো। মা'কে প্রতিটি কাজে তারা সাহায্য করলো। এই দৃশ্য দেখে আমার খুব ভালো লাগল। আমাদের দেশে সাধারণত সংসারের কাজে সহযোগিতা করা ছেলেদের কর্তব্য হিসেবে শেখানো হয়না। আমরা এ ব্যাপারে বেশ উদাসীন। ফাহমিদা তার ছেলেদের এত চমৎকার শিক্ষা দিয়েছে যে তারা যেকোন সাংসারিক কাজে সহযোগিতা করতে বোধ করি কোনদিন দ্বিধাবোধ করবে না। উনি একজন সার্থক জননী।

ধীরে ধীরে স্ট্রেটেজি ঠিক করলাম, কীভাবে আমি পুরুষ অফিসারদের নিয়ে একসাথে কাজ করার পরিবেশ গড়ে তুলতে পারি। তাদের সাথে বন্ধুসুলভ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করলাম। চট্টগ্রাম শহরের সকল সমাজকল্যাণ অফিসারকে আমার বাসায় নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করলাম। একজন অফিসারের মেয়েকে স্থানীয় স্কুলে ভর্তি করে দেয়ার ব্যবস্থা করলাম। একজনের অসুস্থ স্ত্রীকে হাসপাতালে দেখতে গেলাম। তাকে ভালো ডাক্তার দেখিয়ে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে দিলাম। অফিসে প্রত্যেকের সঙ্গে পৃথকভাবে বৈঠক করলাম। তাদের অফিস সংশ্লিষ্ট সুবিধা-অসুবিধার কথা জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলাম। কাজের পর্যালোচনা করতে গিয়ে তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে বিশেষভাবে প্রশংসা করলাম। বিদেশে পাঠাবার জন্য দু'য়েকজনের নাম সুপারিশ করলাম।

এইসব উদ্যোগের মাধ্যমে আমি এক নতুন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হলাম। আমি যখন কোন ক্ষতি না করে তাদের প্রাপ্য মর্যাদার প্রতি সম্মান দেখালাম এবং বন্ধুসুলভ আচরণ করলাম তখন তারা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করলো একজন নারীরও কর্মদক্ষতা থাকতে পারে। তিনিও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ হতে পারেন। সকলের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে পারেন। সহকর্মীদের উন্নয়নের জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টার উদ্যোগ নিতে পারেন। তারা একে একে আমার প্রতি আস্থা স্থাপন করতে লাগলো। ক্রমে আমি সকলের বড়আপার স্থানে অধিষ্ঠিত হলাম। সেই স্থান থেকে তারা আমাকে আর কোনদিন নামায়নি। আমরা একে অপরের আনন্দ-বেদনার অংশীদার হতে শুরু করলাম। এই পর্যায়ে আসতে প্রায় মাস দশেকের মতো আমাকে অসীম ধৈর্য সহকারে কাজ করতে হয়েছে।

আমারও উপলব্ধি হলো আমার পুরুষ সহকর্মীরা সকলে চমৎকার ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাদের মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা আছে এবং তাদের কর্মদক্ষতারও অভাব নেই।

আমরা ধীরে ধীরে পুরুষ অফিসার এবং 'নারী বসের' মধ্যে এই কৃত্রিম ব্যবধান অতিক্রম করতে সক্ষম হলাম। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতেও কিছুটা পরিবর্তন এলো। সদিচ্ছা এবং কমিটমেন্ট থাকলে যে কোন সমস্যা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার উপায় খুঁজে বের করা যায়।

আবার নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করলাম। ভাবলাম পুরুষ ও নারী একই প্রক্রিয়াতে পৃথিবীতে আসে। প্রত্যেকেই মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ। কেউ কারো অধীন নয়। একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেই পারস্পরিক আস্থা স্থাপন করা যায়। পারস্পরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধাই সব কিছুর মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর বিশ্বাস রেখে নারী ও পুরুষ উভয়ে সম্পূরক হিসেবে কাজ করে যেতে পারে। সমাজের ভারসাম্যতা রক্ষার জন্য এই মূল্যবোধকে সদা উর্ধে রেখে পথ চলার, বিশেষ করে, আজকের দিনে প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

বোরখা না পরার বিড়ম্বনা

গত শতাব্দীর ষাট দশকের শেষের দিকে। আমি সমাজকল্যাণ বিভাগের চট্টগ্রাম বিভাগীয় অফিসার। তখন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন দেয়াও আমাদের একটা কাজ ছিল। সমিতিগুলো পরিদর্শন করে যারা সমাজকল্যাণ বিভাগের আরোপিত নিয়মকানুন মেনে চলে শুধু তাদেরকে আমরা রেজিস্ট্রেশন দিতে পারতাম। মাদার্সার একটি সমিতি রেজিস্ট্রেশনের জন্য দরখাস্ত করেছিল। আমি তা পরিদর্শন করার জন্য তারিখও ঠিক করলাম। তখন বর্ষাকাল। যাওয়ার দিন ভোর থেকে ভীষণ বৃষ্টি। এরকম দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া দেখে আমার স্বামী এবং বাসার সকলে আমাকে সেদিন যেতে নিষেধ করলো। ইতোমধ্যে মাদার্সা সমিতির সেক্রেটারি আবু তাহের এসে গেছেন আমাকে নেয়ার জন্য। অগত্যা রওনা হলাম গাড়ি করে। বড় বড় বৃষ্টির ফোটা অঝোরে আকাশ বেয়ে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল সারা পৃথিবী ভেসে যাবে। কাপ্তাই যাওয়ার পথ ধরে আমরা চলছিলাম। গাড়ি যখন হালদা ব্রিজে এসে পৌঁছল, তখন আবু তাহের বললেন, এখানে নৌকায় উঠতে হবে। মাইল দু'য়েক নৌকাপথে যাওয়ার পর পালকি করে আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে পারবো। এই বৃষ্টির মধ্যে নদী পথে নৌকা চড়ে যেতে হবে জেনে ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল। কিন্তু আমি নিরুপায়, যেতেই হবে। নৌকায় উঠলাম। কীভাবে দু'মাইল পথ অতিক্রম করলাম জানি না। ক্রমে বৃষ্টিও কমে এলো। এবার পালকির পালা। আবু তাহেরকে একবার অনুরোধ করলাম পায়ে হেঁটে যেতে পারি কিনা। তিনি বললেন, আপনি যদি পায়ে হেঁটে বোরখা না পরে আমাদের সমিতিতে যান, তাহলে এই সমিতির কাজ বন্ধ করে দিতে হবে। আমাদের আর কেউ সহযোগিতা করতে চাইবেনা।

মনে মনে ভাবলাম এত প্রতিকূল অবস্থার মাঝেও মাদার্সা সমিতি কাজ করে যাচ্ছে। সেখানকার লোক যতই রক্ষণশীল হোকনা কেন, তাদেরকে আমার বিশেষভাবে সাহায্য করা দরকার। পালকি চড়ে গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হলাম। সেখানে সকল সদস্যই পুরুষ। তাদের মাঝে আমাকে বেমানানই লাগছিল। জানতে চাইলাম মাদার্সা সমিতিতে কোন নারী সদস্য আছে কিনা। উত্তরে শুনলাম, দু'চার জন আছে কিন্তু তারা সমিতিতে আসতে

Pioneer in village based website

পারেনা; কারণ এখানে সকলেই পুরুষ। বুঝতে বাকি রইলোনা নামেমাত্র তাদেরকে সদস্য করা হয়েছে। সেখানে তাদের কোন ভূমিকা নেই। সমিতির কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করার তাদের কোন সুযোগ নেই। এই সমিতি কি করে, তার উদ্দেশ্য কি, কি কি কর্মসূচি হাতে নিয়েছে— এসব ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমাদের পরিদর্শন শেষে আমি দুই একজন নারী সদস্যের সাথে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। আবু তাহের এবং অন্য সদস্যরা তাতে কোন উৎসাহ দেখালেন না। বললেন, এই সমিতি আমাদের সুবিধামত পরিচালনা করা হয়। নারী সদস্যদের সমিতিতে আনলে, এখানকার লোকেরা পছন্দ করবে না। তবুও আমার অনুরোধ রক্ষা করার জন্য আমাকে একটি বাড়ির ভেতরে নিয়ে একজন নারী সদস্যের সাথে পরিচয় করে দিলেন। তিনি আমাকে দেখে মাথার ঘোম্‌টা সামনে টেনে তার চেহারাটা প্রায় ঢেকে ফেললেন। আমি তার কুশলাদি চাটগাঁয়ের ভাষায় জিগ্যেস করাতে আমাকে তার দেশেরই একজন ভেবে তিনি কিছুটা স্বস্তি পেলেন। আমার পাশে এসে বসলেন। তার কাছে সমিতির কথা জানতে চাইলাম। তিনি সম্মুখের রুমে পুরুষ সদস্যদের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এসব তাদেরই কাজ।

ওই সময়ে গ্রামাঞ্চলে নারী পুরুষের সম্মিলিত সমিতিগুলোর বোধ করি এই অবস্থাই ছিল। বিশেষ করে চট্টগ্রামের মতো রক্ষণশীল জায়গায়। শহরাঞ্চলে নারী নেতৃত্বে কিছু কিছু মহিলা সমিতিও যে গড়ে ওঠেনি তা নয়। কিন্তু তা প্রধানত পুরুষদের নির্দেশিত পথে চলতো।

ঢাকায় আসার পর একবার ময়মনসিংহের সুদূর গ্রামাঞ্চলেও এরূপ একটি সমিতি দেখতে গিয়েছিলাম। সে পথ আরো দুর্গম ছিল। সেখানে গাড়ি করে যাওয়ার কোন রাস্তা ছিল না। গাধার পিঠে চড়ে প্রায় দু'মাইলের মতো রাস্তা পাড়ি দিয়ে সেই সমিতিতে পৌঁছেছিলাম। সেই যাত্রাও খুব সুখের ছিল না। কিন্তু আমার জন্য ছিল সে এক বিরাট অভিজ্ঞতা।

গত পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে এদেশে অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও গড়ে উঠেছে। তাতে নারী সদস্যের সংখ্যাও নেহাৎ নগণ্য নয়। তারা আর আগের মতো নিশ্চুপ অবস্থানে থাকে না। আজ তারা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ক্রমশ সোচ্চার হয়ে উঠছে। বর্তমানে কেবলমাত্র নারীদের দ্বারা পরিচালিত কয়েক হাজার সমিতি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সাথে নিবন্ধীকৃত। আজ আমাদের মতো নৌকা করে, পালকি করে বা গাধার পিঠে চড়ে সমাজসেবা বিভাগের অফিসারদের দুর্গম পথে ভ্রমণ করতে হয় না। রাস্তাঘাটের অনেক উন্নতি হয়েছে। গাড়িতে করে বাংলাদেশের যেকোন জায়গায় যাওয়া যায়। এই উন্নয়ন আমাদের মনে আশার সঞ্চার করে বৈকি!

অভুক্ত শিশুর স্নেহশীল পিতা

আমি তখন সমাজকল্যাণে চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা। একদিন জামালখান অফিসে বসে কাজ করছি, এমন সময় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের এক কর্মী এসে আমাকে অভিযোগ করে জানালেন—এই অফিস থেকে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন ফরম

বিক্রি করা হয়। এই কথা আগে কোনদিন শুনিনি। হতবাক হয়ে তাকে বললাম, আমি এ ব্যাপারে তদন্ত করে দেখবো এবং প্রয়োজনবোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। সমাজকল্যাণ অফিসে এইভাবে দুর্নীতি হতে পারে তা প্রথমে বিশ্বাস হলো না। যেহেতু একটা অভিযোগ এসেছে তার একটা সুরাহা হওয়া দরকার ইত্যাদি ভেবে নানা কৌশলে এই রহস্য উদঘাটন করতে চেষ্টা করলাম। স্টাফ মেম্বারদের সাথে একে একে ব্যক্তিগতভাবে কথা বললাম। সপ্তাহখানেক পর পরোক্ষভাবে জানতে পারলাম আমার পি.এ কয়েকটা ফরম বিক্রি করেছে যা নিয়ম-বহির্ভূত। আমার এই পি.এ খুবই সুদক্ষ এবং বুদ্ধিমান। তার সততার প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস। তার ওপর আমি অনেকখানি নির্ভরশীলও ছিলাম। সে যে এই সামান্য অর্থের বিনিময়ে আমার নির্ভরতায় ফাটল ধরাতে পারে এটা বিশ্বাস করতে আমার খুব কষ্ট হলো। অনেক চিন্তা ভাবনা করে তার সাথে কথা বলবো স্থির করলাম। মনে মনে প্রস্তুত হলাম কীভাবে তাকে প্রশ্ন করবো; কী বললে তাকে সত্যি কথা বলানো সম্ভব হবে ইত্যাদি। অবশেষে একদিন তার সাথে কথা বলতে গিয়ে এক করুণ কাহিনী উদ্ঘাটিত হয়। তার দু'চোখ অশ্রুসিক্ত। ক্রন্দনরত গলায় সে জবাব দিলো— সেদিন অফিসে আসার সময় আমার স্ত্রী জানালো বাচ্চার দুধ নেই। বিকেলে যেন আমি অবশ্যই একটিন দুধ নিয়ে আসি। মাসের শেষ। পকেটে পয়সা নেই। যা বেতন পাই তা দিয়ে সংসার চালানো কঠিন। বিকেলে দুধ নিয়ে না গেলে বাচ্চা অভুক্ত থাকবে। এই কথা বলতে বলতে আর কান্না চেপে রাখতে পারলোনা। কিছুক্ষণ পর আবার বলতে শুরু করলো— ঠিক এই সময় কয়েকজন লোক এসেছে রেজিস্ট্রেশন ফরম নিতে। অভুক্ত বাচ্চার মুখটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। আর কিছু চিন্তা না করে আমি চারটা ফরম বিক্রি করে বাচ্চার জন্য দুধ কিনে বাসায় ফিরলাম। কথা শেষে ক্ষমা প্রার্থনা করে সে বললো, এ কাজটি আমি ইচ্ছার বিরুদ্ধে করেছি এক অভুক্ত শিশুর স্নেহশীল পিতা হিসেবে। এজন্য যা শাস্তি প্রাপ্য তা আমি বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করবো।

আমার মনটা এক করুণ বিষণ্নতায় ভরে গেল। কীভাবে তাকে সাহায্য করা যায়। আবার একজন কর্মকর্তা হিসেবে এর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিলে অফিসের শৃঙ্খলা বজিয়ে রাখা সম্ভব হবেনা। এই দ্বন্দ্বেও ভুগতে লাগলাম। অবশেষে তাকে আমার পি.এর পদ থেকে বদলি করে একই অফিসে অন্য পদে রাখার ব্যবস্থা হলো। তার আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রত্যক্ষভাবে কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই কীভাবে তাকে সাহায্য করা যায় ভাবতে লাগলাম। অবশেষে জুন মাসের শেষে অফিস স্টেশনারি কেনার ব্যাপারে ঐ পি.এ এর এক আত্মীয়কে সাহায্য করেছিলাম, যাতে সে (পি.এ) কিছুটা উপকৃত হয়। কিন্তু এই ধরণের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে কি এইরূপ জটিল সমস্যা সমাধান করা সম্ভব ? এই পৃষ্ঠপোষকতাও কি এক ধরণের দুর্নীতি নয়? আমি একটি অভুক্ত শিশুর করুণ মুখের কথা ভেবে এই গোলক ধাঁ ধাঁ থেকে বের হয়ে আসতে পারিনি সেদিন, যদিও মনে মনে এর জন্য বিবেকের দংশনে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছি।

এই দ্বন্দ্ব অনুন্নত দেশে একটি মৌলিক ইস্যু। এর অবসানের কথা চিন্তা করে একটি ভারসাম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থা দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গড়ে উঠবে বলে আশা করেছিলাম। কিন্তু এই লক্ষ্যে এ পর্যন্ত কোন সরকার উদ্যোগ নেয়নি। আমাদের ক্ষমতা

এবং চাহিদার মধ্যে ব্যবধানের ফলে সমাজে এবং প্রশাসন যন্ত্রে রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে দূর্নীতি ঢুকে পড়েছে তার থেকে কি আমরা মুক্ত হতে পারবো কোনদিন? আমরা প্রায়ই সুশীল সমাজের কথা বলি। শিক্ষা থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন স্তর বিন্যাসে যদি আমরা একটি ইতিবাচক সমাজ ব্যবস্থা পত্তন করতে না পারি তাহলে শুধু বক্তৃতা ও বিবৃতি দিয়ে কি সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব?

সরকারি সনাতনী নিয়ম

সরকারি চাকরিরত অবস্থায় প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কনফারেন্স ইত্যাদিতে যোগ দেয়ার জন্য অনেকবার বিদেশে গিয়েছি। সেখানে যা শিখেছি, যা সুন্দর এবং উন্নত সমাজ তৈরি করার সহায়ক বলে ভেবেছি তা সব সময় কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারিনি। আশা নিয়ে ফিরেছি কাজে লাগাবো বলে। কিন্তু বাধাগ্রস্থ হয়ে অনেক সময় হতাশ হয়েছি।

ওয়েলিংটনে পড়ার সময় কয়েকটা চিলড্রেন হোম দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। স্বদেশে ফিরে কি করে এর রেপ্লিকেশন করা যায় সেজন্য আমি একটা সুদীর্ঘ প্রস্তাবনা এবং একটি মডিউল তৈরি করেছিলাম। আমাদের দেশে এতিমখানায় অনাথ শিশুদের চূড়ান্ত দূরবস্থার কথা ভেবে এই মডিউলটি রচিত হয়েছিল। মাতৃ-পিতৃহীন এই শিশুরা যেন স্নেহের উষ্ণতায় বড় হয়। করুণার পাত্র হিসেবে যেন গড়ে না ওঠে। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ যেন ব্যাহত না হয়। হীনমণ্যতায় ভুগে তারা যেন সঙ্কুচিত হয়ে না পড়ে। তাদের যেন স্বাভাবিক সামাজিকরণ হয়। তারা যেন মর্য্যাদাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসতে পারে। এইসব উদ্দেশ্যকে ধারণ করে এই সুদীর্ঘ প্রস্তাবনাটি তৈরি করেছিলাম।

দেশে ফিরে এসেই পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ঘোর প্যাঁচের জন্য আমার সিনিয়রিটি খর্ব করে আমাকে বদলি করে দেয়া হলো চিকিৎসা সমাজকল্যাণ অফিসার হিসেবে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে, যার সঙ্গে আমার বিদেশে প্রশিক্ষণের কোন সম্পর্ক ছিল না। আমি দারুণ হতাশায় নিপতিত হলাম। বিদেশে অবস্থানরত বাঙালি মাত্রই স্বদেশ ভাবনায় তাড়িত হয়। স্বদেশপ্রেমে আলোড়িত হয়। বিদেশের মতো উন্নত দেশ গড়ার স্বপ্নে উদ্দীপ্ত হয়। দেশে এসে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আবার সেই স্বপ্ন খান খান হয়ে ভেঙে পড়ে। এ এক ধরনের গোলকধাঁধাঁ। এ থেকে শত চেষ্টা করেও আমি বের হয়ে আসতে পারিনি। আমাদের দেশে সরকারি কর্মকর্তারা প্রায়ই এই অবস্থার শিকার হয়। বিদেশের প্রশিক্ষণ কাজে লাগাতে পারে না। এক বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেয়, কাজ করতে হয় অন্য ক্ষেত্রে।

চার বছর পর আবার চট্টগ্রাম ডিভিশনের এসিটেন্ট ডাইরেক্টর হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেলাম। তখন বিভাগীয় ডেপুটি ডাইরেক্টরের পোস্ট হয়নি। চট্টগ্রাম বিভাগে তথাকথিত এতিমখানা এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের জন্য যে সেন্টার ছিল সেগুলোর ব্যাপক সংস্কার করার লক্ষ্যে আমাদের ডিপার্টমেন্টে লেখালেখি শুরু করলাম। ভাগ্য ভালো যে ওয়েলিংটনে থাকতে এই সংক্রান্ত কাগজগুলো তৈরি করেছিলাম। নতুবা

চার বছরের মধ্যে হয়তো মূল কথাগুলোই ভুলে যেতাম। এই কাগজগুলো ব্যবহার করে সরকারের গ্রহণযোগ্য হওয়ার মতো প্রস্তাব তৈরি করলাম। সেটা আমাদের তদানীন্তন ডাইরেক্টরের কাছে অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছিল। কিন্তু তিনি বিশেষভাবে চেষ্টা করেও অনাথ শিশুদের জন্য এতিমখানার পরিবর্তে আনন্দদায়ক পরিবেশ সন্নিবেশিত শিশুনিবাস তৈরি করার লক্ষ্যে আমার প্রস্তাবটি মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন করাতে পারেননি।

প্রায় আড়াই বছর ধরে আমি এর পেছনে লেগেছিলাম। এর জন্য লেখালেখি করতে গিয়ে বিরাট ফাইল তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু এতিমখানার কোন পরিবর্তন করতে পারলাম না। এই স্বপ্নভঙের কাহিনী আমার একার নয়। যারা মনপ্রাণ ঢেলে দেশকে গড়তে চায়, অর্জিত বিদ্যা, অভিজ্ঞতা এবং উন্নত প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে একটি সুষম-সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, এই স্বপ্নভঙ্গ তাদের সকলেরই। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এতিমখানার নাম পরিবর্তন করে শিশুসদন রাখা হয়। সামান্য কিছু পরিবর্তন হলেও সরকারি নিয়ম-কানুনের ঠেলায় মৌলিক কোন সংস্কার করা সম্ভব হয়নি। অনাথ শিশুদের অবস্থা যেমন ছিল প্রায় তেমনই রয়ে গেছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে। একবার নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ শিশুসদনের তত্ত্বাবধায়ক লিখিতভাবে জানালেন, ঐ কেন্দ্রের জন্য কেনা চল্লিশ মণ লাকড়ি বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে এবং পাঁচ মণ আলু ইঁদুরে খেয়ে ফেলেছে। প্রয়োজনের তাগিদে তিনি জিনিসগুলো আবার কিনে আমার কাছে চার হাজার টাকা ব্যয় সংবলিত একটি বিল পাঠিয়েছেন আর্থিক অনুমোদনের জন্য। ব্যাপারটি আমার কাছে কিছুটা রহস্যজনক মনে হওয়ায় অতর্কিতে আমি একদিন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। দেখলাম, লাকড়ি রাখার গুদামঘর অক্ষত অবস্থায় আছে। সেখান থেকে বন্যায় লাকড়ি ভেসে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এছাড়া পার্শ্ববর্তী লোকজনের কাছে সাক্ষ্য গ্রহণ করে জানতে পারলাম বন্যার পানি এই গুদাম ঘরের ভিটে মাটি পর্যন্ত ওঠেনি। পাঁচ মণ আলু ইঁদুরে খাওয়ারও কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ পেলাম না। বরঞ্চ এর বিপরীত তথ্য পেলাম যে এত পরিমান আলু কখনো একসঙ্গে কেনা হয়নি। ইঁদুরের উৎপাতও এমন উদ্বেগজনক নয় যে এতগুলো আলু নিঃশেষে খেয়ে ফেলতে পারে। এই ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক নিজেও কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করতে পারলেন না। চার হাজার টাকার বিলও মিথ্যা বলে প্রমাণিত হলো।

এই তদন্তের ভিত্তিতে আমি তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার জন্য আমাদের হেড অফিস ঢাকায় সুপারিশ করে পাঠালাম। দেখা গেল সাময়িকভাবে তিন মাসের জন্য সাসপেন্ড করা হলেও তাকে শেষ পর্যন্ত চাকরিচ্যুত করা গেল না। ছোট ছোট অনাথ শিশুদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়ার মতো অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিকেও শাস্তি দেয়া গেল না। তিনি আবার চাকরিতে পুনর্বহাল হলেন। কারণ সরকারি সনাতনী মধ্যযুগীয় নিয়ম-কানুন। এ নিয়ম-কানুন তৈরি করা হয়েছে বহু ফাঁকফোঁকর রেখে। এর মধ্য দিয়ে প্রকৃত অপরাধী বের হয়ে যায়। আর অনেক সময় নিরাপরাধ ব্যক্তিরা শাস্তি ভোগ করে। এজন্য সরকারি চাকরিতে একবার ঢুকলে সহজে কারো চাকরি যায় না।

কতগুলো অকেজো এবং সময়-অনুপযোগী নিয়ম-নিষেধ আমাদের প্রশাসনে ব্যক্তি উদ্যোগ ও ব্যক্তি সিদ্ধান্তের স্বাধীনতাকে খর্ব করে। এই নিয়মের কারণে বিবেকের শাসনকে অস্বীকার করা হয়। অনেক সময় নিয়মের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে জনস্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্ত নিতে হয়, যা কর্মকর্তাদের উদ্যোগকে নিষ্ক্রিয় করে তোলে। এইভাবে সাধারণত সরকারি কর্মকর্তারা এই সব উদ্যোগ ও পরিশ্রমকে পন্ডশ্রম মনে করে প্রায় সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। গতানুগতিক প্রক্রিয়ায় শাসনকার্য পরিচালনা করে। নতুন কোন উদ্যোগ এবং উদ্ভাবনে উৎসাহ পায় না।

এখনও (২০০০ সাল) যখন কাজ উপলক্ষে বিভিন্ন সরকারি অফিসে যাই মনে হয় অবস্থা উন্নতির বদলে আরো অবনতির দিকে যাচ্ছে। কোন এক সরকারি অফিসে কনসালটেন্সি করতে গিয়ে দেখেছি উপরিস্থ কর্মকর্তারা অধীনস্থ কর্মচারীদের কিভাবে ভয় করে চলে। আনুগত্য এবং নিয়ম শৃঙ্খলা ক্রমশ ভেঙে পড়ছে। একদিন দেখলাম এক কর্মকর্তা তার পিয়নকে দশ হাজার টাকার চেক দিয়ে ব্যাংক থেকে টাকা আনতে পাঠিয়েছেন। অনেকক্ষণ পরে ফিরে এসে সে জানালো, আসার পথে তার পেন্টের ছেঁড়া পকেট থেকে টাকাটা কোথায়ও পড়ে গেছে। চুরিও না, পকেট মারও না। এই কথা শুনে কর্মকর্তা পিয়নের সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদে প্রবৃত্ত হলেন। পিয়ন ঔদ্ধত্যপূর্ণভাবে বললো, ছেঁড়া পকেট থেকে টাকা পড়ে গেছে, এতে আমার কোন দোষ নেই। এইভাবে সে নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে গেলো। অনুসন্ধান করে দেখা গেলো তার পেন্টের কোন পকেট আদৌ ছেঁড়া ছিল না।

দায়িত্বহীনতার জন্য সে মোটেই লজ্জিত কিম্বা অনুতপ্ত নয়। অপরাধ অস্বীকার করার মধ্যেও যে একটা বিনম্রভাব থাকা প্রয়োজন, সেটাও তার মাঝে ছিল না। বরং তার এই অশোভন ব্যবহারের জন্য কর্মকর্তাকেও এক সময় চুপ করে যেতে হলো। একজন পিয়নের মর্যাদা কোন অংশে একজন কর্মকর্তার চেয়ে কম নয়। উভয়ে সমান মানবিক মর্যাদার অধিকারী। আমি এখানে ঘটনাটি এনেছি পেশাগত শৃঙ্খলার অবক্ষয়ে শঙ্কিত হয়ে। এই ঘটনাকে একটি ব্যতিক্রম ভাবতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মস্থলে গিয়ে দেখেছি এটা ব্যতিক্রম নয়। আনুগত্যহীনতা সকল স্তরে সংক্রামক হয়ে উঠছে। পেশাগত শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে না পারলে আমাদের ভবিষ্যতের চিত্র ক্রমশ ম্লান হয়ে যাবে।

Chunati.com
Chunati knowledge based website

মহৎজনের সান্নিধ্যে

সুফিয়া কামাল : মামানিকে যেমন দেখেছি

আমার মায়ের ছোটভাই কামালউদ্দীন খান। আমার মা এই মামার চাইতে বেশ কয়েক বছরের বড়। ভাই-বোনের সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। মামা কলকাতা থেকে নিয়মিত বই পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ভারতবর্ষ, প্রবাসী, মোহাম্মদী, বসুমতি, বুলবুল, সওগাত ইত্যাদি মায়ের কাছে পাঠাতেন এবং চিঠি লিখতেন। মা সবসময় মামার চিঠির অপেক্ষায় থাকতেন। নানা বিষয়ে বিশেষ করে সাহিত্য এবং সংস্কৃতি সম্পর্কিত সংবাদ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এবং আরো বহু কবি-সাহিত্যিক ছিলেন চিঠির প্রতিপাদ্য।

একদিন খবর এলো মামা বিয়ে করেছেন। পাত্রী উচ্চ বংশজাত, বিধবা এবং একজন কবিও। স্বামী যক্ষাক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। শোকে এবং দীর্ঘদিন স্বামী সেবায় নিয়োজিত থেকে মানসিকভাবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও হাবিবুল্লাহ বাহারের দৌত্যে তাঁর সাথে মামার বিবাহ সম্পন্ন হয়। পরিবারের সকলে উদারচিত্তে এই বিয়েতে সমর্থন জানালেন। আমার মা সমর্থনসূচক শুভেচ্ছা জানিয়ে আদরের ছোটভাইকে নববধুসহ দেশে আসবার আমন্ত্রণ জানান। নবপরিণীতা মামানি সুফিয়া কামালকে নিয়ে মামা কামালউদ্দীন খান নিজ বাড়ি চুনতী গ্রামে আসলেন। মা'র মুখে শুনেছি মামানি আমার নানার বাড়ির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেই একমুঠো মাটি কপাল ঠেকিয়ে বলেছিলেন— এ মাটি আমার তীর্থভূমি। এ পরিবারের সাথে আমার সম্পর্ক যাতে চিরদিন সুমধুর থাকে, এই প্রার্থনা করি।

ছোটবেলা থেকে মামা ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। কিন্তু স্নাতোকোত্তর পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল করতে না পারায় কেরিয়ার নির্মাণের দিকে তিনি অমনোযোগী হয়ে পড়েন এবং গভীরভাবে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। এই সময় তিনি কলকাতায় হাবিবুল্লাহ বাহার ও সামসুন্নাহার মাহমুদ সম্পাদিত 'বুলবুল' পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মামা বিভিন্ন সময় প্রচুর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করেন। মহাকবি ইকবালের ডক্টরেল থিসিস Development of Metaphysics in Persia মামা অনুবাদ করেছিলেন। এটা গ্রন্থাগারে 'প্রজ্ঞান চর্চায় ইরান' নামে প্রকাশিত হয়। এছাড়া Reconstruction of Religious Thoughts in Islam গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ এবং সম্পাদনায় অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও জড়িত ছিলেন। 'কথায় কথায়' নামে তাঁর একটি বইও প্রকাশিত হয়। মামা যদিও পদার্থ বিজ্ঞানে এম.এস.সি পাস এবং পেশায় একাউনটেন্ট, আসলে তিনি ছিলেন

একজন মননশীল লেখক এবং দার্শনিক। তিনি প্রচারবিমুখ ছিলেন। এজন্য কখনো তাঁর লেখার যথার্থ মূল্যায়ন করা হয়নি। মামা এবং মামানি উভয়ের জন্ম অভিজাত পরিবারে। উভয়েই ছিলেন মার্জিত রুচির অধিকারী। প্রগতিশীল ও সমাজ পরিবর্তন প্রয়াসী মুক্তবুদ্ধির সাধক।

অপরের কাছ থেকে শিক্ষণীয় বিষয় গ্রহণ করতে মামানির অন্তর ছিল সবসময় মুক্ত। তিনি সারা জীবন এই মুক্তবুদ্ধির চর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন। তাঁর কাব্যচর্চায় সর্বদা তাঁকে সহায়তা করতেন আরেক উন্নত মানের ব্যক্তিত্ব; তাঁর স্বামী, মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। তিনি চট্টগ্রামে চুনতী গ্রামের ডেপুটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ খান বাহাদুর নাসিরউদ্দীন খান ছিলেন প্রদেশখ্যাত একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। এই পরিবারে ফার্সি ও উর্দু সাহিত্যের পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যেরও চর্চা হতো। এদের কয়েকজন খ্যাতনামা কবি গজল লেখক হিসেবে ভারতব্যাপী খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। বনেদী আচরণের জন্য এবং উন্নতমানের সংস্কৃতি চর্চার জন্য ডেপুটি পরিবারের সুনাম বিস্তৃততর ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। এমনি পরিবেশে কামাল মামার রুচি এবং চরিত্র গঠিত হয়। সুফিয়া কামালের কর্মজীবনের ভিত রচনায় তিনি সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। এই কথা বোধ করি অনেকেই জানেন না। তাই এই প্রসঙ্গে মামার ব্যাপারে কিছুটা আলোকপাত করেছি। প্রচারবিমুখ এই মানুষটি চিরকাল নেপথ্যে থেকে মামানিকে উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছেন। তিনি খুব ধীরস্থির প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কম কথা বলতেন। মৃত্যুর আগে বলেছিলেন, আমার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থার দরকার নেই, সাধারণ লোকের মতো সাধারণভাবে আমাকে কবর দিও। চিরকাল অজ্ঞাত এবং নেপথ্যে রয়ে গেলেন তিনি। সুফিয়া কামালের জীবনী রচনায় এই মনিষীকেও যথাযথ স্থান দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি।

১৯৬০ সালে আমি যখন সমাজকল্যাণ বিভাগে সরকারি চাকরিতে যোগদান করি, তখন প্রশিক্ষণের জন্য একমাস টিকাটুলীর তারাবাগে মামানির বাসায় ছিলাম। লুলু-টুলু তখন ছোট। স্কুল থেকে এসে বড়ই গাছের ছায়ায় এক্কা-দোক্কা খেলতো। আমি ঘরের দাওয়ায় বসে তাদের খেলা দেখতাম আর আমার মেয়ে মুন্নির কথা ভাবতাম। চট্টগ্রামে সে স্কুল থেকে ফিরে কিভাবে সময় কাটাচ্ছে ইত্যাদি মনের মাঝে তোলপাড় করতো। শামীম তখন গভীর সমুদ্রের মাছ ধরার কাজ নিয়ে খুলনায়। শোয়েব সবে ম্যাট্রিক পাস করে তেজগাঁ টেক্সটাইল টেকনোলজি ইনষ্টিটিউটে ভর্তি হয়েছে। সাব্বির নওয়াবপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে বোধকরি দশম শ্রেনীতে পাঠরত। ছুটির দিনে আমরা মামানির চারপাশে বসে দারুণ আড্ডা জমাতাম। সেদিনের সেই আন্তরিক সম্পর্ক আমাদের মাঝে এখনো অটুট রয়েছে। মামাতো ভাইবোন হলেও তারা আমার আপন ভাইবোনের মতো প্রিয়। এখনো আমরা সুযোগ পেলে পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণ করি। সেদিনের সেই ছোট্ট লুলু, সুলতানা কামাল, আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। দেশে-বিদেশে নারী আন্দোলনে এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সে অত্যন্ত সক্রিয়। পেশায় এডভোকেট হলেও তার বিচরণের ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত। বর্তমানে সে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের একজেকিউটিভ ডাইরেক্টর। তাকে একদিন সস্নেহে বলেছিলাম, লুলু, তুই মামানির নাম

রাখবি। টুলু, সাঈদাকামাল, পেশায় আর্টিস্ট। মনের আনন্দে আঁকে। ইউরোপ, আমেরিকা এবং ভারতে বিভিন্ন প্রদর্শনীতে সে অংশ গ্রহণ করেছে। শামীম, শাহেদ কামাল, একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক। তার প্রতিভা বহুমূখী। আমার এই ভাইটি খুব এডভ্যান্চার প্রিয়। একবার অল্পবয়সে সাইকেলে করে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেছিল। শোয়েব নিজেকে বিকশিত করার আগে পৃথিবী থেকে ঝরে পড়ে। তাকে হারিয়ে মামানি গভীরভাবে শোকাভিভূত হয়েছিলেন। সাব্বির, সাজেদ কামাল, বস্টনে স্থায়ীভাবে বাস করে। এডুকেশনাল সাইকলজিতে ডক্টরেট করেছে। ও একজন সৌরশক্তি বিশেষজ্ঞও। মামানিকে আমি রত্নগর্ভা বলি।

মামানি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহময়ী। বিকেলে অফিস থেকে ফিরলেই আমাকে নিজে বসে সস্নেহে নাশতা খাওয়াতেন। রাত বারোটার আগে তাঁকে কখনো ঘুমোতে দেখিনি। সারাদিনের সব কাজ সম্পন্ন করে মোটা বইয়ের মতো বাঁধানো বিরাট চ্যাপ্টা একটা খাতা নিয়ে কবিতা লিখতে বসতেন। প্রতি রাতেই প্রায় এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে দেখেছি। এত রাতে না ঘুমিয়ে লেখেন কেন জানতে চাইলে হাসিমুখে বলতেন, সংসারের সব কাজ শেষ না করে লেখায় মন বসে না। এমনি একদিন দেখি রাত প্রায় দেড়টা বাজে। ঘুম থেকে হুড়মুড় করে ওঠে পাশের ঘরে গেলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। দেখলাম শহীদ সাবেরের ভীষণ জ্বর। প্রায় অজ্ঞানের মতো হয়ে প্রলাপ বক্‌ছেন। মামানি বদনা দিয়ে মাথায় পানি ঢালতে শুরু করলেন এবং আমাকে একটা তোয়ালে আনতে বললেন। অনেকক্ষণ পর তিনি যখন একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে ওঠেন, তখন মামানি ঘুমোতে গেলেন। এমন স্নেহময়ী জননীর পক্ষেই কেবল সম্ভব এভাবে একটি মানসিক ভারসাম্যহীন অপ্রকৃতিস্থ মানুষকে আশ্রয় দেয়া এবং দিনের পর দিন তার পরিচর্যা করা। শহীদ সাবের মামানির বাসায় বহুদিন ছিলেন যখন তাঁর কোথায়ও ঠাঁই ছিল না।

জীবদ্দশায় কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিলেন সুফিয়া কামাল। স্বভাবসুলভ মাধুর্য, নির্মল রুচিবোধ এবং দরিদ্রের প্রতি সহমর্মিতা ও দুর্বলের পক্ষাবলম্বন ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষ গুণ। তিনি তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তাকে রুচিহীন বক্তব্যের মাধ্যমে কোনদিন নিম্নগামী করেন নি। ফলে যারা তাঁর আদর্শ ও কর্ম তৎপরতার বিরোধিতা করতেন তারাও তাঁর ব্যবহার ও আচরণে মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। বহু কঠিন সত্য এত সরল ও সহজ ভাষায় ব্যক্ত করে এমন কমনীয়তার সঙ্গে উপস্থাপন করতে খুব কম লোককে দেখা যায়। নিজে যা বুঝতেন না, যে বিষয় তাঁর কাছে স্বচ্ছ ছিল না, তা নিয়ে তিনি কথা বলতে পছন্দ করতেন না। একদিন বিকেলে তাঁর বাসায় বেড়াতে গিয়েছি। দেখলাম, তাঁর কাছে একটি লিখিত বিবৃতিতে সই নেয়ার জন্য একজন বুদ্ধিজীবী উপস্থিত। বলা বাহুল্য, তাঁর অসুস্থতার কথা মনে রেখে এটা করা হয়েছিল। তিনি অত্যন্ত বিনীত স্বরে বলেছিলেন, আমি সাধারণের বোধগম্য ভাষায় কথা বলতে ভালোবাসি। তার ভাষা হতে হবে আমার নিজের। তিনি অনতিবিলম্বে কাগজকলম নিয়ে নিজের মনের মতো করে উক্ত বিবৃতি লিখে ফেললেন এবং তাতে সই করলেন।

১৯৫১ সালের কথা। তিনি চট্টগ্রামে এসেছিলেন হরিখোলার মাঠে পূর্ব পাকিস্তান সংস্কৃতি সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হয়ে। অভিভাষণে বলেছিলেন, আমি উচ্চ শিক্ষিতা নই, তাই আমার রচনায় বুদ্ধির চাকচিক্য ও পান্ডিত্যের দুরূহতা না দেখে আমার উচ্চ শিক্ষিত পাঠকেরা হয়ত হতাশাগ্রস্থ হয়েছেন। তবুও আমি আমার সীমা ছাড়িয়ে যাইনি, অনধিকার চর্চা করিনি কোনদিন। জীবনকে যে ভালোবাসতে পারে, মানুষকে যে ভালোবাসে একমাত্র সেই ফুল ফুটাতে পারে, যে ফুলের পারিভাষিক নাম হচ্ছে সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও বহুবিধ সংস্কৃতি। এই ফুল ফোটাবার সাধনা আপনারা গ্রহণ করুন। এই পুষ্প বিকাশের সাধনা কঠিনের সাধনা।

১৯৫৭ সালে তিনি আবার চট্টগ্রামে আসেন জেলা ছাত্রী সংসদের সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে। আমি তখন চট্টগ্রাম জেলা ছাত্রী সংসদের সভানেত্রী। এই সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন– এই চট্টগ্রামের সঙ্গে আমার শুধু বৈবাহিক সম্পর্ক নয়, আমার আত্মারও যোগ রয়েছে। যে আত্মায় আমি প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের অন্তিম কণ্ঠস্বর শুনতে পাই, শুনতে পাই কল্পনা দত্তের বীরত্বপূর্ণ অগ্রযাত্রার পদধ্বনি। এখান থেকে আমি নারী মুক্তির সনদ ঘোষণা করতে চাই। তোমরা যাতে তাদের সার্থক উত্তরাধিকারী হতে পারো, তার জন্য লেখাপড়ার মাধ্যমে নিজেদের তৈরি কর।

প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগের যে ঘটনাগুলোর কথা উল্লেখ করলাম তাতে সুফিয়া কামালের বহুমাত্রিক জীবন ও চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। মূলত তিনি ছিলেন কবি। কিন্তু কেবল কাব্য সাধনার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। এই কাব্যচর্চার মধ্য দিয়ে তিনি জীবনে কমনীয়তার পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। এদেশের নারী সমাজ, যখন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছিল, অশিক্ষা, কুশিক্ষা এবং কুসংস্কারের অন্ধকারে যখন নিমজ্জিত, সেই অতি দুঃসময়ে তিনি নারী আন্দোলনের হাল ধরেছিলেন। ছোট ছোট আন্দোলন, অভিজ্ঞতা, অনুষ্ঠান, সভা এবং মিছিলের মাধ্যমে এই আন্দোলন ক্রমে এক বিশাল তরঙ্গে পরিণত হয়। এদেশের বহু দুর্যোগপূর্ণ সাংস্কৃতিক সংকটে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। যখনই বাঙালি জাতিসত্তার ওপর আক্রমণ এসেছে, তিনি রাজপথে অবস্থান নিয়েছেন। বিভিন্ন জেলা, মহকুমা, গ্রামে, গঞ্জে বৃদ্ধ বয়সেও ছুটে গিয়েছেন। শুধু নারী মুক্তির জন্য নয়, সমগ্র বাংলাদেশের মুক্তির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসামান্য। যেখানেই মানবতা হয়েছে অবহেলিত, সততা হয়েছে পদদলিত, সুন্দর হয়েছে নিষ্পেষিত, তিনি সেখানেই ছুটে গেছেন অকম্পিত আলোর দীপশিখা হয়ে।

মামানির বহুমুখী প্রতিভার বর্ণনা দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যা নিজে অনুভব করেছি এবং মন থেকে যা অনাবিলভাবে এসেছে তাই শুধু লিখতে চেষ্টা করেছি।

১৯৫২ সালের শেষের দিকে আমার বিয়ে হয়। এই উপলক্ষে তাঁকে চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়ার জন্য আব্বা ঢাকা এসেছিলেন। বিশেষ কোন কারণে মামানি বিয়েতে যোগ দিতে পারেননি। এই ব্যাপারে মাহবুব ও আমাকে দোওয়া করে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন তা নিচে তুলে দিলাম।

Pioneer in village based website

তারাবাগ, টিকাটুলি, ঢাকা
০৮-১০-১৯৫২

মাহবুব,

তোমার চিঠি পেলাম। দুলাভাইও (বুলবুরের আব্বা) এসেছিলেন, তবুও তোমাদের বিয়েতে আমার যাওয়া হলোনা। নাইবা হলো, আমার বুকভরা দোওয়া রইল। যে দোওয়া আমি আমার দুলুর (বড় মেয়ে) বিয়েতে করেছি, বুলবুলের বিয়েতেও সেই দোওয়া করি। আল্লাহ তোমাদের মিলনকে মধুময় করুন।

মাটি বড়বেশী শক্ত, অথচ মাটিতেই ফলে ফসল, ফল, ফুল; উর্বর করতে হয়, শক্তিতে, ধৈর্যে, মমতায়। রঙ্গীন আলো আছে, আছে অগ্নির উত্তাপও। তোমাদের পথে ক্লান্তি না আসে এই প্রার্থনা। দু-জনে দু'জনের কাছে আজকের মতোই সরল থাকবে, আশা করি সব সহজ হবে।

একটি সাম্রাজ্য হবে, একটি হৃদয়
যে জন করিয়া নিয়া জয়
প্রতিষ্ঠা যে করেছে আপন
তুচ্ছ নয় তাহার সাধন।
তার দিন, তার সন্ধ্যা, তার বিভাবরী
মাধুর্য যে দিতে পারে ভরি
তার তরে বিধাতা আপনি
অন্তরে ভরিয়া দেয় বাণী
সে বাণী দারুণ দুঃখে,
অসহ সুখের মাঝে কাঁপে
দুর্দিনে অনুক্ষণ যাপে।

Chhatati.com
Picture village based website

মামানির চিঠিটা প্রায় সময় দু'হাতে স্পর্শ করি আর তাঁর হাতের পরশ অনুভব করি। নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করি যখন ভাবি তাঁর সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে আমিও একজন হবার সুযোগ পেয়েছি।

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় : একটি সুখস্মৃতি

কণিকা বন্দোপাধ্যায় অর্থাৎ আমাদের মোহরদি চলে গেলেন পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়ে। টেলিভিশনের পর্দায় দূরদর্শনে যখন দেখলাম তার মরদেহ ফুলে ফুলে ভরা, যেন ফুলের আসনে শুয়ে তিনি স্বর্গ অভিমুখে যাত্রা করছেন। আমার স্বামী মাহবুব উল আলম চৌধুরী শোকে বিমর্ষ। অবিরাম ঝর্ণার মতো তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে। তিনিও একজন শিল্পী, কবি। তাই মোহরদির সাথে মাহবুবের হয়তো আত্মার সম্পর্ক ছিল। তার মুখে কথা নেই। কাগজ কলম নিয়ে লিখলো

মোহরদি
কেঁদে কেঁদে তোমাকে ফিরে পেতাম যদি

আমি চোখের জলের অঝোর ধারায়
ভাসিয়ে দিতাম নদী,
তুমি নেই বলে
কাঁদে পদ্মা কাঁদে গঙ্গা কাঁদে বঙ্গভূমি
জীবনের সুধাপাত্র ভরে দিয়ে
নিরুদ্দেশ তুমি।

তাঁর মৃত্যুতে আমি কেন এত বিমর্ষ হয়ে পড়লাম? আমি তো একজন সাধারণ মানুষ। কবিও নই, শিল্পীও নই। নিশ্চয় আমার মতো এমন অসংখ্য সাধারণ মানুষ, মোহরদির যারা সঙ্গীতানুরাগী, তারা সকলেই এখন শোকাচ্ছন্ন।

মনে পড়ছে ১৯৭২ সালের শেষের দিকে একটি বিশেষ দিনের কথা। মোহরদি স্বাধীন বাংলাদেশে বেড়াতে এসেছিলেন। ঢাকায় কয়েকদিন অবস্থানের পর চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন। আমরা তখন চট্টগ্রামে। মাহবুব মোহরদির আগমন উপলক্ষে আমাদের বাসায় একটি গানের আসরের আয়োজন করলো। আমাদের বসার ঘরটি ছিল বেশ বড় এবং বারান্দাও সুবিস্তৃত। এই দুটি মিলে প্রায় দেড়শতের মতো লোক বসতে পারতো। মোহরদিকে স্বাগত জানাবার জন্য আমাদের বারান্দা এবং বসার ঘরকে ফুল দিয়ে সাজানো হয়। চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু কষ্টে এই ফুল জোগাড় করা হয়েছিল। তখনও ফুল বিক্রির সংস্কৃতি আমাদের দেশে চালু হয়নি। এ ব্যাপারে আমদের বন্ধু জাহেদ হোসেন বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে সহায়তা করেছিলেন।

মোহরদি একটানা অনেকগুলো গান গাইলেন— আবার যদি ইচ্ছা কর..., আমি রূপে তোমায় ভুলাবো না..., বাজে করুণ সুরে..., সখী আঁধারে একেলা ঘরে..., ইত্যাদি। আমার কানে এখনো তার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর লেগে আছে। তাঁর সুরের মূর্ছনায় সকলে অভিভূত। গান শেষে যখন খাবার পরিবেশন করা হলো তখন তিনি বললেন, বাংলাদেশে এসে আমি এখানে সবচেয়ে ভালো গেয়েছি। এমন সুন্দর পুষ্পশোভিত পরিবেশে গাইতে আমার খুব ভালো লেগেছে। আসলে এটা তাঁর শিশুসুলভ চরিত্রের একটা দিক। ভালো লাগাকে তিনি শিশুর মতো করে প্রকাশ করতেন। তাঁর এমন অপূর্ব হাসিমাখা মুখ এবং চমৎকার বাচনভঙ্গি ভোলা যায় না। আমার জীবনের সুখ-স্মৃতিগুলোর মধ্যে এই দিনটি বিশেষ স্থান জুড়ে থাকবে।

মাহবুব তখন চট্টগ্রামে দৈনিক 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি। মোহরদির শুভাগমনকে স্বাগত জানিয়ে সে দৈনিক স্বাধীনতায় একটি দীর্ঘ উপ-সম্পাদকীয় লিখেছিলো। মোহরদি যখন আসলেন তখন তাঁকে সেদিনের স্বাধীনতা পত্রিকাটি উপহার দেয়া হলো। মনোযোগ দিয়ে পড়ে তিনি বললেন, আপনি যা লিখেছেন আমি কি সত্যিই তাই? আপনারা আমাকে খুবই ভালোবাসেন বলে এসব লিখেছেন। আবার নিষ্পাপ শিশুর মতো হেসে বললেন, নিজের প্রশংসা শুনতে আমার খুব ভালো লাগে। আসলে তাঁর বিনয়ী স্বভাবের জন্য এত অসামান্যভাবে আমাদের এই সামান্য উপহারটি গ্রহণ করলেন।

hunati.com
Pioneer in Village based Website

গায়ক অর্ঘ্য সেন দূরদর্শনে বলেছিলেন, মোহরদি সব ধরনের শিল্পীকে ভালো-বাসতেন, কখনো কারো নিন্দা করতে শুনিনি। এ প্রসঙ্গে আমার একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। আমার ছোট বোন জাহানারা ইসলাম একজন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী এবং মোহরদির একজন অনুরাগী। বাংলাদেশে এলে আমার বোন সবসময় তাঁর সাথে দেখা করতে যেত। একবার সে ফিরোজা রঙের পাথরের একজোড়া কানের দুল নিয়ে মোহরদির কাছে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে দেখে তিনি ঠিক সেই রঙের শাড়ি পরে বসে আছেন। আমার বোনের দেয়া উপহারটি হাতে নিয়ে মোহরদি বললেন, শিল্পীদের এমন মনের মিল থাকে। কি করে তোমার দেয়া কানের দুল আর আমার শাড়ির রঙ একই হয়ে গেল? এত বড় শিল্পী আমার বোনের মতো একজন সাধারণ শিল্পীর সাথে এমন চমৎকারভাবে একাত্মতা প্রকাশ করলেন। একমাত্র মহৎ প্রাণের অধিকারী উদার শিল্পীদের দ্বারাই এরূপ সদাচরণ সম্ভব।

আরেকটি ঘটনা। একবার ঢাকায় মোহরদি গান গাইবেন। ১৯৭২ সাল। তিনি কখনো নিজে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইতেন না। নির্ধারিত লোক থাকতো। এমনি একবার নির্ধারিত কেউ না থাকায় মোহরদি দর্শকদের প্রতি অনুরোধ জানালেন যেন কেউ তাঁর সাথে হারমোনিয়াম বাজায়। এত বড় মাপের শিল্পীর সাথে বাজাবার জন্য অনেকে দ্বিধাবোধ করছিলেন। এমন সময় আমার মেয়ে মুন্নি মোহরদির সাথে বাজানোর ইচ্ছা প্রকাশ করলো। সে অন্যদের তুলনায় অভিজ্ঞতায় এবং বয়সে অত্যন্ত নগণ্য। তিনি যখন 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে'.. গান শুরু করলেন মুন্নি তার সাথে তাল মিলিয়ে বাজিয়েছিলো। মোহরদি তাতে অত্যন্ত চমৎকৃত হলেন। তিনি ছোট-বড় কাউকেই অবজ্ঞা করতেন না বরং সকলকে এমনি করে উৎসাহ দিতেন। সেই থেকে মাহবুবকে তিনি মুন্নির বাবা বলে ডাকতেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। পরবর্তীকালে আশীর দশকের প্রথম দিকে যখন মুন্নি, জামাই ইশতিয়াকসহ শান্তিনিকেতনে বেড়াতে যায়, মোহরদি তাদের মুহূর্তের মধ্যে চিনে ফেলেন। নিজের বাসভবনে বিশেষভাবে আপ্যায়ন করে তাদের খাইয়েছিলেন।

মোহরদিকে আমরা কোনদিন ভুলতে পারবো না। তিনি শিল্পী হিসেবে পৃথিবীকে অনেক গান উপহার দিয়ে গেছেন। তেমনি স্নেহভরা অকৃত্রিম ভালোবাসা দিয়ে সকলের মন জয় করেছেন। বাংলার ঘরে ঘরে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর মৃত্যুতে আজ বারবার মনে পড়ছে চট্টগ্রামে আমার বাসায় গাওয়া শেষ গানটির কয়েকটি লাইন:

যদি জল আসে আখি পাতে
একদিন যদি খেলা থেমে যায় মধু রাতে,
তবু মনে রেখ।

বাড়িতে কাজী মোতাহার হোসেন

একদিন দুপুরে দেখলাম মাহবুব দু'জন মেহমান নিয়ে এসে হাজির। ১৯৬৮ সাল। ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দায় এসে দেখলাম একজন প্রবীণ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এবং সুতার শাড়ী পরা একজন শিল্পীসুলভ নারী। তাঁর কাঁধে ঝোলানো একটি কাপড়ের ব্যাগ। মাহবুব

পরিচয় করিয়ে দিলো— কাজী মোতাহার হোসেন এবং তাঁর কন্যা সনজীদা খাতুন। এমন স্বনামধন্য দু'জন ব্যক্তিত্বকে আমাদের বাড়িতে অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে খুবই আনন্দবোধ করলাম। মাহবুব বললো, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন আর্টস্ ডিপার্টমেন্টের তত্ত্ব অংশের সিলেবাস তৈরি করার কাজে তাঁরা এসেছেন। দু'একদিন আমাদের সাথে থাকবেন। তাড়াহুড়ো করে ঘরে যা ছিল তা দিয়ে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করলাম। সেদিনই বেলা তিনটার দিকে তাঁদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্ধারিত সভায় যেতে হবে। আমাদের বাড়ির পেছন দিকে বারান্দাসহ একটি গেস্ট রুম ছিল। তাতে কাজী মোতাহার হোসেনের বিশ্রাম করার ব্যবস্থা করা হলো।

সন্‌জীদা খাতুনের সাথে পরিচিত হলাম। বহুদিন আগে তাঁর সাথে পত্রালাপ হয়েছিল ছাত্রী সংসদ সংক্রান্ত ব্যাপারে। তিনি ছাত্রী সংসদের জাতীয় কমিটির সম্পাদক এবং আমি চট্টগ্রাম জেলা কমিটির প্রেসিডেন্ট। এই সুবাদে তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ হতো পত্রের মাধ্যমে। এত বছর পর তাঁর সাথে মুখোমুখি সাক্ষাৎ, তাও অপ্রত্যাশিতভাবে। খুবই গৌরববোধ করলাম। তখন থেকে তাঁকে আপা সম্বোধন করা শুরু করলাম।

আমার মেয়ে মুন্নি ছোটবেলা থেকে গান শেখে। এইজন্য আমাদের বাসায় হারমোনিয়াম, তবলা, তানপুরা ইত্যাদি ছিল। সন্‌জীদা আপার গান শোনার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রাতে খাওয়ার পর আমরা সকলে একসাথে বসলাম। এই পরিবেশে মাহবুব হঠাৎ কাজী মোতাহার হোসেনকে অনুরোধ করে বসলো একটা গান করার জন্য। এক মুহূর্ত দেরি না করে তিনি নজরুল গীতি গাইতে শুরু করলেন - 'নিরজনে সখী বল বঁধুয়ারে...'। এই গান আর থামেনা, চলতেই থাকে অনেক্ষণ ধরে। সনজীদা আপা কানে কানে মাহবুবকে বললেন, মাহবুব ভাই, আপনি সর্বনাশ করেছেন, আজকে সারা রাতই আব্বু এই গান গাইবেন। এটা আর শেষ হবে না। মাহবুব তড়িৎ বুদ্ধির লোক। সে জানতো যে কাজী মোতাহার হোসেন দাবা খেলতে ভালোবাসেন। তাঁকে বললো, আপনি যদি দাবা খেলতে চান, তাহলে তার ব্যবস্থা করতে পারি। মুহূর্তের মাঝে তাঁর গান বন্ধ হয়ে গেল। মুখমন্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, দাবা খেলার জন্য তৈরি হয়ে গেলেন। মাহবুব অগত্যা রাত এগারটার দিকে আমার ভাইপো হাফিজকে নিয়ে আসলো। দু'জনে দাবা খেলতে বসে গেলেন। কতক্ষণ এই খেলা চলেছে মনে নেই, তবে ভোর রাত পর্যন্ততো বটেই। এই সুযোগে আমরা সন্‌জীদা আপার কয়েকটা রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনলাম। মুন্নিও কয়েকটা গান শোনালো। মনে পড়ে কাজী মোতাহার হোসেন রোজ ভোরবেলা আমাদের বারান্দায় বসে ইকবালের তর্জমা করতেন। তিনি আপনভোলা ছিলেন বলে অনেক প্রচলিত কাহিনী আছে। আমার বাড়িতেও তার দু'একটা পরিচয় পেলাম। তিনি আমাদের বসার ঘর থেকে কোনদিনই বেডরুমে একলা ফিরে যেতে পারেননি। বসার ঘরের বারান্দা দিয়ে সোজা সামনের উঠোনে চলে যেতেন। সেখানে গিয়ে খুঁজতেন আমার রুমটা যেন কোথায়? সন্‌জীদা আপা বা মাহবুব গিয়ে তাঁকে উঠোন থেকে এনে বেডরুমে দিয়ে আসতে হতো। তিনি যে কয়দিন ছিলেন, এর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এই ঘটনা উপভোগ করার জন্য আমরা তাঁকে একলাই চলাফেরা

Pictures in village based website

করার সুযোগ করে দিতাম। সকলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য উপভোগ করতাম আর অট্টহাসিতে ফেটে পড়তাম।

তাঁদের পরিবারের সাথে আমরা বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হলাম। সন্‌জীদা আপা, ছোটবোন ফাহমিদা খাতুন (লীনু), মেয়ে অপালা ফরহাত নভেদ, এদের সাথে আমাদের আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপিত হলো।

চট্টগ্রামের অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী মাহবুবকে সম্বর্ধনা দিয়েছিল ২৮ মার্চ, ১৯৯৭ সালে। সে উপলক্ষে যে অভিনন্দন স্মরণিকা বের হয়, তাতে সন্‌জীদা আপা লিখেছেন— আজ আমার পিতা পরলোকগত। আমার সঙ্গে মাহবুব ভাইয়ের যোগ আছে অব্যাহত। দেখা হয় কম, তবু তাঁর মনের বাইরে পড়ে থাকিনা কক্ষনো। দুঃখ-বিপদে কিংবা আনন্দে সব সময়েই তিনি স্মরণ করেন আমাকে আর আমার ছোট বোন ফাহমিদাকে। দুর্বার সঙ্গীত প্রীতি রয়েছে যে তাঁর মনে।

আবুল ফজল ও অভিমানী মাহবুব

অধ্যাপক আবুল ফজল সংস্কৃতি অঙ্গনের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি আমার কামাল মামার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। সেই সুবাদে তিনি আমার মা'কে বুবু বলে ডাকতেন এবং তাঁকে আমরা মামা ডাকতাম। মনে আছে ছোটবেলায় আমরা মা'র সাথে তাঁদের বাড়িতে বেড়াতে যেতাম। মামি অর্থাৎ উমরতুল ফজল আমাদের জন্য কোরমা-পোলাও রান্না করতেন এবং যত্ন করে খাওয়াতেন। আমার বড় ভাই হাবিবুর রহমান এবং তিনি চট্টগ্রাম কলেজে এক সঙ্গে অধ্যাপনা করতেন। তাঁদের দু' জনের মধ্যে ছিল খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আমাদের তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আমাদের বিয়েতে বিভিন্ন জনের বাণী সংবলিত যে 'শুভেচ্ছা' ছাপানো হয়েছিল তাতে তিনি আট লাইনের একটি কবিতা লিখেছিলেন। নিচে তা উদ্ধৃত করলাম।

ক্ষুধা কাতর মানুষ সুধা ভিখারী,
প্রিয়তম পুরুষ আর প্রিয়তমা নারী
সেই সুধার অধিকারী।
যৌবনের রাঙা-ভাঙা তীরে এসে,
দুটি জীবন আজ এক হয়ে যাক্ মিশে।
জওশন হউক মাহবুব
মাহবুব হউক বুলবুল
উভয়ের জীবন হউক এক বৃন্তে দুটি ফুল।

আমার বিয়ের পর দেখলাম আমার স্বামী মাহবুব উল আলম চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অনেকটা প্রাচীনকালের গুরু-শিষ্যের মতো। কলেজে মাহবুব ছিল তাঁর প্রিয় ছাত্র। তিনি সীমান্ত পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। মাহবুবের উদ্যোগে গঠিত 'সংস্কৃতি বৈঠকে' মাঝে মাঝে যোগ দিয়ে গল্প, প্রবন্ধ পাঠ করতেন। শুনেছি কলেজে পড়ার সময় মাহবুবের রাজনৈতিক কার্যকলাপেও তিনি নেপথ্যে প্রেরণা যোগাতেন।

Pioneer in village based website

সীমান্ত-এর দাঙ্গাবিরোধী সংখ্যায় (নব-পর্যায়, ৩য় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫৭) 'ইতিহাসের আহ্বান নামে' তিনি একটি সাহসী প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ওই সংখ্যায় প্রথম প্রবন্ধ হিসেবে ছাপা হয়েছিল সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'পশ্চিমবঙ্গের কবি, শিল্পী-সাহিত্যিকদের নিকট একটি নিবেদন।' সেই প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, বর্বরতা যে কারণেই ঘটুক না কেন তা বর্বরতাই, এবং বর্বরতার জয় জয়কারে কোন মনুষ্যত্বকামী মানুষই খুশি হতে পারেন না। এই প্রবন্ধে তিনি পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী সাহিত্যিকদের কাছে একটি সুসংবাদও দিয়েছিলেন। লিখেছিলেন, আমাদের চাটগাঁ শহরের তরুণ শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা মিলে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। তার নাম দেয়া হয়েছে 'শান্তি সম্মেলন।' এই প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে একটি শান্তিফৌজও গড়া হয়েছে। তারা মহল্লায় মহল্লায় শান্তির বাণী প্রচার করছেন, এবং যাতে দুস্কৃতিকারীদের মনে ভয় এবং সংখ্যালঘুদের মনে আশা ও বিশ্বাসের সঞ্চার হয় তার ব্যবস্থা করছেন। নিরাশার আঁধারে তারাই আমাদের আশার আলো। পশ্চিমবঙ্গের কবি, শিল্পী-সাহিত্যিকরা যদি অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন তো একটা কাজের মতো কাজ করা হবে। পশ্চিমবঙ্গের 'পরিচয়' পত্রিকায় 'সীমান্তের দাঙ্গাবিরোধী সংখ্যা' সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করতে গিয়ে গোপাল হালদার লিখেছিলেন, সূর্য পূর্ব দিকেই ওঠে। 'সীমান্ত' আমাদের পথ দেখাল। সীমান্তের বন্ধুদের আমরা অভিনন্দন জানাই।

১৯৫১ সালে ১৬ থেকে ১৯ মার্চ চট্টগ্রামে মহাসমারোহে সংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পকিস্তানের ইতিহাসে শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবিদের এই ধরনের সম্মেলন এই প্রথম। এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিল প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ, সংস্কৃতি বৈঠক এবং সীমান্তের লেখক গোষ্ঠী। মাহবুব উল আলম চৌধুরী আহ্বায়ক হয়ে সীমান্ত অফিসে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবি এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের একটি বৈঠকের আয়োজন করে। এতে সিদ্ধান্ত হয় রহমতগঞ্জে হরিখোলার মাঠে ১৬ থেকে ১৯ মার্চ একটি সংস্কৃতি সম্মেলনের আয়োজন করা হবে। আবুল ফজলকে সভাপতি এবং সায়িদুল হাসান ও শওকত ওসমানকে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়। মাহবুব ছিল এই কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক। বিরুদ্ধবাদীরা যাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে, তার জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীও গঠিত হয়। এর প্রধান ছিলেন কৃষ্ণগোপাল সেন।

এই সম্মেলনে মূল সভাপতি ছিলেন আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। প্রধান অতিথি ছিলেন কলকাতা থেকে আগত সত্যযুগের সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। বিশেষ অতিথি ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল। কলকাতা থেকে আরো এসেছিলেন সলিল চৌধুরীর নেতৃত্বে গণনাট্য সংঘের একটি গণসঙ্গীতের দল। এছাড়া এসেছিলেন সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, বাহাদুর হোসেন খান ও বালকৃষ্ণ মেনন। মুস্তফা নূরউল ইসলাম ও আলাউদ্দীন আল আজাদ এসেছিলেন ঢাকা থেকে। শিল্পী আমিনূল ইসলামের নেতৃত্বে একটি চিত্র প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলন চট্টগ্রামে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আমি তখন খাস্তগীর স্কুলে দশম শ্রেনীতে পড়ি। মাহবুবকে চিনতাম চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে। তার আয়োজিত বিভিন্ন

ফাংশানে আমরা বেশ কয়েকবার গানও গেয়েছি। মনে আছে সুফিয়া কামাল মামানি আমাদের বাড়িতে উঠেছিলেন। তিনি এই সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্য আমাদের উৎসাহিত করেছিলেন। আমি, ছোটবোন জুবলী, মামাতো বোন সাদু, খালাতো বোন রুকু এবং আরো অনেকে রুমঘাটা থেকে দল বেঁধে এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলাম। সংস্কৃতিমূলক কর্মকান্ডের প্রতি আমাদের বরাবরই একটা দারুণ আগ্রহ ছিল। সলিল চৌধুরী, দেবব্রত বিশ্বাস এবং সুচিত্রা মিত্রের দরাজ গলার গান শুনে আমরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম। যাঁদের গান আমরা রেকর্ডে কলের গানে শুনি, সেদিন সামনা সামনি তাঁদের দেখতে পেয়ে দারুণ উৎসাহবোধ করেছিলাম।

পুলিশি তৎপরতায় প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ বন্ধ হয়ে গেলে ১৯৫৬ সালে মাহবুব ও গোপাল বিশ্বাসের উদ্যোগে আসকার দীঘির পশ্চিম পাড়ে বদিউস সালামের বাসভবনে চট্টগ্রামের কবি, শিল্পী-সাহিত্যিকদের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে আবুল ফজলকে সভাপতি এবং এবনে গোলাম নবীকে সাধারন সম্পাদক করে 'চট্টগ্রাম কৃষ্টিকেন্দ্র' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা গঠিত হয়। এভাবে ক্রমে ক্রমে আবুল ফজল এবং মাহবুবের মধ্যে গভীর আন্তরিক সেতু নির্মিত হয়। আবুল ফজল কোন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশ নেয়ার আগে মাহবুবের সঙ্গে পরামর্শ করতেন এবং মাহবুবও শ্রদ্ধাভরে তাঁর উপদেশ মেনে নিত। এভাবে তাঁর সাথে আমাদের প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ হতো।

মাহবুবের মুখে শুনেছি ১৯৪৬ সালে চট্টগ্রামে সর্বপ্রথম যে ব্যাপক ভিত্তিতে নজরুল জয়ন্তী উদযাপিত হয়েছিল তারও সভাপতি এবং সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে আবুল ফজল ও মাহবুব উল আলম চৌধুরী।

১৯৫৯ সালের ১ জানুয়ারি আবুল ফজল সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহন করেন। একদিন সকাল দশটার দিকে তিনি আমাদের ৬০, দেওয়ান বাজারের বাসায় এলেন। আমি তাঁর জন্য চা বানাচ্ছিলাম। তিনি একটি বিস্কিট হাতে নিয়ে কী যেন ভাবছিলেন। মাহবুবকে তাঁর অবসর গ্রহণের কথা উল্লেখ করে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বললেন, এই উপলক্ষে তোমরা একটা সংবর্ধনার ব্যবস্থাও করলেনা। মাহবুব উত্তরে বললো, এই ব্যাপারটা আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার সংবর্ধনার ব্যবস্থা করবো। মাহবুব ভয়ানক একগুয়ে, মাথায় যা ঢোকে তা তৎক্ষণাৎ তার করতেই হয়। পরদিন থেকেই সে এই কাজে লেগে গেল। কিভাবে, কাকে নিয়ে এ কাজে এগুবে তা চিন্তা ভাবনা চলছে। এই সময় তিনি মাহবুবকে বললেন, আবদুর রহমান হেডমাস্টার, ও.আর.নিজাম কিম্বা সাইফুদ্দীন সিদ্দিকীকে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি করতে পারো কিনা দেখো। তাঁরা তিনজনের কেউ রাজি না হওয়ায় মাহবুব একদিন সন্ধ্যায় আমাকে নিয়ে চট্টগ্রাম সরকারি কমার্স কলেজের প্রিন্সিপাল আবদুস সোবহান খান চৌধুরীর নালাপারার বাসায় গেল। তিনিও প্রথমে রাজি হলেন না। অনেকক্ষণ আলোচনার পর তিনি মাহবুবকে বললেন, আপনি যদি সব দায়িত্ব নেন তাহলে আমি সভাপতি হতে পারি। কিন্তু এই ব্যাপারে আমি কোন সাহায্য করতে পারবোনা। কালবিলম্ব না করে আমাদের বাসায় কিছু বন্ধু বান্ধব এবং প্রান্তিকের পুরোনো কর্মীদের উপস্থিতিতে আবদুস সোবহান চৌধুরীকে সভাপতি এবং মাহবুবকে সম্পাদক

করে আবুল ফজল সংবর্ধনার অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়। তাঁর সংবর্ধনা উপলক্ষ করে একটি চমৎকার স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। এতে বিভিন্ন জনের বাণী ছাড়াও সভাপতি, সম্পাদক এবং কমিটির সদস্যদের নামও ছাপানো হয়। মনে পড়ে ফটো তোলার জন্য ঘোড়ার গাড়ি করে আবুল ফজলকে চট্টগ্রাম নিউমার্কেটের কাছে 'জায়দী' ফটো স্টুডিওতে নিয়ে যাওয়ার সময় আমিও মাহবুবের সঙ্গে ছিলাম। আর ছিলেন সুচরিত চৌধুরী। এই সময় তিনি আবারো ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, এই সংবর্ধনাকে চট্টগ্রামী রূপ দেয়ার জন্য আবদুর রহমান, ও.আর. নিজাম এবং সাইফুদ্দীন সিদ্দিকীকে অভ্যর্থনা কমিটির সদস্য করার চেষ্টা করতে। কিন্তু তাঁরা রাজি হওয়াতো দূরের কথা বরঞ্চ আবুল ফজল সম্পর্কে নানা বিরূপ মন্তব্য করেন। তাঁর প্রগতিশীল ভূমিকা তাঁরা পছন্দ করতেন না। আবুল ফজল প্রায় প্রতিদিন আমাদের বাসায় এসে কিংবা চিঠি পাঠিয়ে সংবর্ধনার অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইতেন। এই সম্পর্কিত কয়েকটি চিঠি এখনও মাহবুবের কাছে অতি যত্নে সংরক্ষিত আছে।

এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আমাদের বাসায় ডি.আই.বির লোক আসা-যাওয়া শুরু করে এবং এই উদ্যোগ থেকে সরে দাঁড়াতে মাহবুবকে শাসিয়ে যায়। এ খবরও তাঁকে জানানো হয়। এক পর্যায়ে তিনি মাহবুবকে বললেন, যদি বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয় তবে এই অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিতে পারো। উল্লেখ্য, এর আগে (৭ অক্টোবর ১৯৫৮) ইস্কান্দার মীর্জা দেশের শাসনতন্ত্র বাতিল ঘোষণা করে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী করেন। ফলে সকলে ভীতি ও ত্রাসের মধ্যে দিন কাটাতো। ওই সময় সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ করাও বেশ ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। কিছুদিন আগে হুলিয়া প্রত্যাহার হওয়ায় মাহবুব আত্মগোপন অবস্থা থেকে মাত্র ফিরে এসেছে। ফিরে এসেই সে আবার আবুল ফজলের সংবর্ধনা নিয়ে মেতে উঠলো। যদিও আমি তার সাথে এদিক-ওদিক যেতাম, মনের মধ্যে অসংখ্য চিন্তা এসে ভীড় করতো। ভয় পেতাম, যদি তাকে আবার পালিয়ে বেড়াতে হয়। যাহোক, সমস্ত বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করে সকলের প্রচেষ্টায় এই সংবর্ধনা সমাবেশ বিপুলভাবে সাফল্য লাভ করে।

১৯৬৩ সালে আবুল ফজলকে পাকিস্তান সরকার প্রেসিডেন্ট পুরস্কার দেন। জেনারেল আইয়ুব খানের দমননীতির প্রতিবাদে মাহবুব তাঁকে এই পুরস্কার প্রত্যাখান করার আবেদন জানায়। কিন্তু তিনি এতে একমত হতে পারেননি। এই পুরস্কারপ্রাপ্তিকে উপলক্ষ করে চট্টগ্রামের কিছু নব্য সংস্কৃতিসেবী স্থানীয় মিশ্‌কা হোটেলে নৈশভোজের মাধ্যমে আবুল ফজলকে সংবর্ধনা দেয়ার আয়োজন করেছিল। এই খবর পেয়ে মাহবুব তাঁর কাছে ছুটে যায় এবং এতে যেন তিনি সম্মত না হন, সেজন্য বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে তাঁর সাথে বিস্তৃত আলোচনা করে। তিনি অবশেষে মাহবুবের সাথে একমত হয়ে তাদের প্রস্তাবের প্রতি অসম্মতি জানান। ভোজসভার পরিবর্তে মুসলিম ইনস্টিটিউটে তাঁর ষাট বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে মাহবুব আরেকটি বড় সংবর্ধনার আয়োজন শুরু করে। তাঁর দ্বিতীয় সংবর্ধনা যেন প্রেসিডেন্ট পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে না বোঝায়, তার জন্য আবুল ফজলের আপত্তি সত্বেও এর নাম দেয়া হলো 'হীরক জয়ন্তী'। এই সংবর্ধনা কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন চট্টগ্রাম কলেজের বাংলার অধ্যাপক আহমদ হোসেন এবং মাহবুব

উল আলম চৌধুরী। কোষাধ্যক্ষ ছিলেন কে. রহমান কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার ইয়ুনূস চৌধুরী। সংবর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যক্ষ সাহিত্যিক আবু রুশদ্ মতিনউদ্দিন। উদ্বোধন করেছিলেন পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি চট্টগ্রাম নিবাসী ইমাম হোসেন চৌধুরী। তিনি ছিলেন মাহবুবের মামা আহমদ সাগীর চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেই সূত্রে মাহবুবকে 'নাতি' ডাকতেন। তাঁর ভাষণটিও মাহবুব তৈরি করে দিয়েছিল।

মাহবুব যথারীতি এবারও ঢাকায় গিয়ে সুফিয়া কামাল, ফাহমিদা খাতুন, জাহেদুর রহিম, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম প্রমুখকে সঙ্গে করে চট্টগ্রামে নিয়ে এসেছিল। তাঁরা আমার বাড়িতেই ছিলেন। মামানি (সুফিয়া কামাল) রাতে আমার মা'র সাথে ঘুমাবার জন্য রুমঘাটায় থাকতেন। সকালে তাঁকে আমরা নিয়ে আসতাম। ঢাকায় শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের সঙ্গে দেখা করে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য মাহবুব তাঁর সম্মতি আদায় করে। তিনি উপস্থিত হয়ে নিজের আঁকা একটি বড় ছবি আবুল ফজলকে উপহার দেন।

উল্লেখ্য, আবুল ফজল সংবর্ধনা এবং হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে যে মানপত্র দেয়া হয় তাও মাহবুব লিখেছিল এবং দু'টি অনুষ্ঠানে নিজেই পাঠ করেছিল। এই অনুষ্ঠানে গান করেছিলেন ফাহমিদা খাতুন, জাহেদুর রহিম, অচিন্ত্য চক্রবর্তী, সত্যসাহা, হরিপাল, জাহানারা ইসলাম, বিজয়লক্ষ্মী দাশ, শিখারানী গুহ, রিজিয়া শহীদ, নাসিরউদ্দীন, গোপাল ভট্টাচার্য, রফিকুল ইসলাম, এ.কে. মান্নান, স্নেহময় রক্ষিত, মোহাম্মদ ইউসুফ প্রমুখ শিল্পীরা।

এই সংবর্ধনা উপলক্ষে আমার বাড়িতে দিনরাত সঙ্গীত অনুষ্ঠানের মহড়া চলতো। আমার বাড়িটি যেন একটি সংস্কৃতি-কেন্দ্র। আমার বিস্তৃত বারান্দায় ব্যানার লেখা, বসার আর খাবার ঘরে রিহার্সেল। বিরাট নীল কাপড়ে সিলভার রং দিয়ে লেখা আবুল ফজল হীরক জয়ন্তীর ব্যানারটি এখনো আমার কাছে আছে। তখনকার দিনে এত বড় ব্যানার তৈরি করার মতো কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রামে হয়তো ছিল না। কিংবা মাহবুব এত পারফেকশনিষ্ট যে সব কাজ নিজের তত্ত্বাবধানে করতে চাইতো। অবিরাম বিভিন্ন লোকের আসা-যাওয়া, তাদের আপ্যায়ন করার জন্য আমার কাজের ছেলে আইয়ুব সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতো। অনেক সময় বেশ কয়েকজনকে দুপুরে এবং রাতে খাওয়াতে হতো। মাহবুবের আব্দার না রেখে উপায় নেই। মাঝে মাঝে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। আবার তার সাথে এদিক-ওদিক যেতেও হতো আমাকে।

মনে পড়ে ঢাকা থেকে আগত শিল্পীদের নিয়ে আমাদের বাসায় একটি সঙ্গীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে আবুল ফজলসহ চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে মামানির হাতের রান্না মুগ ডালের খিচুরি এবং মুরগি ভুনা দিয়ে সকলকে আপ্যায়ন করা হয়েছিল। মনে আছে মামানি বিরাট বড় দুই ডেক্‌চি খিচুরি রান্না করেছিলেন। পরের দিন সকলে আমরা সেই খিচুরি দিয়ে নাশতা খেয়েছিলাম। ফাহমিদা খাতুন (লীনু) প্রায় দশ বারোটা রবীন্দ্র সঙ্গীত, দ্বিজেন্দ্রগীতি এবং অতুলপ্রসাদের গান গেয়েছিল। সেদিন কোন একটা জরুরি কাজে সুচরিতদাকে চলে

যেতে হয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখলাম তিনি ফিরে এসেছেন। বললেন, ফাহমিদার কীর্তন সুরে গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত 'জীবনবল্লভ'-এর টানে ফিরে এসেছি। এত অপূর্ব এবং মধুর সুরে লীনু সেদিন সকলকে বিমুগ্ধ করে রেখেছিল। তার সাথে সেই সুমধুর সম্পর্কে আমরা আজও সমৃদ্ধ। তার কোন নতুন গানের সিডি বের হলে সে মাহবুবকে উপহার দেয়ার জন্য আমাদের বাড়িতে ছুটে আসে। আমরা তার গানের অনুরাগী।

একবার ময়মনসিংহে তার বাসায় আমি একরাত ছিলাম। বসার ঘরে দেখলাম নানা রংয়ের বড় বড় গোলাপ। এই ফুল কোথায় পেয়েছে জিগ্যেস করতেই আনন্দে উচ্ছল হয়ে সে তখনি আমাকে ছাদে নিয়ে গেল। দেখলাম, তার আদর-যত্নে লালিত অসংখ্য গোলাপ ফুটে আছে। আর লীনু একটার পর একটা গোলাপের নাম বলে গেল। তার স্মরণ শক্তি দেখে অবাক হলাম।

আগের কথায় ফিরে আসি। এই সময় আমাদের বাড়িতে যেন একটা উৎসব পর্ব চলছিল। সকলের আনন্দের সীমা ছিল না। এর মধ্যে একদিন ভোর হওয়ার আগে দু'টো গাড়ি নিয়ে চলে গেলাম পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে। তখন সূর্য উঠি উঠি। সুচরিতদার ভোরের রাগে বাজানো বাঁশির সুর যেন সূর্যের আগমন ঘোষণা করলো। আমরা সবাই একসঙ্গে গেয়েছিলাম— আনন্দধারা বহিছে ভুবনে.., আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর...। দেখলাম পূর্ব দিকে সমুদ্রের ঢেউয়ের মাঝে আকাশের নীল ঘেঁষে লাল থালার মতো ভোরের সূর্য। তার স্নিগ্ধ রোদে স্নান করে আমরা যেন আলোকিত হলাম। মনের সকল অন্ধকার দূর হয়ে গেল। আমরা শিশুর মতো সমুদ্রতীরে বিশাল বালুচরে নানা ধরণের খেলায় মেতে উঠলাম।

আবুল ফজলের দু'টো সংবর্ধনার স্মৃতি ভোলা যায় না। তিনি তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ রেখাচিত্রে (পৃষ্ঠা ৩৫৪) এ সম্পর্কে যা লিখেছেন তা নিচে তুলে দিলাম।

> 'তবুও চট্টগ্রামের ছাত্র আর বুদ্ধিজীবিরা মিলে ১৯৫৯-এর ২২শে নভেম্বর— আমার চাকরি-জীবন থেকে অবসরগ্রহণ উপলক্ষে আমাকে বড় রকমের এক সংবর্ধনা জানালেন। সভাপতিত্ব করলেন ঢাকা থেকে এসে ডক্টর মুহাম্মদ এনামূল হক— অভ্যর্থনা সমিতির কর্মকর্তা ছিলেন আমার পুরোনো বন্ধু অধ্যক্ষ আবদুস সোবহান খান চৌধুরী। আমার লেখা সম্বন্ধে আলোচনামূলক প্রবন্ধ লিখেছিলেন ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, শামসুন্নাহার মাহমুদ, অধ্যাপক আহমদ শরীফ, খান মঈনুদ্দীন, জনাব আবদুল মওদুদ প্রভৃতি অনেকে। আমার সাহিত্যিক বন্ধুদের অনেকে পাঠিয়েছিলেন বাণী আর কবিতা। এসব দিয়ে কমিটি একটি চমৎকার স্মরণিকাও করেছিলেন প্রকাশ।'

এরপর ১৯৬৩ সালের ১ জুলাই তাঁর যে 'হীরক জয়ন্তী' করা হয়েছিল সে সম্পর্কে তিনি কী লিখেছেন তারও কিছুটা এখানে উল্লেখ করলাম (পৃষ্ঠা ৩৭৬ ও ৩৭৭ রেখাচিত্র)।

> '১৯৬৩- ১লা জুলাই আমার বয়স ষাট পার হল। এ উপলক্ষে চট্টগ্রামের বন্ধু আর অনুরাগীরা মিলে আমার এক সংবর্ধনা আয়োজন করেছিলেন। আমার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও তাঁরা এ সংবর্ধনার নাম দিয়েছিলেন 'হীরক জয়ন্তী'। আমি আমার ভাষণের প্রথমেই এ সম্পর্কে আমার আপত্তি আবারও জানিয়ে দিলাম।

এ সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন সাহিত্যিক আবু রুশদ মতিনউদ্দিন আর উদ্বোধন করেছিলেন পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের তখনকার প্রধান বিচারপতি ইমাম হোসেন চৌধুরী। এ উপলক্ষে শিল্পী জয়নুল আবেদীনও এসেছিলেন আর নিজের হাতের আঁকা একটি বড় ছবি আমাকে দিয়েছিলেন উপহার। এটি আমার জীবনে একটি বড় সম্পদ— কারণ জয়নুল আবেদীনের মতো শিল্পীর স্বীকৃতি আমার মতো লেখকের পক্ষে সামান্য কথা নয়। এদিনের সংবর্ধনা এ কারণেও আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে।'

দেখলাম তাঁর 'রেখাচিত্রে' এই দু'টি সংবর্ধনার ব্যাপারে মাহবুবের কোন উল্লেখ নেই। মাহবুব যে এই দু'টি অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা এবং সম্পাদক ছিল তারও কোন উল্লেখ নেই। এই বইতে চট্টগ্রামের সমকালীন সংস্কৃতি আন্দোলনের ওপর কোন বক্তব্য নেই দেখে মাহবুব আরো মর্মাহত হয়। এই বই পড়ে তার অনেক অনুরাগী, বন্ধু, যাঁরা আবুল ফজলের সংবর্ধনায় মাহবুবের ভূমিকা সম্পর্কে জানতেন তাঁরা সকলে তার নাম উল্লেখ না থাকার কারণ জিগ্যেস করতে থাকে। এতে সে ভয়ানক বিব্রতবোধ করে। আবুল ফজল, যাঁকে মাহবুব পিতার মতো শ্রদ্ধাভক্তি করে, তাঁর কাছ থেকে এত বড় আঘাত পেয়ে সে বহুদিন হতাশা এবং বিষণ্নতায় ভোগে। এই সময় সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সে উৎসাহ এবং উদ্যম হারিয়ে ফেলে। এই মানসিক যন্ত্রণার পর্যায় অনেকদিন চলে। নিজের মধ্যে এই বেদনা লুকিয়ে রাখতে গিয়ে সে এক সময় অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে সুস্থ করে তুলতে আমার যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। কিন্তু সে কোনদিন ঘুণাক্ষরেও কাউকে জানতে দেয়নি তার এই মনোবেদনার কাহিনী। মাহবুব চিরকাল অভিমানী। খুব বড় আঘাতেও সে ভেঙে পড়েনা, কিন্তু যাদের কাছ থেকে স্নেহ-মমতা প্রত্যাশা করে, প্রত্যাশা করে ন্যায়নিষ্ঠা, তা না পেলে সে হতাশ হয়ে পড়ে। তার এই অভিমানের তীব্র যন্ত্রণা আমাকেও বিভিন্ন সময় গভীরভাবে ভারাক্রান্ত করেছে।

Chhagal.com
Pioneer in village based website

আবুল ফজল যতদিন বেঁচে ছিলেন মাহবুব নিয়মিত তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল। চাটগাঁ গেলে কোনদিন তাঁকে না দেখে ঢাকায় ফেরেনি। তিনিও মাঝে মধ্যে মাহবুবকে চিঠি লিখে তাঁর সুখ-দুঃখের কথা জানাতেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মাহবুব যখন দৈনিক 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সম্পাদক তখন তিনি মাঝে মাঝে এই পত্রিকায় লিখতেন। রেডিওতে দু'জনকে সাক্ষাৎকারে পরস্পরের মুখোমুখি হতেও দেখেছি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিভিন্ন সময়ে কলকাতা থেকে আমাদের বাড়িতে অতিথি হয়ে এসেছিলেন কণিকা বন্দোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, ভারতের বিখ্যাত শিল্পপতি স্যার বীরেন মুখার্জীর পত্নী লেডী রাণু মুখার্জী। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা লেডি মুখার্জী চারুশিল্পের একজন কনিস্যার। তাঁর সংগ্রহে আছে দেশ বিদেশের বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা বিপুল সংখ্যক শিল্পকর্ম। তাঁদের জন্য আমার বাড়িতে যে অনুষ্ঠান এবং নৈশভোজের আয়োজন করা হতো তাতেও আবুল ফজল যোগ দিয়ে আমাদের উৎসাহিত করতেন। মাহবুব প্রত্যেকবার নিজে গাড়ি চালিয়ে তাঁকে নিয়ে আসতো। মাহবুবের এত অভিমান সত্ত্বেও দু'জনের মধ্যে সহৃদয়তার অভাব দেখিনি কোনদিন। তাঁকে আমরা শ্রদ্ধাভরে এখনও স্মরণ করি।

মুক্তিযুদ্ধ : রুদ্ধশ্বাস নয় মাস

চট্টগ্রাম শহর ত্যাগ

২৫ মার্চ, ১৯৭১ সাল। রাত দশটার দিকে আমার স্বামী মাহবুব ঢাকায় জামিল চৌধুরীর সাথে টেলিফোন করে জানতে পারলো সেখানে গোলাগুলি শুরু হয়েছে। আমাদের আর বসে থাকার সময় নেই। এই কথা বলে তৎক্ষণাৎ সে অস্থির হয়ে আমার বন্ধু শিরিনের ছোট ভাই বাবলুকে সঙ্গে নিয়ে আন্দরকিল্লায় আওয়ামী লীগ অফিসে ছুটে গেল। পাকিস্তানিরা ২৫ মার্চের হত্যাযজ্ঞের নাম দিয়েছিল অপারেশন সার্চলাইট। সেই কালোরাত্রিতে বর্বর সেনাবাহিনীর নির্মম হামলায় ঢাকা পরিণত হয় এক নরকপুরীতে। ৭ মার্চ লক্ষ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে রেসকোর্স ময়দানে মুহুর্মুহু ধ্বনি ও করতালির মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে চট্টগ্রাম শহরে পাড়ায় পাড়ায় গঠিত হয় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ। আমাদের দেওয়ান বাজার পাড়ায়ও পূর্নেন্দু দস্তিদার, মাহবুব উল আলম চৌধুরী, কৃষ্ণগোপাল সেনের নেতৃত্বে গঠিত হয় সংগ্রাম পরিষদ। বাবলুর দু'টি লাইসেন্সধারী রাইফেল ছিল। সে রাইফেল চালানোর ট্রেনিংপ্রাপ্ত সুদক্ষ শিকারি। তাকে প্রশিক্ষক করে দেওয়ান বাজারে তরুণ এবং কিশোরদের নিয়ে গঠিত হয় মুক্তিবাহিনী। আমাদের বাড়ির পেছনে দেওয়ানজী পুকুরপাড়ে সমাবেশ করে নিয়মিত ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থাও করা হয়।

রাত একটার দিকে ফিরে এসে মাহবুব বললো, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আমরা যেন গ্রামে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাই। চট্টগ্রাম শহরে আর থাকা যাবে না।

এর আগে ২৩ মার্চ চট্টগ্রাম কলেজের কাছে প্যারেড ময়দানে এক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মাহবুব সেখানে তার স্বরচিত কবিতা 'অঙ্গীকার' পাঠ করেছিল। তার কয়েকটি লাইন এখানে তুলে ধরলাম :

> মৃত্যুর ভয়ে ভীরু ক্রন্দন আর না
> প্রাণ দিয়ে জীবনের দাম নে
> যারা কাপুরুষ পেছনেই তারা থাকনা

আমরা দাঁড়াব বুলেটের ঠিক সামনে । তখন আমরা বুঝিনি যে দু'দিন পরই এই কালো অধ্যায় শুরু হয়ে যাবে। মাহবুব সংগ্রামী কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। উষ্ক খুষ্ক অবস্থায় বাসায় এসে বললো, আজ (২৬ মার্চ) দুপুরে আগ্রাবাদ বেতার কেন্দ্র থেকে

Pioneer in village based website

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করা হবে। এতে আমরা উজ্জীবিত হলাম। এইভাবে যে যেদিকে পারে মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়লো।

কয়েক দিন আগে লালদিঘির ময়দানে এক বিশাল সমাবেশে দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হয়েছিল। এতে আমার মেয়ে মুন্নি 'আমার সোনার বাংলা' গানটি গেয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম জেলার তৎকালীন পুলিশ সুপার শামসুল হক উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাদের পারিবারিক বন্ধু। শামসুল হক আমাদের গ্রামে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন এবং নিজেও চলে গেলেন। পরে তাঁর উপরিস্থ উর্দুভাষী ডি.আই.জির আশ্বাসে আস্থা স্থাপন করে শহরে কাজে যোগ দিলেন। এই সুযোগে পাক বর্বররা তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

দিনে দিনে শহরের অবস্থা অবনতির দিকে। রাস্তাঘাটে পাকবাহিনী অবস্থান নেয়া শুরু করলো। তিন চারদিন পর আবদুল্লাহ আল হারুনের সাথে আমরা কাপ্তাইর পথ ধরে পাহাড়তলী, কদলপুর হয়ে রাউজান গহিরা আমার শ্বশুরবাড়িতে চলে গেলাম। তখন তিনি ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতা এবং এম.পি.। পরদিন মাহবুবের ছোট মামা এল.এ চৌধুরী তাঁর পরিবারসহ এসে আমাদের বাড়িতে উঠলেন। আমরা প্রায় বাইশজনের মতো শহরবাসী। একেতো এত জনের জন্য রান্না করা, তদুপরি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাবার তৈরি করে পাঠানো ইত্যাদি নিয়ে আমরা খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। সেখানে গিয়েও মাহবুবের ব্যস্ততা কমলো না। তার কাছে শুনলাম এম. আর সিদ্দিকী, জহুর আহমদ চৌধুরী, এম.এ হান্নান প্রমুখ নেতা এবং অধ্যাপক আলী আহসান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি.সি ড.এ.আর মল্লিক, তাঁরা সকলে গহিরা এসে কুন্ডেশ্বরী স্কুলে আশ্রয় নিয়েছেন। রাতে সিদ্ধান্ত হলো তাঁরা সীমান্ত অতিক্রম করে চলে যাবেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একে একে সবাই রামগড় দিয়ে সীমান্তের ওপারে চলে গেলেন।

আবদুল্লাহ আল মামুন এবং আবদুল্লাহ আল হারুন মাহবুবের মামাতো ভাই। তাদের সাথে মাহবুবের সম্পর্ক ছিল আপন ভাইয়ের চেয়েও ঘনিষ্ঠ। ছোটবেলায় তারা একসাথে বড় হয়েছে। এ ছাড়াও তারা ছিল মাহবুবের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অনুরাগী। মাহবুবের নেতৃত্বে এবং তাঁদের উদ্যোগে ষাট দশকের মাঝামাঝি স্থাপিত হয় গহিরা কলেজ। মাহবুব ছিল ঐ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। আমরা ঢাকা চলে আসার পর মামুন ভাই আমৃত্যু এই কলেজের দায়িত্বে নিবেদিত ছিলেন। হারুন ভাই যদিও আমার সিনিয়র ছিল, চট্টগ্রাম কলেজে দু'জনে প্রায় একই সময়ে পড়েছি। তাদের দুই ভাইয়ের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর।

বাবার বাড়িতে আপন ভাইদের সঙ্গে যা সময় কাটিয়েছি তার চেয়ে আমার অনেক বেশি সময় কেটেছে তাদের সঙ্গে। প্রায়ই দুপুরে আমার বাসায় সকলে একসাথে খেতাম। খাবার টেবিলে বসে মাঝে মাঝে ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যেত, আমাদের কথা ফুরাতো না। আমাদের মধ্যে এমন একাত্মতা ছিল যে কোন দিন এর অন্যথা হবে ভাবতে পারতাম না। মামুন ভাইয়ের সাথে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। দেবরের সঙ্গে এমন মধুর সম্পর্ক সাধারণত দেখা যায় না। তার জীবনের সকল সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় আমার সাথে আলোচনা করতো। তিনি অত্যন্ত সুরসিক ব্যক্তি ছিলেন। মানুষের

স্ববিরোধিতা নিয়ে এমন সব মজার মজার রসালো গল্প বানিয়ে বলতো, উপস্থিত সবাই হাসিতে ফেটে পড়তো। তার কথা প্রায়ই স্মরণ করি। কর্কটরোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাগত ছিল প্রায় বছরখানেক। আমাদের দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে মামুন ভাই পৃথিবী থেকে বিদায় নিল কয়েক বছর আগে, ১৯৯৩ সালের আগষ্ট মাসে।

গ্রামে গ্রামান্তরে

মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে ফিরে আসি। গহিরার বাড়িতে আমাদের দিন কাটছে কিছুটা শঙ্কায়, কিছুটা যন্ত্রণায় এবং কিছুটা মানসিক দ্বন্দ্বে। আমরাও কি সীমান্ত পার হয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যাবো, না এখানে থেকে যাবো, ইত্যাদি ভাবনা নিয়ে দুঃসময় কাটছে। এমন সময় খবর পেলাম হারুন ভাইয়ের নেতৃত্বে তাদের পরিবারের সকলে ওপারে চলে গেছে। আমাদের মনটা বিষাদে ভরে গেল। বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো এই দুর্দিনে তারা আমাদের ফেলে কিভাবে চলে গেলো। চিরকাল আমরা ভাবতে অভ্যস্ত যে আমরা একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এই বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে মাহবুব এমন তীব্র অভিমান করে বসলো যে পরে ওপারে যাবার সুযোগ পেয়েও আমরা আর গেলাম না। মাহবুব চিরকালই এমন অভিমানী। কোনদিন সে অভিমানের কথা কাউকে বলে না।

হারুন ভাইয়ের ছোট ভাই আবদুল্লাহ আল নোমান ভিন্ন ধারার রাজনীতি করতো। সে বিপ্লবী রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিল। মুন্নির প্রিয় চাচা। মুন্নি তার রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী ছিল। সেই সুবাদে তাদের আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান করতো এবং নোমানকে সহায়তা করতো। নোমানের কাছে শুনেছি সে আমার ভাই লুৎফর রহমান, ভাইপো হাফিজ, ইশরাক ও শফিক এরা এবং আরো অনেকে মিলে শহরের বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। হানাদার বাহিনীর আক্রমণের মুখে সেই প্রতিরোধ বেশীদিন টেকেনি। তারা ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন গ্রামে। সেখানে স্থানীয় লোকজন, কৃষক, যুবক, ছাত্রদের মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করে। নোমান এখন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতিবিদ, বর্তমানে মন্ত্রী। সে অত্যন্ত ভদ্র, নম্র এবং কোন অবস্থাতেই তাকে উত্তেজিত হতে দেখিনি। হারুন ভাইয়ের সঙ্গে তার রাজনৈতিক মত পার্থক্য ছিল। এ নিয়ে হারুন ভাই মাঝে সাজে উত্তেজিত হয়ে তার ওপর রাগ করতো কিন্তু নোমান অত্যন্ত শান্তভাবে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতো। পরমত সহিষ্ণুতার সে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রাজনীতি করার সময় সে আমাদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসে। পরবর্তীতে নোমান আমার এক স্নেহভাজন অনুজপ্রতিম শফিকউদ্দীনের বোন তাসমিনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাসমিন একজন সার্থক মা এবং স্ত্রী। শফিকের সাথে আমাদের নিবিড় পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। আমাদের বাসায় প্রায়ই আসতো। মাঝে মাঝে আমার মেয়ে মুন্নিকে পড়াতো। পরে মাহবুব যখন (১৯৭২) চট্টগ্রামে দৈনিক 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সম্পাদক, তখন শফিক সেই পত্রিকায় যোগদান করে। এই সুবাদে আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আরো বৃদ্ধি পায়। এই দৃঢ়চেতা যুবক এখন তিন সন্তানের জনক এবং আমেরিকায় কানেক্টিকাটের স্থায়ী বাসিন্দা। যখনই দেশে আসে শত ব্যস্ততার মাঝেও

Pioneer in Village based Website

আমাদের সঙ্গে কিছু সময় কাটাতে ভালোবাসে। তার কৃতজ্ঞতাবোধ অসামান্য। আমি যখন আমেরিকা যাই এবং তার আতিথ্যে থাকি, সে মনপ্রাণ ঢেলে সান্নিধ্য দেয়। দেশে ফিরে আসার সময়, বিদায় মুহূর্তে আমরা উভয়ে আবেগে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ি। বয়সে আমার অনেক ছোট হলেও সে তার মনের কথা, সুখ-দুঃখ, ব্যর্থতা ও সাফল্যের কথা আমাকে নিঃসঙ্কোচে বলে।

মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে ফিরে আসি। এর মধ্যে পাক হানাদার বাহিনীর গ্রাম ধ্বংস-যজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে। গ্রাম পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্রমে ভেঙে পড়লো। যে যেদিকে পারে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে ছুটে পালাতে লাগল। যারা পালাতে পারলোনা তারা পাকবাহিনীর সংহতি রক্ষার নামে নৃশংস হত্যাকান্ডের শিকারে পরিণত হয়। তাদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হয় ওই গ্রামের কুন্ডেশ্বরী স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা দানবীর নতুনচন্দ্র সিংহ। অগ্নিদগ্ধ হয় অসংখ্য বাড়িঘর। এ দুঃসময়েও মানুষের পাশবিক বৃত্তির পরিচয় পেয়ে মানুষের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি। আমরা গহিরা ছেড়ে অন্য গ্রামে যেখানে আশ্রয় নিয়েছিলাম, সে বাড়ির পাশ দিয়ে চলে গেছে সীমান্তগামী একটি বড় রাস্তা। সেখানে দেখলাম পাকিস্তানিদের দোসর গ্রাম্য টাউটেরা দলে দলে সীমান্ত পাড়ি দেয়া মানুষের শেষ অবলম্বন কেড়ে নিতে। আমাদের সামনেই এই পরিস্থিতির শিকার হতে দেখেছিলাম চট্টগ্রামের বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী মলয় ঘোষ দস্তিদার এবং তার পরিবারকে। এই সব লুটেরারা নতুন সিংহের লাশের ওপর দিয়ে লুট করেছিল কুন্ডেশ্বরী ঔষধালয়। দেখেছিলাম কিভাবে অসহায় নারীদের ওপর পাক বাহিনীর বর্বর সেনারা এবং দেশীয় দোসরেরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। উন্মত্ত উল্লাসে ধর্ষণ করেছিল অসংখ্য নারী, যুবতী এবং কিশোরীকে। তাদের কান্নার রোলে আকাশ ভেঙে পড়েছিল। মানুষের এ দানবীয় রূপ দেখে পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। পাশাপাশি এও দেখেছি, এই নরপশুদের ব্যতিক্রমধর্মী বহু বিবেকবান মানুষকে, যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। এঁরা পথে পথে খাবার বিতরণ করে সীমান্তগামী মানুষদের ওপারে পৌঁছে দিতেও সাহায্য করেছিলেন।

গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যাযাবরের মতো ঘুরে বেরিয়েছি মাহবুব, আমি, মুন্নি, মাহবুবের জেঠাইমা এবং আমার আয়া তোয়াজা খাতুন। আয়া আমার কাছে বিশ বছর ছিল। অত্যন্ত স্নেহময়ী। এই দুর্যোগের দিনেও সে মুন্নির পাশ ছাড়েনি এক মুহূর্তও। তার মূল্যবোধ ছিল অত্যন্ত প্রখর। ওই দুঃসময়ে তার কাছে বিপদে পড়ে অনেকে সোনার অলঙ্কার পানির দামে বিক্রি করতে চেয়েছিল। কিন্তু ও কেনেনি। বলেছিল, দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের বিপদের সুযোগ নিতে নেই। এই অসামান্য নারীর জন্য আমার গর্বের অন্ত নেই। ও আজ জীবিত নেই। বছর দুই আগে তার নিজ বাড়িতে নবীনগরে পরলোকগমন করেন।

মাহবুবের জেঠাইমা (প্রয়াত) আম্বিয়া খাতুনের অন্তর ছিল স্নেহ এবং ভালোবাসার খনি। মানুষের জন্য তাঁর অপরিসীম স্নেহ কোনদিন ফুরোতে দেখিনি। আর মাহবুব তো ছিল তাঁর চোখের মণি। এই সময়েও দেখেছি তিনি মাহবুবকে শিশুর মতো ঘিরে

রাখতেন, যেন কেউ তার ক্ষতি করতে না পারে। মুন্নিকে এবং আমাকেও ভীষণ ভালোবাসতেন। আমাদের ঘিরে যেন তাঁর জগৎ। আমরা কি খাচ্ছি, আমাদের স্বাস্থ্য ঠিক আছে কিনা ইত্যাদি ভেবেই তাঁর সময় কাটতো। চট্টগ্রাম শহর থেকে রাঙ্গামাটি যাওয়ার পথে গহিরা গ্রাম। মাহবুব প্রায়ই দশ বারোজন বন্ধু নিয়ে গহিরার বাড়িতে দুপুরে খাওয়ার জন্য থামতো। জেঠাইমা একঘন্টার মধ্যে অনেক রকম রান্না করে সবাইকে তৃপ্তিভরে খাওয়াতেন। নির্লোভ অথচ পরের সেবাই যেন ছিল তাঁর ধর্ম।

আগের কথায় আসি। এই পথযাত্রায় কখনো খাবার জোটেনি। কখনোবা লবণ মেখে ভাত খেয়েছি। কখনো খালের হাঁটু পানি ভেঙে হেঁটে চলেছি মাইলের পর মাইল। কখনো সবুজ ধানের ক্ষেতের আইল দিয়ে। কখনো জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। কখনো উঁচু টিলার ওপর দিয়ে বিরামহীন হেঁটে চলেছি। কোনদিন সারারাত বৃষ্টিতে ভিজেছি। আশ্চর্য এই দুর্গম পথে আমাদের কোন অসুখ বিসুখ হয়নি। ওষুধ বা ডাক্তারের প্রয়োজন পড়েনি। বিপদকালে পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানুষের জীবনীশক্তি এমন অদম্য হয়ে ওঠে।

মাহবুবকে আশ্রয় দিতে ভয়

এমনি অনিশ্চয়তার মধ্যে গ্রামে থাকা আর সম্ভব হলনা। যেখানে যাই মাহবুবকে আশ্রয় দিতে সকলে ভয় পায়। তার জেঠাতো ভাই দিদারুল আলম চৌধুরী চট্টগ্রাম মুসলিম লীগের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। আমাদের এই দুর্বিষহ দিন যাপনের কথা জানতে পেরে তিনি আমাদের শহরে নিয়ে এলেন। আমাদের দেওয়ান বাজারের বাড়ির রাস্তার মুখে ঢুকতেই দারোয়ান ওয়াজিউল্লাহ ছুটে এসে বললো, গতরাতে আপনাদের বাড়ি লুঠ হয়েছে। গাড়ি নিয়ে গেছে। মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে গেছে। বই পত্র পুড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের শারীরিক নির্যাতন করে সাহেব কোথায় আছে জানতে চেয়েছে। বাবলু মামাকে ধরে নিয়ে গেছে। পেছনের গলিতে হয়তো এখনো তাদের কেউ কেউ পাহারা দিচ্ছে। খুব অস্থির হয়ে বললো, এই মুহূর্তে অন্য কোথাও চলে যান। সময়ক্ষেপণ না করে তাড়াতাড়ি দিদার ভাইসাহেবের শহরের বাড়িতে চলে গেলাম। সেখানেও থাকা নিরাপদ নয়। কোথায় যাওয়া যায়, মাহবুব, আমি, মুন্নি, আয়া, আমাদের চারজনের ঠাঁই কোথায় হবে, কে আশ্রয় দেবে— এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একজন পরম আত্মীয়ের কথা মনে পড়লো। তিনি মাহবুবের টেলিফোন পাওয়ার সাথে সাথে নিজে গাড়ি চালিয়ে এসে হাজির। আমাদের তাঁর বাসায় শুধু নিয়ে গেলেন না, তাঁর বিছানায় আর একটা চকি জুড়ে দিয়ে সস্নেহে জায়গা দিলেন নিজের বেডরুমে। বললেন, আমি বাঁচলে তোরাও বাঁচবি। মরলে সকলে একসাথে মরবো। ভাবীও আমাদের সাদরে গ্রহণ করলেন। এমন বিপদের দিনে তাঁদের এই মহানুভবতা দেখে আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত রইলো না। তিনি মেসবাহউদ্দীন জাহেদ। অদম্য সাহসী। রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও তাঁর সাথে আমাদের বহু বছরের সম্পর্ক। তাঁকে আমরা ফজলী ভাই (ডাক নাম) বলে ডাকি। আমাকে তিনি আপন ছোট বোনের মতো স্নেহ করেন।

দু'একদিন যেতে না যেতেই ফজলী ভাইয়ের বাসায় আরো অনেক পরিবার আশ্রয় নেয়। রেলওয়ের এক উচ্চপদস্থ অফিসারও এলেন। মাহবুবের রাজনৈতিক সঠিক পরিচয় জানতে পেরে তিনি এখানে থাকা নিরাপদ নয় মনে করে সপরিবারে চলে গেলেন। কিন্তু অদৃষ্টের এমন পরিহাস গ্রামে গিয়েও পাক বাহিনীর হাত থেকে তিনি রক্ষা পেলেন না। তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। পরের দিন বাবলুকে অর্ধমৃত অবস্থায় কোলে করে কে বা কারা নিয়ে এসেছিল মনে নেই। সমস্ত শরীরে আঘাতের চিহ্ন এবং রক্তক্ষরণে সারা শরীর লাল। ফজলী ভাবি আর আমি ডেটল দিয়ে তার শরীরের ক্ষতগুলি পরিষ্কার করলাম। যত্ন করে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। বাবলু জানালো, তাকে আর্মিরা আমাদের বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে সার্কিট হাউজে অকথ্য নির্যাতন করেছে। বারবার মাহবুবের সন্ধান জানতে চেয়েছে। কিন্তু মৃত্যু অবধারিত জেনেও সে আমাদের কোন খবর আর্মিকে দেয়নি। এক পর্যায়ে তাকে গুলি করে মারার আগের মুহূর্তে তার পাঞ্জাবি বস্ এসে বললো, এভাবে যদি তেল কোম্পানির স্টাফদের ধরে ধরে মেরে ফেলা হয় তাহলে আমি আর্মিকে আর তেল সাপ্লাই দিতে পারবো না। বাবলু ছিল তেল কোম্পানির একজন অফিসার। এই কথা বলে সে বারবার মিনতি করতে লাগলো। মাহবুব যেন শহর ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যায়। তাকে ধরার জন্য আর্মিরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং ওই অভিপ্রায়ে ফটো নিয়ে তাকে খুঁজছে।

আমরা এক দুর্বিষহ পরিস্থিতি থেকে আরেক করুণ পরিস্থিতিতে উপনীত হলাম। সবাই এক সঙ্গে মৃত্যুবরণ করার চাইতে সবচেয়ে বিপদজনক যে 'মাহবুব' তাকে আমাদের কাছ থেকে কোথাও দূরে পাঠিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত হলো। সে তৎক্ষণাৎ অদূরবর্তী তার এক মামাতো বোন আক্তার আপার বাসায় আশ্রয় নিল। আমরা ফজলী ভাইয়ের বাসায় থেকে গেলাম। সেই বেদনাময় মুহূর্তটি আমার এখনো মনে পড়ে। মাহবুব আর কোনদিন ফিরে আসবেনা— এই সিদ্ধান্তটি প্রায় চূড়ান্ত মনে করে আমরা তাকে বিদায় দিলাম। আমরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম। মুন্নি বাবাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদলো। ফজলী ভাই, ভাবি, তাঁর মেয়েরা এবং আয়া সবার মধ্যে কান্নার রোল উঠলো। কিন্তু মাহবুব একেবারেই নিশ্চুপ, মুখে কোন কথা নেই। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যেন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত।

মাহবুব যাওয়ার পরের দিন আক্তার আপার বাড়ি আর্মি ঘিরে ফেললো। সকলকে ঘরের বাইরে উঠোনে এনে এক সারিতে দাঁড় করালো এবং এ বাড়িতে সে (মাহবুব) আছে কিনা জানতে চাইলো। এক পর্যায়ে সবাইকে গুলি করার জন্য নির্দেশ দেয়ার মুহূর্তে হঠাৎ এক মেজর এসে তাদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলো। ওই বাড়িতে মাহবুব থাকলে ওদের জীবনও বিপন্ন হবে। এজন্য সে ওই বাড়ি ছেড়ে আব্দুল গফফার চৌধুরীর (মাহবুবের সম্পর্কিত জেঠাতো ভাই) সহায়তায় কক্সবাজারের নিকটবর্তী ইলিশিয়া গ্রামে আমার খালার বাড়িতে আশ্রয় নেয়। কয়েকদিন পর গফফার ভাই শহরে ফিরে এসে আমাকে জানাল, যাওয়ার পথে কালুরঘাট, পটিয়া এবং দোহাজারী, এসব জায়গায় বিভিন্ন চেক্‌পোষ্টে মাহবুবদের বাস থামিয়ে বেশ কয়েকজন যাত্রীকে ভারতীয় চর আখ্যা দিয়ে, কিল ঘুষি মেরে নামিয়ে নেয়। গুলি করে হত্যা করে রাস্তার ধারে ফেলে

Chuadi.com
Pioneer in Village based Website

রাখে। লোহাগাড়া পৌছলে দেখা যায় বাস ভর্তি লোকের মধ্যে মাত্র কয়েকজন জীবিত আছে। ভাগ্যক্রমে মাহবুব ও গফ্ফার ভাই বেঁচে যায়। এই পরিস্থিতিতে বাস আর যেতে চাইল না। হতবুদ্ধি হয়ে তারা দুজন একটি চায়ের দোকানে বসে কী করা যায় ভাবছিল। এমন সময় বিধ্বস্ত এক বৃদ্ধ লোক এসে মাহবুবকে জিগ্যেস করলো, আপনি মাহবুব উল আলম চৌধুরী না ? মাহবুব নিজের পরিচয় আড়াল করার জন্য বললো, আমার নাম আবদুর রহিম। বৃদ্ধও জবাবে বললেন, এখন আমার নামও আবদুল করিম; কিন্তু আমি ডা. সুখেন্দু দাশের বাবা। তিনি আরও বললেন, আমাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। গ্রামের অনেককে হত্যা করেছে। আমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। আপনি যেখানেই যান, অনুগ্রহ করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

ইলিশিয়া আমার খালুদের জমিদারি অঞ্চল। গফ্ফার ভাইয়ের শ্বশুরবাড়ি। সেখানে মাহবুব আশ্রয় নিয়েও নিরাপদ মনে করলো না। ওখানে রাজাকারেরা তখন হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল পুড়িয়ে দিচ্ছিল। তারা দলে দলে ধর্মান্তরিত হয়ে বাঁচার চেষ্টায় এ জমিদার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানে একজন রাজাকার মাহবুবকে প্যারেড ময়দানে ২৩ মার্চে কবিতা পড়েছে বলে সংগ্রামী হিসেবে চিহ্নিত করায় সে আর ওখানে থাকতে চাইলো না। তাকে আমার খালাতো ভাই খাইরুল ইসলাম টুক্কু এমন এক খামার বাড়িতে পাঠিয়ে দিল, যেখানে আশ্রয় নিয়েছিল প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা পূর্ণেন্দু দস্তিদার এবং আরো কিছু মুক্তিযোদ্ধা। সেখানে দীর্ঘদিন সে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কাটায়। এই সময় গফ্ফার ভাই এবং তার স্ত্রী সিতারা (সম্পর্কে আমার খালাতো বোন) মাহবুবকে যথেষ্ট সাহায্য করে। সিতারা অত্যন্ত স্নেহময়ী এবং পরোপকারী। তারা দুজন নিয়মিতভাবে আমাকে মাহবুবের খবর জানাতো। যাহোক, দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আমরা ফজলী ভাইয়ের সস্নেহ আশ্রয়ে গভীর উৎকণ্ঠায় দিন কাটিয়েছি।

Pioneer in village based website

ঝুঁকি নিয়ে আবার কর্মস্থলে

এদিকে বর্বর সরকার বার বার চাকরিতে যোগ দেয়ার জন্য সরকারি কর্মচারীদের নানারকম ভীতি প্রদর্শন করতে লাগল। মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে আমি পুনরায় কর্মস্থলে যোগদান করলাম। মোমিন রোডের সমাজকল্যাণ অফিস শূণ্য প্রায়। যতদূর মনে পড়ে মহিউদ্দীন, আমিনুল ইসলাম, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ সমাজকল্যাণ অফিসার এবং অফিস সহকারী হাফিজ ও ওয়াহিদ এই কয়েকজন মাত্র সাহস করে অফিসে আসতো। মফজল ড্রাইভার অফিসের জিপ গাড়ি করে আমাদের অফিসে নিয়ে যেত। জিপের ভেতর মাঝখানে আমি বসতাম। আমার এক পাশে মহিউদ্দীন আর এক পাশে আমিনুল ইসলাম। একে অপরের হাত ধরে রাস্তা চলতাম। আমি ভয় পেলে ওরা দু'জন বলতো, আপা, আমাদের জীবন থাকতে আপনার কোন ক্ষতি হতে দেবো না। একবার অফিসে আসলে আর যে বাসায় ফিরে যেতে পারবো এর কোন নিশ্চয়তা ছিল না। রোজ বের হওয়ার সময় আমার মেয়ের কাছ থেকে মনে মনে চির বিদায় নিয়ে আসতাম। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর সংবাদ। শুধু মৃত্যু আর মৃত্যু।

মনে পড়ে এক বছর আগে লেখা মাহবুবের একটি কবিতার কথা। এ কবিতাটি পড়ে আমি তার সাথে ভীষণভাবে রেগে গিয়েছিলাম। বলেছিলাম, কেন এ ধরনের বীভৎস দৃশ্যের কথা তোমার মনে উদয় হয়। আমি এরকম দুঃখবাদী কবিতা পছন্দ করি না। কবিতাটির শিরোনাম ছিল 'নির্জন কবর'। ভাবতে অবাক লাগে কেমন করে মাহবুব এক বছর আগে মুক্তিযুদ্ধের অবর্ণনীয় হত্যাযজ্ঞে সারাদেশ কবরে ছেয়ে গেছে বর্ণনা দিয়ে এমন কবিতাটি লিখেছিল। এখনো সমস্ত শরীর শিহরে ওঠে যখন মনে পড়ে :

নির্জন কবর

শব্দ বিহীন হাড় দিয়ে ঠাসা কবর অনেক কবর।
যেখানে হৃদয় মরু পথ দিয়ে প্রবাহিত
অন্ধকার বুক কাঁপানো অন্ধকার।

আমার দেশের নদী প্রান্তরে আজ মৃত্যুর ছড়াছড়ি
উর্মি মুখর নদীর তীরে মৃত্যু আসে
চরণবিহীন পাদুকার মতো মৃত্যু আসে
অবলম্বনহীন পোষাকের মতো মৃত্যু আসে
শিশুর দোলনায় মৃত্যু আসে
শব্দ করে নিঃশব্দে মৃত্যু আসে। ...

নব প্রত্যয়ে সঞ্জীবিত

Chunati.com
Pioneer in village based website

একদিন খবর পেলাম গহিরা কলেজের অধ্যক্ষ পরিতোষ বোসকে হানাদার বাহিনী চন্দনপুরাস্থ তার বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গেছে। চকবাজারের কোন এক স্থানে তাকে গুলি করে। প্রাণে বেঁচে থাকা সত্ত্বেও অনেকের সঙ্গে তাকে গণকবরে মাটি চাপা দেয়। আশে পাশের লোকেরা তাকে দেখেছে মাটি থেকে বহু কষ্টে মাথা তুলে পানি পানি করে গোঙাতে। তাঁর এই খবর পেয়ে আমি বেদনায় মুমূর্ষ হয়ে পড়েছিলাম। মনে পড়ে একাত্তরের প্রথম দিকে সে প্রায়ই আমাদের দেওয়ান বাজারের বাড়িতে আসতো। বারান্দায় বসে রাজনীতি নিয়ে মাহবুবের সঙ্গে আলোচনা করতো। আমাকে ভাবি ডেকে চা খাওয়াতে বলতো।

দেশব্যাপী এই কান্নার রোলের মধ্যে, অসংখ্য মানুষের করুণ আর্তনাদের মধ্যে, যখন শুনতাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংবাদ, শুনতাম বিভিন্ন রণক্ষেত্রে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বড় বড় সাফল্যের কাহিনী, তখন আশায় ও সাহসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠতাম। মাঝে মাঝে আমার মোমিন রোডের সমাজকল্যাণ অফিসে ছদ্মবেশে আসতো জানাশোনা কিছু মুক্তিযোদ্ধা। তাদের কার্যক্রমের কথা বলতো। তাদের কাজে সামান্য অংশ নিতে পেরে কিছুটা তৃপ্তি পেতাম। তাদের দৃঢ়তা দেখে মনে হতো আমাদের বিজয় আসন্ন।

নয় মাসের লক্ষ লক্ষ জীবনের বিনিময়ে, অসংখ্য কবর অতিক্রম করে, রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভ করে আমরা স্বাধীনতা পেলাম। প্রত্যাশায় ভরা স্বাধীনতা। দীর্ঘ নয়

মাসের মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানের গৌরবের স্বাধীনতা। আত্মোৎসর্গ অঙ্গীকারে দীক্ষিত স্বাধীনতা। সকল প্রকার বিভেদ, দলাদলি এবং সঙ্কীর্ণতা পরিহার করে মহান স্বদেশভূমি গড়ে তোলার শপথ-দীপ্ত স্বাধীনতা। সারাদেশ আনন্দে ভেসে গেল। রাস্তার মোড়ে মোড়ে মাইকে দেশাত্মবোধক স্বাধীনতার গান শোনা গেল। আমরাও সে আনন্দ-উৎসবে যোগ দিলাম। অদম্য উৎসাহে দেশ গড়ার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। অফিসে সবাই মিলে পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে কি করে সমাজের পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের কাজ ত্বরান্বিত করা যায় তা নিয়ে বার বার বৈঠক করলাম।

সেলাই মেশিন এবং রিলিফের কাপড়

তখন আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমদ চৌধুরী স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী। তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল জীবন-যাপন করতেন। চট্টগ্রামের অধিবাসী বিধায় তিনি ছিলেন আমাদের নিকট-আত্মীয়ের মতো। আমার ওপর তাঁর অগাধ আস্থা ছিল। তিনি একবার চট্টগ্রাম এসে সার্কিট হাউসে আমাকে ডেকে পাঠান এবং সাত ট্রাকভর্তি রিলিফের কাপড়, কম্বল, টিন ইত্যাদি বন্টনের জন্য আমাকে দায়িত্ব দিয়ে যান। তিনি নিয়ম-কানুনের তেমন ধার ধারতেন না। কাজের জন্য যখন তখন তাঁকে বিরক্ত করা যেত।

একদিন আমি মোমিন রোডের অফিসে বসে কাজ করছিলাম। চট্টগ্রাম ডিভিশনের বিভিন্ন জেলা থেকে অনেক চিঠিপত্র এসে জমে ছিল। একে একে ফাইল বের করে ডিকটেশন দিচ্ছিলাম অফিস সহকারিকে। এমন সময় চার পাঁচ জনের একদল যুবক এসে আমার টেবিলের সামনে চেয়ারে বসলো। কোন কথা না বলেই একটি পিস্তল বের করে টেবিলে রাখলো। কঠোর গলায় বলতে শুরু করলো, দশটি সেলাই মেশিন এবং দুই বান্ডিল রিলিফের কাপড় নেওয়ার জন্য এসেছি। এখনি দিতে হবে। মিনিস্টার সাহেব আমাদের পাঠিয়েছেন। তাদের অঙ্গভঙ্গি দেখে আমার সন্দেহ হলো, তারা আদৌ বিবেচনাযোগ্য লোক কিনা। তারা এমন লম্ফঝম্প করতে লাগল যেন তাদের দাবি না মেটালে আমাদের অফিসসুদ্ধু উড়িয়ে দেবে। বারবার পিস্তল হাতে নিয়ে নাড়াচড়া করছিল যেন আমি ভয়ে তাড়াতাড়ি জিনিসগুলো দিয়ে তাদের বিদায় করি।

মনে মনে যে ঘাবড়ে যাইনি তা নয়। যদিও ওপর দিকে নির্বিকার ভাব দেখাচ্ছিলাম। হঠাৎ মনে সাহস এলো। আমি ইশারা করতেই অফিস সহকারী মুহূর্ত অপেক্ষা না করে সামনে, পেছনে এবং পাশের তিনটি দরজা বাইরে থেকে তালাবন্ধ করে দিলো। বাইরে সব পিয়ন পাহারা দেয়ার জন্য প্রস্তুত। আমি সাহস করে বললাম, আপনারা বসুন, আমি মিনিস্টার সাহেবকে টেলিফোন করি। এই বলে তাদের নাম জিগ্যেস করতেই লক্ষ্য করলাম চেহারাগুলো একে একে ফ্যাকাশে হয়ে আসছে। কিন্তু মুখে তাদের গর্জন কমলো না। আমার ভাগ্য ভালো। টেলিফোন করতেই লাইন পেয়ে গেলাম। পি.এ কে বললাম, অত্যন্ত জরুরি ব্যাপার, আমি মিনিস্টার সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চাই। তিনি আমার অবস্থা বুঝতে পেরে জহুর আহমদ চৌধুরীকে ফোন লাগিয়ে

দিলেন। সালাম জানিয়ে তাঁকে বললাম, স্যার, এভাবে অফিসের নিয়ম-কানুন, শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব নয়। যোগ্যতা বিচার না করে যাকে তাকে সরকারি জিনিস বিলিয়ে দিলে আমরা ন্যায্য লোকের দাবি মিটাবো কি করে। তখন আসল কথা বলে ফেললাম। তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন, এই নামে কোন লোককে তিনি পাঠাননি। এরা মিথ্যাবাদী। চট্টগ্রামের ডি.সি কে তিনি এখনি ফোন করে দেবেন যেন তাদের গ্রেফতার করে উচিত শাস্তি দেয়া হয়। আমার অনুরোধে তিনি টেলিফোনে এই ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা ঐ ব্যক্তিদের জানালেন। পালিয়ে যাবার কোন পথ না পেয়ে তারা করজোড়ে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। বললো, জীবনে আর কোনদিন একাজ করবোনা— এবারের মতো আমাদের ক্ষমা করে দেন।

কয়েক দশক গত হয়েছে। আশ্চর্য হয়ে ভাবি বর্তমানের পরিস্থিতিতে কী আমি এই অবস্থান নিতে পারতাম? প্রতিদিন সংবাদপত্র খুললেই সন্ত্রাসমূলক খবরে চোখ ঝলসে যায়। সেদিনের সন্ত্রাস আর আজকের সন্ত্রাসে কতো আকাশ-পাতাল তফাৎ। আজকের সন্ত্রাসীরা কথা বলার সুযোগ না দিয়েই গুলি ছোঁড়ে। তাদের কাছে মানুষের জীবনের কোন মূল্য নেই। নিজের দুষ্কর্মের জন্য কোন অনুতাপ নেই। যে যত বেশি অপকর্ম করতে পারে ততবেশি নিজেকে শক্তিশালী মনে করে। তাদের কাছে গোটা সমাজটাই যেন জিম্মি।

মুক্ত বিহঙ্গের মতো পাখা মেলে আকাশে উড়ে বেড়াবার স্বাধীনতা কি আজ আমাদের আছে?

Chunati.com
Pioneer in village based website

ঢাকায় বদলি

সুযোগ বারবার আসে না

১৯৭৫ সালের জুন মাস। আমি তখন চট্টগ্রাম ডিভিশনের এসিসটেন্ট ডাইরেক্টর। জামালখান অফিসে বসে কাজ করছিলাম। দুপুরবেলা। ঢাকা থেকে আমাদের পরিচালক মোজাম্মেল হোসেন টেলিফোন করে বললেন, তিনি আমাকে ঢাকায় বদলি করে নিতে চান। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় একটা নতুন প্রজেক্ট হয়েছে, সোস্যাল ওয়েলফেয়ার মাদার্স ক্লাব । তিন বছরে সারা বাংলাদেশে সাত'শ চৌষট্টি মাতৃকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য পরিবার পরিকল্পনার কথা গ্রামের নারীদের মধ্যে পৌঁছে দেয়া। বাংলাদেশে ছয়টি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এই পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে গ্রামে মাঠ পর্যায়ে সোস্যাল ওয়েলফেয়ার মাদার্স ক্লাব এবং বাংলাদেশ রুর‍্যাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের অধীনে উইমেনস্ কো-অপারেটিভ ছিল অন্যতম প্রধান প্রকল্প। গ্রামের মেয়েদেরকে প্রত্যক্ষভাবে পরিবার পরিকল্পনার কথা বলা সেই সময় খুবই দুরূহ কাজ ছিল। তাই মাতৃকেন্দ্র এবং সমবায় সমিতির আওতায় এনে অর্থিক উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে সাথে পরিবার পরিকল্পনার কথা নারীদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়। এই প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে এগিয়ে গেছে। কাজী শামসুনকে সোস্যাল ওয়েলফেয়ার থেকে এবং তাহরুন্নেছা আবদুল্লাহকে উইমেনস্ কো-অপারেটিভ-এর প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে, যেমন, শিক্ষা বিভাগে ড. ওবায়দুল্লাহ, কৃষি বিভাগে মমতাজউদ্দীন, শ্রম মন্ত্রণালয় থেকে মসিউজ্জামান এবং ইনফরমেশন থেকে এহিয়া খানকে পপুলেশন অফিসার হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়ে গেছে। বিশ্বব্যাংকের কনসালটেন্ট ড. ইকল্‌স এসে তাদের এক মাসের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এবার হাওয়াইতে দু'সপ্তাহের প্রশিক্ষণ এবং তারপর মালেশিয়া, ফিলিপিন, দক্ষিণ কোরিয়া ইত্যাদি জায়গায় বিভিন্ন কর্মসূচি দেখার জন্য স্টাডিট্যুরের পালা। এমন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে কাজী শামসুন এই কাজে তাঁর অপারগতা জানান। কারণ তাঁর স্বামী নূরুল ইসলাম খান তখন গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে। স্বামীর পরিচর্যার জন্য শামসুন আপা এত বড় সুযোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করলেন। একথা শুনে মনে হলো— মানুষের মনুষত্বই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। নিজের স্বার্থের চেয়ে শামসুন আপা স্বামী সেবাকে বড় করে দেখলেন। এতে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। কাজী শামসুনকে এই প্রকল্প থেকে অব্যাহতি দেয়া হলো।

Pioneer in Village based website

কিন্তু এখন কী করা যায়? অন্য একজন অফিসারকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করার সময়ও নেই। এমন সঙ্কটময় সময়ে মোজাম্মেল হোসেন আমাকে এই কাজে যোগদান করতে অনুরোধ করলেন। সময় দিলেন মাত্র এক দিন। পরের দিন দুপুরবেলা তাঁকে ফোন করে জানাতে হবে আমার সম্মতি আছে কিনা। আমার জন্য এ এক বিরাট পাওয়া। কিন্তু চট্টগ্রাম থেকে নিজের ঘরবাড়ি, আত্মীয়-স্বজন, মা-ভাই বোন, বন্ধু-বান্ধব সব ছেড়ে ঢাকা চলে যেতে হবে, এটা ভাবতেই মনটা বিষণ্নতায় ভরে উঠলো। অফিস থেকে বাসায় গিয়ে মাহবুবকে সুসংবাদটি দিলাম। সব কথা শুনে সে আমাকে বললো, তোমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে আমি ধরে নেবো। মানুষের জীবনে সুযোগ বারবার আসেনা। হয়তো কোনদিন এই সুযোগ আর পাবেনা। সব কিছু চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিও। এই সময় সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছিলেন মাহবুবের বিশেষ বন্ধু জাহেদ হোসেন। জাহেদ ভাই একই কথা পুনরাবৃত্তি করে বললেন, There is a tide in the affairs of man which when taken at the flood leads on to fortune. Omitted, all the voyage of their life is bound in shallows and miseries. এই কথা বলে আমাকে ঢাকা যাওয়ার সম্মতি জানিয়ে দিতে বললেন।

সারারাত ঘুম হলোনা। আমার একমাত্র মেয়ে মুন্নির কী হবে, আমার স্বামীর ব্যবসার কী হবে ইত্যাদি চিন্তা করতে করতে ভোর হয়ে গেল। আমি তখনও পুরোপুরি সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছাইনি। দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভাসতে ভাসতে অফিসে এসে ঢুকলাম। টেলিফোন হাতে নিয়ে ঢাকায় আমাদের ডাইরেক্টরকে জানিয়ে দিলাম আমার সম্মতি আছে। তিনি উৎসাহিত হয়ে আমাকে এক সপ্তাহের মধ্যে অফিস এবং ব্যক্তিগত কাজ গুছিয়ে হাওয়াই প্রশিক্ষণে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দিলেন।

pathagar.com
Pioneer in village based website

হাওয়াই-এর East West Training Centre-এ দু'সপ্তাহ থেকে, মালয়েশিয়া ও ফিলিপিনে আরো দু'সপ্তাহ কাটিয়ে চট্টগ্রামে ফিরলাম। এবার আমার ঊনচল্লিশ বছরের স্মৃতিময় পাট গুটিয়ে চট্টগ্রাম ছেড়ে ঢাকায় চলে এলাম। শহীদ মিনারের উল্টোদিকে ৩৪ নম্বার ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টারে আমার ছোটবোন জাহানারা (জুবলী) ইসলামের বাসায় উঠলাম। তার স্বামী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর রফিকুল ইসলাম। অত্যন্ত অধ্যবসায়ী এবং প্রায় সময়ই লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। এই সুযোগে আমার বোন আমাকে যথেষ্ট সঙ্গ দিতো এবং তা আমার নিঃসঙ্গতা কাটাতে অনেকখানি সাহায্য করে।

এই সময় আবার দেখা হলো বহুদিনের পরিচিত সাহিত্যিক জাহানআরা নওশিনের সাথে। আমার ছোট আপার স্নেহাস্পদ এবং জুবলীর বন্ধু। এই সুবাদে আমরা তাকে মিতা ডাকি। আরো পরিচয় হলো প্রমীলা ও মৃদুলা ভট্টাচার্যের সাথে। সুযোগ পেলেই আমরা প্রমীলার সুমধুর কণ্ঠে কীর্তন শুনতাম। রফিক ভাইয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় তারা ঢাকার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত। জুবলীকে তারা আপন বৌদির মতো ভালোবাসে। সেই সূত্রে আমাকে আপা এবং মাহবুবকে দুলাভাই ডাকে।

প্রথম দিন অফিসে গিয়ে মোজাম্মেল হোসেনের সাথে দেখা করতেই তিনি আমাকে সমাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে সিনিয়ার প্রশাসন কর্মকর্তা সামাদকে ডেকে পাঠালেন। তাকে বললেন, মিসেস রহমানের অফিসরুম আমার রুমের চেয়েও সুন্দর করে সাজিয়ে দিন।

তার কাছে বিশ্বব্যাংকের কর্মকর্তারা আসবেন। তাদের সাথে সমভাবে চলতে যেন মিসেস রহমানের কোন অসুবিধা না হয়, এদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন। সামাদ আমার রুমকে সত্যি সত্যিই চমৎকার করে সাজিয়ে দিলেন। আমার প্রাত্যহিক কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে চলার জন্য সকলের সহযোগিতার অন্ত ছিল না।

মোজাম্মেল হোসেন আজ আর পৃথিবীতে নেই। তাঁর মতো একজন মহান ও উদার মানুষ আজকাল সচরাচর দেখা যায় না। একবার তাঁর সাথে আমি এবং আমাদের কলিগ শেখ নেয়ামত আলী ট্যুরে গিয়েছিলাম। জায়গাটার কথা ঠিক মনে পড়ছেনা। সম্ভবত খুলনা। সার্কিট হাউজে সন্ধ্যার দিকে কাজ সেরে এসে আমরা চা খাচ্ছিলাম। ঠিক এই সময় সমাজকল্যাণ অফিসার এসে জানালেন সার্কিট হাউজে কেবল একটি রুম পাওয়া গেছে ডিরেক্টর সাহেবের জন্য। নেয়ামত আর আমার জন্য কোন রুম নেই। মোজাম্মেল হোসেন আবার চেষ্টা করতে বললেন। রাত প্রায় আটটা। আমরা তখনও খাওয়ার টেবিলে। আবারও জানানো হলো অন্য কোন রুম পাওয়া যায়নি। নেয়ামত ও আমাকে সমাজকল্যাণ অফিসে থাকতে হবে। মোজাম্মেল হোসেন কোন চিন্তা না করেই তৎক্ষণাৎ বললেন, মিসেস রহমান একজন মহিলা। তার সম্মান রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। তাকে আমার রুমটা দিয়ে দিন। আমি অফিসে থাকতে পারবো। শেষ পর্যন্ত রাত দশটায় খবর পেলাম একজন অফিসার হঠাৎ ঢাকা চলে যাওয়াতে আর একটা রুম পাওয়া গেছে। তাঁর এই মহৎ দৃষ্টান্তে আমরা মুগ্ধ হলাম। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার কাছ থেকে এরূপ ব্যবহার সাধারণত বিরল। এমন উদার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন উচ্চপদস্ত কর্মকর্তা সুপারভাইজার হিসেবে যদি মাথার উপরে থাকে এবং কাজের লক্ষ্য সম্পর্কে যদি স্বচ্ছ ধারণা থাকে তাহলে যেকোন কাজে প্রবল উৎসাহ ও অদম্য প্রেরণার সঞ্চার হয়। মোজাম্মেল হোসেন একজন ব্যতিক্রমধর্মী দৃষ্টান্ত যিনি শুধু আমাকে নয়, সকলকে সবসময় উদ্বুদ্ধ করতেন। সুদৃঢ় নেতৃত্ব দানের গুণাবলী সবার মধ্যে থাকেনা। তিনি এই দুর্লভ গুণের অধিকারী ছিলেন।

বন্ধুগোষ্ঠীর সৃষ্টি

আমরা তখন ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কে নেদারল্যান্ড টেরেড্স হোমসের রেস্ট হাউজে দোতলায় থাকি। ঢাকায় ভালোভাবে তখনও বসবাস শুরু করিনি। ১৯৭৬ সালের মাঝামাঝি। Carpenter এর Sweet Sweet Smile Everyday গানটা আমার খুবই প্রিয়। সেদিন এই গানটি শুনে শুনে আমেরিকার স্মৃতি মন্থন করছিলাম সোফায় শুয়ে। এমন সময় আমার বন্ধু হাসনাহেনা জেলী তার দুই বন্ধু রাশিদুল হাসান এবং তার স্ত্রী হোসনেআরাকে (রেনু) নিয়ে হাজির। অজানা অতিথি দেখে আমি একটু ভ্যাবাচেকা খেয়ে শোয়া থেকে উঠে বসলাম। জেলী তাদেরকে আমার সাথে পরিচয় করে দিলো। হঠাৎ মনে পড়লো এই মহিলাকে আমি কোথায়ও দেখেছি। এমন লাবণ্যভরা চেহারা, একবার দেখলে ভোলা যায়না। কৌতুহলভরা কণ্ঠে তাকে জিগ্যেস করেই বসলাম, আপনার সাথে কিছুদিন আগে ওয়াশিংটনে দেখা হয়েছিলো না? একগাল হেসেই তিনি

উত্তর দিলেন আমার সাথে নয়, আমার জাঁয়ের সাথে দেখা হয়েছে নিশ্চয়। তিনি ওয়াশিংটনে থাকেন। মিসেস সাবের রেজা করিম। তাঁকে সকলে সেতারা ভাবি বলে ডাকে। কী আশ্চর্য, দু'ই জাঁয়ের চেহারায় এত মিল। দুই বোন বললে কেউ অবিশ্বাস করবে না। খুব সম্ভব ওয়াশিংটনে মাসুমা খাতুনের বাসায় ডিনারে সেতারা ভাবির সাথে দেখা হয়েছিল। মাসুমা খাতুন আমার ছোটবোনের ননদ। তিনি এক সময় বাংলাদেশ টেলিভিশনে ঘোষিকা হিসেবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। বর্তমানে ভয়েস অব আমেরিকায় একজন উচ্চপর্যায়ের সাংবাদিক। আমি আর মাহবুব যখন আমেরিকা গিয়েছিলাম, মাসুমা আমাদের আপনজনের মতো খুবই আদর যত্ন করেছিল। যাহোক, জেলীর দুই বন্ধুকে আমাদের ভীষণ ভাল লাগলো। কিছুদিনের মধ্যে তাদের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠলো। আমরা আপনি থেকে তুমি সম্বোধনে অভ্যস্ত হয়ে পড়লাম। রাশিদুল হাসানকে বীরু এবং তার স্ত্রীকে রেনু বলেই ডাকা শুরু করলাম। তারা ধানমন্ডির ১৪ নম্বর সড়কে থাকতো। ক্রমে আমরা একই পরিবারের মতো হয়ে গেলাম। প্রত্যেকদিনই দু'পরিবার এক সাথে কিছুক্ষণ সময় না কাটালে আমাদের ভালো লাগতোনা। রেনু অত্যন্ত কর্মঠ। ঘর সংসার ব্যবস্থাপনায় খুবই নিপুণ। মাহবুবকে সে বড় ভাইয়ের মতো শ্রদ্ধা করে। মাহবুব তাকে বলতো, সব সময় কিছু না কিছু নিয়ে ব্যস্ত, তার নাম রেনু। এভাবে আনন্দমুখর ছিল আমাদের দিনগুলো।

তখন ইশরাক প্রায়ই রাতে এসে আমাদের কাছে থাকতো। তার জ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত। তাই মাহবুবের সাথে তার আলোচনা জমতো ভালোই। এর মধ্যে আমার বন্ধুদের সঙ্গেও তার সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠলো। ইশরাকের সুন্দর প্রদীপ্ত চেহারা এবং চারিত্রিক মাধুর্যের জন্য প্রথম দেখাতেই সকলে তাকে ভীষণভাবে পছন্দ করে বসে। চট্টগ্রামে আমাদের ৬০ নম্বর দেওয়ান বাজারের বাসায় ইশরাক প্রায়ই বেড়াতে আসতো। ও তখন ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজে আমার বড় ভাইয়ের ছেলে হাফিজের সাথে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে। তার বাড়ি নওগাঁ জেলায়। দূরে বলে দু'চারদিনের ছুটি পেলে হাফিজের সাথে বেড়াতে আসতো রুমঘাটায় আমার বাপের বাড়িতে। তাকে আমি খুবই স্নেহ করতাম। হয়তো এই কারণেই সেও আমাকে আম্মু ডাকা শুরু করলো এবং আমার মেয়ে মুন্নিকে আপন ছোটবোনের মতো আদর করতো। তার মতো একজন ভাই পেয়ে মুন্নির খুশির অন্ত ছিল না। স্কুল ছুটি হলেই ভাইয়ার জন্য আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করতো। বহুদিন পর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় শুনলাম ইশরাক মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে এবং বিবিসিতে যুদ্ধরত অবস্থায় তাকে বেশ কয়েকবার দেখানো হয়েছে। তার জন্য আমি অত্যন্ত গর্ব অনুভব করি। পরবর্তীকালে তার ছোটভাই ইশতিয়াকের সঙ্গে মুন্নির বিয়ে হয়।

বীরু তখন ইনডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের ডাইরেক্টর জেনারেল। তার সাথে আমাদের বন্ধুত্ব হওয়ার পর দেখলাম আমাদের আরো অনেক নতুন বন্ধু জুটে গেল। যাদের চেনার কোন সম্ভাবনা ছিল না তারাও দিন দিন আমাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে লাগলো। বুঝতে পারলাম তাদের উদ্দেশ্য আমাদের মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রির ডি.জি.র সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা। এইভাবে সমাজের অন্য চেহারাটিও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে

pathagar.com
Pioneer in Village based website

উঠলো। একদিন এক শিল্পপতি এক মূল্যবান উপঢৌকন দিয়ে গেল। এতে আমরা খুবই বিব্রতবোধ করলাম। ওই শিল্পপতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এমন না যে তার উপহারকে সানন্দে গ্রহণ করা যায়। কয়েকদিন পর তিনি আবার এসে তার আসল উদ্দেশ্যের কথা বললেন। বীরুর হাতে একটা শিল্পের অনুমতির জন্য তিনি আবেদন করেছেন। এই কাজটা যেন আমরা করিয়ে দিই। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে তার দেয়া উপহারটি ফেরৎ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। তাকে বললাম, ওই কাজটি ন্যায্য হলে এমনিতেই হয়ে যাবে। বীরু এদেশের শিল্প উন্নয়নের ব্যাপারে খুবই উৎসাহী এবং নিবেদিতপ্রাণ। এদেশের শিল্প উন্নয়নে তার যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

বীরু অত্যন্ত মিষ্টভাষী। তার মতো বন্ধুবৎসল এবং পরোপকারী সচরাচর দেখা যায়না। অসংখ্য বন্ধুরা তাকে অকৃত্রিম ভালোবাসে। এক সময় জানতে পারলাম বীরু আমাদের বিশেষ বন্ধু প্রয়াত মনসুর আহমদের ফুফাতো ভাই। মনসুর ভাই চট্টগ্রামে এ.ডি.সি জেনারেল হিসেবে বছর দু'য়েক পোস্টেড ছিলেন। তার সাথে আমাদের খুবই প্রীতির সম্পর্ক ছিল। তিনি চমৎকার ছোট গল্প লিখতেন। ঐ সুবাদে বয়সের তফাৎ থাকা সত্ত্বেও মাহবুবের সঙ্গে তার ছিল গভীর বন্ধুত্ব। মনে পড়ে তখন দেশে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন চলছে। ওই সময় কবিয়াল রমেশ শীলের মৃত্যু হলে মনসুর ভাই মাহবুবের সঙ্গে তাঁর নিজের জিপ গাড়ি নিয়ে গোমদন্ডী গ্রামে গিয়েছিলেন। সামরিক শাসকের কাছে রমেশশীল ছিলেন একজন বিপজ্জনক ব্যক্তি। একজন এ.ডি.সি হয়ে তাঁর মৃত্যুতে যোগদান করার মধ্যে যে ঝুঁকি ছিল তা অগ্রাহ্য করে মনসুর ভাই তাতে যোগদান করেছিলেন। গুণীজনদের প্রতি এমনি ছিল তার শ্রদ্ধাবোধ। আমরা ঢাকায় আসার পর তার আকস্মিক এবং অকাল মৃত্যু সংবাদে শোকাভিভূত হয়ে পড়েছিলাম।

ধীরে ধীরে আমাদের সাথে আরো বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো বীরুর বন্ধু ডাক্তার রশীদউদ্দীনের সাথে। তিনি পিজি হাসপাতালে নিউরোলজী ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর। আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী। তিনি এক মজার মানুষ। তাকে আমরা এবসেন্ট মাইন্ডেড প্রফেসর বলি। তাকে নিমন্ত্রণ করলে কয়েকবার স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। এরপরও একবার রশীদ নির্ধারিত তারিখের পরের দিন আমাদের ডিনারে এসে হাজির। আমরা ধানমন্ডি থাকতে একবার ফোনে তাকে ডাকা হলো। হয়তো কারো অসুস্থতার কারণে তার পরামর্শ তখনি প্রয়োজন। তিনি এখনি আসছি বলে ভুল করে প্রতিদিনের মতো পিজি হাসপাতালে গিয়ে উপস্থিত। গাড়ি থেকে নামতেই বুঝতে পারলেন 'হেথা নয়, অন্য কোথাও।' সেখান থেকে আবার গাড়ি ঘুরিয়ে আমাদের বাসায় এসে বললেন, sorry, আমি ভুল করে পিজিতে চলে গেছিলাম। এধরনের ভুল আমার প্রায়ই হয়। নিঃসঙ্কোচে তিনি এসব ভুল আবার সবসময় স্বীকারও করেন। এমন আপনভোলা লোক রশীদ। অথচ মস্তিস্ক অপারেশনের মতো এমন একটি জটিল অস্ত্রোপাচারে সিদ্ধহস্ত ডাক্তার এই উপমহাদেশে দ্বিতীয়জন আছে কিনা সন্দেহ। একই মানুষের মধ্যে এরকম বিপরীতধর্মী স্বভাবের সহ-অবস্থান সাধারণত বিরল। এভাবে বীরু-রেনুর মাধ্যমে আমাদের একটা বন্ধুগোষ্ঠীর সৃষ্টি হলো। এই গোষ্ঠীতে পরবর্তীতে অন্তর্ভুক্ত হলো জেলীর আরেক বন্ধু জয়াপতি, দানবীর আর.পি. সাহার সুযোগ্য কন্যা। তার ব্যবস্থাপনায় অনেক

সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি গড়ে উঠেছে। দিনে দিনে আমাদের বন্ধুত্ব গাঢ়তর হয়। এই প্রবীণ বয়সেও আমরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিবিড় আনন্দ অনুভব করি।

ঢাকা এসে সমাজকল্যাণ বিভাগে মাতৃকেন্দ্রের প্রধান হিসেবে যোগ দিলাম। সাময়িকভাবে ঢাকা বিভাগের স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রেশনের দায়িত্বেও ছিলাম। এই সূত্রে অনেকের সাথে পরিচয় হয়। যোগাযোগ হয় বাংলাদেশ ইকনমিক এসোসিয়েশনের যুগ্ম-সম্পাদক অধ্যাপক জাহান আরা হক এবং সদস্য অধ্যাপক আক্তারী জলিলের সাথে। তাঁরা ওই সময় নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকায় একটি জাতীয় সম্মেলন করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এই বিষয়ের প্রতি আমারও একাত্মতা থাকার কারণে তাঁরা আমাকে সাদরে এই কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করলেন। ১৯৭৬ সালের মে মাসে (৯ থেকে ১১ তারিখ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার স্টুডেন্টস সেন্টারে Women in Socio Economic Development in Bangladesh শিরোনামে তিন দিনব্যাপী একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জাহান আরা হক এই সম্মেলনের আহ্বায়ক ছিলেন। সারা দেশ থেকে প্রায় তিন'শ নারী এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশে নারীদের দ্বারা সংগঠিত এবং পরিচালিত এটাই সর্ব প্রথম জাতীয় সম্মেলন। এই দিক থেকে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। এতে নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। পরিবার পরিকল্পনায় মাতৃকেন্দ্রের ভূমিকাকে কেন্দ্র করে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলাম আমি। ওই সময় আরো পরিচয় হয় অধ্যাপক খালেদা সালাউদ্দীনের সাথে।

এই সম্মেলনের মাধ্যমে আমি নারী উন্নয়ন প্রচেষ্টার সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হবার সুযোগ পেলাম। ঢাকা এসে বোধকরি সরকারি চাকরির কাঠামোর বাইরে এটাই আমার প্রথম যাত্রা। এই সম্মেলনই আমাকে ঢাকায় নারী উন্নয়ন কর্মীদের কাছাকাছি নিয়ে যায়।

যতদূর মনে পড়ে সত্তর দশকের শেষার্ধে জাহান আরা হক এবং আক্তারী জলিল নারী আন্দোলনের অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন। তখন থেকে তাঁদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। মাঝপথে আক্তারী হারিয়ে গেছেন। তিনি এখন স্বর্গলোকে। জাহান আরা এবং খালেদা সালাউদ্দীনের সাথে নিয়মিত দেখা হয়। ওমেন ফর ওমেন-এর সভায়, নারী উন্নয়ন বিষয়ক অঙ্গনে। জাহান আরার জন্য আমার মনের গভীরে বিশেষ স্থান রয়েছে। ওই সময়ে তাঁর মাধ্যমে নারী উন্নয়ন আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ না ঘটলে হয়তো আমি অনেক পেছনে পড়ে থাকতাম।

আরেকজন বন্ধু গোলাম সারওয়ার। সিনিয়র আয়কর আইনজীবি। আমাদের পরম হিতৈষী। আপদে-বিপদে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন সবসময়। ১৯৯৬ সালে আমার যখন একসিডেন্ট হয়ে কলার-বোন ও রীবস্ ভেঙে শয্যাশায়ী ছিলাম, মনে পড়ে, রাত একটার সময় সারওয়ার ভাই আমার জন্য ডা. সালে তালুকদারকে এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর সাথে ছিল এডভোকেট আমিন আহমদ মন্টু। তাঁরা দু'জনেই অত্যন্ত পরোপকারী। যোগাযোগ হলো ডা. নূরুল আমিনের সাথে। চট্টগ্রামে থাকতে আমাদের পরিবারের কারো নাক কান গলায় সমস্যা হলেই ছুটে যেতাম তাঁর কাছে। আমাদের জন্য তাঁর অবারিত দ্বার। এখন যাই মহাখালিতে অবস্থিত সাহিক-এ। এর

Ghuati.com
Pioneer in village based website

সাথে আজীবন সদস্য হিসেবে আমিও জড়িত আছি, যদিও আমার বিশেষ কোন অবদান নেই। নাক কান গলার চিকিৎসার সস্তা এবং সুব্যবস্থা বিশেষ করে বধির শিশুদের মতো প্রতিবন্ধীদের জন্য এত যত্ন সহকারে শিক্ষার ব্যবস্থা করে ডা. নূরুল আমিন এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। চট্টগ্রামের বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক ডা. রবিউল হোসেনও এই প্রতিষ্ঠানে সবসময় সক্রিয় সহযোগিতা করেন। জাতীয় প্রফেসর ডা. নূরুল ইসলামের কাছে যাওয়া শুরু করলাম। তাঁর এপয়েন্টমেন্ট পাওয়া আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো দুষ্কর। তিনি প্রথম দিনই আমার প্রেশক্রিপশনে লালকালি দিয়ে কী যেন লিখে দিলেন সাংকেতিক পদ্ধতিতে। বললেন, রিশিপশনে এটা দেখাবেন। আপনাদের এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবেনা। এভাবে তাঁর কাছে মাহবুবকে নিয়ে যেতাম। তাঁকে একদিন জিগ্যেস করলাম, কী উপায়ে তিনি এত বছর সুস্বাস্থ্য রক্ষা করেছেন। বললেন, কম খাবেন। বেশী খেলে মানুষ অসুস্থ হতে পারে, কম খেলে কোন ক্ষতি হয়না। আস্তে আস্তে কথা বলবেন, শুনবেন বেশী। নিজের এনার্জি সঞ্চয় করে রাখবেন। অপ্রয়োজনে তা ব্যয় করবেন না। তাঁর এ মূল্যবান কথাগুলো মেনে চলতে চেষ্টা করেছি।

ঢাকায় এসে মাহবুব প্রায়ই পেটের ব্যাথায় ভুগতো। চিকিৎসকের সন্ধান করতে গিয়ে জেলী নিয়ে গেল ডা. আজাদ খানের কাছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। তাঁর চিকিৎসায় সবসময় সুফল পেয়েছি। আরেক জনের কথা না বললে নয়। ডা. মনিরুজ্জামান। কলাবাগানে তাঁর ফিজিওথেরাপী ক্লিনিকে গেলে মনটা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। মাহবুব এবং আমাকে স্পনডিলাইটিস চিকিৎসার জন্য প্রায়ই তার কাছে যেতে হয়। মনিরুজ্জামান ভাই প্রতিটি রোগীকে মজার মজার কথা বলে আনন্দে মুখরিত করে রাখেন।

Pioneer in village based website

বহুদিন পরে ঝিলু ভাইয়ের (মোহাম্মদ নুরুল কাদের) সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করলাম। পুরোনো বন্ধুত্ব পুনরুজ্জীবিত হলো। তাঁর আতিথেয়তার কথা ভোলা যায়না। একদিন নিজে বাজারে গিয়ে বড় বড় কৈ মাছ কিনে এনে রান্না করে আমাদের খাওয়ালেন। চট্টগ্রামে এ.ডি.সি থাকতে প্রায়ই আমরা একসাথে বেড়াতে যেতাম। কার্ড খেলতাম। আড্ডায় বসতাম। এ.ডি.সির বাসভবনটা ছিল চট্টগ্রাম কোর্ট বিল্ডিংয়ের পাশাপাশি পাহাড়ের ওপর। পরীর পাহাড় নামে পরিচিত। অনেক সিঁড়ি ভেঙে সে বাড়িতে যেতে হতো। এক সময় প্রখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় বাস করতেন। ত্রিশ দশকের মাঝামাঝি তিনি ছিলেন চট্টগ্রাম জেলার এডিশনাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। পর্তুগীজ নির্মাণ-শৈলীতে তৈরি এ বাড়ি ছিল পুরোনো ঐতিহ্যবাহী। ঝিলু ভাই এই বিল্ডিংকে নতুনরূপে সজ্জিত করলেন। তাঁর বসার ঘরে আমরা বহুবার গানের আসর করেছি। চট্টগ্রামের গুণীজনদের সমাবেশ করেছি। মাহবুব কয়েক ঘন্টার মধ্যেই এসবের ব্যবস্থা করে ফেলতো। তাই যখন তখন তার ডাক পড়তো। সেসব দিনের স্মৃতি এখনো মনের মাঝে উজ্জ্বল হয়ে আছে। পরবর্তীতে রোকেয়া কাদের তারিন-এর সাথে ঝিলুভাই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। পেশায় এডভোকেট হয়েও তারিন স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর ব্যবসাগুলো দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করছে। আজকাল কিছু কিছু নারীকে সুদক্ষ ব্যবসায়ী হিসেবে দেখা যায়। এতে আমাদের মনে আশার সঞ্চার হয়।

কাজের মাধ্যমে সাক্ষাৎ হয় মাশহুদা খাতুন শেফালীর সাথে, নারী উন্নয়নের সংগ্রামে সে নিবেদিতপ্রাণ। পরিচিত হলাম রীনা সেন গুপ্তার সাথে। সেভ দি চিলড্রেন ডেনমার্ক-এ কনসালটেন্সি করার সময় তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। তার সাথে দেখা না হলে জীবনে অনেক কিছু অপূর্ণ থেকে যেতো। সদা হাসিমাখা মুখ। তাকে টেনশন করতে দেখিনি কোনদিন। কাজকে ভয় পায়না। কর্মক্ষেত্রে যে কোন সমস্যার চমৎকার সমাধান পাওয়ার জন্য তার কাছে যেতে হত। বয়সে অনেক ছোট কিন্তু তাকে বন্ধু বলে ডাকতে ভালো লাগে। সম্প্রতি পরিচয় হয় কবি লিলি হকের সঙ্গে। সুন্দর রোমান্টিক কবিতা লেখে। আমরা তার কবিতা খুব পছন্দ করি। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে দেখা হয় ডা. আনিনা শেখের সাথে। আমার জামাতা ইশতিয়াকের ছোট খালা। লন্ডনে থাকে। মাঝে মাঝে দেশে আসে। তাকে আমরা মিষ্টি বলে ডাকি। তার হাসিতে যেন মিষ্টি ঝরে। আমরা সত্যিই বন্ধু ভাগ্যে ভাগ্যবান।

স্থায়ী বাসিন্দা হলাম

ঢাকায় এসে (জুন ১৯৭৫) কিছুদিন গেস্ট হাউজ, কিছুদিন ধানমন্ডি এবং লালমাটিয়ার ভাড়া বাড়িতে বাস করতে গিয়ে নানারকম অসুবিধার মধ্যে দিন কাটিয়েছি। প্রায়ই মনে পড়তো চট্টগ্রামের বিস্তৃত বারান্দা, বড় বসার ঘর সংবলিত দেওয়ান বাজারে ছায়াঘেরা আমাদের বাড়ির কথা। মনে পড়তো সেই কামরাঙ্গা গাছটির কথা, যার ছায়ায় বসে মুন্নি তার বন্ধুদের নিয়ে খেলতো। মনে পড়তো এই বাড়িতে কতো জ্ঞানী-গুণী জনের আনাগোনার কথা। কবরী সারোয়ারের কথা। ছোটবেলায় নৃত্যশিল্পী রুণু বিশ্বাসের সাথে আমাদের বাসায় আসতো। চমৎকার নাচতো। তার মিষ্টি লাবণ্য ভরা হাসি দেখে মনটা ভরে যেতো। অসাধারণ প্রতিভাময়ী কবরী আজ আমাদের গর্ব। চট্টগ্রামের গর্ব। সে কেবল একজন জনপ্রিয় অভিনেত্রী নয়, কীর্তিমান চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবেও সুপ্রতিষ্ঠিত। একজন সচেতন সংস্কৃতিসেবী হিসেবে তার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। ওই বাড়ির স্মৃতি আমাদের বড়ই পীড়া দিত। ভাবতাম ঢাকায় কি একটি ছোট্ট বাড়ি করা যায় না? এই লক্ষ্যে গুলশান, বনানিতে সরকারি জমির জন্য আবেদন করতে লাগলাম। দেখলাম আমাদের সঙ্গে যারা দরখাস্ত করেছিল তাদের অনেকে জমি পেয়ে গেছে। বুঝলাম তদ্‌বিরের অভাবে আমরা পাই না। অথচ উপরিতলায় মন্ত্রী পর্যায়েও আমাদের বেশ কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব ছিল। মাহবুব ভয়ানকভাবে তদ্‌বির বিরোধী। তাই আমরা কোনদিন এই প্রয়োজনের কথা কোন বন্ধু-বান্ধবকে বলতে পারিনি।

একদিন দেখলাম পত্রিকায় উত্তরায় জমি বিতরণের বিজ্ঞপ্তি। ভাবলাম এবার ভাগ্যের পরীক্ষা হবে। সমস্ত শর্ত পূরণ করে ডি.আই.টির নিয়ম অনুযায়ী টাকা জমা দিয়ে দরখাস্ত করে দিলাম। দিন যায়, মাস যায়, বছর গড়িয়ে যায়, জমির কোন খবর নেই। একদিন দৈনিক সংবাদ-এ দেখলাম উত্তরায় জমি বিতরণের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। বহু যত্ন সহকারে পড়ে দেখলাম, কোথায়ও আমাদের নাম নেই। ফলে ঐ দিনই

Ghorati.com
Pioneer in village based website

টাকা ফেরত নেয়ার জন্য মাহবুব ডি.আই.টিতে গেল। আমাদের এক জামাতা এক্সেকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার, এমদাদুল ইসলাম, ডি.আই.টিতে চাকরিরত ছিল। বর্তমানে চিফ ইঞ্জিনিয়ার। তার কক্ষে বসে আমাদের আমানতের টাকা তুলে আনার জন্য রশিদটি তার হাতে দিয়ে মাহবুব বললো, টাকাটা তাড়াতাড়ি পেলে ভালো হয়। সে রশিদটি নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগে চলে যায়। মাহবুব টেবিলের ওপর রাখা বাংলাদেশ অবজারভার পত্রিকায় জমির তালিকাটি আবার পড়তে গিয়ে অকস্মাৎ দেখল উত্তরা তিন নম্বর সেক্টরে আমাদের নামে পাঁচ কাঠার একটি জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। এমদাদ ফিরে এসে কিছু বলার আগেই মাহবুব এই সুসংবাদটি তাকে দিলো। সে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে জেঠাআব্বাকে কংগ্রেচুলেট করলো। বললো, তাড়াতাড়ি সে আমাদের জমিটি পজেশন দেয়ার ব্যবস্থা করবে। এভাবে কোন তদ্‌বীর ছাড়াই লেকের পাড়ে আমরা সুন্দর একখন্ড জমি পেয়ে গেলাম। চমৎকার লোকেশন কিন্তু জনবসতি বিরল। আল্লার কাছে শোকরিয়া আদায় করলাম। এই সুখবরটি সিঙ্গাপুরে আমার মেয়ে মুন্নিকে এবং জামাতা ইশতিয়াককে জানালাম। পেশায় ইশতিয়াক একজন স্থপতি। তাকে বাড়ির নকশা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে বললাম। তিন বছর সিঙ্গাপুরে অবস্থান শেষে তারা দেশে ফিরলে আমরা ওই জমিতে বাসস্থান নির্মাণ করার প্রস্তুতি নিলাম। ইশতিয়াক অত্যন্ত উৎসাহ ভরে বেশ কয়েকটি নকশার খসড়া তৈরি করলো। সব কয়টি দেখে আমরা ইশতিয়াকের পছন্দমতো নকশাটিই বেছে নিলাম। সেই সময় আমার এক খালাতো বোন ঝর্ণা উত্তরার ছয় নম্বর সেক্টরে একটি বাড়ি তৈরি করেছিল। সে থাকতো ধানমন্ডিতে। তার স্বামী ডা. সিরাজুল হক তখনো লন্ডন থেকে দেশে আসেননি। সে একাই সাহস করে তার বাড়িটি তৈরি করেছিল। তার উৎসাহ এবং সহযোগিতায় আমরা উত্তরায় বাড়ি নির্মাণের কাজ শুরু করি। চট্টগ্রাম থেকে মাহবুবের জেঠাতো ভাইয়ের ছেলে খাইরুল আনোয়ার চৌধুরী এবং সদ্য ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করা এক নাতি এম. হাসান চৌধুরীকে চট্টগ্রাম থেকে বাড়ির নির্মাণ কাজ দেখাশোনা করার জন্য ঢাকায় আনা হলো। সামগ্রিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিল ইশতিয়াক। আমরা তখন লালমাটিয়ায় ভাড়া বাসায় থাকি। সেখান থেকে রোজ উত্তরায় চলে আসতাম। মাঝে মাঝে বন্ধু জাহেদ হোসেনকে মাহবুব নিয়ে আসতো এবং তাঁর পরামর্শও চাইতো। চোখের সামনে বাড়ির নির্মাণ কাজ এগিয়ে যাচ্ছে দেখে আমরা খুব আনন্দবোধ করতাম। বাড়ির কাজ দেখার জন্য নওগাঁ থেকে ইশতিয়াক নিয়ে এলো এক সাহসী যুবক, নাম ওসমান গনি। সে এই নির্জন উত্তরায় একা রাত জেগে আমাদের বাড়ির নির্মাণ সামগ্রী পাহারা দিত। এখনো সে আমাদের সঙ্গে আছে।

উত্তরা তখন ছিল অত্যন্ত নির্জন অঞ্চল। মাত্র ছিটেফোঁটা কয়েকটা বাড়ি। আমাদের সামনের রাস্তা দিয়ে সারাদিনে কয়েকটি গাড়ি চলাচল করতো। শুনেছি রাত্রে পাশের পল্লী অঞ্চল থেকে ডাকাত এসে হানা দিতো। তখনো আশে পাশে কয়েকটি তাল গাছ ব্যতীত কোন গাছ পালা ছিল না। এখন ইউকেলিপটাস, কৃষ্ণচূড়া, রেইন-ট্রি, কাঠাল ও আম গাছে ভরে গেছে আমাদের লেকের পাড়। কী সুন্দর সুশীতল ছায়া। গ্রীষ্মে কৃষ্ণচূড়ার আলোয় ভরে যায় দিগন্ত। প্রায় আঠারো মাস অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ১৯৮৭ সালে বাড়িটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। সেপ্টেম্বর মাসে লালমাটিয়ার ভাড়া বাসা থেকে

Pioneer in village based website

আমরা উত্তরায় নিজ বাড়িতে চলে আসি। মাহবুবের এক কালে সম্পাদিত 'সীমান্ত' মাসিক সাহিত্য পত্রিকার নাম অনুযায়ী এ বাড়ির নাম রাখা হলো 'সীমান্ত'।

তখন উত্তরায় চেনা জানা বাসিন্দাদের মধ্যে ছিলেন কাস্টমস্ কালেক্টার এস.এম আকরাম। চা বাগানের মালিক জাহানজেব রশীদ চৌধুরী। বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক কর্ণেল এম. আলী। আমার ভাই আহমদ-ফরিদ ৭ নম্বর সেক্টরে তার বাড়ি তৈরির কাজ সবেমাত্র শুরু করেছে। প্রথম প্রথম ভাবতেই পারিনি, এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে প্রতিদিন কি করে ধানমন্ডিস্থ আমার ইউনিসেফ অফিসে আসা যাওয়া করবো। মাহবুবের অফিস মতিঝিলে। সেই বা কি করে এই দীর্ঘ পথে রোজ যাতায়াত করবে। কিছুদিন যেতে না যেতেই আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়লাম এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায়।

নিজের বাড়িতে থাকার যে কী আনন্দ তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি। প্রয়োজন এবং সৌন্দর্যের সমন্বয়ে তৈরি করেছিল ইশতিয়াক এর নকশা। তাই বাড়িতে বাস করতে গিয়ে কোন প্রয়োজনের অভাব বোধ করি না। যা চাই তা হাত টানলেই পাই। এভাবে আমরা আমাদের সমুদ্রবেষ্টিত, পাহাড় ঘেরা জন্মস্থান চট্টগ্রাম ছেড়ে ঢাকায় স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেলাম।

ডা. ইব্রাহীমের সান্নিধ্যে

আমি যখন সমাজকল্যাণ বিভাগে মাতৃকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে ব্যস্ত, তখন ডা. ইব্রাহীম বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক মন্ত্রী। মাতৃকেন্দ্রের আসল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামাঞ্চলে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে জনমত সৃষ্টি এবং ছোট পরিবারের আদর্শে নারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা। এই সময় একই উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্প ছয়টি মন্ত্রণালয়ে গ্রহণ করা হয়েছিল। বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের অধীনস্থ মহিলা সমবায় সমিতির দায়িত্বে ছিলেন তাহরুন্নেসা আবদুল্লাহ। মাতৃকেন্দ্রের দায়িত্বে ছিলাম আমি। বাংলাদেশের উনিশটা গ্রামীণ থানায় তিন বছরের মধ্যে মোট ৭৬৪টি মাতৃকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার কথা। এর মধ্যে গোপালপুর, রাঙ্গুনিয়া, ঝিকরগাছা এবং শেরপুর এই চারটি জায়গাকে সমন্বিত কার্যক্রমের থানা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এগুলোতে আমি এবং তাহেরা একসঙ্গে কাজ করতাম। ডা. ইব্রাহীম যখন মাঠ পরিদর্শনে যেতেন, তাঁর হেলিকপ্টারে করে অনেক সময় তাহেরা এবং আমাকে নিয়ে যেতেন। তাঁর স্মরণ শক্তি এতই তীক্ষ্ণ ছিল যে আমরা ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতাম, কোন্ সময় কী তথ্য জিগ্যেস করে বসেন। তাঁর সাথে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা যার যার প্রকল্পের সম্ভাব্য তথ্যাদি মুখস্থ করতাম। তিনি প্রায়ই পরিদর্শনের জন্য পূর্ব পরিকল্পিত থানা অফিসে যেতে চাইতেন না। হেলিকপ্টারে উঠেই নির্দেশ দিতেন তাঁর পছন্দমতো কোন বিশেষ গ্রামে যাওয়ার জন্য, তিনি যেন মাতৃকেন্দ্র কিংবা মহিলা সমবায় সমিতির সদস্যদের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারেন। সাথে করে নিয়ে যেতেন আমাদের দেয়া রিপোর্ট। সমিতির সদস্যদের সাথে কথা বলে যাচাই করে দেখতেন আমাদের পরিবেশিত খবর সঠিক কিনা। সদস্যরা যখন সঠিক উত্তর দিতেন তখন তাঁর খুশির অন্ত

Pioneer in Village based Website

থাকতো না। সাথে সাথে তাহেরা এবং আমার একগাদা প্রশংসা করতেন। আমরা অনেক সময় বিব্রতবোধ করতাম। কিন্তু আবার সামান্য ত্রুটিতেও তিনি রেগে যেতেন। তক্ষুণী ত্রুটি সংশোধন করে আমাদের লেকচার দেওয়া শুরু করতেন। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ছিল অপরিসীম।

একদিন তাঁর সাথে আমরা দু'জন যশোরের ঝিকরগাছা মাতৃকেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। সেখানে লাল শাকের বাগান করেছিল মাতৃকেন্দ্রের একজন সদস্য। ক্ষেত থেকে একগুচ্ছ শাক হাতে নিয়ে তিনি জিগ্যেস করলেন— এই শাকে কী ভিটামিন আছে এবং তাতে কি উপকার হয়। একজন সদস্য সঠিক উত্তর দিয়েছেন বলে তাকে অভিনন্দন জানালেন। তখন তাঁর চেহারা দেখে মনে হলো আনন্দ উপ্‌চে পড়ছে। এরপর গেলেন একটি মহিলা সমবায় সমিতিতে। সেখানে তখনো সবজী বাগান করা হয়নি। কিন্তু তিনি সদস্যদের জিগ্যেস করে বসলেন সবুজ শাক খাওয়ালে বাচ্চাদের কী কী উপকার হয়। সকল সদস্য নিশ্চুপ, তাহেরা হতবুদ্ধি হয়ে প্রস্তুত হচ্ছিল তাঁর বকুনি শোনার জন্য। এমন সময় নিজের অজান্তে হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে সত্যি কথাটা বের হয়ে গেল। বললাম, এই সমিতি মাত্র কয়েক দিন আগে গঠিত হয়েছে। এখনও তাদের কোন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি। তাই তারা এ সম্পর্কে এখনও অবগত নয়। তাহেরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। আমরা সকলে এ যাত্রা রক্ষা পেলাম। ক্রমে তাহেরার সাথে আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো। চির মিষ্টভাষী এবং বহু গুণে গুণান্বিতা তাহেরা আমার চিরকালের বন্ধু। আমরা দুজন ঢাকা পর্যায়ে মাতৃকেন্দ্র এবং সমবায় সমিতির মধ্যে চমৎকার সমন্বয় সাধন করে চলতাম। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে দুইটি সরকারি বিভাগের সমন্বয় করা খুবই দূরূহ ব্যাপার। তাদের মধ্যে যথেষ্ট কমপিটিশন হতো। মাঝে মধ্যে একে অপরের সদস্য নিয়ে টানাহেঁচড়াও করতো। নিয়মিতভাবে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনে না গেলে এই অভিজ্ঞতা আমরা এতো প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে পারতাম না।

Pioneer in village based website

এই সময় পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সচিব ছিলেন ড. এম.এ সাত্তার। তাঁর মতো একজন তেজস্বী অফিসার সাধারণ মানুষের সাথে কিভাবে মিশে যেতে পারতেন, তা তাঁর সাথে একবার মেহের পঞ্চগ্রামে গিয়ে দেখেছি। চাঁদপুর থানার অন্তর্গত মেহের পঞ্চগ্রামে ছিল ড. সাত্তারের বাড়ি। সেখানে তিনি গড়ে তুলেছিলেন একটি আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প। এই সময় আমাদের আরো কাজ করার সুযোগ হয়েছিল তৌফিক এলাহী চৌধুরী এবং আকমল হোসেনের সাথে। খুব সম্ভব তাঁরা দু'জনেই একই মন্ত্রণালয়ে উপ-সচিব ছিলেন। পরবর্তীকালে যখন তৌফিক এলাহী চৌধুরী বাংলাদেশ ব্যুরো অফ ষ্ট্যাটিষ্টিক্স-এর এবং আকমল হোসেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, তখন তাঁদের সাথে আবার কাজ করার সুযোগ পাই। তাঁরা দু'জনেই করিতকর্মা। কাজের জন্য কোনদিন তাঁদের কাছ থেকে হতাশাব্যঞ্জক উত্তর পাইনি।

বহুদিন পর ডায়বেটিক সেন্টারে একদিন ডা. ইব্রাহীমের সঙ্গে দেখা। তখন আমি মাতৃকেন্দ্র ছেড়ে ইউনিসেফে যোগ দিয়েছি। তাঁকে সালাম দিয়ে সম্ভাষণ জানাতেই দেখলাম তাঁর চেহারা ক্রোধান্বিত। আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, তোমার সাথে কোন কথা নেই। মোটা অর্থের বিনিময়ে এমন সুন্দর প্রকল্প ছেড়ে ইউনিসেফে চলে গেলে।

ইউ.এন.-এর নিয়মই তাই। তারা টাকার লোভ দেখিয়ে আমাদের ভালো ভালো মাথাগুলো কিনে নেয়। এই পলিসি আমি পছন্দ করি না। আমি হতভম্ভ হয়ে তাঁর দিকে করুণ দৃষ্টি দিলাম। জানতাম, তাঁর এই প্রশ্নের কোন উত্তর আমার কাছে নেই। ধীরে ধীরে ডায়বেটিক সেন্টারে অসংখ্য মানুষের ভিড়ে ডুবে গেলাম।

গাড়িতে বসে তাঁর কথা ভাবতে ভাবতে অফিসের দিকে রওনা হলাম। আসলে তাঁর মতো এমন স্পষ্টবাদী মানুষ আমাদের সমাজে বিরল। জীবিত থাকতেই তিনি কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। মানুষের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম মমত্ববোধ সারাজীবন তাঁকে তাড়িত করেছে দুর্গত মানুষের সেবায়। চিকিৎসা শাস্ত্রে এমন সুপন্ডিত এবং সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে এমন সজাগ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ আমি জীবনে খুব কম দেখেছি। তাঁর মহান কীর্তি ডায়বেটিস সমিতি এখন শত সহস্র মানুষের সেবায় নিয়োজিত। ডায়বেটিস সেন্টারে মাঝে মধ্যে তাঁর সাথে দেখা করতে যেতাম। আমাকে পাশে বসিয়ে তিনি বলতেন, জীবন মানেই শৃঙ্খলা। দেখতাম, কিভাবে তিনি হতাশাগ্রস্ত ডায়বেটিক রোগীদের সামনে তুলে ধরতেন তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিত্র। শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনযাপনের মাধ্যমে কত সহজে ডায়বেটিস রোগকে মোকাবেলা করা যায়, তিনি নিয়মিত এই পাঠ দিতেন রোগীদের। তাঁর মতো একজন জ্ঞানগর্ভ মনিষীর সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। তাঁর অজস্র শিষ্যদের মধ্যে আমিও একজন ভেবে নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করি। তাঁর সুযোগ্য কন্যা ডা. হাজেরা মাহতাব পিতার মূল্যবোধে উজ্জীবিত। একজন ধীরস্থির এবং নিবেদিত চিকিৎসক। তাঁর মধ্যে ডা. ইব্রাহীমের স্পর্শ পাই।

Chunati.com
Pioneer in village based website

কয়েকটি মাতৃকেন্দ্রের স্মৃতি

চাকমাদের নিজস্ব প্রথা

১৯৭৭ সালের মাঝামাঝি। বর্ষাকালের শেষের দিকে। রাঙ্গামাটিতে মাতৃকেন্দ্র দেখতে গিয়েছিলাম। এটা আমার অপরিকল্পিত পরিদর্শন ছিল। তখন থানা সমাজকল্যাণ অফিসার ছিল খুব সম্ভব শফিকুর রহমান ভূঁইয়া। চট্টগ্রাম শহর থেকে থানা সমাজকল্যাণ অফিসারসহ গাড়িতে রওনা হলাম সকাল ১১ টায়। দুপুর একটার দিকে রাঙ্গামাটি শহরের অদূরে প্রধান সড়কের উপরে হঠাৎ গাড়ি থামাবার নির্দেশ দিলো শফিক। গাড়ি থেকে নেমে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলো এখানেই রাঙ্গামাটি থানার একটি মাতৃকেন্দ্র আছে। সে হাত দিয়ে সামনে বিস্তৃত পাহাড়ের দিকে ঈঙ্গিত করে বললো, এখানেই মাতৃকেন্দ্র, তবে তা প্রত্যন্ত অঞ্চলে। প্রায় তিন চার মাইল বন্ধুর পথে পায়ে হেঁটে যেতে হবে। সেখানে পৌছতে প্রায় দু'তিন ঘন্টার মতো সময় লাগবে। তবুও আমি যেতে চাই কিনা। আমার মনে হলো, শফিক আমাকে এইভাবে বোকা বানিয়ে মাতৃকেন্দ্র না দেখিয়ে চট্টগ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। আমি তাকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। মনে সন্দেহ জাগলো আদৌ সেখানে কোন মাতৃকেন্দ্রের অস্তিত্ব আছে কিনা। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আমি যাওয়ার সম্মতি দিলাম। শফিক গাড়ি থেকে কিছু খাবার বের করে

বললো, আপনারা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন। ফিরে আসতে রাত হবে। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে আমরা পথ চলতে শুরু করলাম। যতই হাঁটছি পথ আর ফুরায় না। শফিক বলে, আর একটু সামনে। আর একটু সামনে যেতে যেতে প্রায় বিকেল চারটা হয়ে গেল। পাহাড়ী আকাঁবাকাঁ সরু পথ দিয়ে চলার সময় মাঝে মাঝে ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছিলাম। পাহাড়ে নানা ধরণের তরুলতা, বুনোফুল, বাঁশের ঝাড়। তার মাঝে নানা রং-এর প্রজাপতি মুক্ত মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে এক গাছ থেকে অন্য গাছে। পাখির মধুর কূজন এবং অপূর্ব সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে শরীরের ক্লান্তি হারিয়ে গেল। বাস্তব জীবনের সকল গ্লানি মুছে দিয়ে আমাকে নিয়ে এলো আরেক জগতে। মনে হলো— আমার দেশ সত্যিই সুন্দর। তাকে উপভোগ করার জন্য মাঝে মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হয় প্রকৃতির বিশালত্বে।

এইভাবে কয়েকটা পাহাড় ডিঙিয়ে, ছোট ছোট খালের পানিতে হেঁটে অবশেষে এসে পৌঁছলাম আমাদের গন্তব্যস্থলে। শফিককে দেখে দু'তিন জন চাক্‌মা মেয়ে এসে স্বাগত জানালো। তাদের বুঝতে দেরি হলোনা আমরা সমাজকল্যাণ (তখনও সমাজ সেবা নাম দেওয়া হয়নি এবং ডিপার্টমেন্ট-এ উন্নীত হয়নি) থেকে মাতৃকেন্দ্র দেখার জন্য এসেছি। তাদের বাড়িগুলো মাচাং-এর ওপর নিজস্ব স্টাইলে বাঁশ দিয়ে তৈরি। মাচাং-এর নিচে তারা তাদের পালিত জীবজন্তু রাখে।

মুহূর্তের মাঝে দশ বারো জন মেয়ে এসে ভিড় জমালো। তারা পাহাড়ি কায়দায় মুখে হাত দিয়ে এক রকম সুদীর্ঘ সঙ্গীতের মতো শব্দ করে অন্য সঙ্গীদের ডাকলো। তারপর স্রোতের মতো মেয়েরা একের পর এক আসতে থাকলো। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। না দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না। পাহাড়িদের মধ্যে এত একতা, এত মমত্ববোধ। তারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠী নিয়ে পাহাড়ি জাতি। তারা নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অধিকারী। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সৌহার্দ্য বিরাজমান। এদের মধ্যে শিক্ষা দীক্ষায় চাক্‌মারা অগ্রগামী। এখনো মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রধান্য এখানে পরিলক্ষিত হয়। পাহাড়ি নারীরা ঘরের কাজ ছাড়াও চাষাবাদ করে, হাটবাজারে যায়, জিনিসপত্র কেনা বেচা করে। মেয়েদের তুলনায় পুরুষেরা পরিশ্রমবিমুখ। তারা অত্যন্ত দরিদ্র। তাদের গড় আয়ু তুলনামূলকভাবে কম। আমাদের নিয়ে গেল তাদের একটি মন্দিরের বারান্দায়, যেখানে তারা মাতৃকেন্দ্রের জন্য মিলিত হয়। দেখলাম, দেয়ালে সেই গ্রামের সব তথ্য আমাদের দেয়া ছক অনুযায়ী সাজিয়ে লেখা আছে। গ্রামের আয়তন এবং লোকসংখ্যা কত। তার মধ্যে নারীর অনুপাত কত। কতজন সন্তান ধারণক্ষম বয়স সীমার মধ্যে আছে। শিশুর সংখ্যা কত। মাতৃকেন্দ্র কবে শুরু হয়েছে। কতজন তার সদস্য। কি কি কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। কি কি প্রশিক্ষণ দেয়া হয় ইত্যাদি। তাদের ট্রেইড ইনস্ট্রাকটার একটি রেজিষ্ট্রি খাতা নিয়ে সকলের নাম ডাকল। সবাই যার যার দল অনুযায়ী কাজ করা শুরু করল। সমাজকল্যাণ বিভাগের দেয়া সেলাই কলে কেউ কেউ বসে গেল। কেউ তাদের ঐতিহ্যবাহী তাঁত বুননে বসলো। কেউ ব্যবহারিক শিক্ষা ক্লাসে মনোনিবেশ করলো। দু'জন ট্রেইড ইনস্ট্রাকটার ঘুরে ঘুরে সকলকে প্রশিক্ষণ দিতে লাগলো। চাক্‌মারা পাহাড়ি নিজস্ব প্রথা মেনে চলে।

তারা কাজের সময় কারো সাথে কথা বলে না। এরকম শৃঙ্খলা আমাদের দেশের লোকদের মধ্যে সাধারণত দেখা যায় না। তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ মাতৃকেন্দ্র থেকে সামান্য টাকা ঋণ নিয়ে ক্ষুদ্রভাবে অর্থকড়ি উপার্জন করার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। সমাজকল্যাণ বিভাগ থেকে মাতৃকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতি সদস্যের জন্য আমরা তখন পাঁচ শ' টাকা পর্যন্ত ঋণ দিতে পারতাম। এই প্রকল্পের মাধ্যমে তখন ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি চালু করা হয়। সরকারি নিয়ম কানুন যারা মেনে চলে এবং যারা পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করে, কেবলমাত্র তাদেরকেই ঋণ দেয়া হতো। সুতরাং যারা সন্তান ধারণক্ষম শুধু তারাই ঋণ পাওয়ার যোগ্য ছিল। তবে সব বয়সের নারীরাই মাতৃকেন্দ্রের সদস্য হতে পারতো। সরকারি নিয়ম-কানুন বেশ কঠোর। এর মধ্যেও এত জন সদস্য দেখে অবাক হলাম। মাতৃকেন্দ্রে তারা কেন এত স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদস্য হয়েছে জিগ্যেস করতেই কয়েকজন সমস্বরে বলে উঠলো, তাদের এই প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চলে কোন সরকারি সংস্থা কোনদিনই আসেনি। এরকম একটি কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বলে তারা সমাজকল্যাণ বিভাগকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালো। তারা বললো, এটাই তাদের একমাত্র শৃংখলাবদ্ধ কাজ এবং বিনোদনের উৎকৃষ্ট উপায়। তারা সেলাইয়ের মেশিন চালাবার সুযোগ পাবে, একথা কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি। এর সাথে কিছু কিছু ব্যবহারিক শিক্ষা, অক্ষরজ্ঞান পাওয়া তাদের জন্য পরম সৌভাগ্য। বস্তুতপক্ষে এর যথার্থতা রয়েছে। ওই সময়ে একজন পাহাড়ী নারী একটা ব্যাগ হাতে নিয়ে সুদূরের পথ হেঁটে এসে একটি মেশিনে বসে সেলাই করাও একটা বিপ্লবের সামিল ছিল।

কিভাবে এক ঘন্টা কাটিয়ে দিলাম টেরও পেলামনা। আমরা যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে চাইলাম। তারা কিছুতেই রাতের খাবার না খেয়ে আসতে দেবেনা। এর মধ্যে মোরগ জবাই হয়ে গেছে, রান্নাও প্রায় শেষ। পাহাড়িদের মধ্যে এ অপূর্ব আতিথেয়তা দেখে মুগ্ধ হলাম। একজনের বাড়িতে আমাদের নিয়ে গেল। একজন পানি ঢেলে আমাদের হাত ধুতে সাহায্য করলো। আরেকজন পাটি বিছিয়ে দিলো। উচুঁ সরু সিড়ি দিয়ে উঠে বাঁশের তৈরি ঘরে প্রবেশ করলাম। সুন্দর পরিপাটি একটি রুম। খাবার পরিবেশন করা হলো। তাড়াহুড়া করে এই পর্ব সেরে নিলাম। সন্ধ্যা হয়ে এলো। মনে মনে ভয় পেলাম। অন্ধকারে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে এই দুস্তর দূর্বার পথ পাড়ি দেবো কেমন করে। তাদের এত আন্তরিক আতিথেয়তার মাঝে বিঘ্ন ঘটিয়ে সাহস করে বললাম, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারে যাওয়া বিপজ্জনক নয়তো? তারা অভয় দিয়ে বললো, পাহাড়িদের মধ্যে কোন সন্ত্রাসীর ভয় নেই। যত রাতই হোক, তারা পৌঁছে দেবে। খাবার শেষে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম। দু'জন চাক্‌মা পুরুষ আমাদের এগিয়ে দেয়ার জন্য দু'টি কুপি হাতে নিয়ে তৈরি হলো। ফেরার পথে যাত্রা শুরু হলো। পাহাড়ের মাঝে ঘন অন্ধকার ভেদ করে আমরা এগিয়ে চলেছি। ধান ক্ষেতের আইলের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ পা পিছলে পড়ে যাবো বলে দু'জন চাকমা দু'পাশ থেকে আমাকে ধরে সতর্কতার সঙ্গে নিয়ে গেল। সুদূর পথ পাড়ি দিয়ে আমরা অবশেষে রাঙ্গামাটির প্রধান সড়কে গাড়ির কাছে এসে পৌঁছলাম। তখন রাত প্রায় দশটা। ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। তারা দু'হাত জোড় করে

Ghunati.com
Pioneer in village based website

আমার হাত ধরে বললো, তোমাদের সঙ্গ পেয়ে আমরা নিজেকে ধন্য মনে করছি। তাদের এই সারল্য এবং আন্তরিকতা চিরদিন মনে থাকবে।

গাড়িতে উঠে শফিককে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, এই মাতৃকেন্দ্র পরিদর্শন আমার জন্য একটা বিশেষ শিক্ষাস্বরূপ। এর মাধ্যমে আমার মনের বদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হলো। মনে মনে লজ্জিত হলাম আর ভাবলাম শফিককে অবিশ্বাস করাটা উচিত হয়নি। কোন কিছু কল্পনা করে বা নিজের চোখে না দেখে কাউকে অবিশ্বাস করা ভীষণ অন্যায়। এই শিক্ষা যেন আমার জীবনের পাথেয় হয়।

গোপালপুরে বিশ্বব্যাংক টিম

মাতৃকেন্দ্রের উপ-পরিচালক থাকাকালীন বেশ কয়েকবার বিশ্বব্যাংকের টিম আমাদের কর্মসূচি পরিদর্শন করে। কারণ এই প্রকল্প বিশ্বব্যাংক সাহায্যপুষ্ট। এমনি একবার টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর থানায় বিশ্বব্যাংক টিম নিয়ে গেলাম পরিদর্শনে। পথে হঠাৎ ভীষণ ঝড় উঠলো। ধুলার ঝড়ে রাস্তাঘাট দেখা যাচ্ছিল না। মুহূর্তের মাঝে চারিদিক মেঘাচ্ছন্ন। অন্ধকার হয়ে গেল। এরকম অবস্থায় আমদের একটা ফেরি পার হতে হবে। আমাদের গাড়িও ফেরিতে পার করতে হবে ছোট একটা নদীর ওপারে। ওয়াশিংটন থেকে আগত বিশ্বব্যাংকের উপদেষ্টা ড. ইকল্‌স এবং ডিভিশন চিফ ড. ইসরাত জাহান ভয় পেয়ে গেলেন। খুব ইতস্তত করে আমাকে আকারে ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইলেন— এই ট্রিপ বাদ দিয়ে আমাদের ঢাকা ফিরে যাওয়া উচিত। কিন্তু আমি যেকোন প্রকারে তাঁদের নিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী। কারণ মাতৃকেন্দ্রে সকলে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। বিশেষ করে বিদেশীদের দেখার জন্য গ্রামের লোকেরা অত্যন্ত আগ্রহী। সেই সময়, ১৯৭৬ সালের গোড়ার দিকে গ্রামের লোকেরা শহরের দিকে খুব একটা আসা-যাওয়া করতো না। বিদেশীদের দেখার তেমন কোন সুযোগ তাদের ছিল না। যাহোক, যখন ঝড়ো বাতাস বন্ধ হয়ে গেল— আমরা নৌকায় উঠলাম। একটি বড় নৌকা দিয়ে নদী পার হলাম। ঘাটের কাছে আসতেই দেখলাম অনেক লোকের ভীড়। প্রায় শ'খানেক লোক নদীর ঘাটের কাছে বিদেশীদের স্বাগত জানাবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তখন ড. ইকল্‌স আমাকে কানে কানে বললেন, আজকে না এলে একটা বিরাট ভুল হয়ে যেত। এত লোক আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, এটা আমাদের জন্য একটা অমূল্য পুরস্কার। না এলে এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতাম। নৌকা থেকে নামতেই ফুলের মালা দিয়ে আমাদের বরণ করলো নদী তীরে অপেক্ষমান লোকজন। তারপর কিছুটা পথ পায়ে হাঁটলাম। দুধারে বাঁশ দিয়ে তৈরি অত্যন্ত সরু একটা সাঁকো পার হলাম অনেক কষ্টে। পা পিছলে নদীতে পড়ে যাব বলে ভয়ে আমাদের প্যালপিটিশন হচ্ছিল। অবশেষে গন্তব্যস্থলে পৌছলাম। তখন প্রায় দুপুর দেড়টা। সেখানে গিয়ে শুনলাম মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা সকাল থেকে আমাদের অপেক্ষায় সময় গুণছে।

আবহাওয়া খারাপ বলে আমরা যদি অর্ধেক পথ থেকে ফিরে যেতাম, মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা কি আমাদের আর কোন দিন বিশ্বাস করতো? সমাজকর্ম পড়ার সময় অনেকবার

Shunali.com
Pioneer in village based website

শিখেছি, কমিউনিটিতে কাজ করার সময় সেখানে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং সকলের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা সমাজকর্মের প্রথম পদক্ষেপ। এই কথা বাস্তব কর্মক্ষেত্র আমাকে আবার নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিলো।

প্রাইমারি স্কুলে রাত্রিযাপন

এই প্রসঙ্গে মনে পড়েছে ঢাকা জেলার কালিয়াকৈর থানায় কয়েকটি মাতৃকেন্দ্র পরিদর্শনের কথা। ১৯৭৫ সালের শেষের দিকে। তখন মাতৃকেন্দ্রের বয়সকাল মাত্র ছয় মাস। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই কর্মসূচি সঠিকভাবে চালু করাও সম্ভব হয়নি। কিন্তু এর কার্যক্রম যাতে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয় তার জন্য আমরা খুবই সজাগ ছিলাম। এসব কেন্দ্র মনিটর করার পদ্ধতি আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে অনুসরণ করতাম। এর অগ্রগতি রিপোর্টের ভিত্তি যাচাই করার জন্য আমরা প্রতি মাসেই ফিল্ডে যেতাম। এমনি একবার কলিয়াকৈর-এ গিয়েছিলাম। রাস্তার পাশে গাড়ি রেখে নৌকা করে প্রায় পাঁচ মাইল ভেতরে গেলাম মাতৃকেন্দ্র দেখার জন্য। যথারীতি মাতৃকেন্দ্র পরিদর্শন শেষ করে ঢাকা ফিরে যাওয়ার জন্য নৌকায় উঠতেই মাঝি বললো, নদীতে ভাটা পড়ে গেছে। আজকে আর নৌকা করে ফিরে যাওয়া সম্ভব হবেনা। অগ্যতা আমরা আবার ফিরে গেলাম সেই গ্রামে। গ্রামের নামটি মনে করতে পারছিনা। সেখানে কোন ডাকবাংলো নেই। রেস্ট হাউজ নেই। হোটেল নেই। অজ পাড়া গাঁ বলতে যা বুঝায়, এই গ্রামটা অনেকটা তাই। আমার থাকবার কোন ব্যবস্থা নেই। থানা সমাজকল্যাণ অফিসার এবং আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। মাতৃকেন্দ্রের কয়েকজন সদস্য তাদের বাসায় আমাকে রাখার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো। অবশেষে স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলে আমার থাকার ব্যবস্থা করা হয়। এই স্কুলে একটি বিরাট ক্লাস রুমের মাঝখানে আমার জন্য একটা বিছানা পাতা হলো। ভয় পেলাম, একলা কেমন করে রাত কাটাবো। জনপ্রাণীশূন্য কয়েক বিঘা জমির ওপর বাঁশের তৈরি এবং টিনের ছাউনি দেয়া এই স্কুল। প্রধান শিক্ষকের রুমের সামনে একজন দারোয়ান ছাড়া আর কেউ নেই। আমার অনুরোধে একজন আয়া রাতে আমার সাথে থাকলো। আয়া বললো, এখানে ভয় করার মতো কিছু নেই। রাত কেটে গেল।

মাঝে মাঝে মনে হয়, আগের দিনগুলিই ভাল ছিল। সন্ত্রাসীর ভয়ে ভীত হয়ে কালিয়াকৈরে আমার রাত কাটাতে হয়নি। দু'জন নারী বাঁশের টিনের ছাউনি দেয়া বিরাট একটা ঘরে সারারাত নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়েছিলাম। আমার দেশে কি আবার সেদিন ফিরে আসবে, যখন কেউ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবেনা ?

ছনকা মাতৃকেন্দ্রে বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট

সেপ্টেম্বর মাস ১৯৭৬ সাল। স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা মন্ত্রণালয় থেকে খবর পেলাম বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারা বাংলাদেশে আসবেন। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় যে জনসংখ্যা প্রকল্পগুলো গ্রহণ করা হয়েছে তিনি সেগুলো পরিদর্শন করবেন। বিশেষ করে সমাজকল্যাণ বিভাগের মাতৃকেন্দ্র এবং রুরাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের

Bhumati.com
Pioneer in village based website

(বি.আর.ডি.বি) মহিলা সমবায় সমিতি দেখবেন বলে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। ড. মিজানুর রহমান শেলী তখন সমাজকল্যাণ বিভাগের পরিচালক। তিনি আমাকে নিয়ে সচিবালয়ে ড. সাত্তারের (সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা) সঙ্গে দেখা করলেন। সেখানে গিয়ে দেখি এই কর্মসূচির সঙ্গে জড়িত অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারাও ইতোমধ্যে চলে এসেছেন। সবাইকে একসাথে ড. সাত্তার ব্রিফিং দিলেন। ম্যাকনামারা কবে আসবেন। তাঁকে কোন ধরণের প্রকল্প দেখাবেন। সফল কার্যক্রম দেখাতে না পারলে বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতা বন্ধ হয়ে যাবে। ঢাকার কাছাকাছি কোন প্রকল্প দেখানো যাবে না। কারণ তাতে মনে হবে আমরা শুধু নিকটস্থ স্থানেই কাজ করি। পুরো বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে আমরা কাজ করি তাও প্রমাণ করতে হবে ইত্যাদি।

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টকে উত্তরবঙ্গে বগুড়া জেলায় নিয়ে যাওয়া হবে। সারাদিনের অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে একটি মাতৃকেন্দ্র এবং একটি মহিলা সমবায় সমিতিও দেখানো হবে। আমরা প্রায় প্রতি সপ্তাহে বগুড়ায় যেতে লাগলাম। মাতৃকেন্দ্রের সদস্যরা নিয়মিত উপস্থিত থাকেন কিনা। তাদের প্রশিক্ষণ ঠিকমত হচ্ছে কিনা। এ পর্যন্ত কতজন পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। কতজন মাতৃকেন্দ্র থেকে ঋণ পেয়েছে। সেই ঋণ নিয়ে সদস্যরা কি কি কাজ করছে। সব খাতাপত্র এবং হিসাব সঠিকভাবে লেখা হয়েছে কিনা ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতাম। বারবার মনের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতো ড. সাত্তারের একটি কথা, সফল কর্মসূচি দেখাতে না পারলে বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতা বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা তাদের ওপর কতখানি নির্ভরশীল। প্রতি মুহূর্তে এইরূপ হীনমণ্যতায় ভুগতে ভুগতে আমাদের ব্যক্তিত্ব কুঁকড়ে যায়। মানুষ হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস আমরা হারিয়ে ফেলি।

Pioneer in village based website

ম্যাকনামারার পরিদর্শন উপলক্ষে প্রতিদিন আমাকে পরিচালকের কাছে প্রস্তুতি পর্বের অগ্রগতি রিপোর্ট দিতে হয়। তিনি আবার ব্রিফিং নোট তৈরি করে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে পাঠান। সেখানে প্রত্যেকটি রিপোর্টের সমন্বিত সার সংক্ষেপ তৈরি হয় এবং তা পাঠানো হয় অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে। প্রতি সপ্তাহে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে সমন্বয় সভায় এর ওপর আলোচনা করা হয়। সেখানে যেকোন প্রশ্নের উত্তর নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হয় আমাদের মতো ক্ষুদ্র অফিসারকেও। আমি তখন মাতৃকেন্দ্রের দায়িত্বে নিয়োজিত সমাজ কল্যাণের ডেপুটি ডাইরেক্টর।

স্থান এবং তারিখ নির্ধারিত হয়। নভেম্বরের ৪ তারিখ, ১৯৭৬ সাল। ম্যাকনামারা বগুড়া জেলার ছনকা মাতৃকেন্দ্র পরিদর্শন করবেন। আমরা একদিন আগে গাড়ি করে শেরপুরে চলে গেলাম। তখন বগুড়া জেলা প্রশাসক ছিলেন আমিন মিয়া চৌধুরী। শেরপুর থানা সমাজকল্যাণ অফিসার কামরুল হাসান মাহফুজকে নিয়ে জেলা প্রশাসকের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনিও বেশ টেন্‌শনে ছিলেন। সারারাত ঘুম হলোনা চিন্তায় এবং ভয়ে, পাছে কোন ত্রুটি হয়ে যায়। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মাহফুজকে নিয়ে ছনকা গ্রামে চলে গেলাম। সব ঠিক আছে কিনা আর একবার চেক করা হলো। প্রথমেই মাতৃকেন্দ্র পরিদর্শন এবং তার পর মহিলা সমিতি। লক্ষ্য করলাম সমাজকল্যাণ এবং বি.আর.ডি.বি-র কর্মকর্তাগণ পরস্পরের প্রতি কিছুটা ঈর্ষান্বিত। মনে মনে ভাবলাম

তাহরুন্নেসা আবদুল্লাহ এবং আমি একে অপরের কাজে সবসময় সহযোগিতা করি। আমাদের দু'জনের মধ্যে কোনদিন মনোমালিণ্য হয়নি। ঢাকা পর্যায়ে আমাদের সমন্বয় ছিল অত্যন্ত সুষ্ঠু। কিন্তু গ্রাম পর্যায়ে গিয়ে দেখি অন্য চিত্র। একে অপরের প্রতি অনেকটা নেতিবাচক। সমন্বিতভাবে কাজ করতে তারা মোটেই ইচ্ছুক নয়, বরঞ্চ অপরকে বাদ দিয়ে কে কত বেশি সাফল্য দেখাতে পারে তা নিয়েই ব্যস্ত।

সব কর্মসূচিকেই সফলভাবে প্রদর্শন করতে হবে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টের সামনে। নতুবা পরিণতি খারাপ হবে। এছাড়া একই উদ্দেশ্যে নিবেদিত বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সামঞ্জস্য এবং সমন্বয় সাধন করে কাজ করতে পারলে সফলতার হার অনেক বেশি হবে। এই উপলব্ধিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে তাহেরা এবং আমি একে অপরের সম্পূরক হিসেবে কাজ করছিলাম। বিভিন্ন সময়ে কাজ করতে গিয়ে জাতীয় পর্যায়ে এর প্রতিফলন দেখেছি। কিন্তু জেলা, থানা বা ইউনিয়ন পর্যায়ে এই প্রচেষ্টার অভাব আমি অনেক সময় অনুভব করেছি। ছনকা গ্রামে এই রকম মনোভাব দেখে আমরা, যারা হেড অফিস থেকে গিয়েছি তাদেরকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হলো, পাছে ম্যাকনামারার পরিদর্শনের সময় কেউ কোন সমস্যার সৃষ্টি করে।

যতদূর মনে পড়ে ঠিক দশটায় ম্যাকনামারা এবং মিসেস ম্যাকনামারাকে নিয়ে হেলিকপ্টার ছনকা গ্রামে ল্যান্ড করলো। তাঁর সাথে ছিলেন তৎকালীন ফাইন্যান্স মিনিস্টার ড. মীর্জা নূরল হুদা, ড. সাত্তার (বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের প্রধান) এবং জনসংখ্যা সংক্রান্ত ঢাকাস্থ বিশ্বব্যাংকের অফিসার পিসারতী। কয়েক মিনিট হেঁটে ছনকা মাতৃকেন্দ্রে প্রবেশ করলেন ম্যাকনামারা এবং মিসেস ম্যাকনামারা। প্রথমেই সমাজকল্যাণের পরিচালক মীজানুর রহমান শেলী তাঁদের অভিনন্দন জানালেন। তারপর আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, এবার আপনার পালা, ছনকা মাতৃকেন্দ্র সম্পর্কে তাঁদের ব্রিফ করেন। সাধারণত উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার তাদের অধীনস্থ কর্মচারীকে এত বড় সুযোগ দিতে চায়না। কিন্তু ড. শেলীর মধ্যে এই কার্পণ্যটা মোটেই ছিল না। তিনি এসবের উর্ধ্বে। অধীনস্থ কর্মকর্তাদেরও কিভাবে তাদের কাজের স্বীকৃতি দেয়া যায়, কিভাবে তাদেরকে সম্মুখে প্রজেক্ট করা যায়, এসব ব্যাপারে তাঁর কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। তিনি যেমন অসাধারণ জ্ঞানী ব্যক্তি তেমনি উদারতাও দেখেছি তাঁর মধ্যে। ম্যাকনামারার প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে এগিয়ে গেলাম। এই কেন্দ্রে প্রায় পঁয়ত্রিশজনের মতো সদস্য উপস্থিত ছিলেন। পুরো গ্রাম থেকে বোধকরি নানারকম হস্ত শিল্পের কাজ দিয়ে ঘরটি সাজানো হয়েছিল। সদস্যদের নিজস্ব তৈরি কাজও যে কিছু কিছু ছিল না তা নয়। কিন্তু তখনো তারা অতখানি দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। তাই কোন কোন সময় এ ধরণের সংমিশ্রণ ঘটানো হতো। ম্যাকনামারা নয়-দশ বছরের একটি মেয়ের কাছে এসে দাঁড়ালেন। জানতে চাইলেন, এত ছোট মেয়ে কেন মাতৃকেন্দ্রের সদস্য হয়েছে। মাতৃকেন্দ্রের আসল উদ্দেশ্য পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে গ্রামীণ নারীদের উদ্বুদ্ধ করা। সেই সময় (১৯৭৫/৭৬/৭৭ সাল) তাদের পরিবার পরিকল্পনার কথা প্রত্যক্ষভাবে বলা যেত না। তারা লজ্জা পেয়ে পালিয়ে যেত। তাই মাতৃকেন্দ্র এবং মহিলা সমবায় সমিতিতে তাদেরকে এনে নানা রকম স্কিল প্রশিক্ষণ দিয়ে রোজগার করার কৌশল শিখিয়ে দেয়া হতো। এই কর্মসূচিতে যখন উৎসাহ নিয়ে সকলে

Jhinaidah.com
Pioneer in village based website

যোগদান করতো, তখন ধীরে ধীরে পরিবার পরিকল্পনার কথা তাদের সঙ্গে আলোচনা করা সম্ভব হতো।

ছোট মেয়েটিকে দেখে ম্যাকনামারার কৌতুহলের অন্ত রইল না।

তাকে জিগ্যেস করলেন : তুমি এখানে কেন এসেছ ?

মেয়েটি উত্তর দিলো : মায়ের সাথে কাজ শিখতে।

রবার্ট ম্যাকনামারা : কি কাজ শিখ্ছো? পাশে বসেছিলেন মেয়েটির মা বাছিয়া বিবি।

বাছিয়া বিবি : এখনও কিছু শেখেনি। আমার সাথে এসে এসে অভ্যাস হোক। এখানে কাজ শিখাবো, রোজগার করতে পারলে এখন বিয়ে দেব না।

র.ম্যা. : এখানে এসে আপনার কোন লাভ হয়েছে?

বা.বি. : অবশ্যই। আমি খড়ের বাস্কেট, বেতের বেগ, নকশি কাঁথা তৈরি করা শিখেছি। এখানে এসে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পেরেছি। শাক-পাতা, তরিতরকারি খেয়ে নিজের এবং বাচ্চাদের শরীর ভালো রাখা যায় এই কথাও আমাদের বলা হয়েছে। নিজের নাম লেখা শিখেছি। কিছু কিছু পড়তে শিখেছি।

র.ম্যা. : কতদিন আগে এই কেন্দ্রের সদস্য হয়েছেন?

বা.বি. : এক বছর চার মাস।

র.ম্যা. : আপনি কি কিছু রোজগার করতে পারেন?

বা.বি. : আমার মাসিক রোজগার আনুমানিক ষাট টাকা। এ পর্যন্ত আমি ৩৫২ টাকা রোজগার করেছি। এই টাকা সংসারে ছেলে মেয়েদের জন্য খরচ করেছি।

র.ম্যা. : আপনার ছেলে মেয়ে কয়জন?

বা.বি. : মোট চারজন ছিল। একজন মারা গেছে। এখন দুই ছেলে আর এক মেয়ে (পাশে উপবিষ্ট) আছে। আর বাচ্চা চাইনা। মাতৃকেন্দ্রে এসে আমরা ছোট পরিবারের উপকারিতা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছি।

বাছিয়া বিবির বয়স চব্বিশ বছর। তার সাথে কথা শেষ করেই ম্যাকনামারা আমাকে বললেন, মাতৃকেন্দ্র শুধু পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে গ্রামীণ নারীদেরকে অবগত করছে না, এর মাধ্যমে বাল্যবিবাহ নিরোধের কাজও এগিয়ে চলেছে। এতক্ষণে আমি বুঝতে পারলাম বাছিয়া বিবির ছোট্ট মেয়েটাকে কি কারণে বিয়ে দেবেনা বলেছে, এটা ম্যাকনামারাকে অত্যন্ত স্পর্শ করেছে। তিনি মাতৃকেন্দ্রের ঘরটা ঘুরে দেখলেন। ত্রিশ মিনিট সময়ের জন্য এসেছিলেন কিন্তু কাটালেন পঁয়তাল্লিশ মিনিট। সকলকে বারবার ধন্যবাদ জানালেন। জেলা প্রশাসক আমিন মিয়া চৌধুরী, ড. শেলী এবং আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বিদায় নিলেন। সরকারি প্রথা অনুযায়ী মাহফুজ মাতৃকেন্দ্র পরিদর্শন

Chunati.com
Pioneer in village based website

খাতাটি এগিয়ে দিলো। তাঁর সময় নেই বিধায় খাতাটি পরে লিখবেন বলে গাড়িতে নিয়ে গেলেন। খাতাটি যখন ফিরে এলো তাতে লেখা ছিল :

To

The Sonka Mothers' Club, RSS Project, Sherpur, Bogra
Congratulations on what you are doing to make a better life for your children and your families.

Signed, Robert McNamara

ম্যাকনামারার এই উক্তিটি পড়ে মাহফুজ আনন্দে আত্মহারা। মিসেস ম্যাকনামারা ঢাকা শহরেও একটি মহিলা সমিতি পরিদর্শন করতে গিয়ে বলেছিলেন 'A woman is only as liberated as she thinks she is'.

তাঁর এই উক্তিটি ৬ নভেম্বর ১৯৭৬ দৈনিক বাংলাদেশ টাইমস-এ ছাপানো হয়েছিল। এটা পড়ে আমার এতই ভালো লেগেছিল যে আমি যখনি মাতৃকেন্দ্র পরিদর্শনে যেতাম এই কথাটা ব্যাখ্যা করে সদস্যদের বুঝিয়ে বলতাম। আসলে এটা আমাদের সকলের জন্যও প্রযোজ্য।

মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর মাঝে মাঝে মাঠ পর্যায়ের অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানায়। আমি তাদেরকে মিসেস ম্যাকনামার এই উক্তিটি সব সময় বলি। আরও বলি যেকোন সরকারি অফিসে সভায় যোগদান করতে গেলে তারা যেন পেছনের সারিতে না গিয়ে সবসময় প্রথম সারিতে বসেন। নিজেকে অন্যের মতো মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে ভাবতে শেখেন। নিজের বক্তব্য স্বাধীনভাবে বলার অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে। একজন মেয়ে বলে সে যেন তার অধিকারের কথা বলতে সঙ্কুচিত হয়ে না পড়ে।

Pioneer in village based website

যাহোক, ফাইনান্স মিনিষ্টার, জেলা প্রশাসক, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সচিব, সমাজকল্যাণের পরিচালক ড. শেলী সকলে ম্যাকনামারাকে হেলিকপ্টারে উঠিয়ে দিতে গেলেন। আমরা রয়ে গেলাম সারাদিন ছনকা মাতৃকেন্দ্রে। দ্বিগুণ উৎসাহে সকলে মেতে উঠলাম। এদিকে ম্যাকনামারাকে বিদায় দিয়ে ড. সাত্তার আবার ছনকায় ফিরে এলেন। সেখান থেকে আমরা সকলে গাড়ি করে ঢাকার পথে রওনা দেয়ার কথা। হঠাৎ একটি দৃশ্য দেখে সকলে অবাক হলাম। গাড়ি থেকে নেমে ড. সাত্তার মাতৃকেন্দ্রের বোরখা পরা একজন সদস্যের কাছে গিয়ে নাটকীয়ভাবে বললেন—মা, আজ আপনারা উন্মুক্ত হয়েছেন। আপনার বোরখা খুলে ফেলুন। যেভাবে ম্যাকনামারার সামনে গিয়েছেন, ঠিক সেভাবে সকলের সামনে মুক্ত মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুন। চোখের সামনের অন্ধকার সরিয়ে ফেলুন। এই বলে তিনি এই মহিলার বোরখা হাত দিয়ে টেনে খুলে দিলেন। মহিলা লাজুক দৃষ্টি দিয়ে বললেন, ঠিক আছে। এরপর থেকে যখনি গ্রামে কোন কর্মসূচি দেখতে যেতাম সাত্তার ভাইয়ের এই কথাটি স্মরণ করতাম। নারী স্বাধীনতায় তিনি গভীরভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি আজ আর ইহলোকে নেই। তাঁর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে এখনো স্মরণ করি।

আমেরিকায়

বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ম্যাকনামারার সাথে সাক্ষাৎ

ম্যাকনামারার বাংলাদেশ সফরের কথা লিখতে গিয়ে মনে পড়ে গেলো ১৯৭৭ সালে আমি যখন প্রথমবার আমেরিকা যাই Multi-Regional Programme on Women In Economy-তে যোগ দেয়ার জন্য। উনত্রিশজন প্রতিনিধি বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছিলেন। আমি বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করি। প্রথম দু'দিন নিউইয়র্কে। তারপর ওয়াশিংটনে কয়েকদিন আমাদের সেমিনার হয়। প্রথমে ছিল পরিচয় পর্ব। আমেরিকান অংশগ্রহণকারীরা তাদের পিতৃ নামের শেষ টাইটেল দিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন। আর গর্ব ভরে বললেন— এখন Women's Lib-এর সময়। আমরা স্বামীর নামের চেয়ে বাবার নামে অর্থাৎ নিজের পরিবারের নামে পরিচিত হতে পছন্দ করি। আমি বললাম, এই প্রাক্টিসটি আমি ১৯৫২ সাল থেকে শুরু করেছি। সবাই অবাক হয়ে গেল। ঠাট্টার সুরে কেউ কেউ বললো, বাংলাদেশ এত এগিয়ে গেছে? আমি তখন সত্যি কথাটা বলে ফেললাম। আসলে এটা আমাদের অগ্রগতির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। আমি সচেতনভাবেও এটা করিনি। প্রয়োজনের জন্য বাবার পদবী রেখে দিয়েছি। বললাম, আমার ডিগ্রি এবং মাস্টার্স-এর সার্টিফিকেটে বাবার পদবী আছে। তাই চাকরিতে সেই নামে আমাকে ঢুকতে হয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ এই নিয়ে মজা করা হয়। নামের পদবী নিয়ে আরেকবার বিড়ম্বনায় পড়েছিলাম। মাহবুব আর আমি প্যারিসে ইউনেস্কো হোটেলে যখন রুম ভাড়া করতে গেলাম (১৯৭৩) তখন হোটেল রিসিপশনিস্ট আমাদের জন্য দু'টা রুম দিতে চাইলো। বললাম, আমরা স্বামী-স্ত্রী, একটা রুমই দরকার। সে বললো, তা কেমন করে হয় ? তোমাদের নামের টাইটেল দু'রকম, রহমান এবং চৌধুরী। তখন পাসপোর্টে আমার স্বামীর নাম দেখিয়ে প্রমাণ করতে হয়েছিল আমি তার স্ত্রী। সেদিন প্যারিসের হোটেলে দু'রকম টাইটেল-এ স্বামী-স্ত্রীর নাম হতে পারে এটা বোঝাতে অনেকক্ষণ সময় লেগেছিল।

তাদের হয়তো তখনো উইমেনস্ লিব্-এর ঢেউ দোলা দিতে পারেনি। এমনকি আমেরিকাতেও আমি দেখেছি বিভিন্ন জায়গায় নারীরা উইমেনস্ লিব্-কে ভিন্ন ভিন্নভাবে গ্রহণ করে। ওয়াশিংটন-নিউইয়র্কে এই সম্পর্কে যেভাবে চিন্তা করা হয়, আরিজোনায় দেখলাম তার বিপরীত। ওরা স্বামীর নামের পদবী রাখতে পছন্দ করে। বাংলাদেশে এর অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ১৯৭৫–১৯৭৬ সালে আমি যখন মাতৃকেন্দ্র দেখার জন্য গ্রামে যেতাম

Pioneer in village based website

তখন মনে হতো একজন দরিদ্র নারী একটা ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে যে নিয়মিত মাতৃকেন্দ্রে যাচ্ছে, এটাই তাদের জন্য উইমেনস্ লিব্। তারা যে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে অংশ গ্রহণ করছে, এটাই তাদের জন্য উইমেনস্ লিব্। গ্রামীণ ব্যাংকের মেয়ে সদস্যরা (১৯৮২) যে সারিবদ্ধ হয়ে স্বাধীনভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে সেলিউট দেয়, এটাই তাদের জন্য উইমেনস্ লিব্। যখন তাদের রিজিওনাল কনফারেন্সে (মার্চ ১৯৮৪) কারো সাহায্য ব্যতীত নিজেরা ষোল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে—সেটাই তাদের জন্য উইমেনস্ লিব্। যেকোন অঞ্চল বা দেশের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল এবং আর্থ-সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উইমেনস্ লিব্-এর ব্যাখ্যা করা উচিত বলে আমি মনে করি।

সেমিনার প্রসঙ্গে ফিরে আসি। বিভিন্ন দেশের কান্ট্রি পেপার পাঠ করা হলো। এলফ্যাবেটিকেল অর্ডারে শুরু হওয়ার জন্য বাংলাদেশের পেপারটা প্রথমেই উপস্থাপন করলাম। মাতৃকেন্দ্রের উল্লেখ করলাম গ্রামীণ নারীদের কর্মসূচি হিসেবে। ম্যাকনামারার মাতৃকেন্দ্র পরিদর্শনের কথাও বললাম। দিনের শেষে সংগঠকদের মধ্যে দু'একজন আমাদের কাছে জানতে চাইলো কারো কোন স্পেশাল প্রোগ্রাম দেখার ইচ্ছা আছে কিনা।

আমি অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ হাত তুলে ফেললাম। বললাম, বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারার সাথে দেখা করতে চাই। সকলে খুবই আশ্চর্য হয়ে গেল। একজন সংগঠক বললেন, You must be joking ! ততক্ষণে আমার চেতনা ফিরে এলো। মনে মনে লজ্জাবোধ করলাম। ছোট মুখে বড় কথা বলে ফেলেছি। আবার সে বললো, Do you mean it? আমি হ্যাঁ বাচক মাথা নাড়লাম। তারা চেষ্টা করে দেখবো বলে আমাকে আশ্বস্ত করলো। তৃতীয় দিন সকালবেলা কয়েক ঘন্টা অবসর ছিল। আমি ব্রিটিশ এমবেসিতে গিয়েছিলাম ভিসার জন্য, ফেরার পথে লন্ডনে দু'একদিন থাকবার ইচ্ছায়। সেখানে আমাদের সেমিনার সংগঠকদের একজনের কাছ থেকে হঠাৎ একটা জরুরী ফোন পেলাম। বলল, সাড়ে ছয়টায় রবার্ট ম্যাকনামারার সাথে আমার জন্য এপয়েন্টমেন্ট করা হয়েছে। আমি যেন এখনি হোটেলে ফিরে যাই। তাড়াহুড়ো করে পাসপোর্টটা ফেরত নিয়ে চলে গেলাম। দেখলাম দু'জন সংগঠকের মধ্যে কে আমাকে ম্যাকনামারার অফিস রুমে নিয়ে যাবে, তা নিয়ে বেশ জল্পনা-কল্পনা চলছে। কি রকম ড্রেস পরলে ভাল লাগবে, কানে কি পরবে ইত্যাদি আলোচনা হচ্ছে। আমি রুমে গিয়ে একখানা জামদানী শাড়ী পরে এলাম। তাদের আলোচনা শুনে মনে হলো সব দেশের মানুষ প্রায় একই স্বভাবের। ম্যাকনামারার মতো একজন বিশ্ব ব্যক্তিত্বকে সামনাসামনি দেখার জন্য সবাই উদগ্রিব।

১০ মার্চ ১৯৭৭ সাল। আমরা যথা সময়ে বিশ্বব্যাংকে পৌঁছে গেলাম ৭০১ নম্বর, ১৯ স্ট্রীট ওয়াশিংটনে। লবিতে অপেক্ষা করছিলাম। ঠিক সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে ম্যাকনামার সেক্রেটারি এসে আমাকে রুম ই-১২২৭তে নিয়ে গেলেন। বিশ্বব্যাংকের সেই ঐশ্বর্যপূর্ণ রুমের মধ্যে যেন হারিয়ে গেলাম। ম্যাকনামারার টেবিলের সামনে যেতেই আমাকে স্বাগতম জানিয়ে বসতে বললেন। মাতৃকেন্দ্রের কাজ কেমন চলছে

Pioneer in Village based Website

জানতে চাইলেন। ছনকা মাতৃকেন্দ্রে এখন কত সদস্য জিগ্যেস করতেই আমি তাঁর পরিদর্শন কালের ছবিগুলি দেখালাম। এবং ছবিগুলো তাঁকে উপহার দিয়ে বললাম, আপনাকে মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের শুভেচ্ছা জানাতে এসেছি। আমাদের গ্রামের নারীদের অগ্রগতিতে তিনি মাতৃকেন্দ্রের ভূমিকার প্রশংসাসূচক মন্তব্য করলেন। তাঁর সাথে দেখা করার সুযোগ দেয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম। আমেরিকা বলে হয়তো বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্য কোথায়ও এটা সম্ভব হতো কিনা আমার সন্দেহ আছে।

মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটিতে কিছুক্ষণ

মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটিতে সোসিওলজির একজন মহিলা প্রফেসরের লেকচার শোনার জন্য আমাদের নিয়ে যায়। তিনি আমেরিকান সমাজ বিশ্লেষণ করে একটি জ্ঞানগর্ভ লেকচার দিলেন। চমৎকার বাচনভঙ্গি। তাঁদের শিক্ষা পদ্ধতি এত আধুনিক এবং কমিউনিকেশন স্টাইল এত পরিষ্কার যে চোখের সামনে সেখানকার সামাজিক চিত্র ভেসে উঠলো। ছাত্ররা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গেল। প্রফেসরের কোন বিরক্তি নেই। হাসিমুখে সব উত্তর দিলেন।

এক পর্যায়ে তিনি বললেন, তাঁর এক ছেলে এবং এক মেয়ে। তারা দু'জনেই হাই স্কুলে পড়ে। ছেলে মেয়েদের সঙ্গে তার বন্ধুসুলভ সম্পর্ক। তার ছেলে গার্ল ফ্রেন্ডকে নিয়ে প্রায়ই তাঁদের বাসায় বেড়াতে আসে। ছাত্রদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করলো, যদি তাঁর মেয়ের সাথে কারো দৈহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে এতে তার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে। তিনি অত্যন্ত সহজভাবে উত্তর দিলেন, যদি বিয়ের আগে তার ছেলের এই অভিজ্ঞতা হতে পারে, তাহলে তার মেয়েরও হতে পারে। এতে তিনি কিছু মনে করেন না। নিজের ছেলে-মেয়েদের সেক্স সম্পর্কিত এরকম খোলামেলা আলোচনা শুনে আমার ভীষণ কালচারাল সক্ হল। কারণ আমরা এ ধরণের আলোচনায় অভ্যস্ত নই।

আমেরিকানদের খোলামেলা ব্যবহার আমার খুব ভালো লেগেছিল। পথে চলতে কোন আমেরিকানের মুখোমুখি হলেই অপরিচিত জনকেও তারা হা-ই বলে স্বাগত জানায় এবং কুশল বিনিময় করতে ভালবাসে। এমন মুক্ত মনের অধিকারী বলেই তারা এত উন্নতি করতে পেরেছে।

স্টেনফার্ড ইউনিভার্সিটিতে একদিন

এক উইক-এন্ডে আমার ভাইপো হাফিজ রহমানের বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। সে তখন স্টেনফার্ড ইউনিভার্সিটিতে পি.এইচ.ডি করছে। সানফ্রান্সিসকো থেকে পালো-আলটো বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত বাসে করে গেলাম। পাহাড়ি রাস্তায় দু'পাশে নানা শেইডের সবুজের সমারোহ। অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য। অনেকটা আমাদের বান্দরবান যাওয়ার পথে যে সবুজ ঘেরা পাহাড়ি রাস্তা ঢালু হয়ে একবার নিচে নামছে আবার উতরাই বেয়ে উপরে

উঠছে, ঠিক সে রকম। এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে পালো-আলটো পৌঁছে গেলাম। সেখান থেকে হাফিজ আমাকে গাড়ি করে তার বাসায় নিয়ে গেল। সেখানে দু'দিন ছিলাম।

একদিন হাফিজ আমাকে স্টেনফার্ড ইউনিভার্সিটি দেখাতে নিয়ে গেল। কি বিশাল ক্যাম্পাস, লাইব্রেরি, বিভিন্ন ফেকালটি, ক্যাফেটেরিয়া, খেলার মাঠ। ছাত্র-ছাত্রীদের আনাগোনাতে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস যেন গোছানো অনিন্দ্যসুন্দর পরিবেশঘেরা একটি ছোট্ট নগরী। অদূরে ছাত্র-ছাত্রী পরিবার নিয়ে থাকার জন্য অনেক ঘর তৈরি করা আছে। তারই একটির মধ্যে হাফিজের বাসা। একটি শান্তির নীড়ের মতো। হাফিজ এবং তার স্ত্রী নিপা আমাকে ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে দেখালো। এতদিন পর আমাকে পেয়ে তাদের আনন্দের সীমা ছিল না।

এইরূপ বিশাল-বিস্তৃত ইউনিভার্সিটি যতই দেখছিলাম ততই মনে হচ্ছিল আমেরিকা হলো সুযোগ আর সম্ভাবনার দেশ। সুযোগের অবারিত দ্বার দিয়ে যারা প্রবেশ করতে পারে তাদের জন্য অজস্র জ্ঞান এবং সম্পদ আহরণে কোন বাধা নেই। মেধার সাক্ষাৎ পেলে তার জন্য সবরকম সহযোগিতা করতে তারা সদা প্রস্তুত। ভারতীয় জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রফেসর হরগোবিন্দ সিংহ খোরানা এবং বাংলাদেশী স্থপতি ফজলুর রহমান তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

আমেরিকার এত সমৃদ্ধির অন্যতম কারণ বোধকরি এটাই। পরবর্তীতে যতবার আমেরিকা গিয়েছি ততবারই মনে হয়েছে আমেরিকানদের স্পষ্টবাদিতার কথা। আমেরিকা ভ্রমণের সময় যারা আমাদের গাইড ছিলেন তারা সকলেই আমেরিকান। তাদের মধ্যে কোন কমপ্লেক্স বা হীনমণ্যতা দেখিনি। নিজের দেশের ভালো এবং খারাপ দু'টো দিকই আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। সাধারণত ভালো দিকটি দেখানোর দিকে মানুষের প্রবণতা থাকে। কিন্তু দেখলাম এ ব্যাপারে ওরা ব্যতিক্রম।

কতিপয় বৃদ্ধের নিঃসঙ্গ জীবন

আমাদের ঊনত্রিশজন ভিজিটারদের আবার ছোট ছোট দলে ভাগ করা হয়েছিল কাজের সুবিধার জন্য। আমরা একজন গাইডের সাথে পাঁচজন ছিলাম। তিনি আমাদের পুরো নিউইয়র্ক ঘুরালেন। কখনো রেল গাড়ি করে, কখনো হেঁটে, কখনো আন্ডার গ্রাউন্ড রেলে করে। একদিন আন্ডার গ্রাউন্ডে চলতে চলতে আমাদের আমেরিকান গাইড কক্ষের শেষ প্রান্তে উপবিষ্ট এক বয়স্ক নারীর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ভালো করে লক্ষ্য করুন এর চালচলন, গতি-প্রকৃতি। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। শুধু দেখলাম তার পায়ের কাছে একটি কাপড়ের বোচ্‌কা। মাথার চুল উস্কখুস্ক। নিশ্চুপ, মুখে কোন কথা নেই। বয়স হয়তো সত্তরের কোঠায়। আমরা কয়েক স্টেশন পর নেমে গেলাম। আন্ডার গ্রাউন্ড থেকে স্কেলিটার দিয়ে উপরে উঠে গাইডের কাছে সেই বিশিষ্ট নারী সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করলাম। গাইড তখন বললো, এ ধরণের কিছু বুড়ো-বুড়ি আছে যাদের কোন ঘরবাড়ি নেই। এই রকম ট্রেনেই তাদের বসবাস। ট্রেন যখন শেষ স্টেশনে গিয়ে

থামে তারা সেখানে নেমে পাবলিক-বাথে গোসল করে। দোকানে গিয়ে কিছু ডগ্‌ফুড কিনে খায়। এগুলো সাবসিডাইজড্ রেটে, সস্তা দামে পাওয়া যায়। তারা যা পেনশন পায় তা দিয়ে ভদ্রভাবে চলা সম্ভব নয়। এভাবেই তারা জীবন কাটিয়ে দেয়।

খুবই দুঃখ লাগলো মনে। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধিশালী দেশ। সেখানে কেন মানব জাতির এই দুর্দশা। সেখানে কেন বস্তিবাসী থাকবে। সেখানে কেন ইন্ডিয়ান রিজার্ভের অধিবাসীরা জীবনের মৌলিক প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত হবে। একটি ইন্ডিয়ান রিজার্ভও আমাদের দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের বাসার ভেতর পানির কল নেই। হিটারের ব্যবস্থা নেই। কাছে কোন চিকিৎসালয় নেই। অসুস্থ হলে কি করে জিগ্যেস করাতে তারা বললো, কেউ যদি দয়া করে ডাক্তার খানায় নিয়ে যায় তাহলে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এসব রিজার্ভে দেখলাম শুধু বুড়ো-বুড়িদেরই বাস। অল্প বয়সীরা সকলে লেখাপড়া শিখে চাকরি নিয়ে শহরে চলে গেছে। আমেরিকার সমাজে যারা শ্রম দিতে পারে এবং যারা মেধাবী তাদের জন্য উন্নতির সম্ভাবনা আকাশচুম্বী। আর যারা কাজ করার অযোগ্য হয়ে পড়ে তাদের কোন দাম নেই। আমাদের দেশও ক্রমে সেদিকে পদার্পণ করছে। যদিও বৃদ্ধ মা-বাবাকে এখনও ছেলে-মেয়েরা দেখাশোনা করে, কিন্তু খুব শিঘ্রই এখানে পাশ্চাত্যের মত ওল্ড পিপলস হোম তৈরি করতে হবে বলে মনে হয়। আমেরিকার কোন্ একটা জায়গায় ঠিক মনে পড়ছেনা, আমাদের নিয়ে গিয়েছিল একটা ওল্ড পিপল্‌স হোম দেখাতে। সেখানে দুপুরের খাবারের সময় আমাকে একজন বৃদ্ধ নারীর সাথে একই টেবিলে বসানো হয়। পরিচয় হলো। তিনি কেডিলাক কার কোম্পানির মালিকের গ্র্যান্ড মা। বয়স হয়তো নব্বইয়ের কোঠায়। তিনি এত বেশি বুড়ো হয়ে গেছেন যে নিজে হাঁটতে পারেন না। দুই পাশে দু'জন নার্স তাকে সর্বক্ষণ পরিচর্যা করে। সেদিন ছিল রোববার। তাঁর জন্মদিন। তিনি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমাকে বললেন, তাঁর নাতি-নাতনিরা তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে আসবে। এজন্য তিনি অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন। খাওয়া শেষ হলো। দু'জন লোক এসে তাঁকে একটি ফুলের তোড়া হাতে দিয়ে Happy Birth Day বলে প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা জানালো। তার দুই গালে চুমো খেল। আদর করে বললো, তাদের জরুরি কাজ আছে। এখনি চলে যেতে হবে। বাই বাই করে হাত নেড়ে চলে গেল। তিনি ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে অসহায়ের মত তাদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

আমার মনটা বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। এই হলো ঐশ্বর্যময়, ভোগবাদী সমাজ। অর্থের অভাব নেই। প্রাচুর্যের মধ্যে দিন কাটে। সুখের অন্ত নেই, কিন্তু শান্তি পলাতক। সুন্দর গৃহ আছে, স্নেহভরা নীড় নেই। শূন্যতায় ভরা। শেষ জীবন কাটায় তারা এই সব বিলাস বহুল ওল্ড পিপলস্ হোমে। সেখানে পরিচর্যার কোন ত্রুটি নেই। চাইলেই সব পাওয়া যায়। কিন্তু পাওয়া যায় কি প্রিয় জনের স্নেহ সান্নিধ্য। পাওয়া যায় কি আপন জনের মমতার স্পর্শ, লক্ষ ডলার দিয়ে যার মূল্য পরিমাপ করা যায় না।

ভোগবাদী সমাজের নির্দয় আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কি কোন উপায় আছে? ঐশ্বর্যের পেছনে নিশিদিন ধাওয়া করে ক্রমশ যে মূল্যবোধ অবক্ষয়ের সঙ্কটের মধ্যে

Pioneer in village based website

আমরা নিমজ্জিত হচ্ছি, তা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার কোন দর্শন কি আমরা খুঁজে পাবো?

সানফান্সিসকোতে এসে শুনলাম একজন নারী তাঁর সাথে সারাদিন কাটাবার জন্য আমাকে নিয়ে যাবেন। পরের দিন সকালে এসে তিনি আমাকে গোল্ডেন গেইট থেকে শুরু করে অনেক জায়গা দেখালেন। দুপুরে একটা রেস্টুরেন্টে খাওয়ালেন। তারপর তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন। একটা বড় রুম, মাঝখানে স্ক্রিন দেয়া। একপাশে বেডরুম এবং অপর পাশে বসার ঘর। এক কোণায় ছোট্ট একটা টয়লেট। আর এক কোণায় একটা কুকিং রেইঞ্জ এবং তার পাশে রান্নার সরঞ্জাম।

সবকিছু আমাকে ঘুরে ঘুরে দেখালেন। অনেক গল্প করলাম দু'জনে। তার জীবন কাহিনী শুনলাম। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার পর থেকে তিনি নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে আসছেন। অথচ জীবনের প্রথমার্ধ কেটেছে তার দারুণ হৈ চৈ এবং আনন্দ স্ফূর্তিতে। ওই মহড়ায় একজনকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন। সুখীও ছিলেন। কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে এসে তাদের মধ্যে মতামতের সঙ্কট দেখা দেয়। একজনের পছন্দের সঙ্গে আরেকজনের পছন্দ মেলে না। একজনের জীবনবোধের সঙ্গে আরেকজনের জীবনবোধ খাপ খায় না। এই মতান্তর একদিন মনান্তরে পরিণত হয়। উভয়ে স্থির করলেন, তারা একসঙ্গে আর থাকবেন না। পরস্পর পরস্পর থেকে আইনগতভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। তিনি আর কোন নতুন সঙ্গী জোটাতে পারেননি। সুযোগ পেলেও বারবার মনে পড়ে তার অতীত অসুখী জীবনের কথা। এই অভিজ্ঞতা তাকে বেশিদূর অগ্রসর হতে দেয়না।

দিন শেষে আমাকে হোটেলে নামিয়ে দিলেন। বিদায় নেয়ার সময় তাকে আমি সবিনয় ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, আপনি আমার জন্য সারাটা দিন নষ্ট করলেন। এত টাকা খরচ করলেন। তার বিনিময়ে তো আমি কিছুই দিতে পারলাম না। কোনদিন যদি আমার দেশে আসেন তবে খুব খুশি হবো। তিনি বললেন, আমি যা করেছি তা আমার নিজের জন্যই। তোমার জন্য নয়। আমার একটা নিঃসঙ্গ দিন তোমার সাথে আনন্দময় ছিল। আমার মনের এই শূণ্যতাকে আনন্দ এবং সঙ্গ দিয়ে ভরিয়ে তুলেছো, এজন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আমি যে সারাদিন একজন কথা বলার সঙ্গী পেয়েছি এটাই আমার জন্য বড় পাওয়া। সেদিন সারারাত এই মহিলার নিঃসঙ্গ জীবনের দারুণ বেদনার কথা ভেবেছি। এত মানুষ, কিন্তু তার মনের মতো মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। নিঃসঙ্গতা মানুষকে চরম দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত করে।

Chunati.com
Pioneer in village based website

জাপানে

পশ্চাদগামিতার দ্বাররুদ্ধ

প্রথমবার জাপানে গেলাম International Seminar on Women in Administration-এ অংশ গ্রহণকারী হিসেবে। এপ্রিল ১৯৭৫। টোকিওতে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেমিনার শেষে কিউটো এবং নাগোয়ায় কিছু কিছু প্রোগ্রাম ছিল। যত সুন্দর টুরিস্ট স্পট আছে এই তিন সপ্তাহের মধ্যে তার কয়েকটাই আমাদের দেখানো হয়। আমরা যখন গিয়েছি পুরো জাপান দেশটাই যেন চেরী ফুলে সজ্জিত। মৃদু গোলাপি আভা। মনটা ভরে গেল প্রকৃতির এই অপরূপ শোভা দেখে। প্রবল ঠান্ডা থেকে রক্ষা করার জন্য গাছকে কৃত্রিম তন্তু সহযোগে সযত্নে ঢেকে রাখা হয়েছে। গাছপালার প্রতি তাদের এই সযত্ন পরিচর্যা দেখে অবাক হলাম। জাপানিরা অত্যন্ত বিনয়ী। হাঁটতে বসতেই 'আরিগাতো গোজাইমাস্তা' বলে মাথা নুইয়ে ধন্যবাদ জানায়। আমরা ছিলাম বারোজন। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি। তার মধ্যে একজন ছিলেন ভারতের কোন একটা জেলার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। সেদিন একজন নারী জেলা শাসনকর্তা দেখে আনন্দিত হয়েছিলাম। এবং আশার আলো দেখেছিলাম হয়তো আমাদের দেশেও একদিন নারীরা জেলা প্রশাসক হওয়ার সুযোগ পাবে।

টোকিওতে জাপানি ঐতিহ্যবাহী বেশ কয়েকটা প্যাগোডা দেখলাম। প্রায় প্রত্যেকটাতেই আকাশ, পাথর, মাটি, গাছ, ফুল, তাদের নৈতিক আদর্শে তৈরি সাজানো বাগান। মেইজী রেস্টোরেশনের পূর্বে জাপানি নারীদের যে করুণ অবস্থার মুখাপেক্ষী হতে হতো তার কিছু নমুনা চিত্র দেখলাম। নারীরা কিভাবে নিজের দেহ-মন বিলিয়ে দিয়ে তাদের প্রভুদের চিত্ত বিনোদন করতো তারও আঁকা প্রতিকৃতি দেয়ালে।

একজন জাপানি বৃদ্ধ নারী নেত্রীর সাথে দেখা করার জন্য আমাদের নিয়ে গেল। তাঁর বয়স ১০৫। তিনি একটা ইজি চেয়ারে বসে অনর্গল কথা বলে গেলেন। দুইটি মহাযুদ্ধের তিনি সাক্ষী। তখনকার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হেরে যাওয়ার পর জাপানের আর্থিক অবস্থা এত শোচনীয় হয়ে গিয়েছিল যে আমরা প্রতি আটজনের ভাগ্যে একটা ডিম জুটতো। গাছের লতাপাতা এবং শিকড় সেদ্ধ করে নিজেরা এবং বাচ্চাদের খাওয়াতাম। সেই অবস্থা থেকে জাপান এই পর্যায়ে উন্নীত হতে তাদের কঠোর অগ্নিপরীক্ষা পার হতে হয়েছে। কঠিন মনোবল এবং মাত্রাধিক পরিশ্রম,

Pioneer in Village based website

ম্যানেজমেন্ট স্কিল, উন্নততর প্রযুক্তিবিদ্যা এবং সর্বোপরি দেশপ্রেমের জন্য জাপান আজকে উন্নত বিশ্বে নিজের স্থান করে নিয়েছে।

এক পর্যায়ে আমরা OISCA হেড কোয়ার্টারে গেলাম। এটা জাপানের অন্যতম বৃহৎ সাহায্য সংস্থা। পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশকে তারা নানাভাবে সাহায্য করে। বাংলাদেশে, বিশেষ করে কৃষি ও পশুপালন বিষয়ে উন্নততর প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে তাদের যথেষ্ট অনুদান আছে। হেড কোয়ার্টারে দেখা হলো OISCA-র প্রেসিডেন্ট ইয়োকো নাকানোর সঙ্গে। বাংলাদেশের নারীদের অবস্থা সম্পর্কে তাঁর সাথে অন্তরঙ্গ আলোচনা হলো। দেখলাম আমাদের দেশ সম্পর্কে তিনি বেশ অবগত। তাঁর বয়স এখন প্রায় সত্তুর বছর। তিনি এখনও তাদের কর্মসূচি দেখার জন্য বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। কিছুদিন আগে বাংলাদেশও ঘুরে গেলেন। যেসব দেশে তাদের কর্মসূচি রয়েছে সেই দেশগুলো সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন। তাঁর মতে যে দেশে তারা কাজ করেন সে দেশ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত জরুরি। নতুবা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

টোকিওতে সম্রাটের প্রাসাদ দেখতে যাওয়ার সময় প্রবেশ পথের কাছাকাছি চোখে পড়লো এক বিকলাঙ্গ পুরুষ রাস্তার পাশে শুয়ে আছে। হাত পেতে ভিক্ষা করছে । জানতে পারলাম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শিকার এই ব্যক্তি। আজ নিঃস্ব। তার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। যুদ্ধ বিধ্বস্ত হিসেবে যে ভাতা সে পায় তাতে তার চলেনা। এই দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ায় আমাদের গাইড খুব বিব্রত বোধ করলেন। এ ধরণের আরো একজন ভিক্ষুক সেখানে দেখেছিলাম।

Chhatri.com
Pioneer in village based website

মনে পড়ল ১৯৭৪ সালে লন্ডনে দুই জাপান (Two Japan) নামে টেলিভিশনের বিবিসি প্রোগামে একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম দেখেছিলাম। তাতে দেখানো হয়েছিল জাপানের প্রাচুর্যভোগী সমাজের পাশাপাশি জাপানি দরিদ্রদের করুণ অবস্থার চিত্র। সেখানে দৈনন্দিন জীবন যাপন এতই ব্যয়বহুল যে দরিদ্ররা অনেক সময় প্রয়োজনীয় চিকিৎসার সুযোগ পেতোনা। ছোট্ট একটি রুমে দ্বিতল-চৌতল বাঙ্কে প্রায় দশ বারোজন ঠাসাঠাসি করে থাকতো। মনে মনে ভাবি A coin has two sides, চাঁদেরও কলঙ্ক আছে। অপ্রতিহত প্রাচুর্যের মধ্যে কিছু কিছু কালো রেখা অস্বাভাবিক নয়।

মেইজি রেস্টোরেশনের পূর্বে জাপানে ছিল প্রাচীন সামন্ত প্রথার রাজত্ব। বাইরের কোন হাওয়া তার বাতাসে তখনও চাঞ্চল্য জাগায়নি। সেখানে ভূস্বামীরাই ছিল সমাজের প্রভু। সম্রাট যদিও ছিল, কিন্তু তার কোন ক্ষমতা ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে প্রায় দীর্ঘ দু'শ বছর জাপান ছিল সমগ্র পৃথিবী থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। গৃহ বিবাদ লেগেই থাকতো। এমনি এক সময় উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আমেরিকার একটি রণতরী বহর বানিজ্যের অভিপ্রায়ে জাপানের তীরে এসে ভিড়ল। জাপানিরা এই প্রথম বাষ্পচালিত জাহাজ দেখল, বিস্মিত হলো। কিন্তু আশ্চর্যের কথা অনতিকালের মধ্যে জাপানে এক নতুন সম্রাট ক্ষমতায় এলেন। নাম মুৎসিহিতো। ১৮৬৭ থেকে ১৯১২ সন পর্যন্ত পঁয়তাল্লিশ বছর তিনি রাজত্ব করেন। এই সময়কে বলা হয় মেইজি রেস্টোরেশন বা জ্ঞানদীপ্ত শাসন যুগ। এই সময় কিউটো থেকে সরিয়ে জাপানের রাজধানী ইয়েদোতে

নিয়ে যাওয়া হয়। এর নামাকরণ করা হয় টোকিও। তাঁর রাজত্বকালে জাপানে পশ্চাদগামিতার সব দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। অল্প সময়ের মধ্যে পাশ্চাত্য জাতিদের প্রগতিশীল ধরণ-ধারণ অনুকরণ করে শিল্পে, বাণিজ্যে, জাপান একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়।

শিক্ষায়, আইনে, শিল্পে এবং শাসনকার্যে অভূতপূর্ব রূপান্তর ঘটে। বৈজ্ঞানিক এবং শিল্প বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্য দলে দলে ছাত্রছাত্রী ইউরোপে এবং আমেরিকায় পাঠানো হয়। সেখান থেকে সুদক্ষ বিশেষজ্ঞ এবং পন্ডিতদের নিয়ে আসা হয়। সম্রাট মুৎসিহিতোকে শাসন সংস্কার, সামন্তপ্রথা রদ করা এবং উন্নয়ন বিষয়ে পরামর্শ দিতেন একদল দেশপ্রেমিক রাজনীতিজ্ঞ বুদ্ধিজীবী। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, প্রযুক্তির উন্নতমানের গ্রন্থগুলো জাপানি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এভাবে জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করে ক্রমে জাপান বিশ্বের একটি বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়। জাপানি নারীরাও সামন্ত প্রথার শৃঙ্খল থেকে ক্রমশ মুক্ত হতে লাগল। এত পরিবর্তন পরিবর্ধনের মধ্যেও জাপানিরা তাদের ঐতিহ্যকে কোনদিন বিসর্জন দেয়নি। সম্রাটের প্রতি তাদের আনুগত্যও অকল্পনীয়। ঐতিহ্য অভিমানী জাপানিরা তাদের ঐতিহ্যকে যথেষ্ঠ প্রাধান্য দেয়।

বুলেট ট্রেনে করে নাগোয়া গেলাম। সেখান থেকে টয়োদা কোম্পানির কারখানা দেখার জন্য টয়োদা সিটিতে নিয়ে গেল আমাদের দলকে। সেখানে তাদের কর্মচারীদের জন্য চিত্ত-বিনোদনের ব্যবস্থা থেকে শুরু করে বাসস্থান, হাসপাতাল এবং বাচ্চাদের স্কুল পর্যন্ত সব সুযোগ-সুবিধারই ব্যবস্থা আছে। পাহাড়ের ওপর অবস্থিত তাদের রেস্ট হাউসে টয়োদা কোম্পানির মালিকের স্ত্রীর সাথে আমরা মধ্যাহ্ন ভোজে মিলিত হলাম। স্বাগতিক বক্তৃতায় তিনি বললেন, আপনারা হয়তো আশ্চর্য হচ্ছেন টয়োদা কোম্পানির গাড়ির নাম টয়োটা কেন। টয়োদা-সামগ্রী বাজারজাত করার আগে আমরা এর নাম পরীক্ষামূলকভাবে জরিপ চালিয়ে গবেষণা করি। এতে দেখা যায় ধ্বনির দিক থেকে TOYOTA is more acceptable to people. পরে কৌতুক করে তিনি বলেছিলেন, আপনাদের প্রত্যেককে এক একটা টয়োটা গাড়ি উপহার দিতে চাই। আপনারা কি যাওয়ার সময় বিমানে করে নিয়ে যেতে পারবেন? আমরা সকলে হেসে উঠলাম। তখন যন্ত্রের মতো জাপানি কিমোনো পরা ফুটফুটে কয়েকটি সুন্দরী মেয়ে আমাদের প্রত্যেকের হাতে দিয়ে গেল এক একটি টয়োটা মডেল কার। তারপর আমাদের দলকে টয়োটা গাড়ির ফ্যাক্টরি দেখাতে নিয়ে গেল। সে এক বিশাল ব্যাপার। শুধু দেখেই চলেছি। তার আর শেষ নেই। সেখানে অনেক নারী শ্রমিক এবং কর্মরত অফিসার দেখলাম। আমরা এতজন পুরো ফ্যাক্টরি ঘুরে বেড়ালাম। কিন্তু তাতে তাদের কাজের কোন হের ফের হলো না। যে যার কর্ত্তব্য সম্পাদন করতে ব্যস্ত। তাদের শৃঙ্খলাবোধ সুমার্জিত।

নাগোয়ায় জাপানের সব চাইতে নামকরা সিরামিকস ফ্যাক্টরি নরিতকীও আমরা দেখতে গেলাম। তার দ্রব্যসামগ্রী পৃথিবী বিখ্যাত। অসংখ্য শ্রমিকের সুশৃংখল কার্যকলাপের আরেকটি দৃষ্টান্ত। দেখলাম মেয়েরা তাদের নিপুণ হাতে কী অসম্ভব ধৈর্যের সঙ্গে বাসন-কোসন, চায়ের পেয়ালা এবং অন্যান্য সিরামিক দ্রব্যের গায়ে নানা ধরণের

Pioneer in village based website

নানদিক নক্‌শা এঁকে চলেছে। প্রতিটি নক্‌শা এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং নিখুঁত, মনে হয় যন্ত্র দিয়ে আঁকা। আসলে হাতের কাজের জন্য নরিতকী চীনে-মাটির দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য খুব বেশি।

আমাদের সঙ্গ দিচ্ছিলেন টোকিয়ো থেকে মিসেস ইয়োকো আবে, লেবার ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি ডাইরেক্টর এবং ইবায়শী নামের বছর বিশেকের একজন গাইড। জাপানের এত উন্নতি দেখে আমরা প্রশংসা করছিলাম। ইবায়শী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে কী যেন বলতে চাইলো। তারপর জাপানি একসেন্টে ইংরেজিতে বললো, You have a lot to do, you can go up to the sky. But we have nothing left to go up. That is why we are so frustrated. তার স্বতস্ফূর্ত মুখমন্ডলে বিষাদের ছায়া নেমে এলো। আধুনিক যুগে মানুষের মনে আনন্দ আছে কিন্তু শান্তি নেই। শান্তির সন্ধানে মানুষ ঘুরে বেড়ায়। যেমন নদীর এ-কূল থেকে মনে হয় ওই কূলে সব সুখ, সেখানে যেতে চায় মন। তাদের দু'জনের সাথে আমাদের বেশ সুসম্পর্ক গড়ে উঠলো। ইয়োকো আমাকে এখনও নিয়মিতভাবে চিঠি লেখে। যতবারই জাপানে যাই সে আমাকে তার বাসায় নিয়ে যায়। দু'জনে একসাথে স্মৃতি রোমন্থন করি। টোকিওর আশাকুশা সপিং এলাকায় যাই। উইক-এন্ডে এই এলাকা অপরূপ রূপ ধারণ করে। কাগজের চেরী ফুল দিয়ে সাজানো। মানুষ আর মানুষ। মনে হয় মানুষের মেলা। নানা রকম হস্তশিল্প থেকে শুরু করে আধুনিক সরঞ্জাম, সবকিছুই পাওয়া যায়। ইয়োকো কিছুক্ষণ পরপর আমাকে জিগ্যেস করে, হাঁটতে পারছোতো? ক্ষিদে লেগেছে? কিছু লাগবে? ইত্যাদি। সে অত্যন্ত স্নেহময়ী। তার কোন সন্তান নেই। স্বামীর আগের স্ত্রীর দু'সন্তান এবং তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে ইয়োকোর সংসার। যেখানে যায় সেখান থেকে তার নাতি-নাতনিদের জন্য ছোট ছোট অনেক উপহার সংগ্রহ করে। ১৯৭৫ সালে তার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে সে তিনবার ঢাকা এসেছে। এখানে এসে আমাকে ফোন করে প্রথমেই বলে তোমাকে দেখতে এসেছি। জাপানিরা একবার আপন হয়ে গেলে চিরদিন সে সম্পর্ক বজায় রাখে।

আমাদের আরেক বন্ধু প্রফেসর তাদাহিকো হারা। আমার স্বামী মাহবুবের সাথে তার পরিচয় বহু বছর আগে। সে ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিল এনথ্রপলজীতে গবেষণা করার জন্য। চাটগাঁয়ে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় আমার ছোটবোন জাহানারার স্বামী প্রফেসর রফিকুল ইসলাম তাকে মাহবুবের কাছে পাঠিয়েছিল। মাহবুব তাকে আমার শ্বশুরবাড়ি গহিরা গ্রামে গবেষণা কাজ করার ব্যবস্থা করে দেয়। সেখানে সে প্রায় তিন বছর ছিল। সেই থেকে হারা আমাদের বাসায় প্রায়ই আসতো। সেই বন্ধুত্বের সম্পর্ক সে আমরণ রক্ষা করেছে।

প্রথমবার যখন জাপানে যাই (১৯৭৫) হারার স্ত্রী প্রফেসর হিরোকো হারা বাংলাদেশের নারীদের অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলার জন্য ওচানোমিজু মহিলা ইউনিভার্সিটিতে আমাকে আমন্ত্রণ জানান। তিনি আমার পেপারটি জাপানি ভাষায় অনুবাদ করিয়ে সকলের মধ্যে বিতরণ করলেন। আমার বক্তব্য উপস্থাপন করার সময় বাংলাদেশী নারীদের অবস্থা সম্পর্কিত অনেক সরাসরি প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিলাম। প্রশ্ন

Jhunati.com
Pioneer in village based website

করা হয়েছিল, বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রশাসন পর্যায়ে নারীর আনুপাতিক হার কত। কোন মহিলা মিনিস্টার আছে কিনা। সর্বোচ্চ পর্যায়ে নারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করতে পারে কিনা। আলোচনা শেষে তারা আমার হাতে একটা এনভেলাপ গুঁজে দিয়ে বললো, এটা তোমার জন্য সামান্য উপহার। খুলে দেখলাম তাতে জাপানি টাকা। আমি নিতে ইতস্তত করায় তারা বললেন, তোমার শ্রমের তুলনায় এই অর্থ অতি সামান্য। এটা গ্রহণ করলে আমরা কৃতার্থ হবো। জাপানিদের বিনয়ের তুলনা হয় না।

১৯৮৬ সালে Regional Seminar on Women's Information Network for Asia and the Pacific (WINAP)-এ অংশগ্রহণ করার জন্য আমি অষ্টমবারের মতো জাপানে যাই। এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় সাইটামাতে অবস্থিত ন্যাশনাল উইমেনস এডুকেশন সেন্টারে। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিল ESCAP। এখানে সতেরোটি দেশের প্রতিনিধি, আটজন জাপানি এনজিও প্রতিনিধি এবং সাতাশজন অবজারভার অংশ গ্রহণ করেন। এর মধ্যে আই.এল.ও ইউনিসেফ, এডিবি, ইউনিক এবং ইউ.এন ইউনি-ভার্সিটির কর্মচারিবৃন্দও ছিলেন। আমি এই রিজিয়ন থেকে ইউনিসেফকে প্রতিনিধিত্ব করি। এই সেমিনারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রথম ইউ এন আন্তর্জাতিক নারী দশকের পর থেকে এই রিজিয়নে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে কতখানি অগ্রসর হয়েছে তার পর্যালোচনা করা। নারী সম্পর্কিত ইনফরমেশন সিস্টেমে ESCAP এর সার্বিক সমন্বয় পদ্ধতি কীভাবে আরো উন্নত করা যায় তা বিবেচনা করা। আইরিন করটিস, হেলেন ওয়ার এবং হেলেন কে. বল্‌বে তিনটি প্রধান পেপার উপস্থাপন করেন। এতে নারী অধিকার সনদ CEDAW কার্যকরী করার সূচক, বাস্তব ভিত্তিক ইনফরমেশন সিসটেম, WINAP-এর উদ্দেশ্য এবং সাংগঠনিক কাঠামো ও তার মডেল তৈরি করা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

Pioneer in village based website

সেমিনার শেষে প্রফেসর হারার অনুরোধে টোকিওতে এক সপ্তাহ ছিলাম। টোকিয়োর নাকানো এলাকায় একই বিল্ডিংয়ে প্রফেসর হারার দুটো ফ্ল্যাট আছে। তিন তলায় তার পরিবার নিয়ে হারা থাকতো এবং চার তালার ফ্ল্যাটটি রেখেছিল তার বন্ধুদের জন্য। সেই ফ্ল্যাটে আমি ছিলাম। আমার জন্য ফ্রিজ ভর্তি খাবার কিনে রেখেছিল। অনেক দিন বাংলাদেশে ছিল বলে আমাদের খাবারের প্রতি তার বেশ দুর্বলতা ছিল। একদিন বললো, বাংলাদেশী খাবার খেতে তার খুবই ইচ্ছা হচ্ছে। আমি তাকে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করলাম। তার স্ত্রীসহ এসে বাংলাদেশী রান্না খেয়ে হারা কিছুটা নস্‌টাল্‌জিক হয়ে পড়লো। তাদের একমাত্র ছেলেকে আনেনি কেন জিগ্যেস করাতে বললো, আমার ছেলের একটা নিজস্ব মতামত আছে। তাকে জোর করতে চাইনি। সে এখানে আসার পরিবর্তে নিজের রুমে বসে গল্পের বই পড়তে চেয়েছে।

হারার এই কথাতে আমার বিরাট শিক্ষা হলো। এই ছোট্ট আট বছরের ছেলেটির কথাকে হারা কত মূল্য দিলো। আমরা ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলি কিন্তু একটা শিশুরও যে নিজস্ব মতামত থাকতে পারে, এটা ভেবেও দেখি না। মনে মনে স্থির করলাম আমিও ছোটদের ব্যক্তিগত মতামতের ওপর আর হস্তক্ষেপ করবো না কোনদিন। চেষ্টা করেছি

এই কথাটি মেনে চলতে। কখনো সফলকাম হয়েছি, কখনো ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু সচেতনভাবে চেষ্টা করেছি সব সময়।

দেশে ফেরার আগের দিন হারার ফ্ল্যাটে খেতে গেলাম। দু'পাশে বইয়ের স্তূপ। তার মাঝখানে একটা সরু প্যাসেজ। সেই সরু পথ বেয়ে গেলাম বসার ঘরে। সেখানেও বই আর বই। পুরো ফ্ল্যাটটা যেন একটা বইয়ের সমুদ্র।

বাংলাদেশ সম্পর্কে আলোচনা শুরু হতেই হারা তার বইয়ের স্তূপ থেকে বের করে আনলো নারীদের ওপর অতি সাম্প্রতিক তথ্য সংবলিত একটি রিপোর্ট। এই রিপোর্ট সম্পর্কে তখনও আমি কিছুই জানতাম না। কোথায় পেয়েছে জিগ্যেস করাতে সে বললো, টোকিয়োতে একটা তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন দেশের প্রতিদিনের খবর এবং তথ্য যোগ করা হয়। এছাড়া তারা বেশ কয়েকজন জাপানি মেয়েকে বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ তৈরি করার কাজেও হাত দিয়েছে।

বাংলাদেশে হারার নিয়মিত আসা যাওয়া ছিল। ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে কুমিল্লা বার্ড, বগুড়া বার্ড ইত্যাদি সব জায়গায় তার অবাধ বিচরণ। হারা একজন দৃঢ়চেতা, জ্ঞানী এবং সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি। আমাদের সংস্কৃতির প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। এদেশের মানুষকে সে গভীরভাবে ভালোবাসতো। তাই বারবার ফিরে আসতো এখানে। এভাবে একদিন সে অন্তিম শয্যায় শায়িত হয় ঢাকার মাটিতে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে নাকি সে মাহবুব এবং আমার খোঁজ করেছিল। আমরা তখন আমেরিকায়। ফিরে এসে বাংলাদেশের জাপান দূতাবাস থেকে একটা নোট পেলাম। তাতে হারার অন্তিম মুহূর্তের ইচ্ছাটা আমাদেরকে জানানো হয়েছিল। আমরা দু'জন শোকে অভিভূত হয়ে তার আত্মার প্রতি চোখের জলে নীরবে শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম।

Pioneer in village based website

লেকচার ট্যুর

ইউনিসেফের জাপান ন্যাশনাল কমিটির আমন্ত্রণে ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শেষবারের মত জাপান গেলাম। ইউনিসেফ জাপান ন্যাশনাল কমিটি এবং জাপান কনজিউমার্স কো-আপারেটিভ ইউনিয়নের (যে.সি.সি.ইউ) যৌথ কর্মসূচির দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে স্মারক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল বিভিন্ন জায়গায় লেকচার ট্যুর। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইউনিসেফ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণাকে জোরদার করা এবং ইউনিসেফের পক্ষে তাদের সমর্থন আরো বৃদ্ধি করা। এই কর্মসূচির আওতায় হক্কাইডো, টহুকু, কান্তু, কানসাই এবং কিউসিও অঞ্চলে মোট পাঁচটি লেকচার-ট্যুরের ব্যবস্থা করা হয়। আমার ওপর দায়িত্ব পড়ে কানসাই (Western Region) অঞ্চলের।

এই লেকচারট্যুরের যাবতীয় সহযোগিতায় ছিল যে.সি.সি.ইউ। এর সদস্য সংখ্যা প্রায় পনের মিলিয়ন। এই সংগঠন প্রতি বছর ইউনিসেফকে আড়াই মিলিয়ন ডলার চাঁদা দিত।

কানসাই অঞ্চলে ঘুরেছি মোট দশ দিন এবং লেকচার দিয়েছি ওসাকাসহ চারটা প্রিফেকচারে (ডিস্ট্রিক্ট)। শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে তাদের কর্মসূচি দেখেছি। মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত কোপারেটিভও দেখেছি। এর মধ্যে বিশেষ করে মনে আছে ওত্সু শহরে শিগা কোপারেটিভ-এর প্রেসিডেন্ট কোশী হিগাশিনোর কথা। তিনি আমাকে মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়ন করেন। জাপানি কায়দায় পাটির মত মাদুরে বসে পা' দু'টো একটা গর্তে ঢুকিয়ে দিলাম। এর সঙ্গে নিচু খাবার টেবিল। জাপানি খাবার। কাঁচা মাছ। সুকিয়াকী এবং সালাদ, চিংড়ি মাছ এবং পুঁই শাখের পাতার মত এক প্রকার পাতা ভাজি। এটা তাদের প্রিয় খাদ্য। একখন্ড তরমুজ এবং সবুজ চা। এরপর গেলাম নারা সিটিজেন্স্ কোপারেটিভে। জাপানি বিয়ে করে নারাতে বসবাস করেন একজন মার্কিন নারী। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন একটা অতি পুরোনো মন্দির দেখতে। এই হাজার বছরের পুরোনো মন্দিরকে পরিবেশ সহকারে অক্ষত অবস্থায় সুরক্ষা করেছে নারার ঐতিহ্য অভিমানী জাপানিরা। উঁচু পাহাড়ি রাস্তায় হেঁটে যেতে যেতে আমরা দেখলাম অসংখ্য হরিণ। আমার সঙ্গী মার্কিন নারী ছোট্ট একটা দোকান থেকে কয়েকটা রুটি কিনে আমার হাতে গুঁজে দিলেন। অবাক হয়ে গেলাম যখন দেখলাম হরিণগুলো আমার হাত থেকে রুটি নিয়ে খাচ্ছে। ওখানে কেউ হরিণ শিকার করে না। তারা অন্যান্য গৃহপালিত পশুর মত রাস্তাঘাটে অনায়াসে বিচরণ করে।

নাগোয়াতে কিন্রো-শিসিন্ কনসিউমার্স কোপারেটিভ সোসাইটির একটা দোকানে আমাকে নিয়ে গেলেন প্রজেক্ট ম্যানেজার কনিচিমোরি। সেখান থেকে আমি কয়েকটা ছোটখাটো জিনিস কিনে যখন বের হয়ে এলাম তখন মোরি আমাকে বললেন, এই জিনিসগুলো কিনে আপনি কোপারেটিভ সোসাইটিকে সাহায্য করেছেন। তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। জাপানিদের বিনয়ের এরকম বহু উদাহরণ আছে। এরপর কোবে কোপারেটিভে গিয়ে জানতে পারলাম এই সংগঠনটি জাপানের সর্ব বৃহৎ কোপারেটিভ। এর সদস্য সংখ্যা দশ লক্ষের মত। এই সংগঠনটি জাপানে সর্ব প্রথম ইউনিসেফকে প্রয়োজনীয় সমর্থন এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিল। তাদের নিজস্ব বিল্ডিংয়ে আমার বক্তৃতা দেয়ার ব্যবস্থা হলো। জাপানে আমার এটাই সর্ববৃহৎ অনুষ্ঠান।

ওসাকাতে শেষ দিনের অনুষ্ঠানে জাপান ন্যাশনাল কমিটির এক্জেকিউটিব ডাইরেক্টর ইয়োসিহিসা টোগো বলেন, বিশ্বের দরিদ্র শিশু ও নারীদের জন্য ইউনিসেফের যে কর্মসূচি তার ব্যাপক প্রচার দরকার। জাপানের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই সংবাদ পৌছে দেয়ার জন্য লেকচার ট্যুরের মত মুখোমুখি আলোচনার গুরুত্ব অপরিসীম। এ ব্যাপারে আপনার অবদান চিরদিন কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ রাখবো। কানসাই অভিজ্ঞতা বিনিময় আমাদের ভবিষ্যত কর্মসূচিতে অনেকখানি সাহায্য করবে। এই অঞ্চলের নারী-পুরুষের জন্য এটা একটা দুর্লভ সুযোগ।

আমার বক্তৃতায় বাংলাদেশের দারিদ্র্য, শিশু ও নারীদের সার্বিক অবস্থা বিশেষ করে ছিন্নমূল শিশু, শিশু শ্রমিক এবং মেয়ে শিশুদের দূরবস্থার কথা আলোচনা করলাম। আমাদের সরকার এবং এনজিওরা বিশেষ করে ব্র্যাক তাদের উন্নয়নের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তাতে ইউনিসেফ কি ভূমিকা পালন করেছে, ইত্যাদি সম্পর্কে

মোটামুটি একটা ধারণা দিতে চেষ্টা করলাম। আলোচনা পর্বে কেউ কেউ জানতে চাইলেন বাংলাদেশে কোন্ ধরণের কর্মসূচিতে তারা সাহায্য করতে পারে। উত্তরে বললাম, যদি সম্ভব হয় প্রাইমারি শিক্ষার জন্য তারা তহবিল সংগ্রহ করতে পারেন। প্রাইমারি শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের দিকে ইউনিসেফ পরবর্তীতে বিশেষ প্রচেষ্টা নেয়ার পরিকল্পনা করেছে।

মেয়ে শিশুদের শিক্ষার ওপর বেশি জোর দেয়া উচিত বলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করলেন। এই প্রসঙ্গে আমি বললাম, আমাদের দেশে সিংহভাগ মেয়ে শিশুরা নিজ বাড়িতে পরবাসে দিন কাটায়। তাদেরকে বিয়ে দিয়ে পরের বাড়ির দায়িত্ব নেয়ার জন্য ছোটবেলা থেকে তৈরি করা হয়। প্রায় পনেরো বছর বয়সে অনেকের বিয়ে হয়ে যায়। অনেক সময় দেখা যায় যখন তারা নিজেরাও শিশু, তখন তারা মা হয়ে আরেকটি শিশুকে পরিচর্যা করে। মেয়ে শিশুরা বেশির ভাগই এইভাবে তাদের অদৃষ্টকে মেনে নেয়। লক্ষ্য করলাম সামনের সারিতে কয়েকজন নারী অশ্রুসজল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন বলতে চাইছেন। ইন্টারপ্রিটার মার্কিন মহিলা আমাকে ইংরেজিতে বুঝিয়ে দিলেন বাল্যবিবাহের কথা শুনে তারা খুবই দুঃখ পেয়েছেন। তাঁরা বুঝতেই পারছেন না যে মেয়েদের বিয়ের আইনগত বয়স আঠারো বছর হওয়া সত্ত্বেও কেন তারা বাল্যবিবাহের শিকার হচ্ছে। তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করলাম, আমাদের দেশে এখনও (১৯৯৪) কোন বিজ্ঞান সম্মত জন্ম-নিবন্ধন পদ্ধতি চালু করা হয়নি। তাই বয়স নির্ণয় করা যায়না বলে বাল্য বিবাহ এখনো বেশ প্রচলিত।

আরো বললাম, এই কারণেই তাদের শিক্ষার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। শিক্ষিত হলে এবং দক্ষতা অর্জনমূলক কিছু শিক্ষা পেলে তাদের ক্ষমতায়ণ হবে। তারা বাল্যবিবাহের মতো সমস্যা নিজেরা চিহ্নিত করতে পারবে। রোজগার করার পন্থা খুঁজে পাবে। নিজের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার মতো ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে পারবে। মেয়ে শিশুদের ক্ষমতায়নের জন্য ইউনিসেফ বাংলাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচিতে সহায়তা করে এবং এই কর্মসূচি আরো শক্তিশালী করার জন্য পরবর্তিতে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করবে।

দশদিনের লেকচার ট্যুর শেষে ওসাকার কানসাই বিমান বন্দর থেকে ঢাকার পথে রওনা হলাম। একটি অনবদ্য সুন্দর ফুলের তোড়া দিয়ে ইউনিসেফ জাপান ন্যাশনাল কমিটি এবং জে.সি.সি.ইউর সদস্যরা আমাকে বিদায় দিলেন।

কেনাডায় টুয়েন্টি-টুয়েন্টি সিম্পোজিয়াম

প্রফেসর রেহমান সোবহানের আশাবাদী বক্তব্য

আমি তখন ইউনিসেফে নারী উন্নয়ন কর্মসূচির প্রধান এবং এল.সি.জির (লোকাল কনসালটেটিভ সাব-গ্রুপ অন উইড) কনভেনর। অপ্রত্যাশিতভাবে ১৯৯০ সালের এপ্রিল মাসে কেনেডিয়ান এমবেসি থেকে আমন্ত্রণ পেলাম কেনাডা যাওয়ার জন্য।

আটোয়াতে বাংলাদেশ টুয়েন্টি-টুয়েন্টি সিম্পোজিয়াম করার উদ্যোগ নিয়েছিল কেনেডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সীর (CIDA) সহায়তায় কেনাডাস্থ ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ বাংলাদেশ। তখন ইউনিসেফের রিপ্রেজেনন্টেটিভ ছিলেন কোল.পি.ডজ। আমন্ত্রণ লিপিটা দেখেই তিনি আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে জানতে চাইলেন বাংলাদেশ থেকে আর কেউ প্রতিনিধিত্ব করছে কিনা। কেনেডিয়ান এম্বেসির ফার্স্ট সেক্রেটারি নেইল মাসেলকে ফোন করে জানতে পারলাম প্রফেসর রেহমান সোবহানও যাবেন। এরকম একজন গুণীজনের সাথে একই কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করলাম। তার স্ত্রী ব্যারিষ্টার সালমা সোবহানও এদেশে নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ করে নারীদের জন্য লীগ্যাল এইড সংক্রান্ত বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। একই পথের পথিক হিসেবে তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্পর্ক।

প্রফেসর রেহমান সোবহান আমার একদিন আগে রওনা হয়ে গেলেন। আমি পরের দিন রওনা হলাম। ব্যাংকক ও আমস্টারডাম হয়ে কেনাডা পৌঁছলাম। অটোয়া এয়ারপোর্টে পৌছে দেখি মাসুদা আনোয়ার বেবী আমাকে নিতে এসেছে। এত দূরে সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গায় একজন আপনজন পেয়ে কী যে ভালো লাগল। বেবী বহু বছর ধরে কেনাডায় স্থায়ীভাবে বসবাস করে। সে আমার বন্ধু শিরিন মতিনের ছোট বোন। এই সুবাদে আমাকে বড়বোনের মত শ্রদ্ধা করে। শিরিন আমার প্রিয় বন্ধু। চট্টগ্রামে থাকতে শিরিন এবং আমি একসাথে অনেক সময় কাটিয়েছি। উচ্চতম সরকারি কর্মকর্তার স্ত্রী হয়েও শিরিনের মধ্যে কোনরকম দম্ভ বা আত্মম্ভরিতা কোনদিন দেখিনি। তার মত অসীম ধৈর্যশীল মানুষ খুবই কম দেখা যায়।

বেবীর বাসায় দু'রাত কাটিয়ে চলে গেলাম কুইবেকের কেন্ট্লিতে অবস্থিত ইক্নিক হাউজে। চারিদিকে বিরাট বিরাট গাছ। ছায়ায় ঘেরা বনের মাঝখানে অবস্থিত কাঠের

Ghumati.com
Pioneer in village based website

তৈরি ইক্‌নিক হাউজ। তারই দোতলায় তিন দিন ধরে (১৬-১৮ মে ১৯৯০) চললো আমাদের কনফারেন্স। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ২০২০ সালে বাংলাদেশের অবস্থা কী রকম হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করা এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে কি কি কর্ম-কৌশল গ্রহণ করা যায় তা বিবেচনা করা। আমরা দু'জন বাংলাদেশীসহ মোট সতেরোজন অংশ গ্রহণ করেছিলাম। বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিত সামনে রেখে গবেষণামূলক সম্ভাব্য চিত্র উপস্থাপন করলেন প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞরা। বর্তমান পলিসি-এনভায়রনমেন্ট বিশ্লেষণের মাধ্যমে ২০২০ সালে অর্থাৎ আগামী তিন দশকে বাংলাদেশের অবস্থা কি হতে পারে এবং কি হওয়া উচিত এর ওপর তারা কয়েকটি বিকল্প চিত্র তুলে ধরলেন। তার মধ্যে প্রথম চিত্রটি ছিল অত্যন্ত আশাবাদী (optimistic)। দ্বিতীয়টা ছিল স্থবির (stagnation)। তৃতীয় চিত্রটি ছিল পুরোপুরি ধ্বংসমূলক (decaying)। তুমুল তর্ক-বিতর্কের পর তৃতীয় চিত্রটি বাদ দেয়া হয়। তিনদিন ধরে নিবিড় আলোচনা হয়। উন্নয়নে জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, অর্থনৈতিক ডাইভারসিফিকেশন, দাতাসমূহের মধ্যে নিজস্ব সমন্বয়-সাধন, এসব ইস্যুর ওপরও যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়। দাতাগোষ্ঠীর বর্তমান ভূমিকার সংস্কার সাধন করে বাংলাদেশের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন দিক নির্দেশনার কথাও আলোচনায় একটা বিশেষ দিক ছিল। নারী উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করার দায়িত্ব পড়েছিল আমার ওপর। আমি বাংলাদেশের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯০-১৯৯৫) কিভাবে নারী উন্নয়ন ম্যাক্রো চ্যাপটার সংযোজন করা হয়, এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে দাতাগোষ্ঠী কী ভূমিকা পালন করে, তা বর্ণনা করলাম। এবং ভবিষ্যতে কোন্ ধরণের কর্মকৌশল বা পদ্ধতি অনুসরণ করা দরকার তার সম্পর্কেও আমার মতামত ব্যক্ত করলাম। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ এবং তা আরো শক্তিশালী করার জন্য সকলে নানা ধরণের সুপারিশ রাখলেন।

humati.com
Pioneer in village based Website

প্রফেসর রেহমান সোবহান বরাবরই আশাবাদী বক্তব্য রাখলেন। তিনি অত্যন্ত জোরালো যুক্তি দিয়ে সকলকে বুঝিয়ে দিলেন দুই হাজার বিশ সালে বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধিশালী দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তিনি মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও তার সঠিক ব্যবহারের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। অনেকে যদিও বলছিলেন এরূপ আশাবাদী হওয়া স্বপ্ন-বিলাসিতার সামিল। কিন্তু রেহমান সোবহানের ব্যক্তিত্বের কাছে কেউ দাঁড়াতে পারলো না। তাঁর এই অসামান্য ব্যক্তিত্ব এবং জ্ঞানগর্ভতা দেখে সেদিন অত্যন্ত গর্ব অনুভব করেছিলাম। বাংলাদেশে বিদগ্ধ পন্ডিত ব্যক্তি এবং মানব সম্পদের অভাব নেই। কিন্তু এই সম্পদকে আমরা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি না। এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে। কীভাবে তিন দিন পার হয়ে গেল টের পেলাম না। আশার বাণী নিয়ে আমাদের কনফারেন্স শেষ হলো।

রেহমান সোবহান যে সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন তা কি বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব হবে? ইতোমধ্যে এক দশক (২০০০) অতিক্রান্ত। উন্নয়নসূচক গুলোর কিছু

কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অন্যদিকে দুর্নীতির প্রসার, সন্ত্রাসমূলক তৎপরতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অরাজকতা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা ক্রমাগত বৃদ্ধির দিকে। নারী শিক্ষার হার যদিও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, তাদের সার্বিক অবস্থানের তেমন কোন গুণগত পরিবর্তন হয়নি। উন্নয়নের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার অভাবে এই অর্জন শুধু সাক্ষরতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। সকলের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগের দ্বার অবারিত করা এখনো হয়নি।

শৈশবের লালিত একটি ইচ্ছা

কনফারেন্স শেষে কেন্টলি কুইবেকের নির্জন ইক্‌নিক হাউজ ছাড়িয়ে অটোয়ার লোকালয়ে ফিরে এলাম তৃতীয় দিন রাতে। খাবার টেবিলে অসতর্কভাবে হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়ে গেল শৈশবের লালিত একটি ইচ্ছার কথা। সাথে সাথেই বেবী রাজী, সপ্তাহ্ শেষে আমাকে নায়গ্রা জলপ্রপাত দেখতে নিয়ে যাবে। এই কর্মব্যস্ততার মধ্যে আবার আমার জন্য এত দূরে নিজে ড্রাইভ করে বেবীকে যেতে হবে, একথা ভেবে মনে মনে বেশ সঙ্কোচবোধ করলাম।

শনিবার সকালে বেবী, তার স্বামী বাবু লোককবি জসিমউদ্দিনের ছেলে এবং তাদের বছর দশেকের ছেলেসহ আমরা যাত্রা শুরু করলাম। বিস্তীর্ণ হাইওয়ে দিয়ে যাচ্ছিলাম। প্রচন্ড ঠান্ডা। বেবী তার গায়ের ওভারকোটটা খুলে আমাকে পরিয়ে দিয়ে বললো, তাদের এতটুকু ঠান্ডা লাগছেনা। কেনাডায় এর চেয়ে অনেক বেশি ঠান্ডা পড়ে। তারা এতে অভ্যস্ত। তার এই নিঃস্বার্থ ব্যবহার সেদিন আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আমি শীত থেকে রেহাই পেলাম। পথে পথে ছোট-বড় নানা ধরণের বিশ্রাম কেন্দ্র। দু'য়েকটাতে থামলাম। চা খেলাম। বিশ্রাম নিলাম। সন্ধ্যায় টরেন্টোতে পৌঁছলাম। বেবীদের এক বাংলাদেশী বন্ধুর বাসায় রাত কাটালাম। সেখানে গিয়ে বিশেষ করে উপলব্ধি করলাম বিদেশে বাঙালি সজ্জন। যত দূর হোকনা কেন, সকল বাঙালিদের মধ্যে একটা চমৎকার নেটওয়ার্ক রয়েছে। তারা পরস্পর পরস্পরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। পরদিন ভোরে আমরা নায়গ্রার পথে রওনা হলাম। এবার বিরামহীন ড্রাইভ করে বেবী আমাদের নিয়ে এলো নায়গ্রার কাছাকাছি, যেখানে রাস্তার দু'ধারে অফুরন্ত পানির স্রোত। তার উৎপত্তি আর শেষ কোথায় তা বুঝবার উপায় নেই। এক একবার মনে হলো এই অজস্র পানি পাহাড়ের গা ঘেঁষে ওপর থেকে নামছে। চারিদিকে পানি আর পানি। আকাশের নীলাভ আবরণে আর পানির ছলছল শব্দে মনে হচ্ছিল রূপকথার স্বপ্নপুরীতে প্রবেশ করেছি। পানির স্রোতের ছন্দে ছন্দে নিজের কল্পনার পাখা মেলে যেন উড়ে যাচ্ছিলাম অসীমের পানে। ধীরে ধীরে গন্তব্যস্থানে এসে পৌঁছলাম। নায়গ্রা জলপ্রপাতের স্বর্গীয় দৃশ্য দেখতে দেখতে প্রবেশ করলাম অরেক পৃথিবীতে। বিভিন্ন দিক থেকে ঘুরে ঘুরে নায়গ্রার পানি দেখলাম। চোখের তৃপ্তি মেটে না। সেই মুহূর্তে ইচ্ছা হয়েছিল নায়গ্রার জলপ্রপাতের এই অপূর্ব কলতান শুনে শুনে যদি জীবন কাটিয়ে দিতে পারতাম। এই বিভোর স্বপ্নের মধ্যে

Pioneer in village based website

দিন গড়িয়ে গেল। সন্ধ্যা হয়ে এলো কখন বুঝতেও পারলাম না। আমরা অটোয়ার জন্য রওনা হয়ে গেলাম।

পথ চলতে চলতে ভাবলাম আমাদের দেশে বন্যায় পানির ধ্বংসরূপ দেখেছি। কক্সবাজারে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ দেখেছি। কিন্তু নায়গ্রা জলপ্রপাতের মতো পানির এমন সৃষ্টিময়, ছন্দময় সৌন্দর্য আর কোনদিন দেখিনি, হয়তো আর দেখবোনা। আমার স্মৃতির ভান্ডারে আরেকটি সুন্দর অভিজ্ঞতা যুক্ত হলো।

Chunati.com
Pioneer in village based website

নারী এবং সামাজিক নির্যাতন

লন্ডনের বারনারী প্রসঙ্গে

১৯৭৮ সাল। বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী ভ্যান গখ্ ভিনসেনের (১৮৫৩-১৮৯০) জন্মভূমি নেদারল্যান্ডে কয়েকদিনের জন্য গিয়েছিলাম। বিস্ময়কর সৌন্দর্যের দেশ নেদারল্যান্ড। চারিদিকে বাঁধ দিয়ে সমুদ্রের বিশাল জলরাশি থেকে রক্ষা করা হয়েছে এ দেশকে। এই বাঁধ তাদের দেশপ্রেম এবং কর্মদক্ষতার এক বিরল দৃষ্টান্ত। বিভিন্ন জায়গায় তাদের ঐতিহ্যবাহী উইন্ডমিল। এককালে এই উইন্ডমিল থেকে তারা বিভিন্ন কল-কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করতো। জাতীয় পুষ্প টিউলিপের অপূর্ব সমারোহ দেশটিকে করেছে আরো আকর্ষণীয়।

চারদিকে লেক দিয়ে ঘেরা আমস্টারডেম শহর। সেখানে চারদিন ছিলাম সমুদ্রের নিকটবর্তী একটি হোটেলে। নাম মনে নেই কিন্তু তার দৃশ্য চোখের সামনে ভাসছে। সকালে চা খেতে খেতে জানলা দিয়ে সমুদ্রের ঢেউ দেখতাম। একদিন আমস্টারডেমের চারপাশের লেকে ঘুরে বেড়ালাম বোটে করে। হিপ্পিদের রাজার বাড়ি দেখালো একজন বন্ধু। লেকের পানিতে অর্ধেক ডোবা, একপাশে খড়ের ছাউনি দেয়া। হতাশাগ্রস্ত কিশোর-কিশোরীরা এই রাজার শিষ্য। সাধারণত বড়লোকের সন্তানরা ওই সময় সত্তুর এবং আশির দশকে, পাশ্চাত্যের ভোগবাদী সমাজের ওপর বিরূপ হয়ে বিভিন্ন স্পিরিচুয়্যাল দলে যোগ দিত। সেখানে তারা শান্তি এবং সুখের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতো। হিপ্পিরা এই ধরনের একটি দল বললে অত্যুক্তি হবে না।

নেদারল্যান্ড থেকে লন্ডনে গেলাম কয়েকদিন থাকার উদ্দেশ্যে। এক নির্জন দুপুরে টেলিভিশন দেখছিলাম। সেই দৃশ্যটি কিছুতেই ভুলতে পারি না। তাই এখানে তার অবতারণা। দেখলাম লন্ডনের বারনারীদের সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকার। যে এলাকায় তারা থাকেন সেই জায়গায়াটা প্রথমে দেখানো হয়। কোন একজন পুরুষকে সম্ভাষণ জানাবার জন্য রাস্তার ধারে অপেক্ষমান একজন নারী। বয়স তিরিশের কোঠায়, সাজসজ্জায় যদিও বয়স বোঝা মুশকিল। টেক্সির ভেতর উপবিষ্ট এক ভদ্রলোকের সাথে দৃষ্টি বিনিময় হওয়ায় মুহূর্তের মাঝে সেই অপেক্ষমাণ নারীকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন সকাল এগারোটায়। আবার বারোটায় একই জায়গা থেকে আর একজন পুরুষ তাকে উঠিয়ে নিয়ে হাওয়ার মতো মিলিয়ে গেলেন। প্রতি ঘন্টায় এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এরপর দেখলাম একজন সাংবাদিক সেই বিশেষ নারীর সাক্ষাৎকার নিলেন। চোখে চোখে

Pioneer in village based website

তাকিয়ে কথা বলতে পারছিলেন না। কিন্তু কথার ফোয়ারা ঠিকই চলছিল। তিনি একজন ড্রাগ এডিক্ট এবং একটি ছোট চাকরি করেন। তার মোটা অঙ্কের অর্থ প্রয়োজন। যা বেতন পান তাতে এই চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। তাই তিনি এ পথ বেছে নিয়েছেন। একের পর এক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেলেন। দিনে দশ-বারো জনের কম ক্লায়েন্টে তার চলেনা। তিনি তাদের সঙ্গে কোন মানসিক সম্পর্ক স্থাপন করেন না। এ পথে যাওয়ার জন্য তার কোন দুঃখবোধ নেই, আনন্দও নেই। তবে তিনি কারো অধীন নন। স্বাধীনভাবে জীবনের চাহিদা মিটিয়ে চলার জন্য এ এক অপূর্ব সুযোগ বলে তিনি মনে করেন।

আর একজনের সাথে সাক্ষাৎকার। মহিলা খুবই স্মার্ট। প্রচুর রোজগার করেন এবং তা দিয়ে অত্যন্ত বিলাসবহুল জীবন যাপন করেন। এটাই তার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। একজন অতি সাধারন নারী হয়ে অন্য কোন উপায়ে এত সহজে এত টাকা রোজগার করা সম্ভব নয়। তিনি এ পথে এসে নিজেকে অত্যন্ত সুখী মানুষ মনে করেন। কোন কোন ক্লায়েন্টের সঙ্গ তার কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক। তিনি দৈনিক পনেরো-ষোল জনকে সঙ্গ দেন এবং প্রত্যেকের জন্য বিশ মিনিট থেকে আধঘন্টা সময় ব্যয় করেন।

কথাটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলামনা। এই সাক্ষাৎকার দেখে মনে হলো নারীদের এই কাহিনীগুলো কি গল্প, না সত্যি ঘটনা। হয়তো এমন সত্যি ঘটনাও অহরহ ঘট্‌ছে ওই সমাজে। এমন খোলাখোলিভাবে এসব ঘটনা প্রকাশ করা কি করে সম্ভব হলো? মনের কাছে সেদিন এ এক বিরাট প্রশ্ন ছিল। পশ্চিমের নারীরা মনের দিক থেকে স্বাধীন। তাই তারা মুক্তমন নিয়ে অপ্রিয় সত্যি কথা গুলো নিঃসঙ্কোচে বলতে পারেন। আমাদের নারীরা কোনদিন এভাবে নিজের কথা বলতে পারবে কিনা, আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

Chhatri.com
Pioneer in village based website

আমাদের শত শত নারী অভাবের তাড়নায় কিংবা নানা সামাজিক নির্যাতনের শিকার হয়ে পতিতাবৃত্তির আশ্রয় নেন। কত নারী নিরুপায় হয়ে এ পথে নিজেকে উৎসর্গ করেন হয়তোবা নিজের দু'বেলা অন্ন জোটাবার জন্য। অবস্থার চাপে পড়ে যারা এই পথে আসেন তাদের মধ্যে অনেকে কোন এক সময় নিজের শিকড়ে ফিরে যেতে চান। কিন্তু সমাজ তাদের গ্রহণ করে না। কতখানি অসহায় এই নারী। কোনদিন মুক্ত মনে এই অসহায়ত্বের কথা কি তারা মানব সমাজের কাছে বলতে পারেন?

ইদানিং তাদের মধ্যে কিছু কিছু সচেতনতার আভাস লক্ষ্য করা যায়। নারীপক্ষের আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে কয়েকজন নারী যৌনকর্মীদের কথা বলার সাহস দেখে অবাক হয়েছিলাম। আজকাল দৈনিক সংবাদপত্রেও এই ধরনের প্রতিবাদী রিপোর্ট মাঝে মধ্যে দেখতে পাই। তাদের অধিকার এবং দাবি সম্পর্কে তারা এখন মুখ খুলতে শুরু করেছেন। সমাজকল্যাণ এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং কিছু কিছু এন.জি.ও তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি, উন্নয়ন, আইনগত সহায়তা এবং সমাজে পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত ক্ষুদ্র হলেও তাঁদের সকলকে আমি স্বাগত জানাই। নিঃসন্দেহে এই প্রচেষ্টা আরো প্রসারিত এবং শক্তিশালী করা দরকার।

মেয়েদের জীবন ও সামাজিক কুসংস্কার

১৯৮২ সালের শেষের দিকে আমার শ্বশুরবাড়ি গহিরা গ্রামে গিয়েছিলাম। আমাদের বাড়ি চট্টগ্রাম শহর থেকে প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার দূরে। সেখান থেকে আমার এক দেবরের বাড়িতে দুপুরে দাওয়াত খেতে গিয়ে এক মর্মান্তিক ঘটনার সম্মুখীন হলাম। তা আজও আমার মনে কাঁটার মতো বিঁধে আছে। আমরা যেই ঘরে বসে খাচ্ছিলাম তারই পাশের বাড়ি থেকে একটি মেয়ের করুণ কান্নার শব্দ ভেসে আসছিল। ইচ্ছা করছিল না খেয়ে উঠে যাই এবং কেন প্রতিবেশী মেয়েটা এমন করে কাঁদছে তার খবর নিই। আমরা যেহেতু অতিথি, না খেয়ে উঠে যাওয়াটা হয়তো কারো পছন্দ নাও হতে পারে। এই লোকভয়ে মনে অশান্তি সত্ত্বেও খাবারটা শেষ করলাম। পাশের বাড়িতে মেয়েটা কেন গোঙ্গিয়ে কাঁদছে তার খবর নেয়ার চেষ্টা করলাম। মেয়েটার নাম আমেনা। বিয়ে হয়েছে এক বছর। বয়স পনেরো বছরের বেশি নয়। আমেনা নিজেও একজন মেয়ে শিশু। সে আরেকজন শিশুর জন্ম দিতে গিয়ে এই যন্ত্রণার শিকার। তার বাচ্চা হবে। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। শ্বাশুড়ি বললো, বিগত তিন দিন ধরে সে এইভাবে কষ্ট পাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে গভীর বেদনা অনুভব করলাম। ইউনিসেফে আমরা নিরাপদ মাতৃত্বের কথা বলি। প্রসূতিদের যত্ন নেয়ার কথা বলি। প্রসূতি মৃত্যুর হার কমাবার কথা বলি। শিশু জন্মের আগে প্রসূতির স্বাস্থ্যে কোন রকম জটিলতা দেখা দেয়ার পূর্বে তাকে জরুরি ভিত্তিতে সেবা প্রদান করা, ইত্যাদির কথা বলে থাকি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের বেশিরভাগ নারীই এই অবস্থায় সময়মত উপযুক্ত সেবা থেকে বঞ্চিত। পর্যাপ্ত না হলেও আমাদের দেশে স্বাস্থ্য সেবার যে সীমিত ব্যবস্থা আছে, সচেতনতার অভাবে তার সুযোগও অনেকে নেয় না। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এর অনেক উদাহরণ দেখা যায়। উপরোক্ত ঘটনাটি এর সাক্ষ্য-প্রমাণ। তিন দিন ধরে প্রসব যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে কিন্তু তাকে কোন ডাক্তার দেখানো হয়নি। তাকে যে জরুরিভাবে চিকিৎসা করা দরকার এবং তার বিশেষ যত্ন নেয়া প্রয়োজন এই ব্যাপারে কেউই সচেতন নয়, যদিও সকলে তার প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল। তিন দিন ধরে এই গ্রামেরই একজন দাই আমেনার সেবা করছিল। আমি তার শ্বাশুড়িকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম তাকে অবিলম্বে ডাক্তার দেখানো প্রয়োজন। তাকে নিকটস্থ থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠানো দরকার। পুরুষ ডাক্তার তার ছেলের বৌকে দেখবে এই জন্য সে আমেনাকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠাবার অনুমতি দিলো না। অবশেষে আমি তার স্বামীকে এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে বুঝিয়ে বললাম, এর পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে। আমেনার শ্বশুর এবং স্বামী যখন একমত হলো, তখন অগত্যা শ্বাশুড়িও রাজি হয়। কিন্তু সাথে সাথে বললো, সব মেয়েকেই এরকম কষ্ট করতে হয়। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। এদিকে বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে এলো। আমেনার স্বামী মায়ের অনুমতি নিয়ে রিক্‌শা আনবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলো। তিন মাইল দূরত্বের পথে অন্য কোনভাবে একজন প্রসূতিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ইতোমধ্যে আমেনার ভীষণভাবে রক্তপাত শুরু হয়। রিক্‌শার চারিদিকে শাড়ি জড়িয়ে পর্দা দেয়া হলো। আমেনাকে কোন রকমে রিকশায় উঠানো হলো। তখন সে প্রায় অর্ধ মৃত। কথা জড়িয়ে

Khanati.com
Pioneer in village based website

যাচ্ছে। এই অবস্থায় পথ চলতে চলতে তারা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পাঁচিলের মধ্যে ঢুকতেই আমেনা একটি মৃত সন্তানের জন্ম দিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো।

কেন এই অপরিণত বয়স্ক মেয়ে শিশুটিকে আরেকটি শিশুর মা হতে হলো। কেন এভাবে আমেনার বেঁচে থাকার অধিকার ক্ষুণ্ন করা হলো। এই মর্মান্তিক দৃশ্য আজও ভুলতে পারি না।

আমাদের দেশে বহু আমেনাকে এভাবে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়। প্রসূতি মৃত্যুকে একটি সাধারণ এবং স্বাভাবিক ব্যাপার বলে ধরে নেয়া হয়। প্রসূতি নারীদের অপরিমিত খাবার দেয়া হয়। তারা বেশি খেলে পেটে বাচ্চা বড় হয়ে যাবে এবং বাচ্চা জন্মের সময় তারা কষ্ট পাবে, ইত্যাদি অলঙ্ঘনীয় প্রথা আমাদের সমাজে এখনো প্রচলিত। এটা এক রকম সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং নিষ্ঠুরতাও বটে। একে সামাজিক নারী নির্যাতন বললেও অত্যুক্তি হবে না। এভাবে সামাজিক নির্যাতনের জন্য যদি কোন নারী মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে তাকে ভূতে ধরেছে বলে কবিরাজ, ওঝা ইত্যাদি দিয়ে ঝাঁড়-ফুঁক করা হয়। এমনকি অনেক সময় ভূত তাড়ানোর জন্য উঠোনে গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে তাকে মারধর করা হয়। এতে অনেকের মৃত্যুও ঘটে। এমন ঘটনা আমি বেশ কয়েকটা দেখেছি।

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। আমাদের রুমঘাটার বাড়িতে কাজ করতো ওমদা'বু। বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। আমি তখন গুল-এ-জার বেগম স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি। স্কুল থেকে আসলে ওমদা'বু আমাদের যত্ন করে খাওয়াতো। আমাদের বাড়ির পশ্চিম দিকে একটা বিরাট পুকুর ছিল। পুকুরের দক্ষিণে ছিল একটি বস্তি পাড়া। সেখানে থাকতেন অছি ডাক্তার, হোমিওপ্যাথিক কোয়াক (ডাক্তার নয়, বই পড়ে প্র্যাকটিস করেন)। তিনি ওমদাবুকে বিয়ে করার জন্য আমার মা'র কাছে বেশ কয়েকবার প্রস্তাব পাঠান। ওমদা'বু নিজে লেখাপড়া জানতো না। ডাক্তার সাহেবের সাথে বিয়ে হলে তার সামাজিক মার্যাদা বৃদ্ধি পাবে, হয়তো এই ভেবে সে এক সময় বিয়ের পক্ষে মত প্রকাশ করে। দু'জনের বয়সের অনেক ব্যবধান ছিল। ডাক্তার সাহেব হয়তো ষাটের কোঠায়। এর আগে তিনি একবার বিয়ে করেছিলেন। আগের স্ত্রী তিন সন্তান রেখে মারা যায়। ওমদাবুরও এটা দ্বিতীয় বিয়ে। তাই মা মনে করলেন এ বিয়ে সুখের হবে। মা খুশি হয়ে বিয়ে দিলেন।

ওমদাবুকে তার স্বামী খুবই ভালোবাসতো। কিন্তু সমস্যা হয়ে গেল তার সন্তানদের নিয়ে। তারা ওমদাবুকে মা হিসেবে গ্রহণ করতে পারেনি কোনদিন। নানাভাবে তারা তাকে মানসিক নির্যাতন শুরু করে। দিনের পর দিন অত্যাচারিত হয়ে ওমদা'বু মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। একদিন দুপুরে আমাদের বাসায় এসে পাগলের প্রলাপ বকতে দেখে মা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন। তার স্বামীকে ডেকে পাঠান। তিনি বললেন, ওমদাকে ভূতে পেয়েছে, জ্বিনে পেয়েছে। তাকে ওঝা দিয়ে ঝাঁড়-ফুঁক করতে হবে। একথা বলে তাকে জোর করে নিয়ে গেলেন। সুযোগ পেলেই ওমদা'বু আমাদের কাছে চলে আসতো। কিছুক্ষণের মধ্যে তার স্বামীও তাকে অনুসরণ করে পৌছে যেতেন। একদিন তিনি একটা বোতল নিয়ে এসে বললেন, ভূত বা জ্বিনগুলো ওমদাকে ভীষণ কষ্ট

দিচ্ছে। এই বোতলে তাদেরকে ভরে পুকুরে বা নদীতে ফেলে দিতে হবে। নতুবা সে ভাল হবে না। বোতলে জ্বিন বন্ধ করা হলো এবং সেই বোতল পুকুরে ফেলে দেওয়া হলো। ওঝা দিয়ে ওমদাবুকে ঝাঁড়-ফুঁক করা হলো। কিন্তু সে আর ভাল হলো না। পাড়ার লোকরা পাগলী ডেকে ডেকে তাকে অবশেষে সত্যিকার পাগলই বানিয়ে দিল। এক সময় তার স্বামী তাকে তালাক দিয়ে আমাদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিলো।

এরকম ঘটনা এখনও ঘটে থাকে। একবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বর্তমান আধুনিক জগতে মানুষের জীবনের চেয়ে কুসংস্কারের মূল্যই বেশি— একথা বিশ্বাস করতে খুবই কষ্ট হয়। এত সুদীর্ঘ সময় নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজ করেও কুসংস্কারের মতো এই দুরারোগ্য সামাজিক ব্যাধি থেকে আমরা এখনো মুক্ত হতে পারিনি। শিক্ষিত সমাজেও এ ধরণের কুসংস্কার দেখে শঙ্কিত হই।

একটি মেয়ে শিশুর সাথে কিছুক্ষণ

ঢাকার রাস্তায় অনেক শিশু বিশেষ করে মেয়ে শিশুকে ফুল বিক্রি করতে দেখি। স্বভাবতই তাদের সম্পর্কে জানার কৌতুহল জাগে। তারা কোথায় থাকে। তারা কি কারো স্নেহের পরশ পায়, নাকি তা থেকে চিরতরে বঞ্চিত। তারা কি দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায়, নাকি অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটায়। তারা কি লেখাপড়ার সুযোগ পায়, নাকি নিজেদের শ্রম বিক্রি করে সব সময় মা বাবার জন্য টাকা পাঠাবার ধাঁধায় থাকে। একদিন এসব ভাবতে ভাবতে সার্ক ফোয়ারার সামনে পান্থপথে এসে বিরাট লম্বা গাড়ির লাইনে পড়ে গেলাম। প্রায় পঁচিশ মিনিট যানজটে পড়ে গাড়িতে বসে থাকলাম। এমন সময় পনেরো কি ষোল বছর বয়সের একটি মেয়ে শিশু একগুচ্ছ গোলাপ হাতে নিয়ে আমার গাড়ির দরজায় টোকা দিল। একটা মিষ্টি হাসি দিয়ে ফুলটা দেখিয়ে বললো, মাত্র দশ টাকা। আশ্চর্য হলাম যাদের কথা ভাবছি, তাদেরই একজন আমার সামনে উপস্থিত। তার সাথে কথা বলার প্রবল ইচ্ছা জাগল। মাথাটা এগিয়ে নিয়ে তার নাম জিগ্যেস করলাম। আমার কথায় কান না দিয়ে সে ফুলটা বিক্রি করার চেষ্টায় অনবরত বলে যাচ্ছে 'দশ টাকা মাত্র'। ফুলটা কেনার আশ্বাস দিয়ে এবার তার সাথে গল্প জুড়ে দিলাম। হয়তো সে আমার কাছ থেকে কিছুটা স্নেহের আভাস পেয়েছে। বলতে শুরু করল— তার নাম ফাতেমা, বাড়ি রংপুর। বাবা দিন-মজুর। ভাই বোন তিনজন। মা অসুস্থ, কাজ করতে পারে না। বড়বোনের বিয়ে হয়নি বাবা যৌতুক দিতে পারে না বলে। সে দ্বিতীয় সন্তান। গ্রামের এক মহিলার সাথে ঢাকায় এসেছে দুই বছর আগে। বাসায় কাজ করে রোজগার করার আশায় ঢাকায় পৌঁছে। বাস থেকে নামার সাথে সাথে ফাতেমাকে একজন অপরিচিত পুরুষের হাতে সোপর্দ করে তার গ্রামবাসী মহিলা কোথায় উধাও হয়ে গেলো। তার সাথে আর কোনদিন দেখা হয়নি। তারপর সেই অপরিচিত লোকটা ফাতেমাকে নিয়ে এক সর্দারনীর কাছে পৌঁছে দিলো। হতভাগ্য মেয়েটি তখনও বুঝতে পারেনি যে তাকে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। সর্দারনী তাকে নিয়ে গেল এক বস্তিতে। সেখানে দু'তিন দিন থাকার পর তাকে একটি সুন্দর শাড়ি পরিয়ে আরেকজনের বাসায়

Pioneer in village based Website

নিয়ে গেল। বলতে বলতে তার দু'চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে এলো। হঠাৎ তার চেতনা হলো ফুলটা আমি এখনো কিনিনি। আমাকে আবার কাকুতি মিনতি করলো গোলাপের তোড়াটা নিয়ে আমি যেন তাকে দশটা টাকা দিই। ততক্ষণে আমার মন আরো অনুসন্ধানী হয়ে উঠলো। তাকে বললাম, দশ টাকা নয়, বিশ টাকা দেবো। এই টাকা দিয়ে সে কী করবে তা যদি আমাকে বলে। বিশ টাকার কথা শুনে প্রথমে চেহারাটা প্রসন্ন হয়ে উঠলো। আবার বিষণ্নতায় ছেয়ে গেল তার কোমল মুখমন্ডল। অনেক কষ্টে সে জানালো এই দশ টাকা থেকে তার ভাগ্যে হয়তো জুটবে মাত্র একটি টাকা কিংবা পুরো টাকাই সর্দারনী নিয়ে যাবে। তার কথা ছাড়া ফাতেমা একপাও নড়তে পারেনা। অক্ষরে অক্ষরে তার হুকুম পালন করতে হয়। কোনদিন সে ফুল বিক্রি করে। কোনদিন রাস্তায় ইট ভাঁঙার কাজ করে। ফাতেমার কথা আর শেষ হয় না। শারীরিক পরিশ্রম তবুও সহ্য করা যায়। কিন্তু অত্যাচার আর নির্যাতন সহ্য করা খুবই কষ্টকর। সর্দারনীর কথা অমান্য করলে অমানুষিকভাবে তার মার খেতে হয়। আর তার নির্দেশ মেনে চলতে হলে কোন কোন সময় দৈহিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। এক এক রাতে কয়েকজন খদ্দেরকে দেহদান করতে হয়।

এত কিছুর পরিবর্তে পায় শুধু দু'বেলার খাবার আর পরনের কাপড়। নিজের রোজগারের টাকা সে স্পর্শ করতে পারে না। দুঃখ করে বলতে থাকে যদি তার মা-বাবার জন্য কিছু টাকা-পয়সা পাঠাতে পারতো, তাহলেও এত কষ্ট সহ্য হতো। দেশে চলে যায়না কেন জিগ্যেস করাতে ফাতেমা বললো, সেখানে গেলে তো উপোস থাকতে হবে। তাছাড়া শহরে থেকে থেকে অভ্যেস হয়ে গেছে। আর গ্রামে থাকতে পারবোনা। বলতে বলতে তার গল্প শেষ হওয়ার আগেই যানজট পরিষ্কার হয়ে গেল। তার হাতে একটি বিশ টাকার নোট গুঁজে দিতেই গাড়ি ছেড়ে দিলো। ফাতেমা দু'হাতে ছুঁড়ে মারলো গোলাপ গুচ্ছটি আমার দিকে।

Bhumati.com
Pioneer in village based website

ফুলটা হাতে নিয়ে ভাবলাম এই গোলাপ গুচ্ছের নেপথ্যে কত কাহিনী। ফুলের সৌন্দর্য দেখে আমরা শুধু তৃপ্তি পাই, আনন্দ পাই। তার নেপথ্য কাহিনীর কথা কি কেউ জানতে পারি। এরকম শত শত মেয়ে শিশু রাস্তায়। নানা ধরণের ব্যবসায় রত। এরা ছিন্নমূল, দারিদ্রপীড়িত। প্রধানত অভাবের তাড়নায় গ্রাম থেকে বিতাড়িত। নানা অশুভ চক্রের আবর্তে এই মেয়ে শিশুরা তাদের নিজের অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলে।

এদের পুনর্বাসনের জন্য বিশেষ কোন উদ্যোগ চোখে পড়েনা। একবার সেইভ দি চিলড্রেন ডেনমার্কের সাহায্যপুষ্ট একটা প্রকল্প এপ্রেইজালের জন্য বি.এন.ডব্লিউ.এল.এ পরিচালিত একটি সেল্টার-হোম দেখার সুযোগ হয়েছিল। আমার স্নেহভাজন-বন্ধু এডভোকেট সালমা আলী বেশ কিছু মেয়ে শিশুকে পতিতালয়ে সর্দারনীদের খড়গহস্ত থেকে ছিনিয়ে এনে এই হোমে স্থান দিয়েছে। এই হোমে এসে সালমার সাহস এবং উদ্দীপনা দেখে আশান্বিত হলাম। কয়েকদিন আগে উদ্ধার করা একটি মেয়ে শিশু আমাদের মতো আগন্তুক দেখে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে গেলো। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও তার সাথে দেখা করতে পারলাম না। সে ভয়ে সন্ত্রস্ত। মানসিকভাবেও

বিপর্যস্ত। হয়তো ভাবছে পরিবার ফিরিয়ে নেবেনা তাকে সামাজিক ষ্টিগমার জন্য। সমাজ তাকে গ্রহণ করবেনা 'খারাপ মেয়ে' আখ্যা দিয়ে। সে কোথায় যাবে?

বিশ্বের প্রথম যে ২২টি দেশ জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (সি.আর.সি) র‍্যাটিফাই করেছিল বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। মনে পড়ে ইউনিসেফ থেকে তৎকালীন রিপ্রেজেন্টেটিভ কোল পি ডজের নেতৃত্বে আমাদের সিনিয়র প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর দিলওয়ার আলী খান, সিনিয়র প্ল্যানিং অফিসার বার্টি মেনডিস এবং আমিসহ সকল সেকশন প্রধানরা সি.আর.সি. র‍্যাটিফিকেশনের ব্যাপারে রাতদিন কাজ করেছিলাম। ১৯৯১ সালের ২রা সেপ্টেম্বর থেকে এই সনদের বাস্তবায়ন করার জন্য বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। এর জন্য সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। পরবর্তীকালে National Plan of Action for Children, 1997–2002 তৈরি করার জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব আকমল হোসেন দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি কোর–গ্রুপ গঠন করেন। এর মাস দু'য়েকের মধ্যে তিনি বদলি হয়ে চলে গেলেন। আমরা আকমল হোসেনের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ, অনুপ্রেরণা এবং দক্ষ পরিচালনা থেকে বঞ্চিত হলাম। যাহোক, এই কর্ম সম্পাদন করার জন্য ছয়টি সেক্টোরেল টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হয়। উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা, এনজিও এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত এই সেক্টোরেল কমিটিগুলোতে সর্বমোট বিরাশি জন সদস্য ছিল। প্রতিটি কমিটিকে সাহায্য করার জন্য ইউনিসেফের সহযোগিতায় একজন করে কনসালটেন্ট নিয়োগ করা হয়। এর টীম লিডারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় আমার ওপর। এই ব্যাপারে আমাকে সর্বোতভাবে সহযোগিতা করেন নুরুল ইসলাম খান। সমাজকল্যাণ ডিপার্টমেন্টে থাকতে তাঁর কাছ থেকে নানা বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলাম।

Bhumati.com
Pioneer in village based website

এই পরিকল্পনা প্রস্তুতির পর্বে একটা মিটিংয়ে ড. আহমদউল্লা মিয়া বললেন, ছিন্নমূল পথ-শিশুদের জন্য একটা পৃথক চ্যাপটার থাকা দরকার। উত্তরে আমি বলেছিলাম, এই বিশেষ চ্যাপটারটি আপনাকেই লিখতে হবে। তিনি রাজি হলেন এবং এই সেক্টরের জন্য তাঁকে কনসালটেন্ট মনোনয়ন করা হয়। তিনি প্রচুর পরিশ্রম করে Social Integration, Participation and Cultural Affairs নামক চৌদ্দ পৃষ্ঠার একটি খসড়া তৈরি করেন।

পরিশেষে সকলের কঠোর পরিশ্রমের পর সরকারি এবং বেসরকারি কার্যক্রমের সমন্বয় করে শিশুদের জন্য তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, পানি এবং স্যানিটেশন ইত্যাদি সেক্টরের কার্যক্রম এবং পার্টিসিপেশন ও প্রটেকশনসহ পাঁচ বছর মেয়াদী একটি ব্যাপক জাতীয় পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। সরকার তা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অনুমোদনও করে। ফাতেমার মত অসংখ্য পথ-শিশুদের জন্য এখানে নানাবিধ কর্মসূচির পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু এই পরিকল্পনাও কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ। একে সঠিকভাবে কাজে লাগানো হয় নি। বহু সরকারি পরিকল্পনার মতো সুন্দর করে ছাপানো হয়েছে। ওসমানী মিলনায়তনে এর প্রকাশনা উৎসব হয়েছে। কিন্তু পথ-শিশুদের জীবনে প্রকৃত অর্থে পরিবর্তন আনার জন্য কোন সার্বিক প্রচেষ্টা সরকার থেকে নেয়া হয়নি। এভাবে তারা

আমাদের দেশে অবহেলিত হয়ে আছে এবং থাকবে। ফাতেমারা বিভিন্ন অত্যাচারের শিকার হবে। কেন তাদের ওপর এই অবিচার? এর জবাব দিতে পারিনি, পারবো না কোনদিন।

কিশোরীদের অগ্রযাত্রা

ঢাকার শেরাটন হোটেলে ২৪–২৬ মে (১৯৯৯) ফিউচার সার্চ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর মূল বিষয় ছিল কিশোরীদের উন্নয়ন এবং এতে তাদের অংশগ্রহণের অধিকার। এর সাংগঠনিক দায়িত্বে ছিল মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ইউনিসেফ। ইউনিসেফের প্রটেকশন সেকশন প্রধান বালা গোপালের আমন্ত্রণে আমারও সুযোগ হয়েছিল এই সম্মেলনে যোগ দেয়ার। আড়াই বছর আগে ইউনিসেফ থেকে অবসর গ্রহণ করলেও, এই ধরণের কাজে আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনটা দিন কিশোরীদের সঙ্গে কাটাতে পেরে আমার মধ্যে নতুন করে প্রাণের সঞ্চার হলো। বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, প্রাইভেট সেক্টর এবং সুশীল সমাজের প্রায় পঞ্চান্নজন প্রতিনিধির সাথে ত্রিশজন কিশোরীর এই বার্তা বিনিময় সম্মেলন ছিল অত্যন্ত প্রাণবন্ত। এখানে নয়ন একশান ফাউণ্ডেশন থেকে কয়েকজন কিশোরও অংশ গ্রহণ করেছিল। কিশোরীদের মধ্যে একটি দল এসেছিল সেন্টার ফর মাস এডুকেশন ইন সাইন্স (সি.এম.ই.এস) থেকে। অপর শক্তিশালী দলটি ছিল ব্র্যাকের কিশোরী পাঠাগার এবং নন-ফরমাল এডুকেশন কর্মসূচি থেকে।

ব্র্যাক : প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে গেল মানিকগঞ্জে ব্র্যাকের একটি কিশোরী স্কুলের কথা। একটি স্বতঃস্ফূর্ত কিশোরীর কথা। সেখানে যে কিশোরী দেখেছিলাম (১৯৮৯) সে হয়তো আজ রক্ষণশীল সমাজের বেড়াজালের গন্ডি পার হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাকে সেদিন জিগ্যেস করেছিলাম— বড় হয়ে তুমি কী হতে চাও? সে দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল : মানুষ হতে চাই। তার নাম মনে নেই। কিন্তু সেই সঙ্কল্পদৃপ্ত মুখটি স্পষ্ট মনে আছে। সে নিশ্চয় এতদিনে মানুষের মতো বেঁচে থাকার উপায় খুঁজে পেয়েছে। আমার বিশ্বাস আরো অনেক কিশোরীরা জীবনের সন্ধান পেয়েছে ব্র্যাকের এই কিশোরী কর্মসূচির মাধ্যমে।

এই ব্যাপারে ফজলে হাসান আবেদের অগ্রণী ভূমিকার কথা আমাদের কিশোরীরা কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করবে। তিনি ব্র্যাকের মাধ্যমে কিশোরীদের অগ্রযাত্রার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির যে ব্যাপ্তি ঘটিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে তাদের ক্ষমতায়নের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। আবেদ ভাইয়ের সাংগঠনিক পারদর্শিতা দৃষ্টান্তমূলক। একবার যশোরে ব্র্যাক ট্রেনিং সেন্টারে গিয়েছিলাম। সেই অফিসের কর্মকর্তা, নাম খুব সম্ভব হাবিব একটি খুব মূল্যবান কথা বলেছিল : আবেদ ভাইয়ের দরজা আমাদের জন্য সব সময় খোলা। তিনি ছোট-বড় সব কর্মচারীর সঙ্গে কোন দূরত্ব রেখে চলেন না। যেকোন সমস্যা হলে আমরা তাঁর সাথে নিঃসঙ্কোচে আলোচনা করতে পারি। সেদিন তার এই উক্তি শুনে খুব আশাবাদী হয়েছিলাম। গ্রামে-গ্রামান্তরে যেখানে ব্র্যাক কর্মসূচি আছে সেখানে আবেদ

ভাই উপস্থিত, সশরীরে নয়, তাঁর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। যখনই ফিল্ডে ব্র্যাক কর্মসূচি দেখতে গিয়েছি আবেদ ভাইয়ের এই সুনিপুণ দক্ষতা উপলব্ধি করেছি।

আবেদ ভাইয়ের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি যখন কোল পি. ডজ ইউনিসেফের রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিলেন (১৯৮৯-১৯৯১)। ইউনিসেফের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ক যেকোন নীতি-নির্ধারণী সভায় আবেদ ভাইকে আমন্ত্রণ জানানো হতো। কোল ডজ বলতেন ব্র্যাক স্কুলের মডেল তৈরি না হলে বাংলাদেশের দরিদ্র মেয়ে শিশুরা শিক্ষার আলো দেখতে পেতো না।

একদিন ব্র্যাক সেন্টারে এন.জি.ও ফোরাম ফর ড্রিংকিং ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড সেনিটেশনের একটা রিপোর্ট লঞ্চিং অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। এর সভাপতি হিসেবে এই অনুষ্ঠানে আবেদ ভাই সভাপতিত্ব করেন। সভাশেষে ফিরে আসছিলাম। লিফটে উঠেই তাঁর সাথে দেখা। আমাকে তাঁর অফিস রুমে নিয়ে গেলেন। তাঁর সাথে আলোচনা করছিলাম শেরাটন হোটেলে অনুষ্ঠিত কিশোরী উন্নয়ন সম্পর্কিত ফিউচার সার্চ কনফারেন্সে আমার অভিজ্ঞতার কথা এবং গ্রামের মেয়ে শিশুদের ক্ষমতায়নে ব্র্যাক স্কুলের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা। এই প্রসঙ্গে তাঁকে জানালাম আমার বাসার কাজের ছেলে ওয়াহিদের কথা। ওয়াহিদ লেখাপড়া জানে না কিন্তু তার স্ত্রী ম্যাট্রিক পাস এবং ময়মনসিংহের মাইজহাটী গ্রামে ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষক। একথা শোনার সাথে সাথে আবেদ ভাই ফোন করলেন ব্র্যাকের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা সেক্শনে। মুহূর্তের মাঝে একগাদা বই নিয়ে উপস্থিত হলো একজন কর্মকর্তা। প্রত্যেকটি বইয়ের ব্যবহার সযত্নে একে একে আমাকে ব্যাখ্যা করলেন আবেদ ভাই। আমার হাতে বইগুলো তুলে দিয়ে বললেন, এগুলো ওয়াহিদকে পড়ান, যাতে সে হীনমণ্যতায় না ভোগে।

Pioneer in village based website

একদিকে মেয়ে শিশু এবং কিশোরীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করার জন্য আবেদ ভাইয়ের কঠোর অঙ্গীকার, অন্যদিকে কিশোর এবং তরুণদের মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার পথ দেখিয়ে দেয়ার তাড়না— এই দু'য়ের সমন্বয় দেখে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হলাম।

সি.এম.ই.এস : সি.এম.ই.এস-এর নির্বাহী বোর্ডের সদস্য হিসেবে এর সাথে আমি জড়িত আছি। ১৯৯৪ সাল থেকে এর বিভিন্ন বোর্ড মিটিংয়ে কিশোরী কর্মসূচির কথা অনেক শুনেছি। আলোচনাও করেছি। কিন্তু তার তাৎপর্য সঠিকভাবে বোধগম্য হয়নি এতদিন। ফিউচার সার্চ কনফারেন্সে গিয়ে তাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে বুঝতে পারলাম প্রত্যন্ত অঞ্চলের এই কিশোরীদের মধ্যে লুকিয়ে আছে অশেষ সম্ভাবনা। সুযোগ পেলে তারা ফুলে ফলে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে দু'একজন শিক্ষানবীশ ফটোগ্রাফারও ছিল। দারুণ আগ্রহে তারা আমাদের সাথে কয়েকটা স্ন্যাপ তুলে নিল।

আমাদের গ্রামাঞ্চলে ফটোগ্রাফকে পেশা হিসেবে বেছে নেয়া কিশোরীদের জন্য একটি বিরাট চ্যালেন্জ। এই চ্যালেন্জকে মোকাবেলা করার জন্য তাদের মধ্যে যে অদম্য উৎসাহ এবং সুদৃঢ় মনোবল দেখলাম তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। একজন অবিবাহিত কিশোরী ফটোগ্রাফার হিসেবে ঘুরে বেড়াবে, এটা আমাদের গ্রামীণ

সমাজের লোকরা ভাল চোখে দেখে না। এজন্য অনেক সময় তাদের বিভিন্ন কটূক্তিরও শিকার হতে হয়।

কিছুদিন আগে (ডিসেম্বর ২০০০) সি.এম.ই.এস এর নির্বাহী পরিষদের সভাশেষে দেখলাম কিশোরী ফটোগ্রাফারের গ্রামীণ পর্যায়ে তোলা অনেকগুলো ছবির প্রদর্শনী। রংপুরের রিকসাচালকের মেয়ে এস.এস.সি পরীক্ষার্থী মনোয়ারা বেগম একজন ফটোগ্রাফার। দিনাজপুরের একজন কৃষকের কিশোরী কন্যা সাবিনা ইয়াসমিন স্থানীয় লালমনিরহাট পত্রিকার ফটো-সাংবাদিক। আকলিমা খাতুন ঝালকাঠির একজন কাঠমিস্ত্রির মেয়ে দারুলহুদা মাদ্রাসার অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী, গ্রামের ফটোগ্রাফার। নুরেশা বেগম আলী নগর কিশোরী কর্মসূচির সদস্য। জেলে পরিবারে জন্মগ্রহণ করে সে এখন একজন দক্ষ ফটোগ্রাফার। তারা সকলে এই পেশা থেকে বেশ উপার্জন করে। এরকম ষোলজন কিশোরীর মনোনীত ফটোগ্রাফ এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। গুণগত দিক থেকে এই ছবিগুলির মান বেশ উঁচু দরের বলা চলে। আমি যদিও সি.এম.এস এর নির্বাহী পরিষদের সদস্য, কিশোরী কর্মসূচির সাফল্যের জন্য আমার কোন অবদান নেই। আমি শুধু চোখে দেখেই তৃপ্তি পাই। এই অভূতপূর্ব সাফল্যের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব এর সুযোগ্য নির্বাহী পরিচালক ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম এবং তার সহকর্মীদের। তাদের অসীম ধৈর্য, নিষ্ঠা, অঙ্গীকার এবং কঠোর পরিশ্রমের ফল স্বরূপ আজ কিশোরী কর্মসূচি এই স্তরে এসে পৌঁছেছে। ইউনিসেফে কর্মরত অবস্থায় কয়েকবার চেষ্টা করেও এই কর্মসূচিকে আমি কোন সাহায্য করতে পারিনি। এর জন্য আমি এখনও বেদনা বোধ করি।

এ সকল কর্মসূচির গভীরে প্রবেশ করলে বোঝা যায় এর আন্তর্নিহিত তাৎপর্য। কিশোরীরা যে নানাভাবে বৈষম্যের শিকার হয়ে নিজেকে বিকাশ করার সুযোগ পায়না ; বাল্যবিবাহের শিকার হয়ে অকাল মাতৃত্বের বোঝায় নুইয়ে পড়ে, কৈশোরের আনন্দঘন উচ্ছল মুহূর্তগুলো কোনদিন উপভোগ করার অবকাশ পায়না,— তাদেরকে সেই হারিয়ে যাওয়া মূল্যবান সময়টি ফিরিয়ে দেয়া এবং তা অর্থবহ করে বিকশিত হবার সুযোগ দান করা এই কর্মসূচিগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য।

ফিউচার সার্চ কনফারেন্সের কথায় ফিরে আসি। বিশেষ আকর্ষণ ছিল কিশোরীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং নিজেদের জীবন-সমস্যাগুলোর বিষয়ে তাদের খোলাখুলি মতামত জ্ঞাপন। অনেক সমস্যার মধ্যে তারা প্রায় সকলেই একবাক্যে বলেছিল প্রজনন স্বাস্থ্য, সেক্স এডুকেশন, সেক্সুয়েলী ট্রান্সমিটেড ডিজিস এইচ.আই.ভি সম্পর্কে সচেতনতামূলক শিক্ষা তাদের জন্য নেহাত প্রয়োজন। আরো বলেছিল, তাদের একটি নির্দিষ্ট কিশোরী দল হিসেবে চিহ্নিত করে সবরকম উন্নয়নের দ্বার যেন তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। তারা যেন ধর্ষণ, ট্রাফিকিং, হত্যা, এসিড নিক্ষেপ ইত্যাদি বিভীষিকাময় অভিশাপ থেকে পরিত্রাণ পায়, এদিকে যেন বিশেষ মনোযোগ দেয়া হয়। মনে কিছুটা আশার সঞ্চার হয়েছিল যখন দেখলাম কিশোর এবং কিশোরী অংশ গ্রহণকারীরা হাতে হাত রেখে সেদিন সম্মিলিতভাবে অঙ্গীকার করেছিল— এই দুর্গম পথে তারা একে অপরের সহযোগী হবে। কিশোরীরা যেহেতু পিছিয়ে আছে, তাদের উন্নয়নের ওপর বিশেষ জোর দিতে হবে বৈকি। কিন্তু কিশোরদের পেছনে ফেলে রেখে সামাজিক

ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব নয়। এক সময় দেখা যাবে তারা হীনমণ্যতায় ভুগছে। এতে কিশোরীদের উন্নয়নকে তারা নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখার সম্ভাবনা থেকে যায়। এই কারণে কিশোর এবং কিশোরী দুই দলকেই বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আওতায় আনা প্রয়োজন। এতে তাদের উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধাজনিত দৃষ্টিভঙ্গির উদ্রেক হবে। তারা পরস্পরের সহযোগী হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ পাবে।

সেদিনের সেই সম্মেলন আমার চোখের কালো পর্দা সরিয়ে দিল। তাদের সেই প্রত্যয়পূর্ণ আবেদন এবং অঙ্গীকারের প্রতিধ্বনি এখনো আমার কানে বাজে। তাদের আত্মবিশ্বাসে প্রদীপ্ত মুখগুলো এখনো আমার চোখে ভাসে।

জীবনের প্রতি মুহূর্তে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। শিশু থেকে শুরু করে, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী সকলের কাছ থেকে আমি জীবনের বিভিন্ন স্তরে যে শিক্ষা পেয়েছি তা আমাকে তিলে তিলে তৈরি করেছে। আজকে আমি যা, তা এরই যোগফল।

Chunati.com
Pioneer in village based website

নারীর মাতৃত্ববোধ

জীবনের কোন এক সময় নারী মা হতে চায়

আমার মেয়ে মুন্নিকে নিয়ে যখন সিঙ্গাপুরে থমসন মেডিকেল সেন্টারে ডা. ডব্লিউ.কে.তানের কাছে যেতাম তখন সবাই এক একটা সুন্দর ফুটফুটে বাচ্চা কোলে নিয়ে ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করতো। কেউবা বাচ্চার হেল্‌থ চেক্ শেষে আমাদের সামনে দিয়ে চলে যেত। মুন্নি বিষণ্ন মুখে বলতো, আম্মা আমি কবে এরকম একটা বাচ্চা কোলে নিয়ে বাসায় যেতে পারবো। আমার হৃদয় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেত। তাকে কোন উত্তর দিতে পারতাম না, শুধু বলতাম ধৈর্য ধরো। নারীর মাতৃত্ববোধ এতই প্রবল। জীবনের কোন এক সময় সব নারীই মা হতে চায়। শিশুর কোমল স্পর্শে নিজে স্নিগ্ধ হতে চায়। এ চাওয়ার কোন শেষ নেই। যারা না চাইতেই পেয়ে যায় তাদের কেমন লাগে জানি না। কিন্তু যারা চেয়ে চেয়ে পায় না, যারা শিশু জন্ম দেয়ার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত, মনের গভীরে বেদনা নিয়ে তারা জীবন কাটিয়ে দেয়। কতো অসহায় নারীর স্বামী-বিচ্ছেদ ঘটে। আবার স্বামীর কারণেও যদি কোন নারী গর্ভ ধারণ করতে না পারে, তারাও অকারণে এইভাবে স্বামী-বিচ্ছেদ বেদনা এবং নানা নির্যাতনের শিকার হয়। তারা সত্যিকারের অভাগা। নিজের কোন দুর্বলতা ছাড়াই নানাভাবে অত্যাচারিত হয়। গ্রামাঞ্চলে অনেক সময় তাদের অপয়া কিংবা অলক্ষী বলে অভিহিত করা হয়। বিশেষ করে শ্বাশুড়ি দ্বারা তারা নানাভাবে নিপীড়িত হয়। আমাদের গ্রামাঞ্চলে, এমনকি শিক্ষিত সমাজেও এরকম ঘটনা অহরহ ঘটছে।

১৯৮৪ সালের মার্চ মাস। একদিন সিঙ্গাপুর থেকে আমার জামাতা ইশতিয়াক টেলিফোনে জানালো সেই সুসংবাদটি যার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে বহুদিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম। কয়েক মাস আনন্দে এবং দুঃশ্চিন্তায় কেটে গেল। আমাদের আরাধ্য ধনের আশায় দিন গুণছি। সময় প্রায় হয়ে এলো। আমার ডাক পড়েছে সিঙ্গাপুর থেকে। মাহবুবকে ঢাকায় রেখে চলে গেলাম। কয়েকদিন পর হাসপাতালে চেক্ আপ্ করতে গেলে ডা. তান মুন্নিকে ভর্তি করে নিল। ঘন্টাখানেক পর দেখলাম ডা. তানের চেহারা বিষণ্ন। উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, বাচ্চা নড়ছেনা, তাই আমি খুবই চিন্তিত। এই বাচ্চা আমার কাছে খুবই মূল্যবান। তিন বছর চিকিৎসার পর তাকে আমরা পেয়েছি। তাই আর এক মিনিটও অপেক্ষা করতে পারবো না। এখনি সিজাররিয়ান করতে হবে। মুহূর্তের মাঝে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। মুন্নি ডাক্তারকে বললো, ডক্টর, দরকার হলে আমাকে টুকরা

টুকরা করে ফেলো, তবুও আমি আমার বাচ্চা চাই। কি প্রবল ইচ্ছা এবং গভীর আগ্রহে সে বাচ্চার আগমন অপেক্ষায়। এরপর তাকে নিয়ে গেল হুইল চেয়ারে করে। আমি এবং ইশতিয়াক নিঃশ্চুপ, পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে গেছি। প্রতি মুহূর্ত অতিক্রম হচ্ছে অসহনীয় বেদনায়। দুপুর তিনটায় খবর পেলাম মুন্নিকে ওটিতে নিয়েছে। অপারেশন শুরু হয়েছে। ঠিক তিনটা এগারো মিনিটে একজন নার্স এসে জানালো, তার একটা ফুটফুটে সুন্দর ছেলে হয়েছে। নার্স আমাদের সাথে করে নিয়ে গেল। ইশতিয়াকের কোলে তোয়ালে জড়ানো বাচ্চাটা তুলে দিলো। আমরা দু'জনে আনন্দাশ্রু ফেললাম। ঘন্টাখানেক পর ডা. তান এসে একটা পরিতৃপ্তির হাসি দিয়ে বললেন, মুন্নি এবং বাচ্চা ভালো আছে। নাম রাখা হয় ইখ্‌তিসাদ আহমেদ। নামটা দিয়েছে ইশতিয়াকের বড় ভাই ইশরাক।

এই ডাক্তারের মধ্যে যে দায়িত্বজ্ঞান, মমত্ববোধ এবং কমিটমেন্ট দেখলাম তা অতুলনীয়। মুন্নির জন্য তার অজস্র শুভ ইচ্ছা। নবজাতকের জন্য তার সস্নেহ আশীর্বাদ যেন উপচে পড়ছে। এমন অপূর্ব পরিবেশে আমার মেয়েকে সযত্নে পরিচর্যা করা হচ্ছে ভেবে মনে স্বস্তি পেলাম। এই সময় মুন্নির বন্ধু ফওজিয়া এবং তার স্বামী মোস্তাফিজুর রহমান যেভাবে আমাদের মানসিক শক্তি যুগিয়েছে তা কোনদিন ভুলবো না। মুন্নি এবং ফওজিয়া এখনো প্রিয় বন্ধু এবং দুই বোনের মতো। মুন্নির অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ফওজিয়াই তার সেবা-যত্ন করে। এই সুবাদে আমাদের সাথেও তাদের একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তারা আমাকে খালাম্মা বলে ডাকে। যতবার আমরা সিঙ্গাপুর যাই তাদের বাসায় থাকি। আমাদের অত্যন্ত আদর যত্ন করে রাখে। ফওজিয়া এবং মোস্তাফিজ দু'জনের আচার আচরণে মনে হয় তারা আমাদের একই পরিবারভুক্ত।

ইশতিয়াক পেশায় একজন স্থপতি। তার মুখ দেখে মনের কথা জেনে নিতে হয়। তার হৃদয়ের ভান্ডার স্নেহে পরিপূর্ণ। কিছুটা মুখচোরা কিন্তু একেবারে নিস্পৃহও নয়। বন্ধু ভাগ্যে ভাগ্যবান ইশতিয়াকের বন্ধু সংখ্যা প্রচুর। দেশে যেমন বিদেশেও তার বন্ধুরা তাকে অকৃত্রিমভাবে ভালোবাসে তার মধুর চারিত্রিক বৈশিষ্টের জন্য। আমার মেয়ের প্রতি তার কর্তব্য, সহানুভূতি এবং ভালোবাসা এত গভীর যে সে অফিসের এত কর্মব্যস্ত তার মধ্যেও দু'চারবার টেলিফোন করে তার খোঁজ খবর নিতো। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মুন্নি যাতে শারীরিক সুস্থ থাকে তার জন্য নিয়মিত তাকে ফলমূল ইত্যাদি পুষ্টিযুক্ত খাবার নিজের হাতে খাওয়াতো। এসব দেখে মনে শান্তি পেতাম। প্রায় প্রতিদিনই আমি ইশতিয়াকের সুস্বাস্থ্য, উন্নতি এবং কল্যাণ কামনা করে আল্লার কাছে প্রার্থনা জানাতাম। মানুষের প্রতি তার মমতার অন্ত নেই। আমাদের উত্তরার বাড়ি বানাবার সময় দেখেছি যখনই কোন মিস্ত্রি তার কাছে টাকা ধার চেয়েছে, কাউকে খালি হাতে ফেরায়নি। তারা এখনও ইশতিয়াকের কাছে আসে। সকলে তাকে ভাইয়া বলে ডাকে। তার স্পোর্টস প্রীতি বিস্ময়কর। সে ছাত্র অবস্থায় টেনিস খেলে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছে। টেলিভিশনে টেনিস এবং ক্রিকেট খেলা দেখে অনেক সময় ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেয়। এতে যদি পেশাগত বিপুল ক্ষতি হয়ে যায় সেদিকে তার খেয়াল থাকে না। অনেক সময় তার জরুরি এপয়ন্টমেন্টের কথা মুন্নির স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। শুধু তাই নয়, সে কি কাপড় পরবে, কি খাবে ইত্যাদির প্রতিও মুন্নি বিশেষ দৃষ্টি রাখে। স্বামীর প্রতি সে

Pathagar.com
Pioneer in village based website

ভীষণ যত্নবান। মা-বাবা এবং ভাইবোনদের জন্য ইশতিয়াকের মমতা এবং কর্তব্যপরায়ণতা দৃষ্টান্তমূলক। তার বাবা এম.এ রকীব নওগাঁর একজন খ্যাতনামা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। মা উম্মে কুলসুম বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। নওগাঁ সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। বনেদি এবং প্রতিভাশালী পরিবার হিসেবে উত্তরবঙ্গে তাদের প্রভূত সুনাম আছে।

আমার সাথে ইশতিয়াকের সম্পর্ক শুধু সন্তানতুল্য নয়, বন্ধুত্বপূর্ণও। যদিও সে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকে, আমার পরামর্শেরও বেশ মর্যাদা দেয়। সে এখন দু'সন্তানের সুখী জনক। বাচ্চাদের প্রতি সে এতই স্নেহান্ধ যে তারা যদি আকাশের চাঁদ চায় তাও বুঝি এনে দেবে। যাহোক, হসপিটাল থেকে তার ছেলেকে বাসায় এনে কিভাবে রাখবে, তার জন্য কি কি কিনবে ইত্যাদি চিন্তায় ইশতিয়াক সব সময় অস্থির থাকতো। রোজ ভোরে আমি এবং ইশতিয়াক থমসন মেডিকেল সেন্টারে চলে যেতাম। রাত দশটার দিকে ফিরতাম। এভাবে কয়েকদিন অতিবাহিত হয়। একদিন রাতে সিঙ্গাপুর যখন নিদ্রায় আচ্ছন্ন, আমি মাহবুবকে একটা চিঠি লিখলাম। সেই মুহূর্তে আমার মনের অবস্থা তাকে জানাতে চাইলাম। সেদিন ইখতিসাদের এলবাম দেখতে গিয়ে সেই চিঠিটা চোখে পড়ল। শেষ পৃষ্ঠায় সযত্নে আটকানো। তার কিছু অংশ তুলে দেয়ার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

প্রিয় মাহবুব

জীবনে কত আনন্দ মুহূর্ত এসেছে। কতো কি দেখেছি। কতো কি পেয়েছি। কতো দেশ ঘুরেছি, কিন্তু ইখতিসাদের জন্মলগ্নে যে পরিতৃপ্তি এবং প্রশান্তি, এ তো কোনদিন পাইনি। আল্লাহ আমাকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দিয়েছেন। আমার জীবনে আর কোন চাওয়া নেই।

I am fulfilled. God is Bountiful. His blessings have no limit. He has favoured us with a priceless gift. I am charmed by the dancing tune of my grandchild for whom I waited, waited and waited. So have you, I know. He is the rarest specimen of God's creation. I look at him, time and again, every moment he looks new and ever wanted by all of us. May Almighty help him throughout life.

এখানেই ক্ষান্ত হয়নি। ইখতিসাদের উদ্দেশ্যেও লিখলাম কয়েকটি লাইন। আমি কবি নই। তাই একে কবিতা বলতে চাইনা।

ভাইয়া
আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার
আমার জীবনের পরম সম্পদ
আমার চরম পাওয়া— আমার নির্মল আনন্দ
সাগরের নীলের মতো সুন্দর উঁদার উদাস
আকাশের মতো পবিত্র বৃহৎ

একটি গোলাপের কুঁড়ির মতো কোমল
জোৎস্নার মতো স্নিগ্ধ চমৎকার।
আমার অশেষ প্রতীক্ষার প্রতীক
সাত সাগর সেঁচে তোলা রত্ন
আমার প্রাণ প্রিয় অপূর্ব অনিন্দ্য সুন্দর
মঙ্গলময় - সুখময় হোক তোমার জীবন।।

নানিমা ১৭ অক্টোবর ১৯৮৪, সিঙ্গাপুর

সেদিনের সেই ছোট্ট শিশুটি আজ বড় হয়েছে। কোডিক্যানাল ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে গ্রেড টুয়েলভে যখন পড়তো, পড়ার চাপের ফাঁকে সময় পেলে আমাকে চিঠি লিখতো। আর তাড়া দিতো আমার বইটি যেন তাড়াতাড়ি ছাপিয়ে দিই। চিঠির ভাষা চমৎকার। ঝরঝরে ইংলিশ। মনে হয় কোন সাহিত্য পড়ছি। ক্লাসিক্যাল ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি তার গভীর অনুরাগ। শেক্সপীয়র, চালর্স ডিকেন্স, আলবেয়ার ক্যামু, আরনেস্ট হেমিংওয়ে, লিও টলস্টয় প্রমুখ লেখকদের সাহিত্য কর্মের সে অনুরাগী পাঠক। জন্মদিনে কি গিফ্ট নেবে জানতে চাইলে সে বলতো, আমার কোন জিনিসের প্রয়োজন নেই, বই কিনবো। একগাদা বই কিনে এনে আমাকে দেখাতো আর বলতো, নানীমা, তোমার উপহারের টাকা দিয়ে এই বইগুলো কিনেছি। অসংখ্য বই কিনে কিনে তার রুমের দেয়াল-শেলফ ভরিয়ে ফেলেছে। সেগুলো আবার ক্যাটালগ করে রেখেছে। তার বই যেন তার জীবন। তার নানার সাথে আলোচনা করতো এইসব ক্লাসিক্যাল লেখকের সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। আমি অবাক হয়ে তাদের আলোচনা শুনতাম। নানার প্রতি এই কারণেই হয়তো তার এতো আকর্ষণ।

ছুটিতে দেশে এলে আমার কাছে বেশ কিছু সময় কাটায়। আমার অফিস রুমে স্টাডি টেবিলের পাশে কম্পিউটারে বসে মাঝে মাঝে গান শোনে। মনের আনন্দে লেখে। কি লিখ্ছে জিগ্যেস করলে বলে, তোমার পাশে বসলে লিখতে ইচ্ছে করে। মাঝে মাঝে কবিতা লিখে আমাকে পড়ে শোনায়। সুন্দর তার লেখার স্টাইল। কবিতা শুনে মনে হয় তার নানার গুণ কিছুটা পেয়েছে যদিও ইখতিসাদের লেখাগুলো ইংরেজি ভাষায়।

কোডিক্যানাল স্কুলে তার সাথে একদিন টেলিফোনে কথা বলছিলাম। সে তখন তাদের বার্ষিক ম্যাগাজিনের সম্পাদনা নিয়ে খুবই ব্যস্ত। তাকে ঠাট্টা করে বললাম, আমি কলেজ ম্যাগাজিন সম্পাদনা করেছিলাম, তুমি স্কুল ম্যাগাজিন করছো। নানিমাকে অনুসরণ করছো বুঝি ? পড়া শেষ করে কোডি থেকে চলে এসে যখন ম্যাগাজিনটা দেখালো, আমার মনটা ভরে গেল আনন্দে আর তৃপ্তিতে। স্কুলে নাকি শেকস্পীয়রের A Midsummer Night's Dream নাটকে অভিনয় করেছে, গীটার বাজিয়ে স্কুলের ব্যান্ডে গান করেছে এবং কোন একটা নাটকের ডিরেকশনও দিয়েছে। স্কুল ম্যাগাজিনে পড়ে দেখলাম সে STUDCO-র (ছাত্র সংসদ) প্রেসিডেন্ট হিসেবে অনেক কাজ করেছে। কিন্তু

Pioneer in village based website

মুখফুটে কোনদিন আমাকে বলেনি তার এতসব কাজের কথা। সে বাবার মত মুখচোরা। কিন্তু কাজে অত্যন্ত দৃঢ় সংকল্প। যেটা করতে চায় সেটা করেই ছাড়ে।

বাবার মতো খেলাধুলার প্রতি তার প্রচন্ড আগ্রহ। কোডিক্যানাল স্কুলে থাকতে দেখেছি বাবার সাথে টেলিফোনে ক্রিকেট বা টেনিস খেলা নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করতে। ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলা করতে সে ভীষণ ভালোবাসে। বন্ধুদের নিয়ে খেলার সময় ক্রিকেটের বলের ধাক্কায় আমার বাড়ির পর্চের লাইট যে কতবার ভেঙ্গেছে তার ইয়ত্তা নেই। সে জানতো, নানিমা কোনদিন এতে রাগ করবে না। কারণ তাকে আমি প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। নানিমার জন্যও সে অন্তপ্রাণ। যেখানে গেছে সেখান থেকে, আমেরিকা, সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক থেকে আমার জন্য এনে দিয়েছে আমার প্রিয় নানা রকম পারফিউম। ভুটান থেকে এনেছে তাদের ঐতিহ্যবাহী একজোড়া ড্রাগণ-বল, যা দিয়ে আমি রোজ হাতের ব্যায়াম করি আর তার হাতের ছোঁয়া অনুভব করি। শুধু আমার জন্য নয় তার কাকু ও খালাদের জন্য (ওসমান, ফারুক, শহীদ, ইদ্রিস, প্রদীপ, ওয়াহিদ এবং নুরেশা, যারা আমাদের বাসায় কাজ করে) নিজের পকেট-মানি দিয়ে সব সময় তার সাধ্যমত উপহার নিয়ে আসে।

সে এখন ইংল্যান্ডে, ইউনিভার্সিটিতে ল' পড়ছে। তার দেয়া উপহারগুলো আমার ড্রেসিং রুমে সাজিয়ে রেখেছি। পারফিউমের সুন্দর সুরভির মাঝে ইখতিসাদের মনের স্পর্শ পাই। মনে হয়, সে এখন বিলেতে নয়, আমার পাশে বসে কথা বলছে।

Chunati.com
Pioneer in village based website

একমাত্র শিশুকে গড়ে তোলা কষ্টকর

নানা রকম ফার্টিলিটি ওষুধ খাওয়ার জন্য আমার মেয়ে মুন্নির শরীরে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া হতো। কোন সময় সমস্ত শরীর ফুলে যেত। কোন সময় স্পষ্টভাবে কথা বলতে পরতো না। গলার স্বর বসে যেত। কোন সময় হাতের আঙ্গুল ফুলে যেত। এত কষ্ট দেখে আরেকটা বাচ্চা নিতে আমরা সবাই বারণ করেছিলাম। কিন্তু সে শুনলোনা কারো নিষেধ। তার একাকীত্বের বেদনা সে ভুলতে পারে না। সবার ভাই বোন আছে, তার নেই কেন। ছোটবেলায় এই ধরণের প্রশ্ন করে করে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতো। আমি কোন জবাব দিতে পারতাম না। বহু চেষ্টা করেও আমাদের কোলে আরেকটি বাচ্চা আসেনি। যাহোক, আমার শুধু একটি সন্তান বলে আজ আমার কোন আফসোস নেই। ইশতিয়াক আমার নিজের সন্তানতুল্য। আমার যেকোন আপদে-বিপদে প্রতি মুহূর্তে সে আমাকে সাহায্য করে। সবসময় আমাকে মানসিক শক্তি জোগায়। আমার নিজের ছেলে হলেও এতখানি করতো কিনা সন্দেহ। আমার মেয়ে মুন্নি মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলে, ইশতিয়াক তোমার ছেলে, আমি তোমার ছেলের বউ। ইশতিয়াকের বড় ভাই ইশরাক আমার বড় ছেলের মতো। খাইরুল আনোয়ার, সুজিত, ইত্‌রাত, দৌলা, রেজা, অনু, তনু, নীরু, ওয়াহিদ, আইভী, শুক্লা, পপী, সেলিনা, লিপির মতো সন্তানেরা আমাকে যখন মা বলে ডাকে তখন আমি অশেষ আনন্দে পরিতৃপ্ত হই। টুটু-নীতা, মিতি, বাপ্পা (কলকাতা), নাসিম (পাকিস্তান), সালেহীন, কল্পনা (আমেরিকা),

এবং সেলিমের (কাশ্মীর) মতো আমার অনেক ছেলে মেয়ে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে আছে। নাসিম এবং সেলিম সময়ের গর্ভে কোথায় হারিয়ে গেছে জানি না। তাদের জন্য এখনো আমার অন্তর কাঁদে। আমাদের কাজের লোক থেকে শুরু করে আমার উত্তরা বাড়ি নির্মাণের সময় যে সকল মিস্ত্রিরা কাজ করতো, তারা সকলে আমাকে আম্মু ডাকে। এভাবে আমি হয়েছি অসংখ্য সন্তানের জননী। রুমা আমার অত্যন্ত প্রিয় ভাইজী। তার মধ্যে আমি যেন বড়ভাইয়ের স্পর্শ পাই। এছাড়া আমার ভাই-বোনের ছেলে-মেয়েরা, খুররম, হাফিজ, এমরান, জাহাঙ্গীর, মেঘলা, রতন, বর্ষণ, সেবু, ছবি, আমের, মুনা, চন্দন, রাজ, সমিত, পারুল, শেলী, কচি, খুকু, নন্দন, কানন, সাম্মী এদের সকলের ভালোবাসা আমাকে সবসময় সজীব রাখে। কলকাতায় গেলে যারা আদর যত্নে, আপ্যায়নে, বিশিষ্ট জায়গা ভ্রমণে আমাদের সাহায্য সহায়তা করে তারা হলো প্রদ্যুত সেন, মীরা সেন এবং তাদের সন্তান ইন্দ্রজিৎ ও ইন্দ্রনীল। মীরা এবং প্রদ্যুতের সঙ্গে আমাদের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। এদের দু'সন্তান ইন্দ্রজিৎ ও ইন্দ্রনীল ইতোমধ্যে সঙ্গীত ও শিল্প জগতে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। তাদের জন্য আমরা প্রভূত গর্ব অনুভব করি। তারা আমাকে প্রাণভরা আদর করে মাসিমা ডাকে।

একমাত্র শিশুকে গড়ে তোলা সত্যিই কষ্টকর। মুন্নি সবসময় বন্ধু-বান্ধব দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতে চাইতো। বন্ধুদের নিয়ে বেড়াতে যাওয়া, তাদের নিয়ে আমার বারান্দায় নানা রকম অনুষ্ঠান করা ছিল তার নিত্যদিনকার ব্যাপার। দেওয়ান বাজারে আমাদের বাসার পেছনে থাকতো অরুণ সেনের দুই মেয়ে, টুটু আর নীতা। তারা ছিল মুন্নির নিত্যসঙ্গী। তারাও আমকে আম্মু বলে ডাকতো। সকাল-বিকাল দু'বেলা টুটু-নীতা এবং মুন্নি একসাথে। টুটু-নীতা আমার কোলে বসলে তার পছন্দ হতো না। অন্য রুমে গিয়ে তাদেরকে চকলেট খেতে ডাকতো, সে সুযোগে মুন্নি দৌড়ে এসে আমার কোল দখল করে বসতো। তার জন্য একান্তভাবে কোনদিন আমি কোন খাবার কিনে আনতে পারিনি। টুটু-নীতার জন্যও আনতে হতো। এক পেকেট চকলেট আনলে সেটা তিন ভাগ করতে হতো এবং মুন্নি নিজের হাতেই সেটা বিলি করতো। এখনো তার কোন পরিবর্তন হয়নি। তার কাছে আপন-পর ভেদাভেদ নেই। বন্ধুদের জন্য অন্তপ্রাণ। তাদের বিশেষ বন্ধু খোজেম জিয়াউদ্দীন এবং তার স্ত্রী নাসরীনের সঙ্গে রোজ একবার কথা না বললে তার ঘুম হয় না। তারাও মুন্নি এবং ইশতিয়াকের জন্য যে কোন স্বার্থত্যাগ করতে সব সময় প্রস্তুত। কলিগদের কাছে মুন্নি এত ঘনিষ্ঠ যে তাকে সব সময় ওদের আনন্দ-বেদনার সঙ্গী হতে দেখি। অচিরেই সে তাদের পারিবারিক বন্ধু হয়ে ওঠে। তার বড় ছেলে ইখতিসাদকে যখন বনানীতে প্লেপেন স্কুলে প্রথম ভর্তি করে তখন থেকে সে সেই স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করে। তাদের প্রিন্সিপ্যাল সাবেরা হারুন (ফ্লোরা) তাকে ছোট বোনের মতো স্নেহ করে। স্কুলের যেকোন গুরু দায়িত্ব তার হাতে অর্পণ করে নিশ্চিন্ত থাকে। শ্বশুর-শাশুড়ি এবং ইশতিয়াকের ভাইবোনদের প্রতি তার আন্তরিকতা এবং কর্তব্য পরায়ণতার তুলনা নেই। তার শাশুড়ি আদর করে বলে, মুন্নি আমার বেস্টফ্রেন্ড। সে তার বাবার মতো পারফেক্শনিস্ট। যেকোন কাজ অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা করে। এমনকি তার বাচ্চাদের প্রতিও এর ব্যতিক্রম হয় না। বাড়ির কাজের লোক

Pioneer in village based website

এবং স্কুলের আয়ারাও তার বিশেষ মনোযোগের বাইরে থাকেনা। ছোট বড় সকলের প্রতি কর্তব্য পালনে তার কোন কৃপণতা দেখিনি কোনদিন।

আগের কথায় ফিরে আসি। হঠাৎ একদিন সকালে উঠে শুনলাম টুটু-নীতারা দেশ ছেড়ে কলকাতা চলে গেছে। এতে মুন্নি আবার একাকী, নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লো। বহু বছর পর তাদের সাথে নাটকীয়ভাবে দেখা ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে। ইউনিসেফে যোগদান করার পর আমরা, বীরু-রেনু, গফ্ফার ভাই, সিতারা এবং আরো কয়েকজন বন্ধু এক সাথে ভারত ভ্রমণে গিয়েছিলাম। তখন তীব্র শীত। কলকাতা, দিল্লী, জয়পুর, আজমীর, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি, সেকেন্দ্রা হয়ে মথুরা থেকে রাত একটায় বম্বের ট্রেন ধরলাম। সেখানে কয়েক দিন থেকে কলকাতায় ফিরে পার্ক স্ট্রীটে রাতদিন হোটেলে উঠলাম। সেই রাতেই আমি তীব্র ডাইরিয়ায় আক্রান্ত হলাম। মরি না বাঁচি, এই অবস্থা। খবর পেয়ে আমাদের একজন পুরোনো বন্ধু পীযূষ চৌধুরী ওই রাতেই আমাকে তাঁর গড়িয়ার বাড়িতে নিয়ে গেলেন। আমার জন্য ডেকে আনলেন তাঁদের পারিবারিক চিকিৎসক। তিনি সারারাত জেগে আমাকে ইন্টার-ভেনাস সেলাইন দিলেন। সেখানে আশেপাশে যারা আছেন, তারা সকলে চট্টগ্রামের অধিবাসী। একজন চট্টগ্রামের মহিলা কলকাতায় বেড়াতে এসে মরণাপন্ন অবস্থায় পীযূষ চৌধুরীর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে শুনে পরের দিন ভোরবেলা অনেকে আমাকে দেখতে আসেন। হঠাৎ দেখলাম দু'টি কিশোরী মেয়ে কেঁদে উঠে আম্মু আম্মু বলে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আমার বুঝতে বাকি রইলোনা এরা অরুণদার মেয়ে সেই টুটু আর নীতা, অনেক আগে যারা দেশ ছেড়ে কলকাতা চলে আসায় আমার মেয়ে আবার নিঃসঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। এভাবে বহু বছর পর ওই পরিবারের সাথে আমাদের পুনর্মিলন ঘটলো।

Pinnali.com
Pinnali village based website

মুন্নির নিঃসঙ্গতার কথা বারবার আমাকে পীড়া দেয়। যখন আমাকে তার বেশি দরকার সেই ক্রিটিক্যাল সময়ে আমি চলে গেলাম নিউজিল্যান্ডে। সে যখন আমার সঙ্গ চাইতো, তখন আমি হয়তো বস্তির ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে গল্প করছি। এভাবে বহুদিন, বহু সময় তার নিঃসঙ্গ জীবন কেটেছে। বোধ করি এই কারণে সে নিজের জন্য আরেকটা বাচ্চা চায়। সে বলতো, আমার সন্তানকে এই নিঃসঙ্গ শৈশবকাল দিতে চাই না, যা আমার জীবনে অতিবাহিত হয়েছে। আমার ছোট নাতি ইবতিসাম হওয়ার আগে বড় নাতি ইখতিসাদ প্রায়ই বলতো, তার সঙ্গে খেলার জন্য সে একটা ভাই চায়। যদি ভাইয়ের বদলে বোন হয়, সে যেন মনে আঘাত না পায় সেজন্য আমরা নানা কৌশলে তাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করার চেষ্টা করতাম। যখন সে শুনল তার একটা ভাই হয়েছে তখনই যেন সে তার সাথে খেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। ইবতিসামের জন্ম হয়েছিল গুলশানে ডা. সুরাইয়া জাবীনের লেকভিউ ক্লিনিকে। সুরাইয়া জাবীন আমার বন্ধু রেনুর বড় বোন। তিনি অত্যন্ত সহজ, সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁকে আমরা খুব শ্রদ্ধা করতাম। তিনি বেঁচে থাকলে হয়তো ইবতিসামকে দেখে খুশি হতেন। তার বয়স এখন সাড়ে নয় বছর। অত্যন্ত প্রাণবন্ত। রোজ রাতে ঘুমাবার আগে তিনতলা থেকে নেমে আসে আমাকে আর নানাকে গুডনাইট বলার জন্য। ঘুমাবার সময় হলে আর এক মিনিটও অপেক্ষা করে না। এক দৌড়ে তিনতলায়। যাওয়ার আগে আমাদের সঙ্গে

কিছুক্ষণ খেলতো। এটা তার চিত্তবিনোদনের একটা অংশ। কোনদিন আমাদের চেয়ারে বসিয়ে সে তার স্বপ্নপুরীর ডিসি-টেন-এর পাইলট হয়। মুহূর্তের মাঝে তার কল্পনার পাখা উড়িয়ে আমাদের নিয়ে যায় প্যারিসে, আইফেল টাওয়ার দেখিয়ে আনে। কখনো লুবে মিউজিয়ামে দা ভিঞ্চির আঁকা মোলানিসার ছবি দেখায়। আবার সুবিনিয়র সপ থেকে মোনালিসার প্রিন্ট কিনে দেয়। কখনোবা মাইকেল এঞ্জেলো কিভাবে শুয়ে শুয়ে রোমের সিস্টীন (Sistine) চ্যাপেলের ডোমে ছবি একেঁছিল তার বর্ণনা দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যে লন্ডনে ল্যান্ড করে ম্যাডাম টুসোতে নিয়ে যায়। এসব সেরে আবার আমাদের লতা মঙ্গেশকরের গান শোনায়। টাইটানিকের গানও শোনায়। তার সবচেয়ে প্রিয় হলো টাইটানিক ছবি। এর গল্প বলতে বলতে তার চেহারা বিষণ্ন হয়ে ওঠে। মুহূর্তে আমার স্টাডি টেবিলে বসে অর্ধ ডোবা ভাঙ্গা টাইটানিক এঁকে নানা আর নানিমাকে উপহার দেয়।

বড় ভাইয়ের মতো ইবতিসামেরও বই পড়ার নেশা। হ্যারিপটার তার প্রিয় বই। ওর তথ্য ভান্ডার বিস্ময়কর। তার বিশেষ আগ্রহ প্রাণী জগত। উটপাখি কতো বেগে দৌড়ায়। বিভিন্ন বাঘের রকমফের থেকে শুরু করে ডলফিনের ইন্দ্রিয় জ্ঞান, গতি-প্রকৃতি, তিমি-হাঙ্গর প্রভৃতি মাছের চরিত্র সে এমন বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে মনে হয় আমরা যেন ক্লাস রুমে বসে আছি। ইতিহাস ভুগোলেও তার বিচরণ কম নয়। Statue of Liberty কে তৈরি করেছে। চিনের প্রাচির তৈরি করতে কত বছর সময় লেগেছিল। তাজমহল, পিরামিড থেকে শুরু করে কনকর্ড প্লেইনের নির্মাণ শৈলী তার নখদর্পণে। জোয়ান অব আর্ক, সালাদীন, চেঙ্গিস খাঁ (যার শুদ্ধ উচ্চারণ সে জিঙ্গিশ খান মনে করে) এসব বিষয়ে তার আগ্রহ এত বেশি যে তার অসংখ্য প্রশ্নের জবাব দিতে আমরা হিমশিম খেয়ে যাই। আর ভাবি আকাশ মিডিয়া, কম্পিউটার ইত্যাদির কি বিস্ময়কর অবদান। যা আমরা কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়ও জানতাম না, তা আজকালকার শিশুরা অনায়াসে জানতে পারে বিভিন্ন মিডিয়ার তথ্য বিপ্লবের ফলে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির অগ্রযাত্রা যদি অব্যাহত থাকে, আর আমাদের ছেলেমেয়েরা যদি এই প্রযুক্তি বিদ্যা গ্রহণের সুযোগ পায়, তাহলে তারাও প্রতিযোগিতায় উন্নত দেশের ছেলে মেয়েদের চাইতে কোন অংশে পিছিয়ে থাকবেনা।

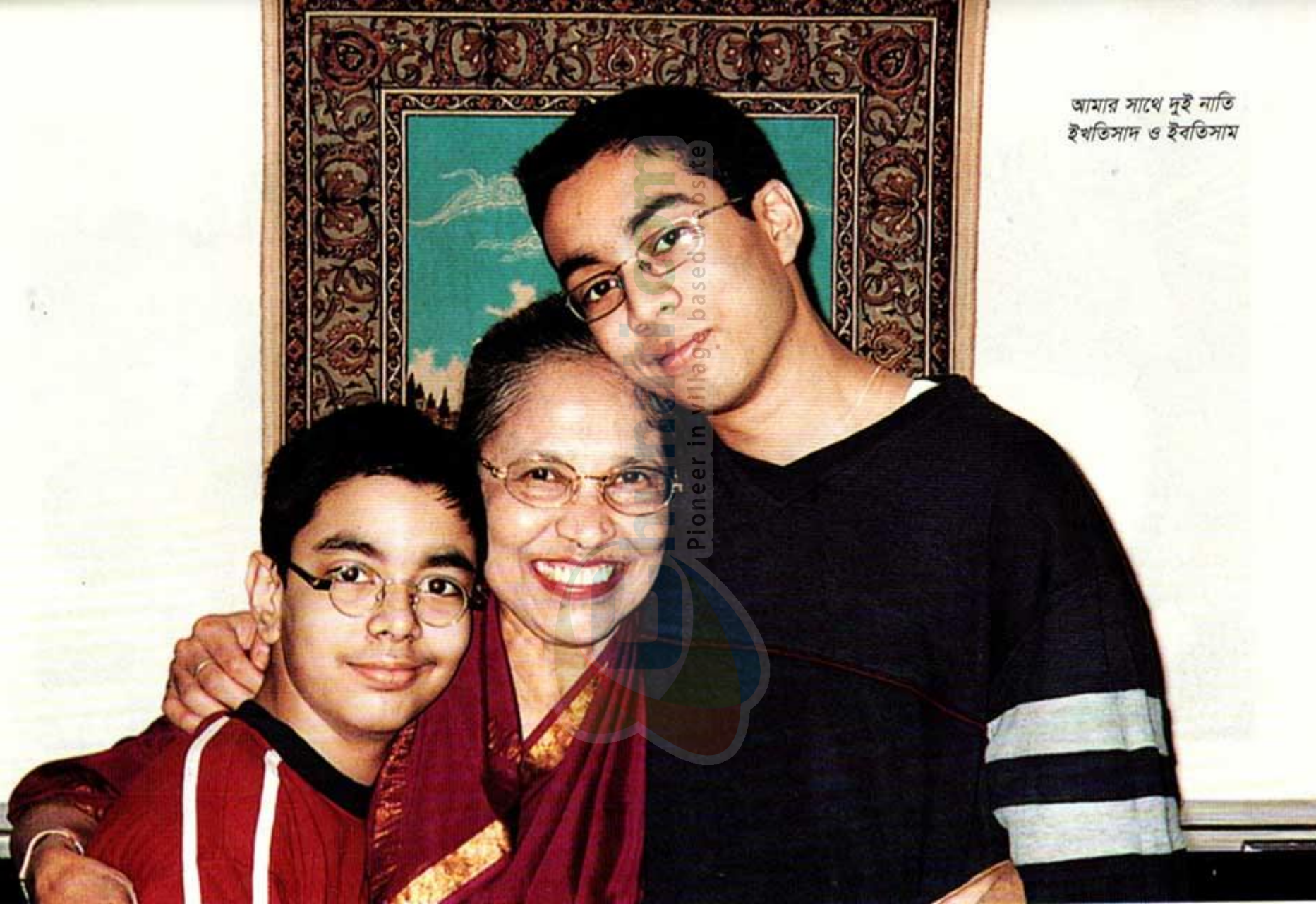


মেয়ে মুন্নির সাথে



জামাতা ইশতিয়াকের সাথে

Chunati.com
Pioneer in village based website



আমার সাথে দুই নাতি
ইখতিসাদ ও ইবতিসাম

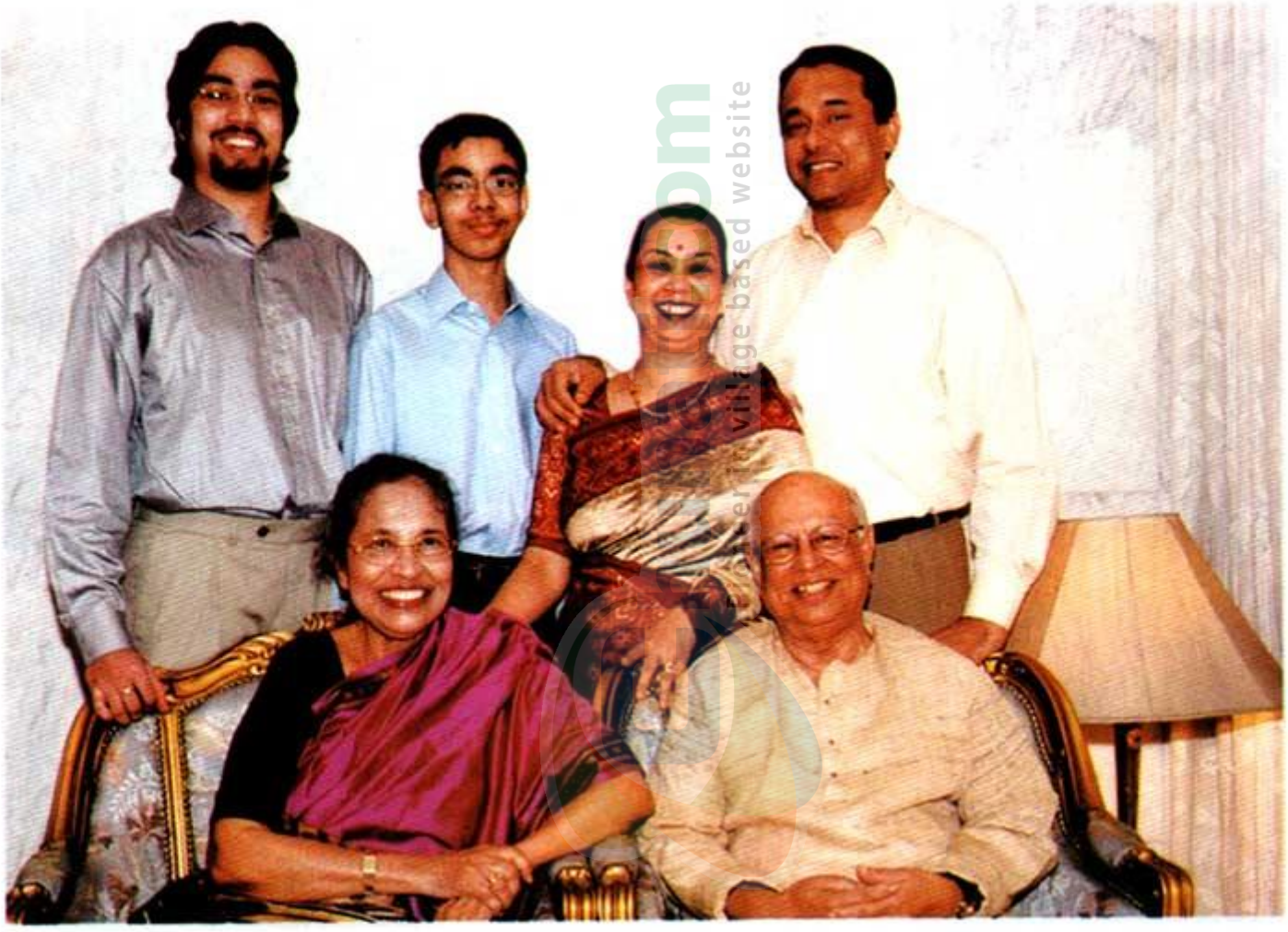


উত্তরার বাড়িতে এই টেবিলে বসে বইটা লেখা হয়েছে। বড় নাতি ইখতিসাদের সাথে আমি

Chunati.com
Pioneer in village based website



ছোট নাতি ইবতিসাম পিয়ানো বাজাচ্ছে



আমি ও মাহবুব, পেছনে বাম দিক থেকে নাতি ইখতিসাদ, ইবতিসাম, মেয়ে মুন্নি, জামাতা ইশতিয়াক



ছোট বোন জাহান আরা ইসলামের সাথে

Chunati.com
Pioneer in village based website



সেজ ভাই শাহাবুদ্দীন আহমদের সাথে



ছোট ভাই আহমদ ফরিদের সাথে



মাহবুবের ৭৮তম জন্মদিনে

Chunati.com
Pioneer in village based website



আমি, কলিম শরাফী, মাহবুব এবং নওশাবা শরাফী



ওয়াশিংটনে মাসুমা খাতুনের বাড়ির সামনে আমি, মাহবুব ও মাসুমা



কুমিল্লা বার্ডের বাগানে আমি ও হাসনা হাজারী জেলী



স্বামী মাহবুব উল আলম চৌধুরীর সাথে

মনুষ্যত্ব

মনুষ্যত্ব তখনো বিলুপ্ত হয়নি

আমি তখন ইউনিসেফে কর্মরত। সময়টা ঠিক মনে পড়ছেনা। খুব সম্ভব ১৯৮৫ সালের শেষার্ধে। তখন এন্থনি কেনেডি বাংলাদেশে ইউনিসেফের প্রতিনিধি।

একবার ডানিডা থেকে তাদের নতুন স্টাফ মেম্বারদের অরিয়েন্টেশন কোর্সে বাঙালি কালচার সম্পর্কে লেকচার দেয়ার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। সেখানে প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী আজিজুল হকও একজন রিসোর্স পারসন ছিলেন। এই অরিয়েন্টেশন কোর্সটার আয়োজন করা হয়েছিল কুমিল্লা বার্ড একাডেমীতে। নির্ধারিত তারিখে ডানিডার গাড়ি আসলো আমাকে কুমিল্লা নিয়ে যাওয়ার জন্য।

দুপুর তিনটার দিকে আমরা রওনা হলাম। দাউদকান্দির কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। মাইল কয়েক বাকি। হাইওয়েতে গাড়ি বেশ স্পিডে চলছিল। হঠাৎ একটা ছাগল আমাদের জিপ গাড়ির সামনে দিয়ে দৌড় দিল। ড্রাইভারের পক্ষে স্পিড কন্ট্রোল করা সম্ভব হয়নি। এমন জোরে ব্রেক কষলো, মুহূর্তের মাঝে আমি সিটের নিচে পড়ে গেলাম। শত চেষ্টা সত্ত্বেও ছাগলটিকে রক্ষা করা গেল না। গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে গেল। আমাদের ড্রাইভার ভীষণ স্পিডে গাড়ি চালিয়ে চলে গেল পাছে মৃত ছাগলের মালিক এসে তাকে মারধর করে। বারবার পেছনের দিকে তাকাচ্ছিল আর গাড়ির স্পিড বাড়াচ্ছিল। লোকের আক্রমণের ভয়ে তার এবং আমার জীবন যে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়লো সেদিকে তার মোটেও খেয়াল ছিল না। কিছুদূর এগিয়ে এসে ড্রাইভার স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেললো। মিনিট পাঁচেক চুপচাপ গাড়ি চালালো। আমিও মনে মনে নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু ছাগলের মালিকের জন্য খুব দুঃখ বোধ করলাম। এমন সময় ড্রাইভার আবার স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে বললো, ম্যাডাম, একটা ট্রাকে করে লোকগুলো আমাদের গাড়িকে অনুসরণ করছে। ড্রাইভার তার সমস্ত শক্তি দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দাউদকান্দি ফেরিতে উঠে গিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। পেছনে দেখলাম সেই ট্রাকটাও ফেরিতে উঠলো। ড্রাইভার তখন গাড়ি লক্ করে দিয়ে আমাকে নিয়ে ফেরির দোতলায় উঠে লুকিয়ে গেল। আমি দোতলায় ছোট্ট রুমে বসে বসে ভাবছিলাম কী করা যায়। এর মধ্যে সেই লোকগুলো, ট্রাক ড্রাইভার এবং ফেরির সহযাত্রী আরো বেশ কিছু লোককে নিয়ে আমাদের জিপ গাড়ি ঘিরে ফেললো। খুবই উত্তেজিত হয়ে বারবার বললো, এই জিপ গাড়ির ড্রাইভারকে পেলে আমরা গণধোলাই দেবো। কেউ কেউ বললো, তাকে মেরে

nuraltech.com
Pioneer in village based website

ফেলবো। আমি মিনিট দশেক লক্ষ্য করলাম। তখন দাউদকান্দি ফেরি পার হতে পঁচিশ মিনিটের মতো সময় লাগত। মনে সাহস সঞ্চয় করে ফেরির ছোট্ট কাঠের সিড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে নিচে নামলাম। আমাদের গাড়ির কাছে গিয়ে লোকগুলোকে জিগ্যেস করলাম, আপনারা কী এই গাড়ির ড্রাইভারকে খুঁজছেন? একজন বয়স্ক মহিলা তাদের পক্ষ নিয়েছে ভেবে তারা সন্তুষ্ট চিত্তে জবাব দিলো, ড্রাইভারটা কোথায় লুকিয়ে গেছে। যেমন করে হোক তাকে পেতেই হবে। আমি বললাম, আপনাদের বিপদের কথা সব শুনেছি। আমি আপনাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। কী করলে আপনারা খুশি হবেন? তারা বললো, ছাগলের ক্ষতি পূরণ স্বরূপ এক হাজার টাকা ওই ড্রাইভারের কাছ থেকে আদায় করে ছাড়বো। আবার কেউ কেউ বললো, এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন ড্রাইভারকে এত সহজে ছেড়ে দেয়া যাবেনা। অন্তত কয়েকটি কিল-ঘুষি হলেও দেয়া উচিত।

আমি তখন আসল কথা বলে ফেললাম। তাদের কাছে ক্ষমা চাইলাম। তাদের বোঝাতে চেষ্টা করলাম, ড্রাইভার যদি তাদের দ্বারা আহত হয়, তবে আমি খুবই বিপদে পড়বো। কুমিল্লায় আমার জরুরি কাজ আছে। যেকোন প্রকারে সূর্য ডোবার আগে আমাকে পৌছতেই হবে। এই বলে এক হাজার টাকা ব্যাগ থেকে বের করে তাদের হাতে দিলাম। অনুরোধের সুরে বললাম, ড্রাইভারকে আমি ডাকবো, কিন্তু আশা করি আপনারা তার গায়ে হাত দেবেন না। আমার বিপদের কথা ভেবে তাকে আপনারা দয়া করে ক্ষমা করে দেন। তারা আমাকে কথা দিলো। আমি ড্রাইভারকে ডাকলাম। এদিকে ফেরি প্রায় ঘাটে লাগার সময় হয়ে এলো। তাকে সকলের সামনে খানিকক্ষণ বকাঝকা করলাম। আর তাদের কাছে পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে বললাম। লোকগুলো হঠাৎ এমন বিগলিত হয়ে গেল, ড্রাইভারকে পায়ে হাত দিতে দিল না। বরঞ্চ তারাই ক্ষমা চাইলো আমার কাছ থেকে। লজ্জিতও হলো। বিনম্রভাবে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিল।

তখনো মানুষের মূল্যবোধের তেমন অবক্ষয় হয়নি। মানুষের মনুষ্যত্ব তখনো আজকের মত বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। মানুষকে ক্ষমা করার মত উদারতা এবং মানসিকতা ছিল তাদের মধ্যে। মাত্র দেড় দশকের ব্যবধানে আজ এই মূল্যবোধ দুর্লভ হয়ে পড়েছে।

এসিড সন্ত্রাস ও প্রথম আলো সহায়ক তহবিল

২০০০ সালের প্রথম দিকে দৈনিক 'প্রথম আলো'র সম্পাদক মতিউর রহমান একদিন টেলিফোন করলেন। বললেন, আপা, আমাদের দেশে এসিড সন্ত্রাস দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এর প্রধান শিকার নারীদের সাহায্যার্থে আমরা একটা সহায়ক তহবিল করার কথা চিন্তা করছি। এ ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য আমরা কয়েকজন বসতে চাই। আপনি আমাদের সাথে থাকলে খুশি হবো। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে তৎক্ষণাৎ আমার সম্মতি জানিয়ে দিলাম। ভাবলাম, এ আমার পরম সৌভাগ্য। এসিডদগ্ধ নারীদের জন্য অর্থপূর্ণ কোন কর্মসূচি হাতে নেয়ার এ এক সুবর্ণ সুযোগ। মতিউর রহমানকে চিনতাম একজন

স্বনামধন্য সাংবাদিক হিসেবে। বিভিন্ন সভা সমিতিতে তাঁর বক্তব্য শুনেছি। নারী উন্নয়নে তাঁর একাগ্রতার কথাও জানতাম। কিন্তু এই ধরণের কাজে তাঁর এই বিশেষ আগ্রহের কথা জানতাম না।

নির্ধারিত দিনে আমরা আলোচনায় বসলাম 'প্রথম আলোর' অফিস, সি.এ. ভবন, ১০০ নম্বর কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজারে। মতিউর রহমান এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য বিশদভাবে ব্যাখ্যা করলেন। আমরা এর বিভিন্ন দিক আলোচনা করলাম। বর্তমানে ধর্ষণজনিত মৃত্যু, নারী পাচার, নারীকে জোরপূর্বক বিভিন্ন অসামাজিক কাজে লিপ্ত করা, যৌতুকের জন্য প্রহার এবং হত্যা করা যেন দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এর মধ্যে এসিড নিক্ষেপ সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক। নারী এবং কিশোরীরা প্রতিনিয়ত এসিডদগ্ধ হয়ে ঝলসে যাচ্ছে। ঝলসে যাচ্ছে তাদের লাবণ্যময়ী মুখমন্ডল, তাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। কতো নারী দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে চির অন্ধত্ব বরণ করেছে। তারা শুধু এভাবে নির্যাতিত হয় না, পারিবারিক এবং সামাজিকভাবেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাদের কোথাও ঠাঁই নেই। চিকিৎসার সুব্যবস্থা নেই। তাদের জন্য কোন কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা নেই। এই প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ জীবন সংগ্রামে তারা নিরুপায়। পরিবার তাদের ধারণ করতে পারে না। সামগ্রিকভাবে তারা নিরাপত্তহীনতায় ভোগে।

বর্তমানে কিছু কিছু সংগঠন এসিড নিক্ষেপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। ডানিডার সহায়তায় 'মাল্টি সেকটোরেল প্রোগ্রাম অন ভায়োলেন্স এগেইনস্ট ওমেন' নামে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় একটি প্রকল্প চালু করেছে। এসিড সারভাইভারস্ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিছু দাতা সংস্থার প্রচেষ্টায়। এই সকল উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান এসিডদগ্ধ নারীদের প্রয়োজন অনেক বেশি। এ ক্ষেত্রে আরো অধিক কাজ করা দরকার। সম্প্রতি 'এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০০' এবং 'এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০২' – এই দুটি আইনের মাধ্যমে এসিড নিক্ষেপকারী ও মজুতদারদের জন্য আজীবন কারাদন্ড, মৃত্যুদন্ড ইত্যাদি কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু নারীর প্রতি এসিড নিক্ষেপের মতো সহিংসতা মোটেই কমেনি, বরং ক্রমাগত আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশনের তথ্য মতে ২০০২ সালে ৪৮৫ জন এবং ২০০৩ সালে ৩৯৪ জন এসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে (২৪ ডিসেম্বর প্রথম আলো,২০০৩)। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর উদাসীনতা এর জন্য বিশেষভাবে দায়ী। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে নারীরা বিচার চেয়ে বিচার পায় না। এতে তাদের জীবন আরো ভীতিময় এবং ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। এই ভীতি এবং অনিশ্চয়তা নারীর সামগ্রিক উন্নয়নের পথে একটি বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এরূপ নির্যাতন ও নির্যাতনের হুমকি এবং পারিবারিক ও সামাজিক প্রত্যাখ্যান নারীকে সমাজে নিম্নাবস্থান মেনে নিতে বাধ্য করে। তারা চির-পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। নারীদের প্রতি এসিড নিক্ষেপের এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতির মোকাবেলা করা কেবল সরকারি আইন প্রণয়ন করে এবং ছিটেফোঁটা কর্মসূচি দিয়ে সম্ভব নয়। একে সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিরোধ করতে হবে। এই ব্যাপারে সংবাদ মিডিয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই উপলব্ধিতে যিনি আমাদের মত কয়েকজনকে 'প্রথম আলোর'

অফিসে একত্রিত করলেন, তিনি হলেন মতিউর রহমান। সংবাদপত্রকে গণ-মাধ্যম হিসেবে জানতাম। জনমত গড়ে তোলা এবং মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির একটি শক্তিশালী হাতিয়ার বলে জানতাম। কিন্তু তার মাধ্যমে জনসেবা করার এই বিরল প্রচেষ্টায় আমাকে অনুপ্রাণিত করলেন মতি ভাই। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এসিড নির্যাতনের শিকার নারীদের সার্বিক সাহায্যার্থে এবং তাদের সামাজিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে মতি ভাইয়ের বিশেষ উদ্যোগে একটি সহায়ক তহবিল গঠন করা হয় ১৯ এপ্রিল ২০০০ সালে। এর সঠিক ব্যবহারের দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য ১১ জুলাই (২০০০) ছোট্ট একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। তাতে আছেন মতিউর রহমান, সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান আজিজ খান, ব্যারিস্টার তানিয়া আমীর, ঢাকা মেডিকেল কলেজ বার্ন ইউনিটের প্রধান ডা. সামন্তলাল সেন, সানিডেল স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল তাজিন আহমেদ, ডা. দীপু মনি এবং আমি। এ কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন 'প্রথম আলোর' সুমনা শারমীন, সাজ্জাদ শরিফ। অনুদান দিয়ে এই তহবিল গঠনের জন্য অশেষ উদ্যম নিয়ে এগিয়ে এলেন মুহাম্মদ আজিজ খান। অনেকের অর্থ থাকে, অন্তর থাকেনা। আজিজ খানের দু'টোই আছে। এই তহবিলে আরো অর্থ প্রদান করেন প্রথম আলোর সাংবাদিকরা তাদের একদিনের বেতন দিয়ে। বহুবিধ দায়িত্ব পালন করে এসিড দগ্ধদের কাজে সহায়তা করতে হলে নির্যাতিতের প্রতি গভীর মমত্ববোধ থাকা চাই। এই কমিটির সকল সদস্যদের মধ্যে এই মমত্ববোধের প্রাচুর্য দেখে কিছুটা আশান্বিত হলাম।

এই ছোট্ট সহায়ক তহবিলের প্রচেষ্টা আজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ক্রমে এতে যোগ দিয়েছেন আরো অনেকে। ইলিয়াস কাঞ্চন, কুমার বিশ্বজিৎ, শমী কায়সার, আসিফ আকবর, সাজ্জাদ শরিফ, কানিজ আলমাস খান। শুরুতে এ কাজের সঙ্গে আরো যুক্ত ছিলেন সেরিন ফেরদৌস, আসিফুর রহমান। বর্তমানে (২০০৩ থেকে) 'প্রথম আলো' সহায়ক তহবিলের সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করছেন পলাশ চৌধুরী। এরই মাধ্যমে বেশ কিছু এসিডদগ্ধ নারীদের চিকিৎসা এবং আইনি সহায়তা দেয়া হয়েছে। সমাজে পুনর্বাসন করা হয়েছে। জমি কিনে, ঘর বানিয়ে, সেলাই মেশিন দিয়ে, আর্থিক সাহায্য দিয়ে বিভিন্ন উপায়ে তাদের আয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারা যেন পরিবারের বোঝা না হয়ে রোজগার করতে পারে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, এই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। নিয়মিতভাবে এসিড সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রচার আন্দোলন করা হয়। এই সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে জেলা ভিত্তিক সমাবেশ ও র‍্যালিও অনুষ্ঠিত হয়। 'প্রথম আলোর' প্রতিনিধিরা এতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই আন্দোলনের সাথে বিভিন্ন সময়ে যোগদান করে একে শক্তিশালী করেছে কিছু সংখ্যক কিশোর এবং যুবক। তারা সাইকেলে চড়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায়, গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে এসিড সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করতে সহযোগিতা করেছে। তাদের এ অবদান অমূল্য। সকল সৎকর্মের জন্য প্রয়োজন একাগ্রতা, সদিচ্ছা এবং কমিটমেন্ট। এসিড দগ্ধদের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য 'প্রথম আলোর' এই কমিটমেন্টকে আমি স্বাগত জানাই।

ইউনিসেফে সাড়ে সতেরো বছর

রীনির দীর্ঘ প্রতীক্ষা

১৯৭৯ সালের মে মাসে ইউনিসেফ ঢাকা অফিসে যোগ দিলাম। আমি যখন সমাজকল্যাণ বিভাগে মাতৃকেন্দ্র নিয়ে ব্যস্ত তখন রীনি জেরার্ড প্রায়ই সেগুনবাগিচায় আমার অফিসে আসতেন। তিনি তখন ইউনিসেফে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত এবং নারী উন্নয়ন কর্মসূচির প্রধান। মাতৃকেন্দ্র সম্পর্কে প্রায়ই আমার সঙ্গে আলোচনা করতেন। মাঝে মাঝে মাঠ পর্যায়েও যেতেন এই কর্মসূচি দেখার জন্য। কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর সাথে আমার বেশ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। রীনি একজন ফরাসি। কিছুটা ভাবপ্রবণতাও তার মধ্যে কখনও কখনও লক্ষ্য করেছি।

একদিন রীনি আর আমি আমার অফিসে মাতৃকেন্দ্র বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। এমন সময় একজনের কাছে খবর পেলাম আমাদেরই একজন জুনিয়র এবং বহিরাগত সহকর্মী (সমাজকল্যাণ বিষয়ের নয়) দু' বার প্রমোশন পেয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা ভারতে চলে গিয়েছিল তাদেরকে তদানীন্তন সরকার এক সঙ্গে দুটি প্রমোশন দেয়ার ঘোষণা দেয়। এই ব্যবস্থাকে আমার অযৌক্তিক মনে হয়েছিল। আমাদের মত যারা ওপারে যেতে পারেনি, প্রতি মুহূর্তে এখানে মৃত্যুর সাথে লড়াই করে বেঁচেছিল এবং মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সহায়তা করেছে, তারা কি তবে এইভাবে পেছনে পড়ে থাকবে। কেবল ওপারে যাওয়ার সার্টিফিকেট নিয়ে অনেক জুনিয়ররা সিনিয়র হয়ে যাবে। তবে কি দক্ষতার কোন মূল্য নেই। কঠোর পরিশ্রম এবং একাগ্রতার কোন মূল্য নেই। যারা তিলে তিলে জীবনের অনেক মূল্যবান সময় কাজের পেছনে ব্যয় করেছে, তাদের কোন স্বীকৃতি নেই। বিনা অপরাধে আমরা সিনিয়রিটি হারাবো কেন। এসব কথা চিন্তা করে খুব হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়লাম। তখন মনে পড়ল আগের কথা। একবার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ঘোরপ্যাঁচে পড়ে সিনিয়রিটি হারিয়েছি। আবার বিনা দোষে হারাতে বসেছি। কতবার এই ধরণের অন্যায়ের শিকার হওয়া যায়। তখন আরবান কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের (ইউ.সি.ডি) অফিসার সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল। অন্যদিকে মেডিকেল সোস্যাল ওয়ার্ক এবং প্রোবেশন সার্ভিসে অফিসারের সংখ্যা ছিল ইউ.সি.ডির প্রায় এক তৃতীয়াংশের মত। পাবলিক সার্ভিস কমিশন নিজের সুবিধার জন্য ছোট দলগুলোর ইন্টারভিউ আগেই সেরে নেয়। অথচ আমরা (ইউ.সি.ডি) প্রায় সকলেই তাদের চেয়ে বছর খানেক আগে চাকরিতে যোগ দিয়েছি। পাবলিক সার্ভিস কমিশনে

ছোট দলগুলো আগে ইন্টারভিউ দিয়েছে, এই সুযোগ নিয়ে তারা সিনিয়র হয়ে যায়। চাকরিতে এক বছর সিনিয়র হওয়া সত্ত্বেও প্রমোশনের বেলায় আমাদের জুনিয়র হিসেবে দেখানো হয়। সেদিন ইউ.সি.ডি অফিসাররা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ করেছিল। কিন্তু তার কোন প্রতিকার হয়নি। তখন মন ভেঙ্গে গেল। স্থির করলাম চাকরি ছেড়ে দেবো।

রীনির বুঝতে বাকী রইলোনা, আমার কোন একটা অসুবিধা হয়েছে। আমাকে জিগ্যেস করলেন, কী হয়েছে? হঠাৎ রাগের মাথায় তাকে বলে ফেললাম জুনিয়রদের অধীনে চাকরি করা সম্ভব নয়। যদিও আমার মত একজন সিনিয়র অফিসার হয়ে একজন বিদেশী ইউ.এন কর্মকর্তার সামনে এ ধরণের উক্তি করা সমীচীন ছিলনা। হয়তোবা বহু পুঞ্জীভূত যন্ত্রণার পরিণতি।

একদিকে এই হতাশা, অপরদিকে মাতৃকেন্দ্রের ব্যাপক সাফল্য। এই দুইয়ের বোঝা আর আশা নিয়ে দোদুল্যমান অবস্থায় দিন কাটতে লাগল। রীনির কাছে একদিন শুনলাম ইউনিসেফ নারী উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য একজন বাংলাদেশী অফিসার নিযুক্ত করার কথা চিন্তা করছে। আমি আগ্রহী হবো কিনা জানতে চাইলেন রীনি। কোন কিছু চিন্তা না করেই বলে ফেললাম, অবশ্যই।

মাঝে অনেক সময় গড়িয়ে গেল। একদিন ইউনিসেফ অফিস থেকে টেলিফোন পেলাম আমি যেন ডা. মাইকেল আরউইনের সাথে দেখা করি। ১৯৭৮ সাল। তিনি তখন বাংলাদেশে ইউনিসেফের রিপ্রেজেনটেটিভ। নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলাম। ডা. আরউইন এবং রীনি জেরার্ড জানতে চাইলেন আমি ইউনিসেফে কাজ করতে আগ্রহী কিনা। কবে নাগাদ যোগদান করতে পারবো ইত্যাদি। মনের কোণে দারুণ বেদনা অনুভব করলাম। বললাম, মাতৃকেন্দ্র আমার সন্তানতুল্য। তাকে এই শৈশব অবস্থায় ছেড়ে আসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই শিশু যতদিন হাঁটতে পারবেনা ততদিন তাকে ছাড়তে পারবো না। অশেষ শ্রম ও নিষ্ঠায় আমি এই মাতৃকেন্দ্র গড়ে তুলেছি। বছরখানেক পর চিন্তা করে দেখবো আসলেই মাতৃকেন্দ্র ছেড়ে আসা আমার পক্ষে সম্ভব কিনা। আমি নাও আসতে পারি। ডা. আরউইন শুধু বললেন, তোমার এই একনিষ্ঠতার প্রশংসা করি। তুমি ইউনিসেফে না আসলেও দুঃখ করবোনা। সম্ভব হলে আমাদের সাথে কনসালটেন্সি করতে পারো। আমি বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

এরমধ্যে আমি মাতৃকেন্দ্রের কাজে আরো অধিক জড়িয়ে পড়েছি। লক্ষ্য মাত্রা স্থির করেছি। এবং তা অর্জন করার জন্য অবিরাম পরিশ্রম করছি। কিছুটা গুছিয়েও নিয়েছি। দেখতে দেখতে বছর কেটে গেল। ঠিক এক বছর পর ডা. আরউইনের অফিস থেকে আবার টেলিফোন পেলাম ইন্টারভিউ দেয়ার জন্য। অবাক হলাম এদের সময়-সচেতনতা দেখে। খুশি হলাম এই ভেবে যে আমি পরম সৌভাগ্যবান। আশাতীতভাবে এই সম্ভাবনা দেখা দিলো দ্বিতীয়বার। রীনি আমার জন্য পুরো এক বছর অপেক্ষা করেছেন। ইন্টারভিউ বোর্ডে ছিলেন ডা. মাইকেল আরউইন, তার ডেপুটি কুনিও ওয়াকী এবং রীনি জেরার্ড। তাঁদের প্রশ্ন বেশিরভাগই মাতৃকেন্দ্রকে ঘিরে। এক পর্যায়ে জিগ্যেস করলেন আমার এই সাফল্যের কারণ কি। উত্তরে বললাম, আমার বস্ ভাগ্য। তাঁরা

Pioneer in village based website

আমাকে নিজের মত কাজ করার অগাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন। প্রচুর উৎসাহ দিয়েছেন। যখন প্রয়োজন সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন। এছাড়া আমার কঠোর পরিশ্রম এবং কমিটমেন্ট। এই ব্যাপারে মাহবুবের সহযোগিতার কথাও উল্লেখ করলাম।

ইন্টারভিউ শেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম। কুনিও ওয়াকী সিড়ি দিয়ে নেমে এসে আমাকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। বাইরে আসতেই দেখলাম মাহবুব গাড়ি নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। কুনিও তাকে দেখেই উৎফুল্ল হয়ে বললেন—You must be a lucky man. Your wife has been praising you all the time.

এই সময় আমাদের ডাইরেক্টর ছিলেন ড. মিজানুর রহমান শেলী। তিনি আমার এই সাফল্যে অত্যন্ত খুশি হলেন। পরের উন্নতিতে আনন্দিত হওয়ার জন্য যে উদারতা দরকার তা শেলীর মধ্যে ছিল অত্যন্ত প্রবল। পরে জানতে পারলাম আমি নির্বাচিত হয়েছি। অফার লেটার পেলাম। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র নেয়া বেশ সময় সাপেক্ষ। এই আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়া জটিলও বটে। সাড়ে আঠারো বছরের সরকারি চাকরি জীবনে এই আমলাতান্ত্রিক জটিলতাকে আমাদের সার্বিক উন্নয়নের পরিপন্থী বলে আমার সব সময় মনে হয়েছে। পদে পদে মানুষকে অবিশ্বাস করার যে প্রবণতা তা প্রতিনিয়ত ঔপনিবেশিক মানসিকতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। শাসন কার্যের সঙ্গে সাধারণ মানুষের এক বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করে। এই ব্যবস্থা সহজকে কঠিন করে তোলে। অকারণে সময়কে দীর্ঘায়িত করে। বিচার দীর্ঘায়িত হলে সাধারণত সুবিচার পাওয়া যায়না। এই সমস্যা বহুল আলোচিত। কিন্তু এর সংস্কার এখনো হয়নি। স্বাধীন দেশে কি করে অধীন দেশের মতো একটি শাসন ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকবে, কার স্বার্থে এবং কেন, এখনও তা বুঝে উঠতে পারিনি।

Pioneer in village based website

যাহোক, প্রথমে দু'বছরের জন্য লিয়নে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছি। প্রত্যেকের টেবিলে বেশ কয়েকবার আমাকে যেতে হয়েছে ফাইল ফলো-আপ করার জন্য। সমাজকল্যাণ বিভাগ এবং মন্ত্রণালয়ে সকলে আমাকে যথেষ্ট সহযোগিতা করা সত্ত্বেও তিন মাসের মতো সময় লেগেছে এই ছাড়পত্র পেতে।

ইউনিসেফ ও সরকারি নিয়ম-কানুনে পার্থক্য

তখন ইউনিসেফ অফিস ধানমন্ডিতে, কয়েকটি বিল্ডিংয়ে ছড়িয়ে। আমার অফিস ছিল সড়ক নম্বর ৪/এ-তে নিচতলায়। এদিকে বাংলাদেশে রীনির কনট্রাক্ট প্রায় শেষ। রীনি এবং আমি মাস দু'য়েক একসাথে কাজ করার কথা, যেন আমার কিছুটা প্রশিক্ষণ হয়, এজন্য এই ব্যবস্থা। কার্যত তা হলোনা। আমি যোগদান করার পর থেকেই রীনি প্রায় দেশের বাইরে। যে কয়দিন ঢাকায় ছিল তা-ও আবার যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত। আমাকে যেন একটা সমুদ্রে নিক্ষেপ করে তিনি চলে গেলেন। রীনি এখন প্যারিসে বাস করেন। নারী উন্নয়ন নিয়ে ব্যস্ত। সম্প্রতি নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ফরাসি সরকার ন্যাশনাল এওয়ার্ড দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেছে। প্রতি বছর তাঁর কর্মতৎপরতা

সম্পর্কে আমাকে জানান। যতই বয়স বাড়ছে ততই তাঁর কর্মশক্তি যেন বেড়ে চলেছে। তার অফুরন্ত জীবনীশক্তি দেখে আমিও নিজের কাজকর্মে দারুণ উৎসাহ পাই।

আমাদের সরকারি ব্যবস্থা এবং ইউনিসেফের নিয়ম-কানুনের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। সরকারি অফিসে আমি টেবিলে বেল বাজিয়ে পিয়নকে ডাকতাম। প্রত্যেক কর্মকর্তার জন্য এক এক জন পিয়ন। পিয়ন এলে তাকে দিয়ে আমার পি.এ কে (পারসনাল এসিসটেন্ট) ডাকাতাম। পি.এ আসলে তাকে ফাইল নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ আবার আসতে বলতাম। এভাবে নিজের অগোচরে প্রত্যেকের অনেক সময় অপচয় করতাম। কিন্তু এর চেয়ে বেশি দাম দিতাম আমার চেয়ারকে। এই চেয়ারে বসে নিম্নস্থ কর্মচারীর টেবিলে যাওয়াকে প্রচলিত ব্যবস্থায় পদমর্যাদা হানিকর বলে মনে করা হয়। যে কোন কাজ করার জন্য আমরা সাধারণত নিম্নপদস্থ কর্মচারীর ওপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়তাম। কাগজপত্র তারাই প্রস্তুত করে দিতো। আমরা কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দিতাম এবং তা মনিটর করতাম। কোন সভা-সমিতিতে গেলে তারা আগে গিয়ে প্রথম সারিতে আমাদের জন্য চেয়ার নির্দিষ্ট করে রাখতো। এইসব বিধান ভাঙতে গেলে সনাতনী ব্যবস্থায় একটা জট লেগে যায়। সেই জট খোলা আমাদের পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব হতো না। কাজেই এই ব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে আমাদের কাজ করতে হতো। এই রকম পরিবেশে আমার সাড়ে আঠার বছর কেটেছে। কোন কোন সময় এর থেকে বের হয়ে আসার প্রচেষ্টা যে করিনি তা নয়। তবে সর্বক্ষেত্রে সফল হইনি।

একবার সরকারি চাকরিতে ঢুকলে তার আর চাকরি হারাবার সম্ভাবনা খুবই কম। যদি যায়ও, সেই প্রক্রিয়া সুদীর্ঘ। কতগুলো অবাঞ্ছিত এবং সময় অনুপযোগী নিয়ম ও বিধিনিষেধ আমাদের প্রশাসনে ব্যক্তি উদ্যোগ ও ব্যক্তি সিদ্ধান্তের স্বাধীনতাকে খর্ব করে। এই কারণে বিবেকের শাসনকে অস্বীকার করে অনেক সময় নিয়মের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে জনস্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্ত নিতে হয়, যা উন্নয়ন এবং প্রগতি বিরোধী, যা সময়ের গতিকে নিষ্ক্রিয় করে তোলে, কর্মকর্তাদের উৎসাহকে দমিয়ে দেয়। এইভাবে কর্মকর্তারা অনেক সময় সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। আমিও অনেকবার এই মানসিক দ্বন্দ্বের শিকার হয়েছি।

সরকারি চাকরিতে নানা ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কখনো কাগজের অভাব, কখনো ডুপ্লিকেশন করার কালি এবং স্টেনসিল পেপারের অভাব। এগুলোর জন্য আমাদের কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হতো। তখন স্টেনসিল পেপারে টাইপ করে তা ডুপ্লিকেশন মেশিনে ছাপাতে হতো। ট্যুরে যাওয়ার জন্য হয়তো স্থান কাল স্থির হয়েছে কিন্তু অর্থ বরাদ্দ নেই। তাতে বিঘ্ন সৃষ্টি হতো। একাউটেন্ট জেনারেলের অফিস থেকে মাসিক বেতনের চেক পেতে মাসের অর্ধেক চলে যেতো। এসব অসুবিধা সত্ত্বেও আমরা আনন্দে কাজ করতাম। ডেপুটি ডাইরেক্টর হিসেবে আমার প্রকল্প সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা ছিল। এখনও সরকারি কর্মক্ষেত্রে এসব সুবিধা-অসুবিধার বিশেষ কোন সংস্কার বা পার্থক্য হয়েছে বলে মনে হয়না। এত সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েও সরকারি কর্মকর্তারা নিজের কর্তব্য নিয়মিতভাবে সম্পাদন করে থাকেন। তাঁদের সাথে একাত্মতাবোধ করে মাঝে মাঝে বিষণ্নতায় ভুগী।

ইউনিসেফে এসে দেখলাম এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কাজের সময় সহায়তা করার জন্য আগের মত অনেকগুলো হাত এখানে নেই। শুধু একজন সেক্রেটারি আবদুল আউয়াল, একজন সহযোগী কর্মকর্তা আফরীন হক এবং একজন কনসালটেন্ট মেহেরুন্নেসা ইসলামকে নিয়ে রীনি জেরার্ড নারী উন্নয়ন কর্মসূচির সম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেন। এর সাথে আমি যুক্ত হলাম। আগেই বলেছি দু'মাস পর রীনি বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যান। নারী উন্নয়ন কর্মসূচির সম্পূর্ণ দায়িত্ব এসে পড়লো আমার ওপর। এখানে ফাইল নিয়ে নিজে কাজ করতে হয়। তখন কম্পিউটার ছিলনা। তাই কাজের পদ্ধতি বর্তমানের তুলনায় বেশ কিছুটা জটিল ছিল। তাতে অনেক সময়ও লেগে যেতো। কোন কোন সময় সরকারি অফিসে চিঠিপত্র নিজে নিয়ে যেতে হতো। প্রথম দিকে এতে আমার এত দিনের অভ্যস্থ আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নানা রকম নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হতো। সরকারি ছোট চাকরিতে যে ক্ষমতার অধিকারী ছিলাম, এখানে তার বিন্দুমাত্রও নেই। মাঝে মাঝে মানসিকভাবে দুর্বিষহ বোধ করতাম।

এইরূপ ভিন্ন ব্যবস্থায় নিজেকে সঙ্গতিপূর্ণ করতে আমার সচেতন প্রচেষ্টা চালাতে হয়েছে। এই প্রক্রিয়াও বেশ কঠিন। অবশ্য বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণের সুযোগে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, তা আমাকে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

শুধু কাজ শিখেছি

আমি যোগদান করার আগেই রীনি জেরার্ড নারী উন্নয়ন কর্মসূচি নির্ধারণের জন্য বেশ কয়েকটা গবেষণামূলক কাজ করেছিলেন, i. Training For Women in Bangladesh (1977), ii. Feasibility Survey of Income Generating Activities for Women in Bangladesh (1977), iii. Handbook on Simple Technologies for Rural Women, iv. Manual of Food Preservation in Bangladesh এবং v. Situation of Women in Bangladesh (Women For Women, 1979) ইত্যাদি। এই গবেষণাগুলোর ভিত্তিতে তিনি বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে সাতটা প্রকল্পে ইউনিসেফ সাহায্য দিয়েছিলেন। আমি যখন ইউনিসেফে যোগ দিলাম তখনও পাঁচটা প্রকল্প চালু ছিল। প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হচ্ছিল বাংলাদেশ মহিলা পুনর্বাসন ও রিহেবিলিটেশন ফাউণ্ডেশন; ঢাকা এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; বি.আর.ডি.বি মহিলা সমবায় সমিতি; কারিকা-বাংলাদেশ হ্যানডিক্রাফট কোপারেটিভ ফেডারেশন এবং স্বনির্ভর বাংলাদেশের মাধ্যমে।

কারিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পারভীন আহমেদ-এর সঙ্গে কাজ করা শুরু করলাম। তার সাথে একবার উত্তরবঙ্গে ট্যুরে গিয়েছিলাম। মনে পড়ে চলার পথে 'সখের হাড়ি' (গ্রামের মেয়েদের হাতে রং করা মাটির হাড়ি) দেখে পারভীন গাড়ী থামিয়ে দিলো। দেখলেন একে একে সবগুলো। পরিশেষে যিনি মাথায় করে হাড়িগুলো বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তার কাছ থেকে সবগুলো কিনে ফেললেন। বললেন, কারিকার জন্য। এগুলোর মান আরো কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় তার চিন্তাভাবনা করা দরকার। এ রকম

সুক্ষ্ম এবং অনন্য ছিল পারভীনের দৃষ্টিভঙ্গি। বাংলাদেশের এসব লোকশিল্প গড়ে তুলতে তার আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল।

তখন মহিলা পুনর্বাসন ও রিহেবিলিটেশন ফাউণ্ডেশনের একজেকিউটিব ডাইরেক্টর ছিলেন মোশফেকা রহমান। তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেও ফাউণ্ডেশনের পৃথক অস্তিত্ব এবং স্বাধীনসত্তা বজায় রাখতে পারলেন না।

এরমধ্যে শুরু হয়ে গেলো ইউনিসেফের পরবর্তী কান্ট্রি প্রোগ্রামের (১৯৮০-১৯৮২) প্রস্তুতি পর্ব। ইউনিসেফ হেড কোয়ার্টারের নির্দেশ অনুযায়ী এই প্রস্তুতি পর্ব অনেকগুলি ধাপে ক্রমশ এগিয়ে নিতে হয়। জানুয়ারি (১৯৮০) মাসে শুরু করতে হবে বলে পরবর্তী কান্ট্রি প্রোগ্রাম নিয়ে আমি ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

একদিকে আমার আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিজনিত সমস্যা, অন্যদিকে সম্পূর্ণ নতুন নিয়মকানুনে চালিত এসব প্রকল্পের সুষ্ঠু পরিচালনা করার কাজে আমাকে প্রচুর ধৈর্য এবং সংযমের পরিচয় দিতে হয়। এই সময় প্রতি মুহূর্তে আমাকে সাহায্য করেছে আউয়াল এবং আফরীন। পাঁচটা প্রকল্প আসলে তারাই চালিয়েছে ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। আমি তাদের সঙ্গে থেকে শুধু কাজ শিখেছি।

নারী-পুরুষ বৈষম্য

এই সময় অধিকতর জটিল সমস্যার সম্মুখীন হলাম। ইউনিসেফের অভ্যন্তরে দেখলাম নারী উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পর্কে বিভিন্ন সেকশনের কর্মকর্তাদের তেমন স্পষ্ট ধারণা নেই। এই কর্মসূচির সঠিক রূপরেখা বা নির্ধারিত পলিসির অভাবে তাদের চিন্তাধারা ভিন্ন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত। বেশির ভাগ কর্মকর্তা মনে করেন নারী উন্নয়নের কাজ নিয়মিতভাবে পরিচালিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানি ও পরিবেশ ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে এমনিতেই হবে। কেউ কেউ মনে করেন, ইউনিসেফের কর্মসূচিতে নারী উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার দরকার নেই। আবার কেউ ভাবেন এসব কর্মসূচিতে নারীদের সমস্যাগুলো বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করা দরকার। প্রকৃতপক্ষে নারী উন্নয়ন কর্মসূচির কোন সুনির্দিষ্ট অবস্থান তখনো ছিল না। ইউনিসেফের বিভিন্ন প্রোগ্রাম সেকশনের প্ল্যানিং প্রক্রিয়ায় আমাদের কোন রকম সংশ্লিষ্টতাও ছিল না। তাদের সেকশনে নারী উন্নয়ন বিষয়ক যে সকল বিশেষ কর্মসূচি ছিল যেমন ম্যাটারনাল হেলথ, মেয়ে শিশুর শিক্ষা ইত্যাদির সংগে সমন্বয় করার ব্যাপারে আমাদের কোন সুযোগ ছিল না। সেগুলো পর্যবেক্ষণ কিম্বা মনিটরিং করার কোন উপায়ও আমাদের ছিল না। নারী উন্নয়ন ইউনিট যেন একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ।

উল্লেখ্য, এই সময় ইউনিসেফের প্রায় ৩৭৮ জন কর্মচারীর মধ্যে সিংহভাগ ছিল পুরুষ। শতকরা এক দশমিক বিরাশি জন নারী ছিল কেবলমাত্র জেনারেল সর্ভিসের অন্তর্ভুক্ত। শুধু আমি একজন প্রফেশনাল অফিসার (১৯৭৯)। একজন নারী হয়ে ইউনিসেফ নারী-উন্নয়ন কর্মসূচির প্রধান হিসেবে আমি যোগদান করলাম, এটা হয়তো কোন কোন অফিসারের পছন্দ হয়নি। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা মনে পড়লো। একবার আমরা টাঙ্গাইলে জেলা পর্যায়ের একটা সরকারি মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করার জন্য

গিয়েছিলাম। তাতে ঢাকা থেকে ইউনিসেফের বেশ কয়েকজন সেকশন প্রধান এবং দু'জন অফিসার ছিলেন। পরিচয় পর্বে ইউনিসেফের তরফ থেকে আমাদের একজন অফিসার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, এবং পানি ও পরিবেশ কর্মসূচির প্রধানদেরকে সঠিক টাইটেলসহ অর্থাৎ প্রোগ্রাম চিফ হিসেবে পরিচয় করালেন। তারা সকলে বিদেশী এবং পুরুষ। আমিই একমাত্র বাংলাদেশী, নারী এবং একজন সেকশন প্রধান। অথচ আমাকে পরিচয় করানো হলো অত্যন্ত সাধারণভাবে একজন অফিসার হিসেবে ।

তখনো ইউনিসেফের পরিবেশ আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন। আমি খুব অবাক হলাম। যিনি পরিচয় করালেন তিনি হয়তো সহজে গ্রহণ করতে পারেননি যে একজন পুরুষ হয়ে তার চেয়ে আমার অর্থাৎ একজন সদ্যাগত নারীর পদমর্যাদা বড়। ইউনিসেফেও কি তবে নারী-পুরুষের মধ্যে এ ধরণের বৈষম্য করা হয় ? মনে মনে খুবই অপমানিত বোধ করলাম। আমার পাশে বসেছিলেন আমাদের কনসালটেন্ট স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ মেহেরুন্নেছা ইসলাম। তিনিও খুব বিব্রতবোধ করলেন। সেই মুহূর্তে ভাবলাম প্রথম থেকে যদি এর প্রতিবাদ না করি তবে এইভাবে সব সময় বৈষম্যের শিকার হতে হবে। এবং এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে আমাদের নারী উন্নয়ন কর্মসূচির ওপর। এই কর্মসূচি সবসময় পেছনে পড়ে থাকবে। আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারবো না। আমাকে সনাতনী নারীর মতো চুপ করে থাকলে চলবেনা। তাই সাহস করে মুখ খুললাম। যে অফিসার আমাদের পরিচয় করালেন তার কাছে তখনি একটা চিরকুট পাঠালাম। তাতে লিখলাম, আমার টাইটেল নারী-উন্নয়ন কর্মসূচি প্রধান। অনুগ্রহ করে আপনার ঘোষণা সংশোধন করেন। তিনি তখন লজ্জিত হয়ে আমাকে আবার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

এভাবে নারী হিসেবে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে, শুধু ইউনিসেফে নয়, সরকারে চাকরিরত থাকতেও।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী কান্ট্রি প্রোগ্রামে নারী উন্নয়ন কর্মসূচি তৈরি করা আমাদের পক্ষে ছিল অত্যন্ত কঠিন। এমনি নাজুক পরিস্থিতি থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রয়াসে তখন আমি হন্যে হয়ে কিছু নারী উন্নয়ন প্রকল্প খুঁজছিলাম। কিভাবে এই ধোঁয়াটে ধারণাকে একটা বাস্তব রূপ দেয়া যায়, এই নিয়ে রাত দিন আমার চিন্তার শেষ ছিল না। মনের মধ্যে শুধু প্রতিধ্বনিত হতো যাওয়ার বেলায় রীনি আমাকে যা বলে গেছেন : Jowshan, a Senior National Officer with your experience can contribute a lot. I am leaving Women's Development Programme with you. Hold the WiD string strongly and never do away with your principles. রীনির এই কথাগুলো এবং তাঁর কাজ আমাকে সবসময় প্রেরণা যুগিয়েছে।

গ্রামীণ ব্যাংকের সঙ্গে ইউনিসেফের প্রথম সংযোগ

এই বিশেষ সমস্যাসঙ্কুল সময়ে একদিন দেখা হয় গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সাথে। তিনি তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি পড়ান। গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্পের পরিচালক। চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া, মিরসরাই এবং হাটহাজারী থানায় তখন

এই প্রকল্পের পরীক্ষামূলক কাজ চলছে। কথা প্রসঙ্গে ইউনূস ভাইকে বললাম, চট্টগ্রামে কলেজ জীবনে একসাথে কাজ করেছি। এখন ইউনিসেফ থেকে নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে আবার আপনার সঙ্গে কাজ করতে চাই। তিনি আমাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, ভালো কথা। আসেন একসঙ্গে বসে আলোচনা করি।

আমি তখন ধানমণ্ডি ৩১ নম্বর রোডে ৭০৪ নম্বর বাড়ির নিচতলায় থাকি। সেখানে প্রায়ই সন্ধ্যায় আমরা আলোচনায় বসতাম। ইউনূস ভাই আমাকে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্পের উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিশদভাবে বোঝালেন। ভূমিহীন নারীরা দলবদ্ধ হয়ে কিভাবে ঋণ নেয়, সময়মত পরিশোধ করে, সেই ঋণের পয়সা খাটিয়ে কিভাবে পরিবারের সদস্যরা দু'বেলা খেয়েও কিছু পয়সা সঞ্চয় করে ইত্যাদি বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করেন। এই প্রসঙ্গে আমি জানতে চাইলাম কেবলমাত্র আর্থিক উন্নয়ন দিয়ে কি তাদের সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব? আর্থিক উন্নয়নের সাথে সাথে বিশেষ করে তাদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, নিরাপদ পানি, শিশু-যত্ন ইত্যাদির দিকেও দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। এ ব্যাপারে হয়তো ইউনিসেফ গ্রামীণ ব্যাংকের সাথে সহায়তা করতে পারে। আপনি চিন্তা করে দেখুন। এই পর্যায়ে ইউনূস ভাই বললেন, আগে আপনি চট্টগ্রামে গিয়ে গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মসূচি দেখে আসুন, তারপর আলোচনায় বসা যাবে। আমি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলাম। যে কোন প্রকল্পের প্রস্তুতি পর্বে নিজের চোখে দেখে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করার মত কোন বিকল্প নেই।

যথাসময়ে চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানায় উপস্থিত হলাম। সেখানে যেতেই গ্রামীণ ব্যাংকের দু'জন নারী কর্মী নূরজাহান ও জান্নাতের সাথে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য হয়। আর সময় নষ্ট না করে তাদের সাথে গ্রামের পথে রওনা হলাম। সেখানে ইতোমধ্যে ভূমিহীন নারীরা দল গঠন করেছে। ব্যাংক থেকে ঋণ নিচ্ছে। তা পরিশোধ করছে। এবং তারা তার কিছু কিছু ফলও পেতে শুরু করেছে। মেয়েরা অত্যন্ত শৃংখলার সঙ্গে দলসভা করছে। ঋণ নেয়া এবং পরিশোধ করার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে আলোচনা করছে। দেখে আশ্চর্য হলাম। তারা লেখাপড়া জানেনা কিন্তু যথেষ্ট বুদ্ধির অধিকারী। তাদের হিসাব-দক্ষতা দেখে চমৎকৃত হলাম। কত টাকায় কত সুদ আসবে, কত দিনে শোধ করতে হবে, ইত্যাদি অনর্গল বলে গেল। নূরজাহান বললো, দল গঠন করার সাথে সাথে এ ব্যাপারে তাদের এক সপ্তাহ ধরে বোঝানো হয়। কিন্তু এই আলোচনার বিষয়বস্তু রপ্ত করে কাজে লাগাতে তাদের যথেষ্ট কষ্ট করতে হয়।

এরকম কয়েকটা দলের কর্মসূচি দেখলাম। কয়েকজন সদস্যের বাড়িতে গেলাম। তারা রোজগার করছে। নিজের হাতে নিজের রোজগারের টাকা স্পর্শ করছে। টাকা গুণছে। হিসাব করছে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজের ওপর আস্থা স্থাপন করছে। নিজের দক্ষতা সম্পর্কে বিশ্বাস অর্জন করছে। সেই বিশ্বাসের আলোতে ঝলমল করছে তাদের মুখ। এ এক অপূর্ব দৃশ্য। এর মুখোমুখি না হলে বিশ্বাস করা দুরূহ। এগুলো কোন রূপকথার কাহিনী নয়, বাস্তব সত্য।

এদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার মনে অসংখ্য প্রশ্নের ভিড় জমলো। কিভাবে এসব মেয়েদের আরো শক্তিশালী করা যায়। কিভাবে তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি,

সেনিটেশন ইত্যাদির উন্নতি করা যায়। কিভাবে তাদের শিশুদের অবস্থার উন্নতি করা যায়। কিভাবে তাদের সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা যায়। কিভাবে তাদের কাছে এই সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য ও খবর পৌছে দেয়া যায়। কোন্ কৌশল অবলম্বন করলে তাদের আর্থিক উন্নয়নের সাথে সামাজিক উন্নয়ন সম্পৃক্ত করা সম্ভব। এসব কথা ভাবতে ভাবতে আর এক পৃথিবী যেন প্রতিভাত হলো আমার সামনে। তৃণমূল নারীদের সাথে একাত্মতা অনুভব করলাম। একটা আত্মবিশ্বাস এবং অঙ্গীকারের পৃথিবীতে নিজেকে দেখতে পেলাম। একরাশ আশায় আশান্বিত হলাম। তাদের কর্মসূচি দেখে দেখে দিন কেটে গেল। নূরজাহান আমাকে তাদের বাসায় যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালো।

তিনজন নারী 'একা'

হাটহাজারীর প্রধান সড়কের ওপর ইউনিসেফের গাড়ি রেখে নূরজাহান, জান্নাত এবং আমি একটা রিকশায় চড়লাম তাদের বাসার উদ্দেশ্যে। মাঝখানে আমি আর দু'পাশে ওরা দু'জন। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। ধান ক্ষেতের মধ্য দিয়ে আঁকা বাঁকা পথে তিন জন গল্প করতে করতে মনের আনন্দে চলেছি। তিনজন নারী "একা" (কোন পুরুষ সঙ্গী ছাড়া) সন্ধ্যায় কোথাও যাওয়া সাধারণত আমাদের দেশে গ্রামীণ পরিবেশে দেখা যেতো না। কিন্তু আমরা মুক্ত বিহঙ্গের মত পথ চলছিলাম। মনে হলো, আমরা স্বাধীন। আমাদের বাধা দেয়ার কেউ নেই।

এমন বিরল মুহূর্তে হঠাৎ আমার পাশে উপবিষ্ট দুই জনের হাতের মৃদু কম্পন অনুভব করলাম। নূরহাজান আমার কানে চুপি চুপি বলল, আমাদের সামনে একজন জাঁদরেল মহাজন আসছে। এরা আমাদেরকে তাদের শত্রু মনে করে। এই মহাজন যদি জানে আমাদের ব্যাগে গ্রামীণ ব্যাংকের নারী সদস্যদের ঋণ শোধের টাকা আছে, তাহলে আক্রমণ করতে পারে।

আমি তাদের ভরসা দিলাম। নির্ভয়ে থাকতে বললাম। যদিও মনে মনে ভীত হলাম অজানা আশঙ্কায়। আগে গল্প শুনতাম মহাজনদের অত্যাচার সম্পর্কে। উচ্চ সুদের হারে গরিবদের কাছে তারা টাকা লগ্নি করতো। সেই টাকা যখন সুদে-আসলে বড় অংকে পরিণত হতো, তখন মহাজনরা অনাদায়ী ঋণের বদলে তাদের বাড়ি-ভিটে দখল করে নিত। জোর করে টিপ সই নিয়ে তাদের জমি কেড়ে নিত। কারো অল্প বয়স্ক সুন্দরী মেয়ে থাকলে বৃদ্ধ মহাজনরা জোরপূর্বক বিয়ে করে তাদেরকে মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেত।

গ্রামে কাজ করতে গিয়ে এসব গল্পের সত্যতার কিছু প্রমাণ পেলাম। নূরজাহান ভাবতো গ্রামের এই অত্যাচারী মহাজনদের কবল থেকে কি করে নিরুপায় নারীদের রক্ষা করা যায়। কতো শিগ্‌গির গ্রামীণ ব্যাংকের আওতায় এনে তাদের ক্ষমতায়ণ করা যায়। কিভাবে মহাজনদের সংঘবদ্ধ শক্তিকে ভেঙে দেয়া যায়। সেদিন নূরজাহান বলেছিল, এই পথ অনেক কন্টকাকীর্ণ, দুর্গম, সময় সাপেক্ষ। তবে প্রফেসর ইউনূসের নিয়মিত নির্দেশনা এবং নেতৃত্ব পেলে ভবিষ্যতে এমন একদিন আসবে যেদিন গ্রামীণ ব্যাংকের

Unnati.com
Pioneer in Village based Website

ভূমিহীন নারী সদস্যরা দলবদ্ধভাবে সংগঠিত হবে। এবং এক বিরাট শক্তিতে পরিণত হবে। সেই বিশাল শক্তির কাছে মাথা নত করবে আজকের এই মহাজনরা। আমরা সেই দিনের অপেক্ষায় আছি।

নূরজাহানের কথাগুলো মন্ত্রের মতো বিমুগ্ধ হয়ে শুনলাম। কিছুটা বিশ্বাস করলাম। আবার দ্বিধাগ্রস্থ হলাম। এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে একসময় নূরজাহানদের বাসার সামনে এসে আমাদের রিকশা থামলো। পাকা দেয়ালের টিনের ছাউনি দেয়া একটি ঘর। এক পাশে একটা কাঠের চকি। ঝকঝকে পরিষ্কার চাদর পাতানো বিছানা। তাতে সুন্দর এম্ব্রয়ডারি করা কভার দেয়া নূরজাহান ও জান্নাতের দু'টো বালিশ। এক কোণায় একটি কেরোসিনের চুলা, দু'তিনটা টিনের বাসন এবং অতি প্রয়োজনীয় রান্নার তৈজসপত্র। আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে একজন চুলায় ভাত বসালো। আরেকজন বাড়িওয়ালীর সাহায্যে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের খাবার পরিবেশন করলো। দিন শেষের ক্লান্তি তাদেরকে একটুও অবসন্ন করেনি। এমন দুর্বার শক্তি দেখে চমৎকৃত হলাম। বোধকরি গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মীরা এমনই এক অভাবনীয় উপাদান দিয়ে তৈরি।

খেতে খেতে নূরজাহান এবং জান্নাতের গল্প শুনলাম। তারা দু'জনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ পাশ করে এই চাকরিতে ঢুকেছে। নূরজাহান বললো, আমি যে গ্রামে ভূমিহীন নারীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজ করি, তাদের মধ্যে দল গঠন করি, ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করি, মহাজনদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করি, এসব কথা আমার মা-বাবা-ভাইবোন কেউ জানে না। তাদের কাছে এই কথা প্রকাশ করিনি। তারা জানলে আমাকে এই চাকরি করতে দেবেনা। গ্রামে এই ধরণের কাজ করি শুনলে নিদারুণ বদনামের ভাগী হতে হবে। গ্রামের মধ্যে দু'জন মেয়ে স্বাধীনভাবে থাকি, এটাও মা-বাবা পছন্দ করবেন না। তাই আমরা মা-বাবাকে বলেছি আমরা গ্রামীণ ব্যাংকের অফিসার, শুধু অফিসে বসে কাজ করি।

Pioneer in village based website

কথাগুলো শুনে নূরজাহান এবং জান্নাতের জন্য মনটা সহানুভূতি এবং সহমর্মিতায় ভরে উঠলো। কি কঠিন প্রতিকুল অবস্থার মাঝে তাদের প্রতিনিয়ত কাজ করতে হয়। কি প্রগাঢ় প্রত্যয় নিয়ে তারা কর্তব্য সম্পাদন করে চলেছে। একদিন এদের জয় হবেই।

সেই থেকে আমিও গ্রামীণ ব্যাংকের সাথে কাজ করে চলেছি। তাদের ঋণ কর্মসূচির সাথে নারী ও শিশুদের সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পৃক্ততায় ইউনিসেফের তরফ থেকে সহযোগিতা করেছি দীর্ঘদিন। সময় গড়িয়ে গেছে। দুই দশক পার হয়ে গেছে। আমরা এখন একবিংশ শতাব্দীর প্রথম মাসে। নূরজাহান এবং জান্নাতের সাথে আমার যখন হাটহাজারীতে প্রথম দেখা হয় (১৯৭৯) তখন তারা দু'জনেই গ্রামীণ ব্যাংকের সাধারণ কর্মী ছিল। ছালেহা বেগমও একজন কর্মী হিসেবে কাজ করতো। এখন নূরজাহান গ্রামীণ ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার। স্তরে স্তরে তার পদোন্নতি হয়েছে। সে আজ ব্যবস্থাপকদের মধ্যে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। সমাজে এবং ব্যক্তিগত জীবনে সে সুপ্রতিষ্ঠিত। জান্নাত গ্রামীণ ব্যাংকের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার। সে আজ কসভোতে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্পের নেতৃত্ব দিচ্ছে। দেশ-বিদেশে গ্রামীণ ব্যাংকের সুনামের

অংশীদারদের মধ্যে নূরজাহান ও জান্নাতের স্থান অন্যতম। সালেহা এখন গ্রামীণ ব্যবসা বিকাশের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। আত্মবিশ্বাসে তারা প্রদীপ্ত।

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মী হিসেবে যদি তাদের হাতেখড়ি না হতো, যদি গ্রামে ঘুরে ঘুরে ভূমিহীন নারীদের জীবন-বৃত্তান্ত পর্যালোচনা করতে না পারতো, যদি তাদের অভিজ্ঞতার ভান্ডার এভাবে প্রসারিত করার সুযোগ না পেতো, তাহলে কি তারা এই স্তরে পৌছতে পারতো? আজ তারা সকলের গৌরব। তাদের মা-বাবাদের গৌরব। আজ তারা গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিহীন নারী সদস্যদের ক্ষমতায়নের কথা মা-বাবাদের জানাতে গর্ব অনুভব করে।

প্রফেসর ইউনূসের সাথে

ইতোমধ্যে প্রফেসর ইউনূস চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি নিয়ে টাঙ্গাইলে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তখন আকুরটাকুর গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্পের অফিসে আমি তাঁর সাথে আবার দেখা করলাম। সেখানেও কয়েকটি এলাকা ঘুরে দেখলাম। মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে ইউনূসের সাথে আলোচনায় বসলাম।

একদিন তাঁকে বললাম, ইউনিসেফ গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্পকে কিভাবে সহায়তা করতে পারে, এই ব্যাপারে একটু ভেবে দেখুন।

প্রফেসর ইউনূস : বিভিন্ন সরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে আমরা কাজ করছি। আর কিছু দরকার আছে কিনা এখনো ভাবিনি।

জওশন রহমান : যারা আপনাদের প্রকল্পের মাধ্যমে ঋণ নিয়েছে তাদের সামাজিক উন্নয়নও দরকার। তাদের জন্য আর্থিক কর্মসূচির সাথে সামাজিক উন্নয়ন সম্পৃক্ত করার কথাও আমরা ভাবতে পারি। এ সম্পর্কে কিছু প্রশিক্ষণ দেয়া যায়।

প্র. ই : চিন্তা করে দেখি কি করা যায়।

জ. র : যা করতে চান তা যদি লিখিতভাবে পাওয়া যায় এবং তার সাথে কি দরকার হবে তাও জানতে পারলে ভালো হয়। তাহলে আমি আমাদের কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভের সাথে আলোচনার সূত্রপাত করতে পারি। গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের সামাজিক উন্নয়নের ব্যাপারে ইউনিসেফ আগ্রহী হবে বলে আমার ধারণা।

প্র.ই : গ্রামীণ ভূমিহীন নারীদের ওপর আমাদের কোন ধারণা চাপানো উচিত বলে আমি মনে করি না। তারা তাদের ছন্দে চলবে। কিভাবে তাদের উন্নতি হবে তারাই তা নির্ধারণ করবে।

জ. র : আমি আপনার সাথে একমত।

প্র. ই : স্থানীয়ভাবে ছোট ছোট ওয়ার্কশপে এনে তাদের একত্রিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়া যায়। এখানে বসে তারা তাদের সমস্যা, ভুল-ত্রুটি এবং সাফল্যের কথা আলোচনা করতে পারবে। এইভাবে তারা তাদের সামাজিক

উন্নয়নের পথ খুঁজে পাবে। এবং তার পদ্ধতিও তারা নিজেরা বের করতে পারবে।

জ. র : চমৎকার। এতে আমাদের কোন অসুবিধা নেই।

ইউনিসেফের এই নমনীয় মনোভাব এবং ফ্লেক্সিবিলিটি দেখে ইউনূস ভাই খুব খুশি হলেন। এইভাবে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্পের সাথে ইউনিসেফ সহযোগিতার আনুষ্ঠানিক প্রারম্ভ।

এদিকে ইউনিসেফ কান্ট্রি প্রোগ্রাম (১৯৮০-১৯৮২) প্রক্রিয়া জোরেসোরে শুরু হয়ে গেছে। আমাদের রিপ্রেজেনটেটিভ ডা. আরউইন গ্রামীণ ব্যাংকের সাথে কাজ করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ সমর্থন দেবেন বলাতে আমি বেশ উৎসাহিত বোধ করলাম। সিনিয়র স্টাফ মিটিংয়ে একদিন আমি যখন এই আলোচনা তুললাম তখন অনেকেই প্রশ্ন করলেন, গ্রামীণ ব্যাংকের মত একটি আর্থিক লেনদেনের প্রতিষ্ঠানে ইউনিসেফ কিভাবে সহায়তা করতে পারে। ইউনিসেফের জন্য একাজ মোটেই প্রযোজ্য নয় ইত্যাদি। আমি ভীষণ দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়লাম। এই ব্যাপারে অনেকক্ষণ আলোচনা হয়। কিন্তু সকলে একমত হতে পারলেন না। তাই কোন সিদ্ধান্তও নেয়া গেলনা।

অনন্যোপায় হয়ে আমি তখন ডা. আরউইনের সহায়তায় প্রফেসর ইউনূসকে দিয়ে গ্রামীণ ব্যাংক সম্পর্কে ইউনিসেফে একটি লেকচারের ব্যবস্থা করলাম। এতে সকল কর্মসূচির প্রধান এবং প্রোগ্রাম অফিসাররা উপস্থিত ছিলেন। হাটহাজারী থানার জোবরা গ্রামের জরিমনসহ কয়েকজন সদস্যের জীবন কাহিনী বর্ণনা করলেন ইউনূস। সকলকে বুঝিয়ে দিলেন গ্রামীণ ব্যাংক ভূমিহীন নারীদের আর্থিক উন্নয়নের জন্য কত নিবিষ্টভাবে কাজ করে। তাদের কর্ম পদ্ধতিও আলোচিত হলো। এরপর দ্বিমত করার আর কোন অবকাশ রইলো না। আমার এই অধ্যবসায়ের ফল পেলাম। গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্পের পক্ষে সকলে মত দিল।

এখানেই আমি ক্ষান্ত হইনি। আমার মনের মাঝে তখনো যথেষ্ট আশংকা। ইউনূসের এই বক্তৃতার সারাংশ তিনি এবং আমি দু'জনে মিলে লিখলাম। ইউনিসেফের তৎকালীন জার্নাল 'শিশু দিগন্ত', ইস্যু নং-৮, এপ্রিল ১৯৮০ সালে আমাদের যুগ্মনামে এটা ছাপানো হলো। পরবর্তীতে Jobra The Grameen Bank Project এই শিরোনামে ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প, সিরিস-১১, আকুর টাকুর, টাঙ্গাইল এবং অসলো প্রেস, ঢাকা থেকে এই লেখাটি পুস্তিকা আকারেও প্রকাশিত হয়।

১৯৭৯ সালের শেষের দিকে পরবর্তী ইউনিসেফ-কান্ট্রি প্রোগ্রামের শেষ প্রিভিউ মিটিং হয়। এতে নিয়ম অনুযায়ী ইউনিসেফ হেডকোয়ার্টার নিউইয়র্ক থেকেও দু'একজন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই যাত্রায়ও তারা বেশ কিছু প্রশ্ন করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমারই জয় হয়। ইউনিসেফের নারী উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে আগের চারটি প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজসহ নতুন কান্ট্রি প্রোগ্রামে (১৯৮০ জুলাই থেকে ১৯৮২ জুন) আমরা গ্রামীণ ব্যাংকের সাথে প্রথম প্রকল্প শুরু করলাম। এর মাধ্যমে আমাদের নারী উন্নয়ন কর্মসূচির মেঘ কিছুটা অপসারিত হলো। আমরা একটি তৃণলতা ধরে ভেসে থাকার সুযোগ পেলাম।

১৯৮০ সালের জুলাই থেকে এই প্রকল্পে ইউনিসেফের সহযোগিতা পর্ব শুরু। এই সময় চট্টগ্রামের হাটহাজারী, মিরসরাই ও রাঙ্গুনিয়া থানায় এবং টাঙ্গাইল জেলায় গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্পে কাজ চলছিল। গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীনদের দলবদ্ধ করে ঋণ দেয়া, তা সময়মত ফেরত নেয়া এবং এভাবে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করাই ছিল গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য।

ইউনিসেফের আর্থিক সহযোগিতায় স্থানীয় পর্যায়ে গ্রামীণ ব্যাংকের দলনেতাদের জন্য ছোট ছোট ওয়ার্কশপ করা হয়। সাধারণত সাত দিন ব্যাপী এই কর্মসূচি চলে। এর প্রথম পর্যায়ে আলোচিত হয় গ্রামীণ ব্যাংকের নিয়ম-কানুন, ঋণ নেয়া এবং পরিশোধের পদ্ধতি; দলভুক্ত নারীদের সুবিধা, অসুবিধা, সমস্যা এবং তার সমাধান ইত্যাদি বিষয়ে মত বিনিময়। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প পরিদর্শনের সুযোগও তাদের দেয়া হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে নারী ও শিশুদের শিক্ষা, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পুষ্টি, সেনিটেশন, নিরাপদ পানি ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা হয়। তৃতীয় পর্যায়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয় নারী ও শিশুদের সামাজিক উন্নয়ন এবং তাদের অধিকার ইত্যাদির ওপর। শেষ দিনে অংশগ্রহণকারীরা তাদের প্রয়োজন কি তা নির্ধারণ করেন এবং তার ওপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারা নিজেদের এলাকায় ফিরে গিয়ে সেগুলো আবার বাস্তবায়িত করেন। নেতৃত্বদানের দক্ষতাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যেও প্রশিক্ষণ দেয়া হয় দলনেতাদেরকে। প্রথমদিকে বেশ কয়েকটা ওয়ার্কশপে প্রফেসর ইউনূসের সাথে আমারও যোগ দেয়ার সুযোগ হয়েছে। আমরা দু'জন তাদের প্রশিক্ষণ দিতাম। যদিও এই প্রশিক্ষণের পদ্ধতি ছিল ভিন্ন ধরণের। এতে দলের সদস্যরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন। আমরা শুধু তাদেরকে আলোচনা এগিয়ে নিতে সাহায্য করতাম। তাদের সাথে একই পাটিতে বসে আমরা বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতাম। তাদের বুদ্ধিমত্তা এবং বাচনভঙ্গী দেখে অবাক হতাম। ইউনূস ভাইয়ের সাথে তাদের যে আন্তরিক সম্পর্ক তা বিশেষ লক্ষণীয়। তিনি যখন তাদের ভাষায় অত্যন্ত সহজভাবে কথা বলতেন, তারা নির্ভয়ে একের পর এক প্রশ্ন করতেন। তারা ইউনূস ভাইকে তাদেরই একজন মনে করতেন। এমন ঘরোয়া পরিবেশ সৃষ্টি করা হতো তাদের প্রশিক্ষণের জন্য।

এছাড়া, যেসব দল সাফল্য লাভ করে এবং যারা অকৃতকার্য হয় এই দুই দলের মধ্যে বিনিময় সফরের ব্যবস্থা করাও এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। এতে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে একে অপরের কাছ থেকে হাতে কলমে শিক্ষা লাভ করার সুযোগ ঘটে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মী এবং কর্মকর্তাদের দক্ষতাবৃদ্ধির লক্ষ্যেও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় ওয়ার্কশপের সিদ্ধান্তগুলো তাদের সঙ্গে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়। এতে একদিকে তারা সমৃদ্ধ হন অন্যদিকে প্রকল্পের কাজ মনিটরিং করতে তাদের সুবিধা হয়। ইউনিসেফ সাহায্যপুষ্ট এই প্রকল্পের নামাকরণ করা হয় Trainers' Training Programme (TTP).

ইতোমধ্যে গ্রামীণ ব্যাংক সদস্যদের জীবন-কাহিনীর ব্যাপক প্রচারের জন্য ইউনিসেফের আর্থিক সহায়তায় (১৯৮২ ডিসেম্বর) 'বেলতৈল গ্রামের জরিমন ও অন্যান্যরা' বই হিসেবে প্রকাশ করা হয়। এটা ১৯৮৪ সালের জুন মাসে ইংরাজিতে

অনুবাদও করা হয়। তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলনে (১৯৮৫) আমার সঙ্গে কয়েক কপি নাইরোবী নিয়ে গিয়েছিলাম। ইউনিসেফ প্যানেলে আমার আলোচনার সময় এই বইটি দেখে সকলে দারুণ উৎসাহিত হয়েছিলেন সেদিন। কেউ কেউ গ্রামীণ ব্যাংক দেখারও আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

প্রথম প্রকল্পের মূল্যায়ণ প্রতিবেদনে দেখা গেল গ্রামীণ ব্যাংক সদস্যদের মধ্যে তাদের সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে প্রথম প্রকল্পের (১৯৮০-১৯৮২) জন্য মোট বরাদ্দ ছিল পনেরো লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা। ইউনিসেফ থেকে আমরা মাত্র এর অর্ধেক টাকা দিয়েছিলাম। বাকী টাকা গ্রামীণ ব্যাংক নিজেই ব্যবস্থা করেছিল। অথচ বিনিয়োগকৃত অর্থের তুলনায় এর সাফল্য এসেছে বহুগুণ বেশি। আসলে অর্থের চেয়ে অধিক মূল্যবান ছিল লক্ষ্য অর্জনের প্রতি সকলের সদিচ্ছা, সততা, একাগ্রতা এবং আন্তরিক নিষ্ঠা।

ওয়ার্কশপে চিহ্নিত গ্রামীণ সদস্যদের প্রয়োজনে এবং তাদের গৃহীত ষোল সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিভিন্ন পর্যায়ে ইউনিসেফ থেকে নানাভাবে আরো সাহায্য দেয়া হয়। ক্রমে নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য টিউবওয়েল, সেনিটেশনের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, ডায়রিয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ও.আর.এস, গয়টার প্রতিরোধের জন্য আয়োডিনযুক্ত লবণ এবং রাত্র্যান্ধতা দূর করা ও পুষ্টির জন্য উন্নততর বীজ বিতরণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। এসব কর্মকান্ডকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য গ্রামীণ ব্যাংক বিভিন্ন রিভলভিং ফান্ড তৈরি করল। ১৯৮০ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত ইউনিসেফের পাঁচটি কান্ট্রি প্রোগ্রামের মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংকের সর্বমোট ১৩০,৫৮৬ জন ভূমিহীন নারী সদস্য এবং ৩৫,৮৯৫ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এই নারী সদস্যরা এখন প্রত্যেকে এক একজন সামাজিক নেতা। এদের কেউ কেউ গ্রামীণ ব্যাংকের বোর্ড মেম্বার। কেউ নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হয়েছেন। কেউবা ইউ.পি সদস্য হয়েছেন এবং সুযোগ্যভাবে তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করছেন।

ইউনিসেফের কনসালটেন্ট ওয়া ওয়াং Story of Unicef in Bangladesh লেখার সময় প্রফেসর ইউনূস-এর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন (১৫ই মে ১৯৯৪)। আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। গ্রামীণ ব্যাংকের সাথে ইউনিসেফের সহযোগিতা সম্পর্কে তিনি প্রফেসর ইউনূসের মতামত জানতে চেয়েছিলেন। ইউনূসের কথাগুলো এখনো কানে বাজছে। এমন সুন্দর গোছানো কথা এত সংক্ষেপে খুব কম লোকই বলতে পারে। এর ধারণকৃত টেপটি আমার কাছে এখনো সংরক্ষিত আছে। এখানে এর কিছু অংশের উদ্ধৃতি দিলাম।

ইউনূস বলেছিলেন, Even to-day it remained as a part of Grameen operation. Because of meetings, we find it extremely useful for women, for themselves to get together and discuss their own problems, find solutions for them. Entire social program that Grameen developed came from those workshops. .....that became our learning ground for ourselves to know about them, what they do, the fears, the problems and so on. And this is also a very good way to disseminate ideas. So, this is very central to our entire

operational programme. And out of that came, which is again as famous as Grameen Bank, which is called 'Sixteen Decisions'. And bacause of these workshops the leadership quality has developed among the women who joined this workshop.

.....

So this program remained an integral part of Grameen and Unicef has been supporting us all along in the entire program. So I cannot just in a few sentences explain to you what it means. If we want to grade how much of it, the impact, that has made on the people's life; on women's life, how much of it comes from the money, and how much of it comes from all these social programs; I would almost tend to make it 50/50. Assign 50 marks on the money and 50 marks on all the rest of it.

.....

Money is key to the start of transformation process. But you need a lot more preparation, so that the transformation goes into right direction, in a speed commensurating with your desires and so on. So, this is what has happened to the programs that has been supported by Unicef .

আজ গ্রামীণ ব্যাংকের সুনাম দেশে বিদেশে বিস্তৃত। এর অসংখ্য সদস্যদের সাথে আমিও প্রভূত গৌরববোধ করি গ্রামীণ ব্যাংকের অসামান্য সাফল্যের জন্য। দরিদ্র, তৃণমূল নারীদের ক্ষমতায়ণের জন্য আমরা সাধারণত যে উদ্দেশ্য এবং কর্মকৌশলের কথা প্রচার করে থাকি, তা প্রয়োগ করার সুযোগ দিয়েছে গ্রামীণ ব্যাংকের উর্বর ক্ষেত্র। এতে আমরা প্রভূত অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়েছি। সমৃদ্ধ হয়েছি। এই অভিজ্ঞতা আমাকে নারী উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসূচি গ্রহণে সাহায্য করেছে এবং প্রেরণা দিয়েছে।

ঢাকায় পোস্ট-কোপেনহেগেন সেমিনার

কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত UN Mid Decade World Conference on Women (১৪–৩০ জুলাই ১৯৮০)-এ যোগ দেয়ার জন্য বাংলাদেশ থেকে ষোল সদস্য বিশিষ্ট একটি ডেলিগেশন গিয়েছিল। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এতো বড় ডেলিগেশন একসাথে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পায়। এর নেতৃত্বে ছিলেন মহিলা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী তাসলীমা আবেদ। প্রতিনিধি দলে ছিলেন–আজিমপুর মেটারন্যাল চাইল্ড হেলথ সেন্টারের ডাইরেক্টর ডা. জাহানারা রাব্বি, রওশন এলাহী এম.পি, খুলনা মহসিন মহিলা কলেজের প্রিন্সিপাল মাজেদা রহমান, ফেডারেশন অফ ইউনিভার্সিটি উইমেনের সেক্রেটারি জীনাত আরা ভূঁইয়া, প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চিফ সালমা খান, জাতীয় মহিলা সংস্থার ভাইস চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার রাবেয়া ভূঁইয়া, ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর রওনক জাহান এবং ড. নীলিমা ইব্রাহীম, ফ্রেপড-এর রিসার্চ অফিসার শামীমা ইসলাম, ভালনারেব্‌ল গ্রুপ ফিডিং-এর প্রজেক্ট ডাইরেক্টর মাহেনুর রহমান, সেইভ দি চিলড্রেন–ইউ.এস এর প্রোগ্রাম অফিসার হাসিনা খান, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সেক্রেটারি

মালেকা বেগম, কনসার্ন ওমেন ফর ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর ডাইরেক্টর মুফাওয়াজা খান, ন্যাশনাল ওমেন কোপারেটিভ সোসাইটির শামা কে. মইনুদ্দীন এবং আই.ডি.এস.-এর রিসার্চ অফিসার সালেহা বেগম।

আজকালকার মতো সকলে একত্রে চিন্তা ভাবনা করে এ ধরনের কনফারেন্সের ফলো-আপ কর্মসূচি হাতে নেয়ার কালচার তখনো আমাদের দেশে গড়ে ওঠেনি। এমনকি যাওয়ার আগেও সমন্বিতভাবে কোন ব্রিফিং মিটিং বা পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহনের রেওয়াজও ছিল না। শামীমা ইসলাম তখন ওমেন ফর ওমেন-এর প্রেসিডেন্ট। মিড ডিকেড কনফারেন্স থেকে ফিরে আসার পর একদিন তিনি আমাকে বললেন, বাংলাদেশে নারীদের একমাত্র গবেষণা প্রতিষ্ঠান হয়েও ওমেন ফর ওমেন মিড ডিকেড কনফারেন্সে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনি। আমি ফ্রেপড্-এর রিসার্চ অফিসার হিসেবে গিয়েছিলাম, ওমেন ফর ওমেন-এর প্রতিনিধি হিসেবে নয়।

সাধারণত দেখা যায় আমাদের দেশে এই সব ডেলিগেশনের সদস্যরা মনোনীত হয় সরকারি প্রক্রিয়ায়। এতে যোগ্যতার চেয়ে ব্যক্তিগত সম্পর্কই বেশি প্রাধান্য পায়। বর্তমানে এই প্রক্রিয়ায় কিছু উন্নতি হলেও সরকারি ডেলিগেশন মনোনয়নে তেমন কোন গুণগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়না।

শামীমা আরো বললেন, মিড-ডিকেড কনফারেন্সে যাওয়ার আগে অংশগ্রহণ-কারীদের মধ্যে বিশেষ কোন সংযোগ স্থাপন করা হয়নি। কোন পূর্ব প্রস্তুতি সভাও হয়নি। সেখানে গিয়েই প্রকৃতপক্ষে দেখতে পেলাম বাংলাদেশ থেকে কারা এসেছেন। এরকম অসংগঠিতভাবে ডেলিগেশন গেলে তারা সেই কনফারেন্সে কোন সুসংগঠিত প্রভাব ফেলতে পারে না। ফিরে আসার পরও একই অবস্থা হয় যদি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মত বিনিময়ের ব্যবস্থা করা না হয়। এ আলোচনার প্রেক্ষিতে আমি আর শামীমা সিদ্ধান্ত নিলাম ইউনিসেফের সহযোগিতায় অবিলম্বে ঢাকায় একটা পোস্ট-কোপেনহেগেন সেমিনার করবো। তখন ইউনিসেফের রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিলেন নীল বাট এবং সিনিয়র প্রোগ্রাম প্ল্যানিং অফিসার ছিলেন জো জাড। তাঁরা দু'জনে আনন্দের সঙ্গে আমার এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে এর সাথে সংশ্লিষ্ট করা হলো। ২৯ আগস্ট (১৯৮০) পোস্ট-কোপেনহেগেন সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ইউনিসেফের নারী উন্নয়ন ইউনিটের যৌথ উদ্যোগে। এই সেমিনারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মিড ডিকেড কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মত বিনিময় করা এবং নারীদের সম-অধিকার সংক্রান্ত যে ঘোষণাপত্র এবং কার্যক্রম গ্রহণ করার কথা কোপেনহেগেনে বলা হয়েছে তা সকলের কাছে পৌঁছে দেয়া। এর পরিপ্রেক্ষিতে সকলে যেন নিজ নিজ সংগঠন থেকে নারী উন্নয়নের ভবিষ্যত কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে সেভাবে দিক নির্দেশনা দেয়াও এই সেমিনারের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

মহিলা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী তাসলীমা আবেদ তাঁর বক্তৃতায় ইউনিসেফকে অনুরোধ জানিয়ে বলেছিলেন, স্থানীয় পর্যায়ে যেন এ ধরনের সেমিনারের আয়োজন করা হয়। তৃণমূল নারীরাও যেন বিশ্ব-সম্মেলনের নারী-উন্নয়ন পরিকল্পনার কিছুটা আভাস পায়।

তারা যেন নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হতে পারে, সেই সুযোগও যেন তাদের দেয়া হয়। এছাড়া ইউ.এন.ডি.পি.র রেসিডেন্ট রিপ্রেজেনটেটিভ বার্নার্ড যাগরীন, সালমা খান, শামীমা ইসলাম, জো.জাড এবং আমি বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে কিভাবে কোপেনহেগেন কনফারেন্সের ফলো-আপ করা যায়, তা আলোচনা করি।

সকলের আলোচনার মাধ্যমে এটাই পরিষ্কার হয়ে উঠলো যে বাংলাদেশের নারীদের অবস্থা বিশ্লেষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় কোয়ালিটেটিভ ডাটার অভাব আছে। বিভিন্ন নারী সংগঠনের মধ্যে সমন্বয় নাই। নারী উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার জন্য ইউ.এন.এজেন্সিগুলোর মধ্যেও সমন্বিত প্রচেষ্টার অভাব আছে। এই প্রসঙ্গে বার্নাড যাগরীন ইউনিসেফ থেকে রীনি জেরার্ডের নেয়া একটি বিশেষ উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেন। ইউ.এন. এজেন্সিগুলো একসঙ্গে কাজ করার জন্য রীনি একটি অনানুষ্ঠানিক ইন্টার-এজেন্সি কমিটি অন উইমেন্স প্রোগ্রাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৯৭৭ সালে। এর মাধ্যমে Training of Women for Skills Instruction নামে ইউনিসেফ এবং আই.এল.ওর যৌথ উদ্যোগে একটি প্রকল্পও চালু করা হয়েছিল। কিন্তু এই কমিটির স্থায়িত্ব ছিল অল্প সময়ের জন্য। ওই সময় ইউ.এন.এজেন্সির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে নারী উন্নয়নে কাজ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। এই ব্যাপারে রীনি জেরার্ডের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

যাহোক, এই সেমিনারে আলোচনার মাধ্যমে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে আলোকপাত করা হলো তা আমাদের ভবিষ্যত দিক নির্দেশনায় বিশেষ সাহায্য করে। এরকম মতবিনিময় সভার মূল্য যে কতখানি, তা এই সেমিনারে বসে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছিলাম। এই কারণে শামীমা এবং আমি এই সেমিনারের বিভিন্ন বক্তব্য ডকুমেন্ট করার একটা সুযোগ নিয়েছিলাম। আমাদের যুগ্ম সম্পাদনায় Mid Decade World Conference of Women : Bangladesh Perspective নামে একটি পুস্তিকা সংকলন করে ছাপিয়েছিলাম ১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে। পরবর্তীতে এই রিপোর্ট আমরা বিভিন্ন সময়ে ব্যবহার করেছি।

নারীর অবস্থা সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের প্রথম প্রকাশনা

ইতোমধ্যে সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় একত্রিত হয়ে যায়। সময়কাল ঠিক মনে নেই। সম্ভবত ১৯৮২ সাল।

১৯৮৫ সালের জুলাই মাসে নাইরোবীতে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব নারী সম্মেলনে বাংলাদেশ যেন সুসংগঠিতভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ইউনিসেফের তিন বছরমেয়াদি কান্ট্রি প্রোগ্রামের (১৯৮২ জুলাই–১৯৮৫ জুন) Strengthening of Information Base প্রকল্পে বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচির জন্য অর্থও বরাদ্দ করার ব্যবস্থা করলাম। এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল একটি জাতীয় কনফারেন্সের আয়োজন এবং তার ভিত্তিতে নারীর সার্বিক অবস্থার ওপর তথ্য সম্বলিত একটি প্রকাশনা করা। ইউ.এন.ডিকেড ফর উইমেনের (১৯৭৬–১৯৮৫) সুদীর্ঘ

দশ বছরে বাংলাদেশে নারীদের অগ্রগতি পর্যালোনা করা এবং তার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল নির্ধারণ করা ছিল এই কনফারেন্সের প্রধান উদ্দেশ্য।

সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ইউনিসেফের যৌথ উদ্যোগে ৩–৬ ফেব্রুয়ারি (১৯৮৫) নীলক্ষেত প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট একাডেমিতে চার দিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে আটটি মূল পেপার এবং পাঁচটি কেস-স্টাডি উপস্থাপন করা হয়। এর প্রতিটি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সচিব পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা এবং দেশের প্রতিষ্ঠিত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। নারীদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর ওপর গভীরভাবে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে এই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা এক'শ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। বিভিন্ন স্তরের সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, সমাজ-কর্মী, উন্নয়ন-কর্মী, উকিল, ডাক্তার সকলে এতে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলন শেষে নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, চাকরি, আইন-অধিকার, রাজনীতি এবং নারী উন্নয়নে এনজিওদের ভূমিকা সম্পর্কে অনেকগুলো সুপারিশ করা হয় (পৃষ্ঠা ৩০২ থেকে ৩১৪, Situation of Women in Bangladesh, UN Decade for Women 1976–1985)। এই সুপারিশগুলো পরিমার্জিত করে ৩০ মার্চ একদিনের জন্য চার'শ জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে একটি ফলো-আপ সেমিনারও করা হয়। উল্লেখ্য, আঠারো বছর আগে আমরা পার্লামেন্টে নারীদের জন্য জেলা-ভিত্তিক একটি করে আসন সংরক্ষিত রাখার সুপারিশ করেছিলাম। তাছাড়া এই সংরক্ষিত আসনে নারীদের প্রত্যক্ষ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার দাবি করেছিলাম (পৃষ্ঠা–৩১১, Situation of Women in Bangladesh, UN Decade for Women 1976–1985)। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এ ব্যাপারে এখনো কোন অগ্রগতি হয় নাই বরং আমরা পিছিয়ে চলেছি। নারীরা এখনো প্রান্তিক অবস্থানে রয়ে গেছে। যাহোক, জাতীয় সম্মেলন এবং ফলো-আপ সেমিনারের সকল দলিল সংকলন করে বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্রস্তুতি হিসেবে Situation of Women in Bangladesh, UN Decade for Women 1976–1985 প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালের মে মাসে। তখন সমাজকল্যাণ এবং মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ছিলেন এ.কে.এম. হেদায়েতুল হক। এই বই প্রকাশনার ব্যাপারে তিনি বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। বইটির সম্পাদনা পরিষদে ছিলেন ড. কাজী খলিকুজ্জামান (চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ), মকবুল আহমেদ খান, (সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট), সালমা খান এবং জওশন আরা রহমান। এটাই বাংলাদেশে নারীর সার্বিক অবস্থার ওপর প্রকাশিত এই মন্ত্রণালয়ের প্রথম নিজস্ব বই। এর আগে এই রকম কোন সরকারি প্রকাশনা ছিলো না।

এই সময় ব্যারিস্টার রাবেয়া ভূঁইয়া সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী হলেন। এদিকে উফে কনিগ বদলী হয়ে চলে গেলেন এবং এনথনি কেনেডি ইউনিসেফের রিপ্রেজেনটেটিভ হয়ে আসলেন। রাবেয়া ভূঁইয়ার নেতৃত্বে দশ সদস্যের একটি সরকারি ডেলিগেশন এবং পনেরো সদস্যের এন.জি.ও ডেলিগেশন নাইরোবিতে বিশ্ব নারী সম্মেলনে যোগদান করে (জুলাই ১৯৮৫)। ইউনিসেফের ফাইলে সরকারি ডেলিগেশনের একটা লিস্ট পেলাম। এরমধ্যে ছিলেন এ.কে.এম. হেদায়েতুল হক (সচিব), গুল

আফরুজ মাহবুব (পরিচালক, মহিলা পরিদপ্তর), সোফিয়া আহমদ (জাতীয় মহিলা সংস্থা), মমতা ওহাব (জাতীয় মহিলা সংস্থা), পারভীন আহমদ (কারিকা), এডভোকেট হোসনে আরা আহসান, বেগম জাহানারা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), আমাতুন নূর বেগম (কিশোর মেলা, চট্টগ্রাম), এডভোকেট সালমা মাসুদ চৌধুরী এবং মাসুরা চৌধুরী (সেনা কল্যাণ সংস্থা)। আমি যদিও সরকারি ডেলিগেশনের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না, তবুও তাদের সাথে কয়েকটি সেশনে যোগ দেয়ার সুযোগ পাই। এই ব্যাপারে রাবেয়া ভূঁইয়ার আন্তরিকতার কথা ভুলবোনা। তিনি সবসময় আমাকে বড় বোনের মতো সম্মান দিয়েছেন। এই সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে রাবেয়া ভূঁইয়া বক্তৃতার সময় মঞ্চ থেকে যখন Situation of Women in Bangladesh বইটি সকলের সামনে তুলে ধরলেন, তখন মনে মনে খুব গর্ববোধ করলাম।

তখন ইউনিসেফের একজিকিউটিভ ডাইরেক্টর ছিলেন জেমস্ পি গ্রান্ট। তাঁর নেতৃত্বে আমাদের হেডকোয়ার্টার এবং ফিল্ড অফিস থেকে এসেছিলেন তেরোজনের একটি দল। নারী উন্নয়ন কর্মসূচির প্রধান মিশরীয় নাগরিক নাদিয়া ইউসেফও এসেছিলেন নিউইয়র্ক থেকে।

১৫ থেকে ২৬ জুলাই কেনিয়াটা ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। একই সঙ্গে ১০ থেকে ১৯ জুলাই নাইরোবী ইউনিভার্সিটির বিশাল এলাকায় এন.জি.ও ফোরামের বিভিন্ন কর্মসূচি চলে। লেটিসিয়া সাহানী ছিলেন বিশ্বনারী সম্মেলনের সেক্রেটারি জেনারেল। নীতা বারই এন.জি.ও ফোরামের কো-অর্ডিনেটর। এই ফোরামে অসংখ্য কর্মশালা এবং প্যানেল আলোচনা হয়েছিল। 1. Health Needs of Women; 2. Child Survival and Development– Implications for Empowering Women; 3. Work and Income for Women– What we have Learned; 4. Women and Food Production; এবং 5. Women, Energy and Environment - এই পাঁচটি কর্মশালার আয়োজন করেছিল ইউনিসেফ। Work and Income for Women কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৭ জুলাই, নাদিয়া ইউসেফের সভাপতিত্বে। এর চারজন প্যানেলিস্ট-এর মধ্যে আমিও ছিলাম। আমি যখন গ্রামীণ ব্যাংক ও নারীদের সামাজিক উন্নয়ন শীর্ষক পেপারটি উপস্থাপন করলাম, তখন নাদিয়া ইউসেফ অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে বলেছিলেন—তৃণমূল নারীদের জন্য এর চেয়ে উৎকৃষ্ট কর্মসূচি আর কী-বা হতে পারে। গ্রামীণ ব্যাংক সম্পর্কে আলোচনা শোনার জন্য সেদিন ইউনিসেফ প্যানেলে অনেক শ্রোতার ভিড় হয়েছিল।

রোজ সন্ধ্যেয় আমরা ইউনিসেফ নাইরোবি আঞ্চলিক অফিসের ডিরেক্টর মেরী রেসেলিসের বাসায় সারাদিনের পর্যালোচনা করতে বসতাম। জেমস্ পি গ্রান্ট যেন আমাদের হাতে ধরে শিখিয়ে দিতেন, কে কোন দলে যোগদান করা দরকার, কিভাবে আমরা বিভিন্ন বিষয়ে অবদান রাখতে পারি ইত্যাদি। পরদিন আবার কে কতখানি কাজ করতে পেরেছি তা আলোচনা হতো। জেমস গ্রান্টের নেতৃত্ব এত সাবলীল ছিল যে আমরা ভয়ের বদলে অনুপ্রাণিত হতাম। জবাবদিহিতার এত চমৎকার পদ্ধতি থেকে জীবনের অনেক পাঠ নেয়া যায়।

Pioneer in village based website

নাইরোবিতে বিশ্ব নারী সম্মেলনে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তা জীবনের সঞ্চয়। সমুদ্রের স্রোতের মতো লক্ষ লক্ষ নারীর সমাবেশ। সে এক অপূর্ব অনুভূতি, যা কথায় বর্ণনা করা যায়না। বিশ্বের নারীদের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে অগুণিত আলোচনা সভা। তাদের জ্ঞানের পরিধি দেখে বিস্মিত হয়েছি। নিজে একজন শিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ নারী হয়েও কোনদিন কল্পনা করতে পারিনি, শুধু নারীদের দ্বারা পরিচালিত এত বড় সম্মেলন এভাবে সাফল্য লাভ করতে পারে। তখনও গ্রামীণ ব্যাংক বিশ্ব নারী সমাজের কাছে বিশেষ করে আফ্রিকানদের কাছে তেমন পরিচিত ছিল না। আলোচনা শেষে কয়েকজন আফ্রিকান নারী আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, গ্রামীণ নারীদের উন্নয়নে তোমরা অনেকখানি এগিয়ে গেছো। তাদের কথাগুলো এখনো আমার কানে বাজে। নিজের কাছে প্রশ্ন করি, আসলে কি তাই ?

নারীদের সাংগঠনিক যোগ্যতা সম্পর্কে নিজের ক্ষুদ্র ধারণাকে মনে মনে ধিক্কার দিলাম। এই প্রেক্ষিতে নিজের কথা গভীরভাবে আবার বিশ্লেষণ করলাম। নিজের দুর্বলতা অপসারণ করার জন্য আমাকে কি দীর্ঘ সংগ্রাম করতে হয়েছে, কত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করতে হয়েছে, ক্ষুদ্র মানসিক গণ্ডি থেকে ধাপে ধাপে কিভাবে আমার মানসিক উত্তরণ হয়েছে ইত্যাদি চিন্তা করে নতুনভাবে উদ্দীপ্ত হলাম।

সংগ্রাম চালিয়ে যাও

খুব সম্ভব ১৯৭৯ সালের প্রথমদিকে। মাহবুব একদিন আমার হাতে একটা বই তুলে দিয়ে বললো, এই বইটা পড়ে মনে হলো এর সঙ্গে তোমার মাদার্স ক্লাবের যথেষ্ট মিল আছে। তখন আমি সমাজকল্যাণ ডিপার্টমেন্টে ডেপুটি ডাইরেক্টর। বইটা পারডিটা হিউসটনের লেখা। যতই পড়ি, ভালো লাগে। র‍্যাপিড রিডিং দিয়ে বইটা শেষ করলাম। পারিডিটা একজন প্রফেশনাল সমাজকর্মী হিসেবে সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার অধিকারী এবং যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী।

এই বইতে কেনিয়া, সুদান, মিশর, শ্রীলঙ্কা, মেক্সিকো এবং টিউনিসিয়া ইত্যাদি ছয়টা দেশে একশ ত্রিশটা গ্রামের নারীদের জনসংখ্যা সংক্রান্ত অনুভূতি, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন পারডিটা। এসব গ্রামের নারীদের সংগে প্রত্যক্ষ ইন্টারভিউর মাধ্যমে তিনি তাদের মনের কথা জানতে পেরেছেন। তাদের কথাগুলো এমন সহজভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যে একে তৃতীয় বিশ্বের যেকোন নারীর মনের কথা বললে অত্যুক্তি হয়না। এই বই পড়ে আরো বুঝলাম গ্রামের নারীদের সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত ধারণা ভুল। তারা নিজেদের স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ নয়। কিন্তু মুখ খুলে প্রতিবাদ করার সাহস তাদের থাকে না। তাদের ইন্টারভিউ করতে গিয়ে পারডিটার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, আশ্চর্য হলেও সত্যি, আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে মাতৃকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আমি প্রায় একই ধরণের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। পারডিটা যে সময় (১৯৭৬-১৯৭৭) উল্লেখিত দেশগুলো ভ্রমন করে গ্রামাঞ্চলের নারীদের মতামত সংগ্রহ করেন, ঠিক সেই সময়ে আমি সমাজকল্যাণ বিভাগে মাতৃকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা নিয়ে ব্যস্ত। বিশেষ করে এই কারণে এই বইয়ের এবং তার লেখকের সাথে

Ehunati.com
Pioneer in village based website

একাত্মতা অনুভব করলাম। বইটাকে মনে হলো আমার পথ নির্দেশক। সেগুনবাগিচায় আমার অফিস রুমে টেবিলের ওপর সবসময় এই বইটি সাজিয়ে রাখতাম। সময় পেলেই কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে ফেলতাম।

১৯৯২ সালের শেষের দিকে আমাদের রিপ্রেজেনটেটিভ রল্ফ কেরিয়ারের কাছে লেখা একটি অপ্রত্যাশিত চিঠি পেয়ে আনন্দে অভিভূত হলাম। পারিডিটা হিউসটনের চিঠি। তাতে লেখা ছিল তিনি ইউ.এন.এফ.পি এর সাহায্যপুষ্ট একটি প্রকল্পের আওতায় কিছু কাজ করার জন্য বাংলাদেশে আসবেন। ইউনিসেফের সাথে আলোচনা করারও আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, যদিও এতে আমাদের কোন প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা ছিল না।

নির্ধারিত দিনে তিনি এলেন। ইউনিসেফের রিপ্রেজেনটেটিভের অফিস তখন ধানমন্ডির ৫-এ নম্বর রোডে। আমি এ বিল্ডিংয়ের দোতলায় বসতাম। তাঁর সাথে প্রাথমিক আলোচনার পর পারডিটাকে নিয়ে এলাম আমার রুমে। তাঁকে বললাম তের বছর আগে তোমার বই Message from the Village-এর মাধ্যমে তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়। সেদিন তোমার সাথে মনে মনে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করেছিলাম। সুদূর বাংলাদেশে থেকে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছিলাম এই বইয়ের বিভিন্ন বক্তব্য দ্বারা। তার সাথে বাংলাদেশের নারী আন্দোলন এবং ইউনিসেফে নারী উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা হয়।

পরদিন দুপুরে একসঙ্গে লাঞ্চ করার জন্য তাঁকে নিয়ে গেলাম বনানীর এ.বি.সি সেন্টারের টপ ফ্লোরে স্কাইরুম রেস্টুরেন্টে। মাতৃকেন্দ্রের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে এক পর্যায়ে দু'জনের গলা ধরে এলো। কিছুক্ষণ দু'জনেই নিশ্চুপ। পারডিটা বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীদের জন্য আর আমি আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারীদের জন্য নীরবে অশ্রুপাত করলাম। পারডিটা বললেন, বিশ্বময় সিংহভাগ নারীদের একই রকম করুণ অবস্থা। আফ্রিকা থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত কোন প্রভেদ নেই। তারপর বললেন, তাঁর বিভিন্ন বইতে যা প্রকাশ করতে পেরেছেন, তা নারীদের সামগ্রিক সমস্যার বিন্দুমাত্র। তাদের জন্য বিশেষ কিছু করতে পারিনি। শুধু তাদের চিত্র আমার বইয়ের মাধ্যমে তুলে ধরে বিশ্ববাসীর কাছে জানাতে চেয়েছি তাদের সংগ্রাম এবং সামাজিক চাপের মুখে ভেঙে পড়া ব্যক্তিসত্তার কথা।

গল্প করতে করতে কোনদিকে চারটা বেজে গেল টেরও পেলাম না। বিদায়কালে তার সর্বশেষ প্রকাশিত Motherhood by Choice বইটি আমার হাতে দিয়ে বললেন, আমরা একই পথের পথিক। তোমার সংগ্রাম চালিয়ে যাও। চাকা বন্ধ করোনা কোনদিন, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও নয়।

তাঁকে বিদায় দিয়ে গাড়িতে বসে তাঁর দেয়া বইটি উল্টাতেই চোখে পড়লো তাঁর হাতে লেখা, Dear Jowshan, caring sister, who understands the messages from the village - with fond regards from Perdita, Dhaka, November, 1992. সারা পথে পথে ভাবলাম, এ যেন একটি অকল্পনীয় ঘটনা। ১৯৭৯ সালে যে বই পড়ে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম, আমেরিকার যেই লেখককে মনে মনে অসংখ্য অভিনন্দন জানিয়েছিলাম, তাঁর সাথে ঢাকায় বসে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ হলো কী করে।

নারী উন্নয়নে দাতা সংস্থার নেটওয়ার্ক

১৯৮৫ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত পাঁচ বছর মেয়াদি ইউনিসেফের কান্ট্রি প্রোগ্রাম প্রস্তুতির আলোচনা পর্ব শুরু হয়েছিল ১৯৮৩ সালের মাঝামাঝি। এই পর্বে একদিন আমার সুপারভাইজার, জো. জাভের সাথে আলোচনা করছিলাম। অন্যান্য দাতা সংস্থারা নারী উন্নয়ন সম্পর্কে কি ভাবছে, কি পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, সে সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা থাকা দরকার। নারী উন্নয়ন একটা ব্যাপক বিষয়। বিচ্ছিন্নভাবে এ সম্পর্কে কাজ করে বিশেষ কোন অগ্রগতি সম্ভব নয়। কাজেই একলা চলার পথ পরিত্যাগ করে আমরা দাতাগোষ্ঠী হিসেবে কিভাবে একজোটে কাজ করতে পারি তার সম্ভাবনা যাচাই করার জন্য আমি একে একে সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে দেখা করা শুরু করলাম। বিশ্ব ব্যাংকের ওয়াহিদা হকের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করলাম নারী উন্নয়ন কর্মসূচিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার এবং তার জন্য দাতাগোষ্ঠীর একটি প্ল্যাটফরম থাকা দরকার। ইউনিসেফের নিয়ম অনুযায়ী কান্ট্রি প্রোগ্রাম প্রস্তুতিপর্ব সাধারণত প্রায় আঠারো মাস ধরে চলে। এই সুদীর্ঘ সময়ে (১৯৮৩ মাঝামাঝি থেকে ১৯৮৪ শেষ পর্যন্ত) সকলের সাথে পরামর্শ করে আমি দাতা সংস্থাদের নিয়ে প্রথম নারী উন্নয়ন নেটওয়ার্ক অনানুষ্ঠানিকভাবে শুরু করলাম। এটাই বাংলাদেশে দাতা সংস্থার সর্বপ্রথম নারী উন্নয়ন বিষয়ক নেটওয়ার্ক। এর আগে আমার পূর্বসুরী রীনি জেরার্ড ১৯৭৭ সালে কেবলমাত্র ইউ.এন সংস্থাগুলোর জন্য নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত একটা অনানুষ্ঠানিক ইন্টার-এজেন্সি কমিটি গঠন করেছিলেন। কিন্তু তার স্থায়িত্ব দু'বছরের বেশি ছিল না।

BanglaBook.org
Pioneer in village based website

ইতোমধ্যে আমার দু'জন সুপারভাইজার পরিবর্তন হয়। আমরা নিয়মিতভাবে নেটওয়ার্কের বৈঠকে মিলিত হতাম। এই মিটিংয়ে কোন্ দাতা সংস্থা কি কি কর্মসূচি গ্রহণ করে, কি পদ্ধতিতে কাজ করে, কি কর্মকৌশল অবলম্বন করে ইত্যাদি বিষয়ে আমরা আলোচনা করতাম। এই বৈঠকগুলো বিভিন্ন দাতা সংস্থার অফিসে চক্রাকারে অনুষ্ঠিত হতো। এতে নারী উন্নয়নের বিভিন্ন ইস্যুর ওপর আলোকপাত করা হতো। গবেষণামূলক প্রবন্ধ– Therese Blaunchet-এর (সমাজ বিজ্ঞানী) Women's Credit in Bangladesh, Teresita Sheffer-এর (তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী, এদেশের নারীদের ওপর বিশেষ গবেষণা করেন) Survey of Women's Programmes in Bangladesh, এবং Women for Women, Research and Study group-এর নানা গবেষণা কর্ম উপস্থাপন করা হতো। এভাবে কাজ করতে করতে এক সময় এই নেটওয়ার্ককে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। জুলাই মাসের ৩ তারিখ (১৯৮৬) সেলী কেলকের সভাপতিত্বে ইউনিসেফ ট্রান্সপোর্ট বিল্ডিংয়ের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত একটি সভায় এই অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্ককে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়। এই সভায় ইউ.এন বিশ্বব্যাংক, বাই-লেটারেল দাতাগোষ্ঠী সহ প্রায় চৌদ্দটি সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইউনিসেফকে এই নেটওয়ার্কের সেক্রেটারিয়েট হিসেবে ব্যবহার করা এবং আমাকে এর সর্বপ্রকার সমন্বয়কারী হিসেবে কনভেনরের দায়িত্ব দেয়া হয়।

বংলাদেশে নারী উন্নয়ন ইস্যুগুলো সম্পর্কে দাতা সংস্থাদের মধ্যে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মানো, পরস্পরের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় করা, একই কাজের পুনরাবৃত্তি না করে সকলে একত্রে সর্বপ্রকার সহযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি নারী উন্নয়নমূলক কর্মসূচিকে শক্তিশালী করে তোলা ইত্যাদি প্রাথমিকভাবে এই নেটওয়ার্কের প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ওই সময় কোন্ দাতা সংস্থা কি কি নারী উন্নয়ন প্রকল্পে সহযোগিতা করে, কোন্ সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হয় এবং সেই ক্ষেত্রে দাতারা কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়— এই বিষয়ে একটি সংকলন তৈরি করা হয়।

ইউনিসেফের সহযোগিতায় আমাদের কনসালটেন্ট সাঈদা আনিস এই সংকলনটি তৈরি করেছিল। এই অপরিপক্ক কাজটি পরবর্তীকালে আমাদের কর্মক্ষেত্রে বেশ কাজে লাগে। এই নেটওয়ার্ক থেকেই সর্বপ্রথম বাংলাদেশের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী উন্নয়ন ম্যাক্রো চ্যাপটার সম্পৃক্তকরণ ধারণার উৎপত্তি। এই নেটওয়ার্ক থেকেই WiD LCG sub-Group গঠন করার কথা চিন্তা করা হয়। এদিক থেকে এই নেটওয়ার্ক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে বলা যায়। ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত ইউনিসেফের কান্ট্রি প্রোগ্রামে ইনফরমেশন বেইজ প্রজেক্টটি বাদ দেয়া হয়েছিল। সুতরাং সেই সময় নেটওয়ার্কের কার্যকলাপ কোন নির্দিষ্ট প্রজেক্টের আওতায় করা সম্ভব হতো না। এর জন্য কোন নির্দিষ্ট আর্থিক বরাদ্দও ছিল না। তখন এই কাজগুলো এডহক হিসেবে করা হতো। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৩ কান্ট্রি প্রোগ্রামে ইনফরমেশন বেইজ প্রজেক্ট আবার নতুন করে গ্রহণ করা হয়। এতে এই ধরণের কাজের জন্য বিশেষ অর্থ বরাদ্দও করা হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে নেটওয়ার্ককে আরও শক্তিশালী করে পরবর্তীতে উইড এল.সি.জি সাব-গ্রুপের কার্যকলাপও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৯৯০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি বোধকরি এই নেটওয়ার্কের শেষ মিটিং করেছি ইউনিসেফে, রিপ্রেজেনটেটিভের কনফারেন্স রুমে। এই মিটিংয়ের কাগজপত্র আমার কাছে এখনও সংরক্ষিত।

এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে শিরীন হক (ডানিডা), ওয়াহিদা হক (বিশ্বব্যাংক), টুরা বেথনিউ (ইউ.এস.এইড), সুজান ডেভিস (ফোর্ড ফাউন্ডেশন), এনজেলা রাইনবাক ও রেহানা বানু (ডব্লিউ. এফ.পি), নুরুন্নবী খান (আই.এল.ও), ফরিদা ইসলাম (কেনেডিয়ান সিডা), তাহেরা আহমেদ (ইউ.এন.এফ.পি.এ), মাহিন সুলতান (ইউ.এন.ডি.পি), হাইডি রিকটার (জি.টি.জেড) ও ইয়াসমিন আলী (বর্তমানে ডেপুটি চীফ, হেল্‌থ সেকশন, ইউনিসেফ), এলিজাবেথ আই (নোরাড) এবং সর্বোপরি আমার সুপারভাইজার সেলী কেলক আমাকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করেন। এই অকৃত্রিম সহযোগিতা না পেলে নারী উন্নয়ন ক্ষেত্রে দাতাগোষ্ঠীর একত্রীকরণ এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার সূচনা নিঃসন্দেহে আরো বিলম্বিত হতো।

জয়েন্ট গভর্নমেন্ট-ফরেন ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্স উইড টাস্কফোর্স

১৯৯০ সালের মার্চ মাসে বিশ্বব্যাংকে অনুষ্ঠিত Local Consultative Group (LCG)-এর মিটিংয়ে প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য কাজী ফজলুর রহমান (আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো) প্রস্তাব করলেন, 'নারীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থাসমূহের অর্থাৎ দাতাগোষ্ঠীর সমন্বয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের টাস্কফোর্স তৈরি করা দরকার'। এই প্রস্তাব সকলের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করে। পরিকল্পনা কমিশন থেকে এই প্রস্তাব সম্বলিত চিঠি অনতিবিলম্বে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়।

মনে পড়ে ওই কার্যালয়ে রাশিদা সেলিমের (ইউ.এন.ডি.পি) পরিচিত একজন কর্মকর্তা ছিল। রাশিদা প্রায়ই টেলিফোনে তাঁর সাথে যোগাযোগ করতো এবং আমাদের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে আমাকে জানাতো। লোকাল কনসালটেটিভ উইড সাব-গ্রুপের কনভেনর হিসেবে যদিও দায়িত্বটা আমারই ছিল, কিন্তু সেখানে আমার চেনা-জানা কেউ না থাকায় রাশেদা নিজে থেকেই আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো। এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে রাশেদার অবদান কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

এখানে কাজী ফজলুর রহমান সম্পর্কে দু'চারটি কথা উল্লেখ করতে চাই। তাঁর কাছে কোন প্রস্তাব নিয়ে আমরা যখনি গিয়েছি, কোনদিন নিরাশ হয়ে ফিরিনি। নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে দাতা সংস্থার প্রচেষ্টাকে সঠিকভাবে দিক নির্দেশনা দেয়ার ব্যাপারে তাঁর অবদান অনন্য। তিনি প্রায়ই একটি কথা বলতেন, আমার মায়ের জন্য আমার সব ভাইরা সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। একইভাবে যেকোন উন্নয়নে নারীর অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু তারা যথাযথ স্বীকৃতি পায়না। সত্যিকারের অবদান রাখতে হলে নারীকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে তৈরি করতে হবে। দুঃখের বিষয়, সমাজের কাঠামোগত এবং সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিজনিত কারণে আমরা এই আমোঘ সত্যের প্রতি প্রয়োজনমতো মনোযোগ দিই না। এই বিষয়ে সকলে সোচ্চার হওয়া উচিত। তাঁর এই কথাগুলো বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমি বেশ কয়েকবার শুনেছি এবং অনুপ্রাণিত হয়েছি।

সেপ্টেম্বর মাসের ১২ তারিখ, ১৯৯০ এই ব্যাপারে পরিকল্পনা বিভাগের সমন্বয় উইং থেকে নং-পক/সমন্বয়-৫১/৯০/৩০২ একটি প্রজ্ঞাপন দেয়া হয়। প্রজ্ঞাপনটি ছিল সরকার এবং উন্নয়ন-সহযোগী দেশ ও সংস্থাসমূহের যৌথ টাস্কফোর্স ও টাস্কফোর্সের ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন সম্পর্কিত বিস্তারিত নির্দেশাবলী। তখন পরিকল্পনা বিভাগের সচিব ছিলেন কাজী সামসুল আলম। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে সচিব-এর স্বাক্ষরে এই প্রজ্ঞাপনটি পরিকল্পনা বিভাগ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে পাঠানো হয়। টাস্কফোর্স সম্পর্কিত এই সরকারি প্রজ্ঞাপনে বলা হয় : "উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় মহিলা সমাজকে সম্পৃক্তকরণ ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় তাহাদের সার্বিক অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মহিলাদের উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে অর্থনীতির বিভিন্নখাতে প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও প্রণয়নের জন্য সরকার উন্নয়ন-সহযোগী দেশ/সংস্থা ও সরকারি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি যৌথ টাস্কফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।"

কাজী ফজলুর রহমানকে চেয়ারপার্সন করে চৌদ্দ সদস্যবিশিষ্ট এই টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। এর মধ্যে সরকারের তরফ থেকে মহিলা বিষয়ক, শিল্প, যুব ও ক্রীড়া, স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ, কৃষি, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ ইত্যাদি সাতটি মন্ত্রণালয়ের এবং পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধিবৃন্দ ছিলেন। এছাড়া ইউ.এন.ডি.পি-র নূজহাত এহসান, বিশ্বব্যাংকের ওয়াহিদা হক, সুইডিস সিডার ইভা বার্গ, ডানিডার শিরীন হক, ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সুজান ডেভিস এবং ইউনিসেফ থেকে আমাকে প্রাথমিকভাবে এর সদস্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরে আরো কয়েকটি সংস্থার প্রতিনিধিকে কো-অপট করা হয়েছিল। তাদের নাম মনে পড়ছেনা। এই টাস্কফোর্স গঠন করতে প্রায় ছয় মাস সময় লেগেছিল। সরকারি প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন স্তর পার হয়ে এত জটিল একটি বিষয় কার্যকরী করা বেশ সময় সাপেক্ষ। এই প্রেক্ষিতে বিচার করলে উক্ত কাজটি দ্রুত সম্পাদন হয়েছে বললে অত্যুক্তি হবেনা।

পরিকল্পনা কমিশনের SCYSWAM (ক্রীড়া, সংস্কৃতি, যুব উন্নয়ন, সমাজকল্যাণ, মহিলা উন্নয়ন ও গণ-সংযোগ) উইংয়ে এই টাস্কফোর্সের সচিবালয় স্থাপন করা হয়। এর জয়েন্ট-চিফ সালমা খানকে মেম্বার-সেক্রেটারি করা হয়। আমাকে উন্নয়ন সহযোগী বৈদেশিক সংস্থাসমূহের অর্থাৎ দাতাগোষ্ঠীর কোঅর্ডিনেটর করা হয়। তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং টাস্কফোর্স সচিবালয়কে সহায়তা করার দায়িত্বও পড়ল আমার ওপর।

টাস্কফোর্সের প্রধান দায়িত্ব ছিল :

১. মহিলা উন্নয়ন সংক্রান্ত বহুখাত-ভিত্তিক প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও প্রণয়নের জন্য কার্যকরী গ্রুপ গঠন করা ;
২. চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ম্যাক্রো-ফ্রেমওয়ার্কে মহিলাদের সম্পৃক্তকরণের কলা-কৌশল সম্পর্কে সুপারিশ করা ;
৩. সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থাসমূহের মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করা ; এবং
৪. সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থাসমূহের মহিলা উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মসূচির সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের পদ্ধতি নিরূপণ করা।

কাজী ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে এই টাস্কফোর্সের প্রথম পরিবর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয় ৩১ অক্টোবর (১৯৯০) পরিকল্পনা কমিশনের এন.ই.সি কনফারেন্স রুমে। এতে সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আটজন এডিশনাল সেক্রেটারি, জয়েন্ট সেক্রেটারি এবং ডেপুটি সেক্রেটারি; মহিলা অধিদপ্তর থেকে পরিচালকসহ এগারজন এবং বৈদেশিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার বিশজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এই মিটিংয়ে আমরা (দাতা সংস্থা) এল.সি.জি উইড সাব-গ্রুপের তরফ থেকে কয়েকটা প্রস্তাব রেখেছিলাম। তার মধ্যে ১. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে উইড ফোকাল পয়েন্ট প্রতিষ্ঠা করা, ২. জেন্ডার ডিজ-এগ্রিগেটেড ডাটা তৈরি করা এবং ৩. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রকল্প-লিস্ট তৈরি করা ইত্যাদিও ছিল। টাস্কফোর্সের প্রাথমিক কর্মসূচি হিসেবে নারী উন্নয়নকে বিভিন্ন সেক্টরে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য-

Chunati.com
Pioneer in village based website

পরিবার-কল্যাণ ও পুষ্টি এবং প্ল্যানিং ও ইনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট; এই পাঁচটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়।

পরিকল্পনা বিভাগের সমন্বয় উইং-এর উল্লেখিত প্রজ্ঞাপনে আরো বলা হয় ওয়ার্কিং গ্রুপগুলো নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে :

১. চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিভিন্ন খাতে নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত চলতি, পরিকল্পিত এবং সম্ভাব্য প্রকল্পসমূহ চিহ্নিত করা,
২. চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম অর্থ বছর অর্থাৎ জুলাই ১৯৯০-জুন ১৯৯১ এর সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্তির জন্য নারীদেরকে উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণ সংক্রান্ত প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করা,
৩. চলতি প্রকল্পসমূহে নতুন অংশের সংযোজন/সংশোধন প্রস্তাব করা,
৪. নারী উন্নয়নের ওপর সকল খাতে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহের নেতিবাচক/ইতিবাচক প্রভাব বিশ্লেষণ করা,
৫. নতুন প্রকল্প প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট খাতকে সহায়তা প্রদান করা, এবং
৬. নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত আন্তঃখাত প্রকল্পসমূহ সমন্বয়ের জন্য একটি সিস্টেম ডিজাইন করা।

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের এডিশনাল সেক্রেটারি এবং জয়েন্ট সেক্রেটারি পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে এই ওয়ার্কিং গ্রুপগুলোর কনভেনরের দায়িত্ব দেয়া হয়। প্রতিটি দলে পরিকল্পনা কমিশন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং দাতাসংস্থার প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যেন সকলের মতামত সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। শিরীন, ওয়াহিদা, নূজহাত এবং আমি প্ল্যানিং ও ইনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট দলে ছিলাম। এই দলের কনভেনর ছিলেন ন্যাশনাল প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট একাডেমির প্রিন্সিপাল জয়নাল আবেদীন।

এই ওয়ার্কিং গ্রুপগুলোর অন্যতম প্রধান কাজ ছিল উল্লেখিত সেক্টরে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে নারী উন্নয়ন বিষয়ক কি কি সমস্যা, তা চিহ্নিত করা এবং এর প্রেক্ষিতে কি কি কর্মকৌশল গ্রহণ করা যায় তার সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখা।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালাসহ উল্লেখিত পাঁচটি বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করা হলো। এই রিপোর্ট গুলোতে প্রধানত ষোলটা সুপারিশ করা হয়। তার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি ছিল : ১. তৎকালীন প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা বিশ্লেষণ করে সর্বস্তরে নারী উন্নয়নকে শক্তিশালী করার জন্য Institutional Review করা; ২. পরিকল্পনা কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী জাতীয় নারী উন্নয়ন কাউন্সিলকে পুনর্গঠন করা এবং সক্রিয় করা। উল্লেখ্য, জাতীয় নারী উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন সম্পর্কে এক সময় একটি সরকারি নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। তারিখ বা সন মনে পড়ছেনা। কিন্তু তা শুধু নির্দেশ জারির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পৃথিবীর আলো তখনও দেখেনি। ৩. Multi-sectoral Programme on WiD Identification Mission আরম্ভ করা; ৪. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, শিক্ষা, শিল্প, কৃষি, মৎস্য ও পশুপালন এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ে উইড ফোকাল পয়েন্ট প্রতিষ্ঠা করা; এবং ৫. প্রত্যেক পি.পিতে (সরকারি প্রজেক্ট প্রোফরমা) মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামত অন্তর্ভুক্ত করা।

Pioneer in village based website

পরবর্তীতে জয়েন্ট গভর্নমেন্ট-ফরেন ডেভেলপমেন্ট টাস্কফোর্সের (জয়েন্ট-জিওবি-এফডিপি) মিটিংয়ে উক্ত প্রস্তাবগুলো অনুমোদিত হয়। কাজী ফজলুর রহমানের তৎপরতায় সকল পি.পিতে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামত সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়। সেই থেকে প্রত্যেক সেক্টরের পি.পি অনুমোদনের পূর্বে মহিলা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। তাদের মতামত ব্যতীত কোন পি.পি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদন করা হয় না। তবে নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে পি.পিতে সঠিক মতামত দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার যথেষ্ট ঘাটতি ছিল এই মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মধ্যে। আমাদের আশা ছিল ক্রমশ তারা এই দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

এক একটা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কতবার, কতভাবে, কত ফোরামে উত্থাপন করতে হয়, তার একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল উল্লেখিত Institutional Review এবং WiD Focal Point কর্মসূচি। আসলে প্রথমেই এল.সি.জি উইড সাব-গ্রুপের একটা মিটিংয়ে এই কর্মসূচিগুলো চিহ্নিত করা হয়েছিল। যেহেতু দাতা সংস্থা দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে এগুলো কার্যকরী করা সম্ভব নয়, তাই বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে এগুলোকে সরকারি আওতায় আনা হয় জয়েন্ট গভর্নমেন্ট-ফরেন ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্স টাস্কফোর্সের মাধ্যমে।

এভাবে ইউনিসেফের চাকরি জীবনে দাতা সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে নানা কর্ম-কৌশল অবলম্বন করেছি। প্রায়ই সফল হয়েছি। আমার নিজের বিবেকের কাছে সবসময়ই স্বচ্ছ থাকতে চেষ্টা করেছি। স্বজ্ঞানে কোনদিন নিজেকে প্রতারিত করেছি বলে মনে হয় না। যা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছি তার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছি। বারবার চেষ্টা করেছি। সোজা পথে এগুতে না পারলে, আঁকাবাঁকাভাবে সুদীর্ঘ পথ ধরে চলতে দ্বিধাবোধ করিনি। এভাবে আমার গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছি। এরকম বৈচিত্র্যময় ঘটনা আমার জীবনকালে অনেকবার ঘটেছে। তবে এর জন্য আমাকে সীমাহীন ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। দাতা সংস্থার প্রতিনিধি হয়ে সরকারি জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাজ করতে গিয়ে অনেক হিমশিম খেয়েছি। কিন্তু হাল ছাড়িনি। যে রশি একদিন ধরেছি, তা বিস্তৃত করেছি। শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছি, ছিঁড়তে দেইনি কাউকেও। আমার এই সুদীর্ঘ কর্মজীবনে যেমন প্রচুর বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছি, তেমনি বহু গুণীজনের সহায়তা পেয়েছি। আমার এই সফলতার জন্য তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য।

টাস্কফোর্সের কথায় ফিরে আসি। এর মধ্যে কাজী ফজলুর রহমান তৎকালীন কেয়ার-টেইকার সরকারের উপদেষ্টা হয়ে চলে গেলেন ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে। ড. একরাম হোসেন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। পরবর্তীতে মোকাম্মেল হক এবং আসাফউদ্দৌলাও পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে টাস্কফোর্সের সভাপতি ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সময়কালে এই টাস্কফোর্সের মাত্র কয়েকটা মিটিং হয়। এই সময়ের একটি বিশেষ মিটিংয়ের কথা মনে পড়ে। এই মিটিংয়ে কয়েকটা ইস্যু নিয়ে ভীষণভাবে তর্ক-বিতর্ক হয়। চেয়ারম্যান বললেন, ইউড ফোকাল পয়েন্ট-এর কার্যপত্রে বাংলাদেশে নারীর অবস্থা সম্পর্কে অনেক তথ্য বিভ্রান্তি আছে। এগুলি গ্রহণযোগ্য নয়। এই কথা

Pioneer in village based website

তিনি কয়েকবার বললেন। এতে আমরা চুপ করে থাকতে পারলাম না। কারণ যে সব তথ্য এখানে ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিসটিকস ডিভিশনের প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে নেয়া। এই মর্মে শিরীন আর আমি জোর প্রতিবাদ করলাম। মিটিং শেষে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা আমাদের ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, আমরা তো সিনিয়রদেরকে কিছু বলতে পারিনা, আপনারা প্রতিবাদ করাতে আমাদের বেশ উপকার হলো, নতুবা এই কার্যপত্র নিয়ে ভবিষ্যতে অনেক সমস্যা হতো।

নানাদিক থেকে বিবেচনা করলে জয়েন্ট গভার্নমেন্ট-ফরেন ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্স উইড টাস্কফোর্সের যথেষ্ট বিশেষত্ব আছে। সরকারিভাবে নারী উন্নয়ন কর্মসূচির সমন্বয় সাধন এবং মনিটরিংয়ের কোন প্রাতিষ্ঠানিক মেকানিজম তখন ছিল না। মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় তখনও সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করার মত শক্তি অর্জন করেনি। প্রকৃতপক্ষে এই টাস্কফোর্সের মাধ্যমেই পরিকল্পনা কমিশন (আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো) বিভিন্ন সেক্টরে নারী উন্নয়ন বিষয়ক কাজের অগ্রগতি মনিটর করতো। এই সঙ্কটের সময়ে আমাদের টাস্কফোর্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

টাস্কফোর্সের প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন ও সম্মতি ব্যতীত পরবর্তীকালে পাঁচ ভলিউমে ইনস্টিটিউশনাল রিভিউ এবং সরকারি সংস্থায় উইড ফোকাল পয়েন্ট প্রতিষ্ঠিত করা – এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি সম্পন্ন করা যেতো কিনা সন্দেহ। অথচ এই কাজগুলোকে আমাদের দেশে নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের ক্ষেত্রে মাইলফলক বলে অভিহিত করা হয়। এই সব কারণে এই টাস্কফোর্সকে আমাদের চিরকাল স্মরণ রাখা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি, যদিও এর বয়সকাল মাত্র কয়েকবছর।

বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও টাস্কফোর্সকে সক্রিয় রাখা গেল না। এর ভূমিকা ক্রমশ দুর্বল হয়ে ওঠে এবং এক সময় সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারি পদ্ধতিতে এর কোনদিন সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়নি।

দীর্ঘদিন শিশু এবং নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমি কাজ করেছি। এই অধ্যায়ে আমি আমার স্বপ্ন ও কর্মকে আমার অভিজ্ঞতার নীরিখে আলোচনা করেছি। এটা না করলে আমার জীবন-খাতা থেকে এবং এদেশে নারী আন্দোলনের ইতিহাস থেকে একটি বিশেষ দিক এবং অধ্যায় বাদ পড়ে যেতো। বিষয়গুলো কারো কারো কাছে নিরস ঠেকবে। কিন্তু জীবনকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে হলে নিরস বিষয়েরও আলোচনা করতে হয়। আমি লেখক নই। তাই নিরস বিষয়কে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পেরেছি কিনা জানিনা। যদি না পেরে থাকি এই অক্ষমতার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার।

লোকাল কনসালটেটিভ উইড সাব-গ্রুপ

আমাদের দাতা সংস্থার নারী উন্নয়ন নেটওয়ার্কের কথা আগে লিখেছি। এর একটি মিটিংয়ে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল নারী উন্নয়ন লোকাল কনসালটেটিভ সাব-গ্রুপ গঠন করা যায় কিনা এর সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখা। বিশ্ব ব্যাংকের সভাপতিত্বে বিভিন্ন সেক্টর যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির জন্য Local Consultative sub-Group ছিল। এই

পরামর্শ-দলগুলোর সদস্য হলো বাংলাদেশে অবস্থিত দাতা সংস্থার প্রতিনিধিরা। প্রতি বছর এই সেক্টরগুলোর বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের সভাপতিত্বে কমপক্ষে একটা করে আলোচনা সভা হয়।

সাধারণত বাংলাদেশ এবং দাতা সংস্থাদের মধ্যে প্রতি বছর প্যারিসে যে কনসোর্টিয়াম মিটিং হয়— তারই প্রস্তুতি স্বরূপ ঢাকায় এই লোকাল কনসালটেটিভ সাব-গ্রুপগুলোর আলোচনা সভা হতো। প্যারিস মিটিংয়ে দাতাগোষ্ঠীরা কি কি ইস্যুর ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করবে, কোন্ সেক্টরে কি কি অবশ্যকরণীয় ইত্যাদি ছিল আলোচনার বিষয়। তাঁরা যে সব ইস্যুর ওপর মোটামুটিভাবে একমত হতেন সেগুলোই প্যারিস মিটিংয়ে আলোচনা করার কথা। এছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে দাতা সংস্থারা কিভাবে সহযোগিতা করতে পারে এবং কারা কোন্ কোন্ কর্মসূচিতে আর্থিক সহায়তা দিতে পারে— ইত্যাদিও এই সকল মিটিংয়ে আলোচিত হতো।

দাতাগোষ্ঠীরা যদিও কনসালটেটিভ সাব-গ্রুপগুলোর সদস্য, এই সভাগুলোতে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মচারিদেরও মাঝে মাঝে আমন্ত্রণ জানানো হতো। সাধারণত পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যের (আর্থ সামাজিক অবকাঠামো, সংক্ষেপে এস.ই.আই) নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ সরকারের তরফ থেকে এই সভায় যোগদান করতেন। পূর্বে নারী উন্নয়ন বিষয়ক কোন লোকাল কনসালটেটিভ সাব-গ্রুপ (এল.সি.জি) ছিল না। একপর্যায়ে এর প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করে আমাদের নেটওয়ার্ক থেকে নারী উন্নয়ন বিষয়ক এল.সি.জি সাব-গ্রুপ গঠন করার উদ্যোগ নেয়া হয়। বিশ্ব ব্যাংক যেহেতু এই প্রক্রিয়ায় প্রধান ভূমিকা পালন করে, প্রাথমিকভাবে ওয়াহিদা হককে এই ব্যাপারে দায়িত্ব দেয়া হয়। সকলের প্রচেষ্টায় ১৯৮৯ সালে এল.সি.জি উইড সাব-গ্রুপ গঠন করা হয়। সাধারণত ইউ.এন, মালটি-লেটারেল এবং বাই-লেটারেল দাতা সংস্থার প্রতিনিধি নিয়েই এই সাব-গ্রুপগুলো গঠিত। কিন্তু ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সুজান ডেভিস আমাদের নেটওয়ার্কে সক্রিয় ভূমিকা রাখে। এই কারণে তাকেও এই সাব-গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এভাবে আমরা নেটওয়ার্ক থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ আসনে উন্নীত হলাম। যেহেতু এই কাজগুলো প্রাথমিকভাবে আমিই শুরু করেছিলাম, আমাকে এই সাব-গ্রুপের কনভেনর নির্বাচিত করা হয় এবং ইউনিসেফকে এর সেক্রেটারিয়েট হিসেবে কাজ করার দায়িত্ব দেয়া হয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে বাৎসরিক প্যারিস কনসোর্টিয়াম মিটিংয়ে আমাদের নারী উন্নয়ন বিষয়ক কি কি ইস্যু উত্থাপন করা হবে, এর কার্যপত্র তৈরি করার বিষয়ে এই সাব-গ্রুপ থেকে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্যারিস মিটিং শেষে আমরা প্রায়ই জানতে পারতাম দিনের পর দিন পরিশ্রম করে আমরা যে কার্যপত্র তৈরি করতাম তার বিন্দুমাত্রও সেখানে আলোচনা হতো না। এতে আমরা হতাশাগ্রস্থ হলেও পরবর্তীকালের কর্মসূচি নির্ধারণে পিছপা হইনি কোনদিন। এই সাব-গ্রুপ নিয়মিতভাবে বৃহত্তর এল.সি.জি-র জন্য কার্যপত্র তৈরি করে দিতো। এই সময় শিরীন হক (ডানিডা), ওয়াহিদা হক (বিশ্বব্যাংক), সুজান ডেভিস, (ফোর্ড ফাউন্ডেশন) মিলিয়া আলী (ইউ.এন.ডি.পি),

Pioneer in village based website

জাকিয়া হাসান (নোরাড), মনিকা মালাকার (SIDA), সুফিয়া ইসলাম (CIDA), রাকা রশীদ (ইউ.এস.এইড), শিরীন লুৎফুন্নেসা (আই.এল.ও), তাহেরা আহমেদ, (ইউ.এন.এফ.পি.এ) এরা সকলে আমার হাতকে বিভিন্নভাবে শক্তিশালী করেছে। এমনি একটি উইড এল.সি.জি সাব-গ্রুপ মিটিংয়ে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং নারী উন্নয়ন কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কয়েকটি কর্মসূচি চিহ্নিত করা হয়। তার মধ্যে প্রথমটি ছিল ডানিডা প্রস্তাবিত Institutional Review of WiD Capability, দ্বিতীয়টি বিশ্ব ব্যাংক প্রস্তাবিত Multi-Sectoral Programme Identification Mission for WiD এবং তৃতীয়টি ছিল Establishment of WiD Focal Point in the Key Sectoral Ministries. উইড এল.সি.জি সাব-গ্রুপের সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারীদের জন্য জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা আরেকটি কর্মসূচি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উইড ফোকাল পয়েন্ট প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব নিয়েছিলাম ইউনিসেফের পক্ষ থেকে আমি।

১৯৯১ সালের ৪ জুন, বিশ্ব ব্যাংকে অনুষ্ঠিত এল.সি.জি মিটিংয়ে আমাদের প্রস্তাবিত উল্লেখিত কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করা হয়। এই মিটিংয়ে সরকারের তরফ থেকে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (এস.ই.আই) ড. একরাম হোসেন এবং যুগ্ম-প্রধান সালমা খান উপস্থিত ছিলেন। সালমা খান উইড ফোকাল পয়েন্ট এবং মাল্টি-সেকটোরেল প্রোগ্রাম আইডেনটিফিকেশন মিশনের প্রতি সমর্থন দেন কিন্তু ইনস্টিটিউশনাল রিভিউ-এর প্রতি আপত্তি জানান। খ্রিষ্টফার উইলোবি ছিলেন তখন বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডাইরেক্টর এবং সেই সুবাদে এল.সি.জি-র চেয়ারপারসন। তিনি এবং রয়্যাল ড্যানিস এম্বেসীর প্রধান কে.কে.নেইলসন অত্যন্ত জোরালোভাবে আমাদের সমর্থন দেন। বিভিন্ন দাতা সংস্থার প্রতিনিধিরাও সমর্থন সূচক ইঙ্গিত করেন। প্রচুর তর্ক-বিতর্কের পর আমাদের প্রস্তাবগুলো সকলের সমর্থন লাভ করে।

বিশ্বব্যাংক থেকে ওয়াহিদা হক মাল্টি-সেকটোরেল প্রোগ্রাম আইডেনটিফিকেশন মিশনের প্রারম্ভিক কাজ শুরু করেছিল। কিন্তু বেশিদূর এগুতে পারেনি। পরে ডানিডার অর্থানুকূল্যে শিরীন হক সাসেক্স থেকে ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিসের ড. নায়লা কবীরকে এর টামর্স অফ রেফারেন্স (টি.ও.আর) তৈরি করার জন্য কনসালটেন্ট নিয়োগ করে। তিনি আট পৃষ্ঠাব্যাপি টি.ও.আর তৈরি করেন এবং তাতে এই মিশন অতি জরুরিভিত্তিতে ফিল্ড করার জন্য সুপারিশও করেন। মাঝপথে কি হলো সঠিক স্মরণ করতে পাচ্ছিনা। এই মিশন আর বিশ্ব ব্যাংক ফিল্ড করলো না।

আমি উইড ফোকাল-পয়েন্ট প্রতিষ্ঠা করার জন্য নানাভাবে প্রচেষ্টা শুরু করলাম। পরবর্তীতে বারোটা মন্ত্রণালয়ে প্রাথমিকভাবে উইড ফোকাল-পয়েন্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সম্পর্কে পরে বিস্তারিত লিখেছি।

ডানিডা থেকে শিরীন হক জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং সমন্বয় করার দায়িত্ব নিয়েছিল। ১৯৯২ সালে অগাষ্ট মাসে Working for Women's Advancement শীর্ষক এই ট্রেনিং সম্পন্ন করা হয়। এতে প্রশিক্ষক হিসেবে এসেছিলেন ইংল্যান্ড থেকে Womankind নামক সংস্থার পরিচালক ড. কেইট ইয়াং এবং মালয়েশিয়া থেকে শান্তি

দাইরিয়াম (Executive Director, International Women's Rights Action Watch, IWRAW, Asia-Pacific)। সাতদিনব্যাপি ডানিডার সম্মেলন কক্ষে এই প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেন মোট বিশ জন উইড এল.সি.জি সাব-গ্রুপ সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারিবৃন্দ।

এদিকে শিরীন হক ইনস্টিটিউশনাল রিভিউ পর্যালোচনার প্রাথমিক কাজও শুরু করে। এর জন্য সাদার্ন ইলিনয় ইউনিভার্সিটি থেকে নাসিম আহমেদকে কনসালটেন্ট হিসেবে নিয়োগ করা হয়। ১৯৯২ সালে জুলাই মাসের দিকে এর টি.ও.আর তৈরি হয়ে গেল বটে কিন্তু রিভিউ করার সরকারি সম্মতি পাওয়া গেল ১৯৯৪ সালে। এই বছরে ডানিডা এক্সপার্ট গ্রুপ মিটিং করে এর একটা পুরোপুরি অবকাঠামো তৈরি করলো। এর মধ্যে উইড.এল.সি.জি দুইটি ওয়ার্কিং-গ্রুপও শিরীনের নেতৃত্বে কাজ করছিল। প্রথমটি হলো ১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্রস্তুতি; এবং দ্বিতীয়টি ইনস্টিটিউশনাল রিভিউ বিষয়ক। ১৯৯৫ সালের অক্টোবরে রিভিউর কাজ শুরু হয়। সংশ্লিষ্ট সকলের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর এক বছর সময়ের মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ করা হলো। সর্বমোট আটটি দাতা সংস্থার (ডেনমার্ক, কেনেডা, নরওয়ে, সুইডেন, ইউনাইডেট কিংডম, নেদারল্যান্ডস, ইউনিসেফ এবং ইউ.এন.ডি.পি) মিলিত উদ্যোগে এবং অর্থানুকূল্যে এই পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৮ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ডানিডার অর্থানুকূল্যে এর ওপর পাঁচ খণ্ডের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর বাস্তবায়ন সংস্থা ছিল। এই পর্যালোচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উন্নয়নের মূলধারার সাথে নারীকে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে এবং তাদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলোকে কি করে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী করা যায় ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং এর ভিত্তিতে যথাযথ সুপারিশমালা তৈরি করা।

ইনস্টিটিউশনাল রিভিউ সমন্বয় করে শিরীন হক। স্পষ্টভাষী শিরীন আমার স্নেহাস্পদ এবং অত্যন্ত প্রিয়। যে কোন কাজে হাত দিলে তা সে নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করে। যা বিশ্বাস করে তার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে দ্বিধা করেনা। সে অত্যন্ত দৃঢ় সঙ্কল্প, স্বাধীনচেতা এবং মুক্তমনের অধিকারী। উইড নেটওয়ার্ক, লোকাল কনসালটেটিভ সাব-গ্রুপ এবং জয়েন্ট-জিওবি-এফডিপি টাস্কফোর্স-এর প্রত্যেকটি কাজে সে আমাকে ছায়ার মতো ঘিরে ছিল। এসব কাজের প্রতিটি পদক্ষেপে সে আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে। শক্তিশালী করেছে। সমৃদ্ধ করেছে। অভিজ্ঞতা হয়তো আমার বেশি কিন্তু আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শিরীনের নারী উন্নয়ন বিষয়ক জ্ঞানের ভান্ডার অনেক বিস্তৃত। তার ছোটবোন নাসরীন হকও আমার অত্যন্ত প্রিয়জন। নাসরীনের প্রতিভা বহুমুখী। বিশেষ করে এসিডদগ্ধ নারীদের প্রাথমিকভাবে সংগঠিত করার ব্যাপারে তার উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টা দেখে আশান্বিত হয়েছি বারবার।

যাহোক, এল.সি.জি. উইড সাব-গ্রুপ নিয়মিতভাবে মিটিংয়ে মিলিত হতো। বিভিন্ন সময়ে বৃহত্তর এল.সি.জি-র জন্য সংশ্লিষ্ট ইনপুটও দিতো। জয়েন্ট জিওবি-এফডিপি উইড টাস্কফোর্সের কার্যপত্র ইত্যাদি নিয়মিতভাবে তৈরি করে দিতো। সেগুলি

নিয়মিতভাবে ফলো-আপ করা এবং বেইজিংয়ে বিশ্ব নারী সম্মেলন প্রস্তুতিতে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করা ইত্যাদিও ছিল এই গ্রুপের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তীকালে একটি পর্যালোচনামূলক রিপোর্টে দেখা যায় উইড এল.সি.জি সাব-গ্রুপই অন্যান্য সাব-গ্রুপের চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয় ছিল। ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত রেকর্ডের ভিত্তিতে দেখা গেছে, এই দল বছরে গড়ে প্রায় চৌদ্দটির মতো সভা করেছে।

১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাসে আমি যখন ইউনিসেফের প্রোগ্রাম প্ল্যানিং সেকশনের প্রধান হিসেবে যোগদান করি, তখন নিশ্চিন্তমনে এল.সি.জি উইড সাব-গ্রুপের কনভেনরের দায়িত্ব দিয়ে এলাম শিরীন হককে। ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সে এই গ্রুপের কনভেনর হিসেবে কাজ করে। ১৯৯৬ সালের জানুয়ারি মাসে এই দায়িত্ব ইউ.এন.ডি.পি-র হাতে অর্পণ করা হয়। বর্তমানে এর নতুন নামাকরণ করা হয়েছে। এখন এই দলকে LCG-WAGE, Women's Advancement And Gender Equality বলা হয়।

উইড ফোকাল পয়েন্ট

আগেই বলেছি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে WiD Focal Point প্রতিষ্ঠা করার জন্য মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করার দায়িত্ব আমিই নিয়েছিলাম। এই ফোকাল পয়েন্ট সৃষ্টি করার আসল উদ্দেশ্য ছিল এদেশের নারীদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা এবং এ সম্পর্কে জবাবদিহিতার সুস্পষ্ট প্রক্রিয়া গড়ে তোলা। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের একটা কৌশল হিসেবেও ওই সময় উইড ফোকাল পয়েন্ট প্রতিষ্ঠা করা যুক্তিসঙ্গত ছিল।

ইতোমধ্যে জুন মাসে (১৯৯১) অনুষ্ঠিত লোক্যাল কনসালটেটিভ গ্রুপ মিটিংয়ে সরকারপক্ষ এর সমর্থন জ্ঞাপন করে। পরবর্তীতে জয়েন্ট গভর্নমেন্ট-ফরেন ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্স টাস্কফোর্স মিটিংয়েও এই কর্মসূচি অনুমোদন লাভ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে উইড ফোকাল পয়েন্ট প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় ১৯৯১ সালে। কাজটা শুরু করার জন্য এল.সি.জি উইড সাব-গ্রুপ-এর তরফ থেকে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রালয়কে একটা চিঠি লেখা হলো। আমি এল.সি.জি সাব-গ্রুপ কনভেনরের পদাধিকারবলে সচিবের সাথে দেখা করে বিষয়টা সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ জানালাম। তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে অবিলম্বে কয়েকটি বিশেষ মন্ত্রণালয়ে উইড ফোকাল পয়েন্ট প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য নির্দেশ দেন। মন্ত্রণালয়ের প্ল্যানিং সেলের প্রচেষ্টায় এই কাজ বেশ দ্রুত অগ্রসর হয়। শিক্ষা, শিল্প, কৃষি,স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ, বন ও পরিবেশ, শ্রম ও জনশক্তি, লোকাল গভর্নমেন্ট ও পল্লী উন্নয়ন, মৎস্য ও পশুপালন, যুব উন্নয়ন, সমাজকল্যাণ, এবং রিলিফ ইত্যাদি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে এই দায়িত্ব দেয়া হয়। মহিলা মন্ত্রণালয় থেকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে সমন্বয়ের দায়িত্ব দিয়ে প্রাথমিকভাবে বারো জন উইড ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করা হয়।

মহিলা মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে এর টি.ও.আর তৈরি করার জন্য আমি ইউনিসেফ থেকে রাশেদা কে. চৌধুরীকে (বর্তমানে CAMPE-এর পরিচালক) কনসালটেন্ট নিয়োগ করলাম। রাশেদা আমার স্নেহভাজন। তার কর্মদক্ষতা সম্পর্কে আমার গভীর আস্থা ছিল। তাই টি.ও.আর-এর যে প্রথম খসড়াটা রাশেদা তৈরি করল তার ওপর আর আমার বিশেষ হাত চালাতে হলোনা, শুধু কিছুটা পরিমার্জন ছাড়া। এল.সি.জি সাব-গ্রুপেও এই টি.ও.আরটি বিশদভাবে আলোচনা করা হয়। ২৩ আগষ্ট (১৯৯২) এর খসড়া মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য পাঠালাম। এর সুপারিশ অনুযায়ী ফোকাল পয়েন্টদের ওরিয়েন্টেশন কোর্স করার জন্য একটা কার্যপত্রও পাঠানো হলো। ২০ অক্টোবর (১৯৯২) এই মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মিটিংয়ে এই টি.ও.আর অনুমোদন করা হয়। এই মিটিংয়ে উইড এল.সি.জি সাব-গ্রুপের কনভেনর হিসেবে আমিও উপস্থিত ছিলাম। এরপর ২৯ এবং ৩০ নভেম্বর (১৯৯২) দু'দিনব্যাপি উইড ফোকাল-পয়েন্টদেরকে এই ব্যাপারে ওরিয়েন্টেশন দেয়া হয়। তাতে ইউনিসেফের সহায়তায় তিনিটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়, ১. চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে উন্নয়নের মূলস্রোতে নারী ও উন্নয়ন; ২. নারী ও উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারি পদক্ষেপ; এবং ৩. নারী ও উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যবেক্ষণ। এই নিবন্ধগুলোর আলোকে ফোকাল পয়েন্টদের জন্য তৈরি খসড়া টি.ও.আরটি আবার পুংখানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা হয়। তাদের ভূমিকা কি হবে সে সম্পর্কেও আলোচনা হয়। এর ওপর ভিত্তি করে তাদের নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচিতে নারী উন্নয়ন ইস্যুগুলো চিহ্নিত করা ; সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাতে (এ.ডি.পি) নারী উন্নয়ন কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা; নারীর অবস্থা এবং সমস্যা সম্পর্কিত তথ্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা; তাদের আওতাভুক্ত যে কোন প্রকল্পে নারী উন্নয়ন কার্যক্রম যুক্ত করা; এবং প্রত্যেক সেক্টরের সাথে নিয়মিতভাবে অভিজ্ঞতা বিনিময় করা, তাদের প্রধান কাজ হিসেবে গৃহীত হয়। ফোকাল পয়েন্টগণকে নিয়মিতভাবে সক্রিয় রাখার জন্য সুনির্দ্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তাদের জন্য বৈঠক ও আলোচনা সভাকেও একটি কর্ম কৌশল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় সমন্বয়কারী সংস্থা হিসেবে ফোকাল পয়েন্টদের জন্য নিয়মিত ত্রৈমাসিক বৈঠকের ব্যবস্থা চূড়ান্ত করে। তাদের জন্য ছয় মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ছকও তৈরি করা হয়। অন্যদিকে আমি এই কর্মসূচিগুলো ইউনিসেফ সাহায্যপুষ্ট মহিলা মন্ত্রণালয়ের এডভোকেসি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করলাম। এই প্রকল্পের আওতায় ফোকাল-পয়েন্ট কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখলাম যেন এর বাস্তবায়ন কোনভাবে ব্যাহত না হয়। এভাবে ফোকাল পয়েন্ট কর্মসূচিকে আনুষ্ঠানিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং সাংগঠনিক রূপ দেওয়া হয়।

উইড ফোকাল-পয়েন্টগণকে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব নারী সম্মেলনের (১৯৯৫) প্রস্তুতি প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করার জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে চারটি বিশেষ অধিবেশন করা হয়েছিল। মনে পড়ে তাতে আমি এবং শিরীন হক ড্রাফ্ট প্ল্যাটফরম ফর একশন (পিএফএ) এর প্রতিটি বিষয় বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছিলাম।

ফোকাল পয়েন্টরাও এই আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ার মূল দলিলের সাথে ফোকাল পয়েন্টদের পরিচিতি ঘটানো এবং বাংলাদেশের প্রস্তুতি প্রক্রিয়ায় তাদেরকে সম্পৃক্ত করা, তারা যেন বেইজিং সম্মেলনের লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিজ নিজ কর্মস্থলে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। ফোকাল পয়েন্টগণ ড্রাফ্ট্ পি.এফ-এর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বলেছিলেন, পূর্বে এ সকল কাজে কেবলমাত্র মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করা হতো। আমাদের এই প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত করাতে বুঝতে পারলাম এর গুরুত্ব কতখানি। সংশ্লিষ্ট প্রতিটি মন্ত্রণালয় বেজিং প্রস্তুতিপর্বের সাথে পরিচিত হওয়া একান্ত দরকার। এই পর্বে আমাদের অনেক কিছু করণীয় আছে। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে কোন একটা বিদেশী দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা এই ব্যাপারে লিখিত আপত্তি জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এই কাজ করা এল.সি.জি.উইড সাব-গ্রুপের আওতায় আসেনা। বাংলাভাষায় আলোচনা করাতেও তাঁর আপত্তি ছিল। বিদেশীরা অনেক সময় বাংলাদেশী কর্মকর্তাদের ভূমিকার গুরুত্ব সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারে না। এতে অনেক সময় সমস্যার সৃষ্টি হয়।

যাহোক, ফোকেল-পয়েন্টদের ইতিবাচক উক্তিতে আমরা অনুপ্রাণিত হলাম। কেউ কেউ নারী উন্নয়ন বিষয়ে নিজ নিজ আওতায় বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। পরবর্তীতে এরই ফলশ্রুতি হিসেবে চারজন উইড ফোকাল-পয়েন্টকে বিশ্ব নারী সম্মেলনে যোগদান করার জন্য বেজিং পাঠানো হয়েছিল।

এইসব কাজগুলো বর্ণনা করা যতো সহজ, সম্পন্ন করা ততোই কঠিন। এই সুদীর্ঘ যাত্রায় অনেক উত্থান পতন হয়েছে। উইড ফোকাল পয়েন্ট কর্মসূচির সফলতার সঙ্গে শুরু করার পেছনে একজনের বিশেষ অবদান আছে। তার কথা উল্লেখ না করলে আমার এই অভিজ্ঞতা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তিনি হলেন মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্ল্যানিং সেলের সিনিয়র এসিসট্যান্ট সেক্রেটারি, জাহান আরা। যতদিন তিনি ছিলেন আমাদের কাজগুলো দ্রুত এগিয়েছে। এর প্রধান কারণ, জাহান আরা ফোকাল-পয়েন্ট প্রতিষ্ঠা করার কাজকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছিলেন। সমন্বয়কারী সংস্থা হিসেবে প্রথম বারোটি সেক্টরেল মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্টদের সাথে তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতেন। তাদের জন্য নিয়মিত আলোচনা সভা করতেন। মিটিংয়ের সিদ্ধান্তসমূহ সময়মত কার্যকরী করা হচ্ছে কিনা তার জন্য ফলো-আপ করতেন। এদিকে আমার সাথেও নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। এমন একটি দিনও যায়নি, যে দিন তার সাথে টেলিফোনে কথা হয়নি বা দেখা হয়নি। ত্রৈমাসিক ওয়ার্ক প্ল্যান তৈরি হলো কিনা, কার্যপত্রের অগ্রগতি কতখানি হলো ইত্যাদির জন্য জাহান আরা আমাকেও রীতিমত মনিটর করতেন।

মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে এই ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। এর আগে মহিলা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যত প্রকল্প বা কর্মসূচি হাতে নিয়েছি তার জন্য সবসময় আমাকেই দৌড়াতে হতো। আমি নিজে ফলো-আপ না করলে কোন কাজ যেন অগ্রসর হতো না। জাহান আরার এই সক্রিয় ভূমিকা দেখে আমি অত্যন্ত আশাবাদী হয়ে উঠলাম। কিন্তু পুরো কাজটা আবার

ঝিমিয়ে পড়লো যখন তিনি বদলি হয়ে গেলেন। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত আমি ইউনিসেফের পক্ষ থেকে এই কর্মসূচির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলাম। কখনো সজীব, কখনো দুর্বল হয়ে ফোকাল পয়েন্ট কর্মসূচি এগিয়ে চলছিল।

আনন্দের বিষয় আজ এই কর্মসূচির গুরুত্ব অপরিসীম। ফোকাল পয়েন্টগণ গুণগতভাবে এবং সংখ্যায় প্রসার লাভ করেছেন। এখন তাঁরা (২০০১) বারোজন থেকে ছিচল্লিশ জনে উন্নীত হয়েছেন। এরমধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সংস্থা,— Statistics Division; Planning Commission including General Economics Divison; Prime Ministers' Secretariat; Public Service Commission, IMED (Information, Monitoring, Evaluation Divison), NGO Bureau ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ১৯৯১ সালে যে বীজটি অঙ্কুরিত হয়েছিল এখন তা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে একটি দৃশ্যমান বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। নিঃসন্দেহে একে আরো শক্তিশালী করা দরকার।

নারী উন্নয়ন কর্মী হিসেবে যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা সবসময় চিন্তিত থাকতাম, সেগুলো সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার দরজা খোলা হয়েছে। সেগুলো প্রাতিষ্ঠানিকরণ করবার জন্য রাস্তার সন্ধান পাওয়া গেছে। এ পথ অত্যন্ত জটিল, কন্টকাকীর্ণ, সুদীর্ঘ। তারজন্য সঠিক কর্মকৌশল তৈরি করতে হবে। তা কার্যে পরিণত করতে হবে। আমরা অনেক সময় কর্ম-কৌশল তৈরি করে কর্তব্য শেষ করে ফেলি। তাকে বাস্তব রূপ দেয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখি না। এ দু'য়ের পার্থক্য অনুধাবন করে আমাদের ভবিষ্যতের পথে পাড়ি দিতে হবে। আমার বিশ্বাস সরকার এবং দাতাসংস্থাগুলোর সম্পৃক্ততায় একসাথে কাজ করলে আমরা অবশ্যই সফল হবো।

Bhumi.com
Bangla Blog and website

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : প্রথম নারী উন্নয়ন ম্যাক্রো অধ্যায়

তখন ইউনিসেফের অফিস ছিল ধানমন্ডির সাতমসজিদ রোডে ছয়টা বিল্ডিংয়ে বিস্তৃত। ট্রান্সপোর্ট বিল্ডিং সংলগ্ন টিনের ছাউনি ঘেরা ছিল আমাদের সম্মেলন কক্ষ। এই সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত দাতা সংস্থার নারী উন্নয়ন নেটওয়ার্কের একটা বিশেষ মিটিংয়ের কথা মনে পড়ে। সম্ভবত ১৯৮৭ সাল। তখন ইউনিসেফের ১৯৮৫–১৯৮৮ সালের তিন বছর মেয়াদী কান্ট্রি প্রোগ্রাম চলছে এবং নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী কান্ট্রি প্রোগ্রাম (১৯৮৮-১৯৯৩) সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছে। আমাদের উইমেনস্ ডেভেলপমেন্ট ইউনিটের তরফ থেকে বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নকে কিভাবে শক্তিশালী করা যায়, এসব নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছিলাম অনেকদিন ধরে। নারীকে উন্নয়নের মূল-ধারায় সম্পৃক্ত করতে হলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্থান পেতে হবে। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে ইউনিসেফের পক্ষ থেকে এককভাবে পা না বাড়িয়ে দাতাগোষ্ঠী হিসেবে আমরা একজোটে কিছু করতে পারি কিনা তা আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলাম। ইউনিসেফের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত উল্লেখিত মিটিংয়ে আমি প্রস্তাব করলাম, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী উন্নয়ন বিষয়ে ম্যাক্রো অধ্যায় সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে আমরা দাতা গোষ্ঠীর নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারি।

এতে কেউ অকুণ্ঠ সমর্থন জানালো। আর কেউ নেতিবাচক কথা বললো। আবার কেউ ঠাট্টার সুরে নানা মন্তব্য করলো। ডানিডার শিরীন হক এবং ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সুজান ডেভিস আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহ দিলো। বিশ্ব ব্যাংকের ওয়াহিদা হক বললো, দাতা সংস্থার তরফ থেকে দেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ম্যাক্রো চ্যাপটার সংযোজনের জন্য কাজ করা আপনার পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব নয়। তার এই বক্তব্য যুক্তিসম্পন্ন। আমরা দাতা গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হয়ে প্রত্যক্ষভাবে একাজ করতে পারিনা। কিন্তু এত নিরাশ না হয়ে বললাম, আমার সাড়ে আঠারো বছরের সরকারি চাকরি এবং ইউনিসেফে আট বছরের (তখন পর্যন্ত) অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কিভাবে এগুতে হবে তা আমার অজানা নয়। সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাকে সামনে রেখে এবং পশ্চাদ থেকে কাজ করে কিভাবে তাদেরকে শক্তিশালী করতে হয়, সে কৌশলও আমার অজানা নয়। সকলের সমর্থন এবং সহায়তা পেলে আমরা অবশ্যই জয়ী হবো।

আমি এই কাজকে চ্যালেন্জ হিসেবে গ্রহণ করলাম। শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও নিজের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমি প্রায়ই সফল হয়েছি। নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে এবং আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি সরকারি যেকোন সংস্থা আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেছে। এই অভিজ্ঞতার আলোকে আমি কোনদিন আত্মবিশ্বাস হারাইনি। আমার এই আত্মবিশ্বাস এবং কমিটমেন্টই সবসময় আমাকে পথ নির্দেশনা দিয়েছে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীকে উন্নয়নের মূলধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উপায় ও কৌশল খুঁজে বের করার প্রচেষ্টায় লেগে গেলাম। এর মধ্যে অনেক সময় গড়িয়ে গেল। ইউনিসেফের ১৯৮৮–১৯৯৩ কান্ট্রি প্রোগ্রাম তৈরি হয়ে গেল। Advocacy, Awareness and Strengthening of Information Base for Women in Development (AASIB) প্রজেক্টের আওতায় এই কাজের জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দ করে রাখলাম। এর বাস্তবায়ন সংস্থা ছিল মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর, তখনো অধিদপ্তরে উন্নীত হয়নি। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যের মধ্যে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী-উন্নয়ন বিষয়ক ম্যাক্রো অধ্যায় সম্পর্কিত কাজ করার জন্য একটি কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করলাম, "Facilitate planning for women in development activities at macro and project levels through workshops and study tours." (page-43, Master Plan of Operations, July 1988-June 1993,the Government of Bangladesh and Unicef).

এর মধ্যে নভেম্বরের ১২ তারিখ (১৯৮৮) দাতা সংস্থার উইড নেটওয়ার্কের একটা পরিবর্ধিত মিটিং করলাম ইউনিসেফে। এতে দাতাসংস্থার প্রতিনিধি ছাড়াও পরিকল্পনা কমিশন, মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সেক্টরের উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাগণ ও সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্মকর্তাসহ মোট তেইশ জন উপস্থিত ছিলেন। দাতা সংস্থা নারী উন্নয়ন বিষয়ে কি চিন্তা ভাবনা করছে তা বিশেষ করে সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করাই ছিল এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য। আমি চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীকে ম্যাক্রো ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করার বিষয়টা আবার উত্থাপন করলাম। এই সভার ফলো-আপ হিসেবে ২৪ নভেম্বর শুধু দাতা সংস্থাকে নিয়ে আর একটা মিটিং

করলাম। তাতে পূর্বের সব পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে নারী উন্নয়ন কর্মসূচির ওপর পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধ পাঠ করার জন্য অনুরোধ করেছিলাম তাহরুন্নেসা আবদুল্লাহকে। এর ওপর বিশদ আলোচনা হয়। এই আলোচনার সারমর্ম হিসেবে দেখা গেল পূর্ববর্তী পরিকল্পনাগুলোতে নারী উন্নয়নকে অত্যন্ত সংকীর্ণভাবে এবং একটা সেক্টর হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। যদিও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীকে সম্পৃক্তকরণের উল্লেখ আছে, শেষ পর্যন্ত এর অর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের জন্য ছোট ছোট কল্যাণমূলক প্রকল্প। এর জন্য নারী উন্নয়ন মাইক্রো অধ্যায়ে খুব সামান্য অর্থ বরাদ্দ ছিল। অন্যান্য সেক্টরে নারী উন্নয়নকে বিবিধ আইটেম হিসেবে যোগ করা হতো এবং তার ওপর যথাযথ গুরুত্ব কোনদিন দেয়া হয়নি।

এই সভাতেই সিদ্ধান্ত হলো চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরির সময় আমরা অর্থাৎ দাতা সংস্থারা সকলে যথাসাধ্য ইন্‌পুট দিতে চেষ্টা করবো। এই কাজের জন্য দশ জন দাতা সংস্থার সদস্য নিয়ে আমরা একটি টাস্কফোর্স গঠন করলাম। এর সদস্যরা ছিলেন সুজান ডেভিস (ফোর্ড ফাউণ্ডেশন), নূজহাত এহসান (ইউ.এন.ডি.পি), ওয়াহিদা হক (বিশ্ব ব্যাংক), তাহেরা আহমেদ (ইউ.এন.এফ.পি.এ), এঞ্জেলা রাইনবাক (ডব্লিউ. এফ.পি), সোফিয়া ইসলাম (সিডা), লাডলি ফয়েজ (ওডিএ), এলিজাবেথ আই (নোরাড), খ্রিস্টফার ওয়েইড (ব্রিটিশ কাউন্সিল), শিরীন হক (ডানিডা) এবং জওশন আরা রহমান (ইউনিসেফ)। আমাকে এই টাস্কফোর্সের ফোকাল পয়েন্ট করা হলো। এই সময় এন্টনী কেনেডী আমাদের রিপ্রেজেনটেটিভ এবং সেলী কেলক সিনিয়র প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর ছিলেন।

Pioneer in village based website

এই টাস্কফোর্সের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেকে নিজ নিজ সংস্থার মাধ্যমে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ইন্‌পুট দেয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করাও এই টাস্কফোর্সের অন্যতম উদ্দেশ্য। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে দাতা সংস্থারা বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সুজান ডেভিসের উদ্যোগে Women and Development in Bangladesh, Challanges and Opportunities শিরোনামে ১৯৮৯ সালের মার্চ মাসে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। ড. রওনক জাহান এই রিপোর্টের প্রণেতা, সেই সময় যিনি বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তিনি আমাদের সামনে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

তখন সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন রেজওয়ানুল হক চৌধুরী এবং প্রতিমন্ত্রী ছিলেন গিয়াসউদ্দীন আহমদ। মহিলা পরিদপ্তরের পরিচালক ছিল গুল আফরুজ মাহবুব। এডভোকেসি প্রজেক্টের সূত্র ধরে সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রীর সঙ্গে আমি একদিন দেখা করলাম। তাঁকে আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করলাম। তিনি আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, এটা অত্যন্ত জরুরি বিষয়, এই ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। তাঁকে আরো জানালাম, সময় অত্যন্ত কম। এ ব্যাপারে পরিকল্পনা কমিশনে যোগাযোগ করলে আমাদের ফলো-আপ করতে সুবিধা হবে। তিনি তৎক্ষণাৎ পরিকল্পনা মন্ত্রী এ.কে খোন্দকারের সাথে টেলিফোনে কথা বলে বিস্তারিত জানালেন এবং আমাকে ফলো-আপ করতে বললেন।

এদিকে ইউনিসেফ সাহায্যপুষ্ট এডভোকেসি প্রকল্পের অন্যতম কার্যক্রম হিসেবে মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তরের মাধ্যমে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নমূলক উপকরণ দেয়ার প্রচেষ্টায় একটি জাতীয় কর্মশালারও আয়োজন করা হলো। ৭-৮ ই জুন (১৯৮৯) নীলক্ষেত পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমিতে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। তখন এডভোকেসি প্রকল্পের পরিচালক ছিলেন মহিলা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা মেহেরুন্নেসা চৌধুরী। এই কর্মশালার প্রধান সমন্বয়ক ছিলেন আসফিয়া ডুজা (ওই সময় এসিসট্যান্ট প্রফেসর, সোসিওলজী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)। ওয়ার্কশপে তিনটা প্রধান বিষয়ের ওপর মোট তেরোটা পলিসি পেপার উপস্থাপন করা হয়। এর মধ্যে একটা ছিল Incorporating WiD in the Planning Process: Pertinent Issues for Macro Framework and Secroral Planning, উপস্থাপন করেন আসফিয়া ডুজা এবং আবু আহমদ আরিফ (যুগ্ম-প্রধান, শিক্ষা ডিভিশন, প্ল্যানিং কমিশন)। এছাড়া সালমা খান, সালমা সোবহান (আইন ও সালিশ কেন্দ্র) , মাহমুদা ইসলাম (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), রিতা আবসার (বি.আই.ডি.এস), নূরুল ইসলাম খান (সমাজকল্যাণ বিভাগ), রাশিদা আখতার খানম (বিসিক)— বিভিন্ন পলিসি পেপার উপস্থাপন করেন। তাহরুন্নেসা আবদুল্লাহ এবং আমি নারী উন্নয়নে এনজিওর ভুমিকা শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করি। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদও এই কর্মশালায় তাদের বক্তব্য দিয়ে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী উন্নয়ন ম্যাক্রো চ্যাপ্টারের প্রতি সমর্থনসূচক একটি লিফলেট বিলি করেছিল। এই সময় নারী নেত্রী মালেকা বেগম এবং আয়শা খানম মহিলা পরিষদের তরফ থেকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

Gramati.com
Pioneer in village based website

দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, পরিকল্পনাবিদ, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, গবেষক, উন্নয়নকর্মী, এনজিও এবং দাতা সংস্থার প্রতিনিধিসহ মোট তিন শ' জন এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরিকল্পনামন্ত্রী এ.কে খন্দকার প্রধান অতিথি এবং সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী রেজওয়ানুল হক চৌধুরী ছিলেন বিশেষ অতিথি। এই কর্মশালাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আখ্যায়িত করে পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেন, নারীকে অবশ্যই উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা উচিত। এই ব্যাপারে সর্বপ্রকার সহায়তা প্রদানে তিনি অঙ্গীকারাবদ্ধ হন। সেলী কেলক ইউনিসেফের অফিসার-ইন-চার্জ হিসেবে এডভোকেসি প্রকল্পের মাধ্যমে সবরকম সাহায্য দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনটি প্রধান সেশনের সভাপতিত্বে ছিলেন তৎকালীন কেবিনেট সেক্রেটারি মুজিবুল হক, শিক্ষা সচিব হেদায়েত আহমেদ এবং সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব আজিজুল হক। সর্বশেষ সেশনে সভাপতিত্ব করেন এ.এন.এম.ইউসুফ, তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব। এতসব বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের যোগদান এবং অত্যন্ত ইতিবাচক উৎসাহে এই কর্মশালায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয়—নারী উন্নয়নকে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ম্যাক্রো ফ্রেমওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত করতেই হবে।

কিন্তু তারপর কি হলো তাও আলোচনা করার প্রয়োজন অনুভব করছি। এই কর্মশালার ফলশ্রুতিতে মহিলা পরিদপ্তর ধরেই নিল যে সরকারের উদ্দেশ্য সফল হয়ে গেছে এবং 'নারী উন্নয়ন ম্যাক্রো অধ্যায়' হিসেবে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সম্পৃক্ত

হয়ে যাবে। কিন্তু ধারণা আর বাস্তবের মধ্যে অনেক পার্থক্য থেকে যায়। এই আশংকায় আমি এর ফলো-আপ করা শুরু করলাম। জুন মাসের ২০ তারিখ (১৯৮৯) সেলী কেলক এবং আমি পরিকল্পনা মন্ত্রীর সাথে আবার দেখা করলাম। ২২ জুন ইউনিসেফ থেকে তাঁর কাছে একটি চিঠি দিয়ে পুনরায় এই ব্যাপারে অনুরোধ করা হয় এবং এর কপি কাজী ফজলুর রহমান (সদস্য, আর্থ সামাজিক অবকাঠামো, পরিকল্পনা কমিশন) এবং সালমা খানকে দেয়া হয়। এই সময় পরিকল্পনা কমিশনে যুগ্ম-প্রধান (স্পোর্টস, কালচার, যুব উন্নয়ন, সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক, সংক্ষেপে স্কাইসোয়াম) ছিলেন সালমা খান। সালমা এবং তার স্বামী হাবিবুল্লাহ খান আমাদের বহু বছরের বন্ধু। আমার সেজভাই শাহাবুদ্দীনের বন্ধু হিসেবে রানু ভাইয়ের (হাবিবুল্লাহ খান) সাথে আমাদের পরিচয়। তিনি সদালাপী, বন্ধুবৎসল এবং অত্যন্ত প্রাণবন্ত। চট্টগ্রামে থাকতে আমরা একসাথে অনেক অনন্দঘন সন্ধ্যা কাটিয়েছি। আমাদের এই অভিযানে সালমার সহায়তা পাবো ভেবে মনে মনে উৎসাহিত বোধ করলাম। তিনি এই সময় পরিকল্পনা কমিশনে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকায় আমাদের বিশেষ সুবিধা হলো। তার কাছ থেকে সঠিক পরামর্শ না পেলে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হতো কিনা সন্দেহ। তাকে সবসময় দেখেছি অত্যন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং কর্মদক্ষ। সালমার সাথে দেখা করলাম। তিনি বললেন, আপনারা অনেক দেরি করে ফেলেছেন। এই প্রচেষ্টা অনেক আগে শুরু করা উচিত ছিল। যাহোক, সবাই একজোটে চেষ্টা করে দেখা যাক। সালমার পরামর্শে পরিকল্পনা কমিশন শিক্ষা ডিভিশনের যুগ্ম-প্রধান আবু আহমদ আরিফ এবং জেনারেল ইকনমিক্স ডিভিশনের যুগ্ম-প্রধান মামদাল হোসেনের সাথে দেখা করলাম। আমরা তিনজন সালমার সাথে প্রায় একঘন্টা আলোচনা করলাম। মামদালও পুনরায় ব্যক্ত করলেন, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ অনেকখানি এগিয়ে গেছে। ম্যাক্রো বিষয় হিসেবে অন্যান্য সেক্টরের বিস্তৃত বিবরণ তৈরি হয়ে গেছে। এই বিবরণ তৈরি করার বিভিন্ন স্তরে নানা পদ্ধতি আছে। এসব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নারী উন্নয়ন বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরি করার সময় অতিক্রম হয়ে গেছে। মন্ত্রী পর্যায় পর্যন্ত এতসব অঙ্গীকার সত্ত্বেও এই কাজ করা এখন সম্ভব নয়। এটা করতে হলে জেনারেল ইকনমিক্স ডিভিশনের তৈরি সোস্যাল ডেভলপমেন্ট ম্যাট্রিক্স অনুযায়ী নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত উপকরণ যোগাড় করতে হবে। এটা অত্যন্ত টেকনিক্যাল প্রক্রিয়া এবং সময়সাপেক্ষ।

জেনারেল ইকনমিকস ডিভিশনের সাহায্য ছাড়া আমাদের পক্ষে কোন ভাবেই আর অগ্রসর হওয়া যাবে না। তাছাড়া মামদাল যদি রাজী না হয় তাহলে এখানেই ইতি টানতে হবে। তাই নাছোড়বান্দার মতো আবার আলোচনা শুরু করলাম। অনেক তর্ক বিতর্কের পর এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য চার সদস্যবিশিষ্ট একটি টাস্কফোর্স গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু সালমা বললেন, এর জন্য ওপর থেকে নির্দেশ না আসলে আমি এই সম্পর্কে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবোনা। এই নির্দেশ সংগ্রহ করার জন্য আমি এবং সেলী কেলক আবার দেখা করলাম পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য কাজী ফজলুর রহমানের সাথে। ইউনিসেফের তরফ থেকে এই মর্মে অনুরোধ জানিয়ে তাঁর কাছে একটা চিঠিও (pp 2.5.1/666/1 dated 31 July 1989) দেয়া হয়। তাতে সালমা খানকে টিম লিডার

Pioneer in village based website

করে আবু আহমদ আরিফ, মামদেল হোসেন, নূর হোসেন (ডেপুটি চীফ, প্ল্যানিং সেল, সমাজকল্যাণ ও মাহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়) এবং জওশন আরা রহমান এই চারজন সদস্য নিয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করার প্রস্তাব করা হয়। এই ব্যাপারে সর্বপ্রকার আর্থিক সাহায্য দেয়ার প্রতিশ্রুতিও ইউনিসেফের তরফ থেকে পুনরায় ব্যক্ত করা হয়।

এই প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে কাজী ফজলুর রহমানের নির্দেশে অনতিবিলম্বে পরিকল্পনা কমিশনের অফিস থেকে সকলকে অবগত করা হয়। এই নির্দেশের ভিত্তিতে আমরা (টাস্কফোর্সের সদস্যগণ) পরিকল্পনা মন্ত্রী, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য এবং সম্পর্কিত সকলের সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনা করি। এরই ফলশ্রুতিতে ইউনিসেফের উদ্যোগে সালমা খানের নেতৃত্বে Integration of Women in Development in the Fourth Five Year Plan 1990-1995: Macro and Micro Issues on WiD, (Dhaka, November 1989) এই শিরোনামে একটি রিপোর্ট তৈরি করা হয় এবং তা ইউনিসেফের তরফ থেকে ছাপানো হয়। এত দিনের অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝতে বাকি রইলো না, কেবল রিপোর্ট তৈরি করে অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌছানো যায় না। সময়মত তার ফলো-আপ না করলে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।

এই সময় ইউনিসেফ বাংলাদেশের প্রতিনিধি ছিলেন কোল.পি.ডজ। তিনি নির্ভয় দিয়ে সব সময় আমাকে বলতেন Jowshan Go ahead, do whatever you want, I am with you. আমার এই সংগ্রামে বসের কাছ থেকে এই ধরনের স্বাধীনভাবে কাজ করার যে সুযোগ এবং উৎসাহ পেয়েছি তা সবসময় মনে পড়ে। মনে পড়ে আমি আন্তর্জাতিক পোস্টের জন্য দরখাস্ত করবো কিনা, এই বিষয়ে কোল ডজের সাথে একবার আলাপ করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, The contribution that you can make in Bangladesh, cannot be done in any other country. The country needs you. The work you have started to incorporate WiD Macro Chapter in the National Five Year Plan, should be continued until the final result is achieved. Without you this work may be left unfinished. তাঁর এই উপদেশ আমার জন্য ছিল আশীর্বাদ স্বরূপ।

আগের বিষয়ে ফিরে আসি। ইতোমধ্যে দাতা সংস্থারা আরো সক্রিয় ভূমিকা-গ্রহণে তৎপর হয়। এল.সি.জি উইড সাব গ্রুপের মিটিংয়ে আমরা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ম্যাক্রো চ্যাপটার বিষয়ক কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা নিয়মিতভাবে শুরু করলাম। ১৯৮৯ সালের ৭ ডিসেম্বর থেকে ইউ.এন.ডিপির উদ্যোগে জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি উইড মিশন এলো। এই মিশনের সদস্যরা ছিলেন নিউজিল্যান্ডের মেরিলীন ওয়ারিং, নেপালের চাঁদনী যোশী এবং বাংলাদেশের শামীম হামিদ। Strategies to Incorporate Women in the Attaiment of the Goals of the Fourth Five Year Plan, Report of a UNDP Mission to the Planning Commission, এই শিরোনামে ইউ.এন.ডি.পি একটি রিপোর্ট তৈরি করলো।

ওই সময় বিভিন্ন বেসরকারি নারী সংগঠনও বেশ সক্রিয় হয়ে ওঠে। Women for Women এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তারাও সাংবাদিক সম্মেলন করে।

Pioneer in village based website

পরিকল্পনা মন্ত্রীর সাথে দেখা করে। Women and National Planning in Bangladesh এই শিরোনামে অক্টোবর মাসে (১৯৮৯) তিন দিনব্যাপী একটি কর্মশালার আয়োজন করে। এই কর্মশালায় দাতা সংস্থাদের ভূমিকা সম্পর্কে বক্তব্য রাখার জন্য আমাকেও তারা সুযোগ দিয়েছিল (১৬ অক্টোবর ১৯৮৯)। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করার সময় ড. নাজমা চৌধুরী (প্রফেসর, পলিটিক্যাল সাইন্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) Women for Women এর প্রেসিডেন্ট এবং ড. মাহমুদা ইসলাম (এসোসিয়েট প্রফেসর, সোসিওলজি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ছিলেন জেনারেল সেক্রেটারি। ইউনিসেফের বিভিন্ন কর্মসূচিতে দু'জনের কাছ থেকে যথেষ্ট সহায়তা পেয়েছি। বিশেষ করে মনে পড়ে যখন ইউনিসেফের প্রথম Strategy Paper on Women in Development তৈরি করলাম, তখন নাজমা এবং মাহমুদা দু'জনেই মূল্যবান অবদান রেখেছেন। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। পরবর্তীকালে আমি Women for Women এর সাধারণ সদস্য হিসেবে অনেকের সঙ্গে মেশার সুযোগ পেয়েছি। আমাদের দেশের নারীদের অবস্থা, অবস্থান, সমস্যা, অবদান ইত্যাদি বিষয়ে এই সংগঠনের প্রচুর গবেষণা কাজ রয়েছে। এরসাথে যুক্ত হতে পেরে আমি নিজেকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করতে পেরেছি।

এর মধ্যে সমাজকল্যাণ এবং মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভক্ত হয়ে গেলো। নতুন মন্ত্রী হিসেবে রাজিয়া ফয়েজ মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তী কর্মসূচি নির্ধারণ করার জন্য উইড এল.সি.জি সাব-গ্রুপের সভা আহ্বান করলাম। এতে দু'টি সিদ্ধান্ত হয়, আমাদের তরফ থেকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী উন্নয়ন ম্যাক্রো অধ্যায় সম্পৃক্তায়ন কর্মসূচি সম্পর্কে নতুন মন্ত্রীকে ব্রিফ করা এবং তাঁর মাধ্যমে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে একটি অনুরোধ পত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করা। এই প্রেক্ষিতে আমি একটি ব্রিফিং নোট তৈরি করলাম এবং তাঁর সাথে ২৬ এপ্রিল (১৯৯০) দেখা করলাম। তিনি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারিকে আমার নোটটি দিয়ে বললেন, এর ওপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা মন্ত্রীর কাছে জরুরিভিত্তিতে একটি চিঠি পাঠিয়ে দেন। কয়েকদিন পর সালমা খানের সাথে দেখা করতে গেলে জানতে পারলাম মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে সেই চিঠিটি এসেছে। এদিকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করে উইড এল.সি.জির তরফ থেকে মাহিন সুলতান ও ফারা গজনবীকে দিয়ে ডানিডা একটি প্রতিবেদনও তৈরি করলো।

এই সময় জানতে পারলাম চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম খসড়া তৈরি হয়ে গেছে। এই খসড়া পর্যালোচনার জন্য ১৯ থেকে ২১ জুন (১৯৯০) পর্যন্ত পরিকল্পনা কমিশন একটি মুক্ত আলোচনার আয়োজন করে। Joint Government-Donors' Task Force on WiD-এ দাতা সংস্থার তরফ থেকে সমন্বয়কারি হিসেবে আমিও এতে অংশগ্রহণ করার আমন্ত্রণ পেলাম। এর কার্যপত্র হিসেবে বিতরণ করা নারী উন্নয়ন ম্যাক্রো চ্যাপ্টারের খসড়া পড়ে আমি দারুণভাবে হতাশ হলাম। সকলের এতসব প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও আমাদের অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছবার মত এখানে কিছুই প্রতিফলিত হয়নি। এতে নারীকে উন্নয়নের মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করার কোনরকম ইঙ্গিত

Pioneer in village based website

থাকাতো দূরের কথা বরং তাদেরকে কেবল উন্নয়নের ফল ভোগকারী হিসেবে দেখানো হয়েছে। এটাকে বেশ প্রতিক্রিয়াশীলও বলা চলে। শুধুমাত্র কল্যাণমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে নারী উন্নয়ন কর্মকৌশলকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ এবং অস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। জনান্তিকে বলে রাখি, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার এই প্রথম খসড়াটি আমার কাছে বহু বছর সংরক্ষিত ছিল। দুঃখের বিষয় কেবলমাত্র বছর দুই আগে (১৯৯৯) আমার বুক-শেলফ পরিষ্কার করার সময় এই মোটাকৃতি খসড়াটি ফেলে দিয়েছি। যদি থাকতো, এখানে তার কিছুটা উদ্ধৃতি দেওয়া যেতো। এর বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে জোরালো প্রতিবাদ করার ব্যাপারে সালমা খানের সাথে আলোচনা করলাম। সালমা সবসময়ই সুপরামর্শ দিয়ে আমাদের সঠিক পথে পরিচালনা করেছেন। দাতা সংস্থা এবং নারী সংগঠন সকলে একজোট হয়ে আমাদের স্ট্রেটেজি ঠিক করা হলো, আমরা এর জোরালো প্রতিবাদ করবো এবং সেইভাবে প্রস্তুতি নেবো।

১৯ জুন মুক্ত আলোচনা শুরু হলো। ড. শেখ মকসুদ আলী, জেনারেল ইকনমিকস ডিভিশনের সদস্য প্রথম অধিবেশনে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপরেখা উপস্থাপন করেন। সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন পরিকল্পনা ডিভিশনের সচিব এ.কে.এম.আমিনুল হক। উদ্বোধন করেন ফাইনান্স এবং পরিকল্পনা মন্ত্রী মোহাম্মদ আব্দুল মুনীম। দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন ড. এ. এইচ. শাহাদতুল্লাহ, (প্রাক্তন সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন)। মকসুদ আলী ম্যাক্রো ইস্যুগুলোর ওপর আলোকপাত করেন। তাঁর উপস্থাপনায় যদিও নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় আনার কথা বলা হয়, কিন্তু চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম খসড়ায় নারীকে প্রধানতঃ কল্যাণমূলক কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়।

সালমা খান আমাদের সমর্থনে জোড়ালো বক্তব্য রাখলেন। এই সময় মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদিকা মালেকা বেগম দেশের বাইরে ছিলেন। আয়শা খানম সাধারণ সম্পাদিকার দায়িত্বে ছিলেন। তিনি আমাদের পক্ষ থেকে যুক্তিসম্পন্ন শক্তিশালী বক্তব্য রাখলেন। দাতা সংস্থার তরফ থেকে আমিও উপস্থাপিত খসড়ার প্রতিবাদ করলাম। সম্মিলিত প্রতিবাদের ঝড়ের মুখে পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাগণ আমাদের সমালোচনাকে ইতিবাচক হিসেবে গ্রহণ করলেন এবং নারী উন্নয়ন অধ্যায়কে পুনর্বিন্যাস করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাহায্য গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। এই সুবর্ণ সুযোগ দেয়ার জন্য তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। এই সুযোগ না পেলে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ম্যাক্রো অধ্যায় নারীর জন্য উন্নয়নমূলক এবং প্রগতিশীল না হয়ে, পশ্চাদগামী এবং প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারতো। এইভাবে আমরা এই দুর্গম পথের প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করলাম।

স্বাভাবিকভাবে স্কাইসোয়ামের যুগ্ম-প্রধান হিসেবে এই দায়িত্ব সালমা খানের ওপর এসে পড়লো। মামদেল, আরিফ এবং আমি ইউনিসেফ প্রকাশিত রিপোর্টকে সংক্ষিপ্ত করে একটি খসড়া তৈরি করলাম। নারীর সামগ্রিক উন্নয়ন প্রেক্ষিত সামনে রেখে সালমা খান এই খসড়াকে পরিকল্পনা কমিশনের চাহিদামত পরিমার্জিত করলেন এবং জেনারেল

ইকনমিক্স ডিভিশনে পাঠালেন। শেষবারের মত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তা গ্রহণ করা হয়।

এভাবে বাংলাদেশের পরিকল্পনা ইতিহাসে প্রথমবারের মতো চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী উন্নয়ন ম্যাক্রো অধ্যায় সম্পৃক্ত করা হয় (পৃষ্ঠা VIII-1 থেকে VIII-5)।

এই প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন ধরে চলেছে। ম্যাক্রো অধ্যায়ের কথা যেদিন প্রথম চিন্তা করা হয়েছিল (১৯৮৭) সেদিন থেকে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত (১৯৯৫) প্রায় আট বছর অতিবাহিত হয়েছে। এরমধ্যে অবশ্য দ্বিতীয় সংশোধিত কপি ছাপানো হয় (মার্চ ১৯৯১)। ১৯৯৩ সালের মার্চ মাসে এই খসড়া পরিকল্পনা ন্যাশনাল ইকনমিক্ কাউন্সিলে চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। এই সুদীর্ঘ সময়-সীমার মাঝে আমার ডায়রি অনুযায়ী আমি একানব্বই বার পরিকল্পনা কমিশনে এবং পয়ষট্টি বার মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পরিদপ্তরে গিয়েছি কেবলমাত্র চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ব্যাপারে। মন্ত্রী থেকে কেরানী পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। এক একজনের টেবিলে গিয়ে বার বার ফলো-আপ করেছি।

যে চ্যালেঞ্জ একদিন গ্রহণ করেছিলাম তা কার্যে পরিণত করতে আমরা সক্ষম হয়েছি। অতি মূল্যবান এই চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি কপি সযত্নে আমার বইয়ের শেল্‌ফ-এ সংরক্ষিত আছে। চিরদিন থাকবে। মাঝে মাঝে একে স্পর্শ করে আমি পুরোনো দিনের স্মৃতি থেকে ভবিষ্যতের পাঠ নেয়ার উৎসাহ পাই।

Shunati.com
Pioneer in village based website

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : প্রথম শিশু উন্নয়ন ম্যাক্রো অধ্যায়

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা 'উন্নয়নে নারী' বিষয়ক ম্যাক্রো অধ্যায়ের কাজ অনেকখানি এগিয়ে গেছে। এর মধ্যে ইউনিসেফের সিনিয়র প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর সেলী কেলক বদলী হয়ে নিউইয়র্কে চলে গেলেন। বার্টি মেন্‌ডিস তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি নারী সম্পর্কিত ম্যাক্রো অধ্যায়ে আমাদের প্রচেষ্টার কথা শুনেছেন। একদিন ইউনিসেফের সেকশন চিফদের মিটিংয়ে বললেন, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় 'শিশু উন্নয়নের' ওপর একটা ম্যাক্রো অধ্যায় থাকা দরকার, আমি কোন সাহায্য করতে পারি কিনা। আমি বললাম, এখন নারী এবং শিশু দু'টি অধ্যায়ের কথা বললে নারী উন্নয়ন ম্যাক্রো অধ্যায়ের গুরুত্ব কমে যাবে। তাই এখন একটার ওপরেই জোর দেয়া উচিত। আগামীতে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিশু অধ্যায়ের জন্য চেষ্টা করা যাবে।

মেনডিস আমার কথায় সন্তুষ্ট হলেন না। বেশ কয়েকদিন পরিকল্পনা কমিশনে যাওয়া-আসা করলেন। অনেকের সাথে দেখা করলেন। কিন্তু অগ্রসর হতে পারলেননা। তখনও বাংলাদেশ সরকারের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে তাঁর তেমন ধারণা হয়নি। এছাড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রস্তুতি পর্ব যে এত সুদীর্ঘ এবং জটিল তাও বোধকরি তিনি ভাবতে পারেননি। আসলে প্রথমে এসেই তড়িঘড়ি করে কোন কাজে হাত নেয়া উচিত নয়। এদেশের সংস্কৃতি, নিয়ম-কানুন, রীতিনীতি ইত্যাদি জানার জন্য যেকোন বিদেশী কর্মকর্তার কিছু সময় ব্যয় করা দরকার। এই ব্যাপারে দেশীয় কর্মকর্তারা যথেষ্ট সাহায্য

করতে পারে। বিদেশী এবং দেশী কর্মকর্তা একসাথে কাজ করলে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছবার পথ অনেকটা মসৃণ হতে পারে।

আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করার কিছু সুবিধা আছে। আমি অনায়াসে আমার 'বস'কে 'না' করে দিলাম। যা ভেবেছি তা নির্বিঘ্নে বলে দিলাম। তাতে আমি অসুবিধা বোধ করলাম না। কিন্তু যখন সরকারি চাকরি করতাম তখন আমার মূল্যবোধ ছিল অন্যরকম । 'বস' যা বলেন, তা আমার পছন্দ না হলেও করতেই হবে। তাতে 'না' করা অভদ্রতা। এভাবে আমি সাড়ে আঠার বছর সরকারি চাকরি জীবন কাটিয়েছি।

যাহোক, 'শিশু উন্নয়ন' পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ম্যাক্রো অধ্যায় হিসেবে সম্পৃক্ত করতে হবে, এই ধারণাটা আমার মাথায় বার্টি মেনডিসই ঢুকিয়েছিলেন। নারীদের মতো শিশুদেরকেও কোন বিশেষ সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তাদের উন্নয়নের জন্য সব সংশ্লিষ্ট সেক্টরে কাজ করতে হবে। এই কারণে ম্যাক্রো ইস্যু হিসেবে শিশু উন্নয়ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রতিফলিত হওয়া উচিত।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরির যখন সময় এলো তার আগে আমি ইউনিসেফ থেকে অবসর গ্রহণ করেছি। কিন্তু ইউনিসেফের প্ল্যানিং অফিসার ইয়ামীন মজুমদার আমাকে ছাড়লোনা। সে আমার সাথে প্রোগ্রাম প্ল্যানিং সেকশনে দু'বছর কাজ করেছে। ধীরস্থির, শান্তিপ্রিয় এবং অত্যন্ত অমায়িক। শিষ্টাচারী ইয়ামীন সকলের কাছে প্রিয়। National Plan of Action for Children, 1997-2002 তৈরি করার ব্যাপারে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করার জন্য ইউনিসেফের তরফ থেকে ইয়ামীন আমাকে কনসালটেন্ট হিসেবে নিয়োগ করে। এই কনসালটেন্সির টার্মস অফ রেফারেন্সে একটা লাইন জুড়ে দিয়েছিল, Coordinate with Planning Commission for inclusion of Macro Chapter on Child Development in the Fifth Five Year Plan of Bangladesh.

এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার। জাতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী উন্নয়ন বিষয়ক ইনপুট দেয়ার বিষয়টি ইউনিসেফ সাহায্যপুষ্ট মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পে আমিই অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। এর একটি বিশেষ কারণ ছিল। আমি ভেবেছিলাম এই প্রকল্পের মাধ্যমে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অনুশীলন করতে গিয়ে মহিলা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করার বিশেষ সুযোগ পাবেন। তখন এই মন্ত্রণালয়ে নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত উপকরণ তৈরি করার মতো দক্ষ লোকবল ছিল না বললেই চলে। তাই যখনই 'এই সময়টা' আসতো তখনই তারা ম্যাক্রো এবং মাইক্রো অধ্যায় লেখার জন্য বিশেষজ্ঞের খোঁজ শুরু করে দিতো। মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত কর্মসূচির মধ্যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরির কাজটা কিভাবে প্রাতিষ্ঠানিকরণ বা institutionalization করা যায়, তা আমাদের একটা ভাববার বিষয় ছিল। এই লক্ষ্যে ইউনিসেফ সাহায্যপুষ্ট এডভোকেসী প্রকল্পের কর্মসূচির মধ্যে এই কাজটি অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। যাহোক, এই প্রকল্পের জীবনকালে তা সম্ভবপর হয়নি। পরবর্তীতে কেনেডিয়ান সাহায্যপুষ্ট PLAGE (Policy, Leadership & Advocacy for Gender Equality) প্রকল্পের নিয়মিত কর্মসূচি হিসেবে এই কাজ সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টায় বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রস্তুতি পর্বের কথা। তখন গুল আফরুজ মাহবুব মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব। ১৯৯৭ এর মার্চ মাসের মাঝামাঝি। আমি ইউনিসেফ থেকে অবসর নিয়ে কয়েক মাস অতিক্রম করেছি মাত্র। ডেনিশ এম্বেসীর সাথে কনসালটেন্সি শুরু করেছি। Strengthening Planning Capability of the Ministry of Women Affairs প্রকল্পের টেকনিক্যাল এডভাইজার হিসেবে মোহসিনা ইসলামের সাথে কাজ করছিলাম। খুব সম্ভব এই ব্যাপারেই একদিন গুল আফরুজের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তার সাথে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। বোধকরি এই বন্ধুত্বের দাবিতে আফরুজ আমাকে বললো, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় 'নারী উন্নয়ন' ম্যাক্রো অধ্যায়ের খসড়া তৈরি করতে হবে। এই ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই।

আমি এই সুযোগটা ছাড়তে চাইলাম না। মনের সুপ্ত বাসনা, শিশু উন্নয়নও এর সঙ্গে যুক্ত করার উপায় বের করবো। আবার আমার একার পক্ষে এত বড় দায়িত্ব নেয়া সমীচীন মনে করলাম না। তাই তাকে বললাম, আমি এবং শিরীন হক, আমরা দু'জনে মিলে চেষ্টা করতে পারি। আফরুজ তড়িতকর্মা এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী। কালবিলম্ব না করে শিরীন এবং আমাকে নিয়ে আলোচনায় বসল এবং এক সপ্তাহের মধ্যে ম্যাক্রো অধ্যায়ের একটি প্রাথমিক খসড়া তৈরি করার জন্য অনুরোধ করলো। সে বললো, সময় নেই, তাই এই তাড়াহুড়ো। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি, এর জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ নেই। আমি তাতেই রাজী হয়ে গেলাম। আমি জানতাম শিরীনও এতে আপত্তি করবে না।

এরকম একটি জটিল কাজ সম্পন্ন করার জন্য শিরীন এবং আমি রাতদিন পরিশ্রম করলাম। প্রতিদিন ডানিডায় বসে অফিস শেষে কাজ করতাম। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য নারী উন্নয়নে মাইক্রো অধ্যায়ের প্রথম খসড়া তৈরি করেছিল মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে। এই অধ্যায়ের সংশোধিত খসড়া তৈরি করেছিল মহসিনা ইসলাম (ডানিডা) এবং ফরজানা নাইম (জেন্ডার কনসালটেন্ট, ইউ.এন.এফ.পি.এ)। তার ওপর ভিত্তি করে আমরা পরবর্তী খসড়া তৈরি করলাম। শিরীন কম্পিউটারে বসে টাইপ করতো এবং আমরা দু'জন একসঙ্গে বিষয়বস্তু তৈরি করতাম। এই খসড়া নিয়ে গুল আফরুজসহ মহিলা মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব আকমল হোসেনের সাথে আলোচনায় বসতাম। তিনি প্রতিটি পয়েন্ট পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করতেন। প্রত্যেকটা খসড়াতে তাঁর নিজের হাতের লেখা মন্তব্য থাকতো। তাঁর এই বিশ্লেষণ দক্ষতা দেখে আমরা দ্বিগুণভাবে অনুপ্রাণিত হতাম। তাঁর পরামর্শ মতো এই খসড়াকে পরিমার্জিত করতাম। এভাবে কয়েকটি খসড়া তৈরি করা হয়।

কথা প্রসঙ্গে একদিন আকমল হোসেনকে বললাম, আপনাদের মন্ত্রণালয়তো কেবল মহিলা বিষয়ক নয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক। সুতরাং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মহিলা উন্নয়ন এবং শিশু উন্নয়ন সম্পর্কে দু'টি পৃথক ম্যাক্রো অধ্যায় থাকা দরকার। উভয়ই ম্যাক্রো ইস্যুর অন্তর্ভুক্ত। আমার বক্তব্য শেষ হবার আগেই আকমল ভাই বললেন, অত্যন্ত সত্যি কথা। কিন্তু সময় নেই, আপনি একটা খসড়া তৈরি করে দেন। তাঁকে

আমরা আকমল ভাই বলেই সম্বোধন করতাম। আমি যখন সমাজকল্যাণ বিভাগের মাতৃকেন্দ্রে কাজ করি তখন (১৯৭৫/৭৬) থেকেই তাঁর সাথে পরিচয়।

ততোদিনে নারী উন্নয়ন অধ্যায়ের প্রায় অষ্টম পরিমার্জন হয়ে গেছে। এরপরের কাজগুলোর দায়িত্ব নিজে নিয়ে শিরীন আমাকে অনুরোধ করলো, শিশু উন্নয়নের কাজটা আপনিই করেন। এক মুহূর্তও নষ্ট না করে আমি ইউনিসেফ থেকে কাগজপত্র যোগার করলাম। সময় অত্যন্ত কম। এক সময় প্রাক্তন পরিকল্পনা মন্ত্রী মুয়ীন খানের নেতৃত্বে পারসপেকটিভ প্ল্যান তৈরি করা হয়েছিল। তাতে শিশু উন্নয়ন অধ্যায়ের খসড়াটাও আমি তৈরি করে দিয়েছিলাম। এই কারণে এত অল্প সময়ের মধ্যে এই কাজটা করার সাহস করলাম। এর মধ্যে ইয়ামীনের সাথে আলোচনা করলাম। সে খুব খুশি হয়ে আমাকে বললো, জওশন আপা, আমি জানতাম, আপনি যে কোনভাবে শিশু উন্নয়নকে ম্যাক্রো চ্যাপটার হিসেবে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ঢোকাবার একটা উপায় খুঁজে বের করবেন। তাকে সাথে নিয়ে ইউনিসেফের চারটি প্রধান প্রোগ্রাম সেকশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করে তাদের মতামত সংগ্রহ করলাম। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে প্ল্যানিং-এর ডেপুটি ডাইরেক্টর মখলেসুর রহমানের সাথে দেখা করলাম। সাত পৃষ্ঠার একটা প্রাথমিক খসড়া তৈরি করলাম। এটা নিয়ে সাবেক কেবিনেট সেক্রেটারি মুজিবুল হকের সাথে (ইউনিসেফের উপদেষ্টা) দেখা করলাম। তিনি একজন চমৎকার মানুষ। তাঁকে সম্পূর্ণ পটভূমি ব্যাখ্যা করলাম। কিসের জন্য এত তাড়াহুড়া তাও জানালাম। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। তাঁর বাসায় ফিরে যাওয়ার সময়। তবুও মন দিয়ে পুরো খসড়াটা পড়লেন। তাঁর ধৈর্যের কাছে মাথানত করতে হয়। কোন কাজে ঠেকে গেলে আমরা মুজিবুল হকের স্মরণাপন্ন হতাম। ইউনিসেফে থাকাকালীন তাঁর সাথে আমার প্রায়ই কাজ করতে হতো। সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট দলের সদস্য হিসেবে আমাকে অনেক জটিল কাজের দায়িত্ব দেয়া হতো। আমি কোন সময় 'না' করতাম না। জানতাম, আমাদের কোন সমস্যা হলে, মুজিবুল হক তো আছেনই। তাঁর পরামর্শ নিয়ে যে কোন কাজ করে ফেলতে পারতাম। সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর উপদেশ মতো কাজ করে আমরা প্রায়ই সফলকাম হয়েছি। তাঁকে শিশু উন্নয়ন ম্যাক্রো চ্যাপটারের খসড়াটা দেখালাম। তিনি কেবল দু'চারটা শব্দ পরিবর্তন করলেন, একটা বাক্য যোগ করলেন এবং বললেন, খুব ভাল হয়েছে। এটা মহিলা মন্ত্রণালয়কে দিতে পারেন।

এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটা আকমল ভাইকে জানালাম। তিনি পড়ে দেখে বললেন, তাঁর আর কোন বক্তব্য নেই। এটা পরিকল্পনা কমিশনে শিগগিরই পাঠিয়ে দেয়া দরকার। ওই সময় আকমল ভাইয়ের মতো ডাইনামিক সচিব না হলে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় 'শিশু উন্নয়ন ম্যাক্রো অধ্যায়' সম্পৃক্ত করা হতো না, এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে কাজলপ্রিয় বড়ুয়ার কাছে (যুগ্ম প্রধান জেনারেল ইকনমিকস ডিভিশন, পরিকল্পনা কমিশন) নারী ও শিশু উন্নয়ন খসড়া দু'টি অতি জরুরিভাবে বিশেষ বাহক মারফত পাঠানো হয়, নং-মশিবিম/সাঃ প্রঃ২/২৬-৯৬/১৭০, তারিখ; ১৫/০৪/৯৭। এর সঙ্গে যে চিঠি দেয়া হয় তাতে লেখা ছিল—

'দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৮ ভাগ শিশু হওয়ায় এবং অত্র মন্ত্রণালয় দেশের মহিলাদের পাশাপাশি শিশুদের উন্নয়নের বিষয় ও দায়িত্ব পালন করায় অত্র মন্ত্রণালয় মনে করে যে, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ডকুমেন্টে শিশুদের জন্যও আলাদা অঙ্গীকার থাকা প্রয়োজন। সে মোতাবেক প্রতিবেদনটিতে শিশু উন্নয়ন বিষয়ে একটি আলাদা অধ্যায় সংযুক্ত করা হইল এবং উহা ম্যাক্রো অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্তির জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হইল।' স্বাক্ষর তাপস কুমার রায়, সিনিয়র সহকারী সচিব।

এখানেই শেষ নয়। সময় কম বিধায় মন্ত্রণালয়ের চিঠির কপি নিয়ে বড়ুয়ার কাছে গেলাম এবং বার বার ফলো-আপ করলাম। বড়ুয়া বললেন, প্রথমে নারী-উন্নয়ন অনুমোদন হয়ে যাক। শিশু-উন্নয়নটা পরে পাঠাবো। আমি আর শিরীন পাল্টা যুক্তি দিয়ে বললাম, সেই 'পরে' আর কোনদিন হবে না। তখন তাঁকে অনুরোধ করে বললাম, দয়া করে দু'টো অধ্যায় একসাথে অনুমোদনের জন্য পাঠান। এ পর্যায়ে আমি একটু কৌতুকও করলাম। বড়ুয়া এবং আমার বাড়ি চট্টগ্রাম জেলায়। তাকে চাটগাঁয়ের আঞ্চলিক ভাষায় বললাম, এ কাজটা যদি না করেন তাহলে আপনার সাথে জীবনেও কথা বলবোনা। তিনিও আবার একই ভাষায় উত্তর দিলেন— আচ্ছা, আচ্ছা করবো। এভাবে হাস্যরসের ভেতর দিয়ে আমাদের কাজ অনেক অগ্রসর হলো। এই খসড়ার ওপর বড়ুয়া আবার মন্তব্য করে বললেন, শিগগিরই যেন প্রয়োজনীয় সংশোধন করে ফাইনাল ড্রাফট তার কাছে পাঠানো হয়।

এখানে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই। একদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ বড়ুয়া আমার বাসায় ফোন করে জানালেন পরদিন সকাল আটটায় পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. মহিউদ্দীন খান আলমগীরের সভাপতিত্বে মিটিং ডাকা হয়েছে। তাতে সকল ম্যাক্রো অধ্যায় আলোচনা হবে। আমরা যেন 'নারী উন্নয়ন এবং শিশু উন্নয়ন ম্যাক্রো অধ্যায়ের' ফাইনাল ড্রাফট এখনই তার কাছে পৌছে দিই। নইলে এ দু'টো বাদ পড়ে যাবে।

আমি ডানিডা থেকে বাসায় ফিরে বিশ্রাম করছিলাম। শিরীন তখনও অফিসে কাজ করছিল। সন্ধ্যা তখন প্রায় ছয়টা। আমি তৎক্ষণাৎ নিজের গাড়ি নিয়ে শিরীনের অফিসে চলে গেলাম। দারোয়ান জানালো শিরীন একটু আগে অফিস থেকে বের হয়ে কাছেই গুলশানে একটা মিটিংয়ে গেছে। ভাগ্যিস দারোয়ান সেই জায়গাটা চিনতো। তাকে গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে গেলাম। গাড়িতে বসে শিরীনকে একটা চিরকুট পাঠালাম। কালবিলম্ব না করে শিরীন মিটিং থেকে বের হয়ে এলো। দু'জনে ডানিডা অফিসে গেলাম। সেখান থেকে নারী উন্নয়নের ম্যাক্রো অধ্যায়ের ডিসকেটটা নেয়া হলো। শিশু উন্নয়নের ডিসকেট আমার কাছেই ছিল। দু'টো ডিসকেট নিয়ে শেরে বাংলা নগর প্ল্যানিং কমিশনে বড়ুয়ার অফিসে উপস্থিত হলাম। বড়ুয়া আমাদের হাতে ডিসকেট দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। শিরীন সেখানেই কম্পিউটারে বসে পড়লো। আমি পাশে বসে তাকে সহায়তা করলাম। প্রয়োজনমত সংশোধন এবং পরিমার্জন করে বড়ুয়ার হাতে নারী এবং শিশু উন্নয়ন-এর দু'টো ম্যাক্রো অধ্যায় তুলে দিয়ে আমরা বিদায় নিলাম। ততক্ষণে রাত প্রায় দশটা। শিরীনকে তার বাসায় ধানমন্ডি পৌছে দিয়ে আমি উত্তরার বাসায় ফিরলাম।

দু'দিন পর বড়ুয়া জানালো, কয়েকটা শব্দ পরিবর্তনসাপেক্ষে 'উন্নয়নে নারী' এবং 'শিশু উন্নয়ন' ম্যাক্রো অধ্যায়ের খসড়া দু'টি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন লাভ করেছে। এভাবে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিশু উন্নয়ন ম্যাক্রো অধ্যায় স্থান পায়।

একচল্লিশ বছর আগে সমাজকল্যাণ বিভাগে শহর সমাজকল্যাণ প্রকল্পে যেই উৎসাহ এবং কমিটমেন্ট নিয়ে যোগদান করেছিলাম তা আজো (২০০১) সজীব রাখতে চেষ্টা করি। পর্যায়ক্রমে নিজেকে শক্তিশালী করার সংগ্রামে কখনো সফল, আবার কখনো বিফল হয়েছি। কিন্তু পরিশ্রমের মূল্য পেয়েছি।

ইউনিসেফে ছয়জন কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভের সাথে

ইউনিসেফে সাড়ে সতেরো বছর কর্মজীবনে (১৯৭৯-১৯৯৬) আমি ডা. আরইউন, নীল বাট্, উফে কনিগ, এনথনি কেনেডি, কোল ডজ এবং রলফ কেরিয়ার– এই ছয়জন কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভের সাথে কাজ করেছি। প্রত্যেকের নিজস্ব কাজের স্টাইলের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য আমাকে বিশেষভাবে সহনশীল এবং অধ্যবসায়ী হতে হয়েছে। এছাড়া জো জাড, সেলী কেলক, বার্টি মেনডিজ এবং সরদ সাপরার কাছ থেকে প্রচুর কাজ শিখেছি। সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিমের একজন হিসেবে উল্লেখিত সকলের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে কাজ করেছি। একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে তারা সকলে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। কোন কোন সময় যে তাঁদের সঙ্গে মত বিরোধ হয় নি তা নয়। আবার সমঝোতার মাধ্যমে বিতর্কের অবসানও হতো। তিক্ততা পরিহার করে কিভাবে সমঝোতার মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে হয়, তা চাকরি জীবনে পদে পদে অনুভব করেছি। তাই সরকারি চাকরি এবং ইউনিসেফে যখনই এ ধরণের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি, ক্ষোভ প্রকাশ না করে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করেছি। যুক্তি-তর্ক-বুদ্ধি দিয়ে এবং বিনীত আচরণের মধ্য দিয়ে অপর পক্ষের মন জয় করেছি এবং প্রয়োজনীয় কাজও হাসিল করেছি। কখনো কখনো প্রতিপক্ষ এমন অনমনীয় হতো যে এসব কৌশল বা স্ট্রেটেজিতেও কাজ হাসিল করা সম্ভব হতোনা। তখন অসীম ধৈর্য ধরে সময়ক্ষেপণ করতে হতো। প্রতিপক্ষকে নিজের ভুল বোঝার জন্য সময় দিতাম।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। আমি যখন প্রোগ্রাম প্ল্যানিং-এ কাজ করি তখন একটি সেবামূলক আন্তর্জাতিক সংস্থার আওতায় বাংলাদেশের একটি বিশেষ শাখা থেকে ইউনিসেফের আর্থিক সাহায্য চেয়েছিল। প্রজেক্ট প্রপোজালটি বিরাট আকারে পাঠিয়েছিল এই সংস্থা প্রধান। তিনি আমাদের কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভের বন্ধু স্থানীয়। রিপ্রেজেনটেটিভ প্রস্তাবটা অনুমোদন করে আমাকে নির্দেশ দিলেন আমি যেন অনতিবিলম্বে এই সংস্থাকে আর্থিক সাহায্য দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু করি। প্রস্তাবটি বিশ্লেষণ করে দেখলাম ইউনিসেফের নিয়ম অনুযায়ী এটা গ্রহণ যোগ্য নয়। কিন্তু রিপ্রেজেনটেটিভ এই ব্যাপারে এতই একতরফা ছিলেন যে এর বিরুদ্ধে ঠিক সেই মুহূর্তে অনিয়মের প্রশ্ন তোলা প্রায় অসম্ভব ছিল। তাঁর পীড়াপীড়িতে ইউনিসেফের আওতার মধ্যে যে দু'একটি কর্মসূচি ছিল, সেগুলোর জন্য সামান্য আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। এ

ব্যাপারে আমার মতামতকে আরো সুদৃঢ় করার জন্য অন্য সেকশনের কয়েকজন কর্মকর্তাকে এর সাথে সংশ্লিষ্ট করলাম। তাদের মতামতও লিপিবদ্ধ করলাম। এর ওপর ভিত্তি করে অন্যান্য কর্মসূচিগুলোর বিস্তৃত ব্যাখ্যা চেয়ে সেই সংস্থাকে চিঠি দিলাম। লম্বা সময়সীমা দিলাম। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমরা রিপ্রেজেন্টেটিভকে এর নেতিবাচক দিকগুলো অবহিত করার সুযোগ নিলাম। এদিকে আরো একটি কাজ করলাম। প্রস্তাবটি আমার হস্তগত হওয়ার দিন থেকে সমস্ত আলোচনা উল্লেখ করে আমি একটি বিস্তারিত নোট তৈরি করলাম। এটা পেয়ে রিপ্রেজেনটেটিভ প্রথমে বেশ বিরক্তি প্রকাশ করলেন এবং কয়েকটা কঠোর উক্তিও করলেন। সরকারি ব্যুরোক্রেসি আমি ইউনিসেফে আমদানি করতে চেষ্টা করছি, এ ধরণের কথাও আমাকে শুনতে হয়। কিন্তু হার মানিনি। শুধু বললাম, আর একটু চিন্তা করার সময় দিন।

ধীরে ধীরে তিনি উপলব্ধি করলেন, এই ব্যাপারে আমিই সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছি। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে তিনি কয়েকবারই বলেছেন, জওশন আমাকে অনেক জটিল এবং অপ্রিয় পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য সবসময় সুপরামর্শ দিয়েছে। চাকরি জীবনে আমাকে এ ধরণের ঘটনার বহুবার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রায় সময়েই উত্তীর্ণ হয়েছি। এর প্রধান কারণ, যখনই এ ধরণের ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছি, তখনই এ সম্পর্কে নিজের ধারণাকে সুস্পষ্ট করতে চেষ্টা করেছি। অপরের কাছে যাতে এগুলো গ্রহণযোগ্য হয়, সেই লক্ষ্যে ঘটনার সত্যতাকে স্বচ্ছ বা ট্রান্সপ্যারেন্ট করে তুলে ধরেছি এবং এর ওপর যথেষ্ট হোম-ওয়ার্ক করেছি।

উফে কনিগ যখন বাংলাদেশে কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ হয়ে এলেন তখনকার একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। তখন বিজন শরীফ নামে একজন ইরানী ইনটিগ্রেটেড ব্যাসিক সার্ভিস সেকশনের প্রধান ছিলেন। তার ওপর দায়িত্ব দেয়া হয় নতুন রিপ্রেজেনটেটিভের ওরিয়েনটেশনের জন্য ফিল্ড ট্রিপের ব্যবস্থা করা। উফে কনিগ সব সেকশন প্রধানদের নিয়ে এই ট্রিপে যাবেন স্থির করলেন। বিজন শরীফ ফিল্ড ট্রিপের প্রোগ্রাম তৈরি করে একদিন সেকশন প্রধানদের মিটিংয়ে আলোচনা করলেন। দেখে বিস্মিত হলাম, সেই প্রোগ্রামের পুরো ট্রিপে সব সেকশন প্রধানদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমার নাম আছে কেবলমাত্র শেষ দিনে বিকেল চারটায় টাঙ্গাইলে গ্রামীণ ব্যাংক পরিদর্শনের সময়। অত্যন্ত হতাশ হলাম। মিটিংয়ে তৎক্ষণাৎ নিজের কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করে ধৈর্য ধরলাম। বহু চিন্তা করে স্ট্রেটেজি ঠিক করলাম কিভাবে এই অবস্থায় এগুনো যায়। উফে কনিগের সাথে পৃথকভাবে দেখা করে এই সম্পূর্ণ ট্রিপে আমার উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করলাম। তাঁকে বললাম, ইউনিসেফে নারী উন্নয়নকে যদি এভাবে পৃথক করে রাখা হয় তবে অন্যান্য কর্মসূচির সাথে কোনদিনই সম্পৃক্ত করা সম্ভব হবে না। নারী উন্নয়ন যে একটা আলাদা সেক্টর নয়, এর বিচরণ যে সর্বত্র, সেটা নিজেদের মধ্যে প্র্যাকটিস করা দরকার। তিনি আমার সব কথা শুনে বললেন, তোমার সঙ্গে আমি একমত। আমাদের ফিল্ড ট্রিপে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে। এই ট্রিপে শুধু নামে মাত্র গেলাম না,

Bhunati.com
Pioneer in village based website

নিজের গুরুত্ব বাড়াবার জন্য রিপ্রেজেনটেটিভের গাড়িতে করেই পুরো ট্রিপে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরলাম। যখনই সুযোগ পেলাম, তাঁকে এদেশে নারীদের অবস্থা সম্পর্কে ব্রিফ করলাম।

এরপর শুরু হয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের সঙ্গে রিপ্রেজেনটেটিভের ইনট্রোডাকটরি মিটিং। এই প্রোগ্রামেও মহিলা মন্ত্রণালয়ের সাথে কোন মিটিং স্থান পেল না। উল্লেখ্য, এই মন্ত্রণালয়ের সাথে তখনও ইউনিসেফের সহযোগিতায় কোন প্রকল্প ছিল না। তাই তাদের সাথে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগও ছিল না। অথচ এই সময় মহিলা মন্ত্রণালয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।

কোন আর্থিক সহযোগিতা না দিয়ে শূন্য হাতে নারী উন্নয়ন ইস্যুর ওপর এডভোকেসি করা তখন একেবারেই অসম্ভব ছিল (১৯৮১)। সরকারি মহল নয় এমনকি ইউনিসেফের মধ্যেও শুধু 'এডভাইজরী' ভূমিকা পালন করা খুব কঠিন ছিল। এইসব ব্যাপারে উফে কনিগের সাথে প্রথমে বিস্তারিত আলোচনা করলাম।

তখন মহিলা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ছিলেন তাসলীমা আবেদ। তাঁর সাথে দেখা করে মন্ত্রণালয় এবং মহিলা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট অফিসারদের নিয়ে মিটিং করা হলো। সিদ্ধান্ত হলো মহিলা অধিদপ্তরের অধীনস্ত শিশু-দিবা যত্ন কেন্দ্রের উন্নয়ন এবং অধিদপ্তরের সাথে নিবন্ধীকৃত এন.জিও গুলোর দিকনির্দেশনামূলক দুটি প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। এই সুযোগে আমি প্রস্তাব করলাম বাংলাদেশের নারীদের জন্য তথ্য সংগ্রহ করার ব্যাপারে সরকারি পর্যায়ে কোন প্রকল্প নেই। এই বিষয়ে একটি প্রকল্প হাতে নেয়া যায়। এই তিনটি প্রকল্পের সম্ভাবতা যাচাই করার জন্য আমি একটি দুই পৃষ্ঠার নোটও তৈরি করে দিলাম। তাতে লিখেছিলাম যদিও বাংলাদেশের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক (১৯৮০-১৯৮৫) পরিকল্পনায় [page-xviii-38, Serial No. 6(a)] মহিলা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি নারী উন্নয়নমূলক রিসার্চ ও ইনফরমেশন সেল এবং একটি ডাটা-ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার কথা, এ পর্যন্ত (১৯৮১) এই ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এই বিষয়ে অবিলম্বে কিছু কর্মসূচি শুরু করা দরকার।

নির্ধারিত দিনে তাসলীমা আবেদের সঙ্গে আমাদের রিপ্রেজেনটেটিভ মিটিংয়ে মিলিত হন। সাথে আমিও ছিলাম। অত্যন্ত উৎসাহিত বোধ করলাম, যখন দেখলাম তিনি সব ইস্যুগুলো এত স্পষ্টভাবে উফে কনিগের কাছে তুলে ধরলেন। আলোচনার একপর্যায়ে তিনি বললেন, আমাদের নারীদের অবস্থা সম্পর্কে যদি আমাদের স্বচ্ছ ধারণা না থাকে, তাহলে আমরা প্রায়রিটি ঠিক করতে পারবোনা এবং সঠিক পথে এগুতে পারবোনা। পূর্ব আলোচনাকে সামনে রেখে তিনি তিনটি প্রকল্পের প্রস্তাব করলেন। উফে কনিগ সবগুলোতে রাজী হয়ে গেলেন এবং আমাকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বললেন। অমি কালবিলম্ব না করে একটি Note for record লিখে রিপ্রেজেনটেটিভের কাছ থেকে সম্মতি নিয়ে নিলাম যাতে পরবর্তীতে কেউ দ্বিমত করতে না পারে। কারণ তখনও ইউনিসেফের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ওপর আমি পুরোপুরি আস্থা স্থাপন করতে পারিনি। Women's Development Unit এর ওপর তাদের উদাসীনতা তখনও বেশ প্রকট।

যাহোক, ইউনিসেফের পরবর্তী কান্ট্রি প্রোগ্রামে (১৯৮২ জুলাই-১৯৮৫ জুন) গ্রামীণ ব্যাংক ছাড়া Development of Day Care Services; NGO Community-based Services for Poor Women and Children; এবং Strengthening of Infromation Base for Women's Development— এই তিনটি নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হলো। এইভাবে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে ইউনিসেফের আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে প্রথমবারের মতো আমাদের সংযোগ-মিনিষ্ট্রি হিসেবে সকলের কাছে উপস্থিত করা হলো। ইউনিসেফের অভ্যন্তরে যারা পৃথক নারী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার বিরুদ্ধে ছিলেন, তারাও অগত্যা চুপ হয়ে গেলেন। এভাবে ইনফরমেশন বেইজ প্রকল্পের মাধ্যমে ইউনিসেফে নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় আনার সূত্রপাত হয়।

এনজিও উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার জন্যও আমাদেরকে প্রচুর বেগ পেতে হয়। এনজিওরা নিজস্ব গতিতে চলে। তাদের শক্তিশালী করার জন্য সরকারি প্রকল্প কেন? এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে বহুবার। আমাদের যুক্তি ছিল, এদেশে গ্রামে-গঞ্জে অসংখ্য ছোট ছোট এনজিও গঠন করে নারীরা তাদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য এগিয়ে এসেছে। এগুলোকে এনজিও না বলে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বলাই বাঞ্ছনীয়। সমাজ কল্যাণ বিভাগে চাকরিরত অবস্থায় পরিদর্শনকালে দেখেছি এসব প্রতিষ্ঠানগুলো নামে মাত্র টিকে আছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোন কোন দানশীল ব্যক্তির ছত্রছায়ায় তাদের অস্তিত্ব। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তরের (তখনো অধিদপ্তরে উন্নীত হয়নি) সাথে নিবন্ধীকৃত এবং নারীদের দ্বারা পরিচালিত কিছু প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলে একটি মডেল তৈরি করাই ছিল এনজিও কমিউনিটি বেইজড সার্ভিসেস প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য। নেতৃত্ব বিকাশ, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা, ব্যবহারিক শিক্ষা এবং ক্ষুদ্র ঋণ এই চারটি কর্মসূচির উপর ভিত্তি করে এই প্রকল্প পরিকল্পনা করা হয়। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, ছোট এনজিওগুলোর বেশিরভাগ— শুধু সেলাই শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কিন্তু কেবলমাত্র সেলাই প্রশিক্ষণের মধ্যে নারীকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। এই উপলব্ধি থেকে তাদের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধিকেই এই প্রকল্পের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

ওই সময় মহিলা পরিদপ্তরের সাথে নিবন্ধীকৃত ছিল প্রায় পাঁচশ'র মত এনজিও। প্রকল্পের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আমরা নির্বাচন করতে পারলাম মাত্র ছয়টি। এর কঠিন নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করতে গিয়ে আমি, মহিলা পরিদপ্তরের হোসনে আরা কাশেম, মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি সেক্রেটারি মাহমুদা খানম সপ্তাহব্যাপী পরিদর্শনে বের হয়েছিলাম। এই সময় বগুড়ায় আমাদের ইউনিসেফ কর্মকর্তা ছিলেন নূরুল ইসলাম। তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ দেখাতে। সকাল দশটার দিকে সেখানে পৌঁছলাম। একজন বোরখা পরা মহিলা তাদের সামনের উঠোনের এক কোণে ছোট্ট একটা টিনের ছাউনি দেয়া বাঁশের ঘরে আমাদের বসালেন। তাতে ছিল একটা নড়বড়ে টেবিল, দু'টো চেয়ার এবং একটা বসার বেঞ্চ। আমাদের বসতে দিয়ে বোরখা পরা মহিলা নিজের পরিচয় দিলেন। নাম হোসনে আরা। শিক্ষকতা

করেন। গ্রামের দরিদ্র মেয়েদের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে তারা সমিতি গঠন করেছেন। তার শ্বশুর এবং স্বামী তাকে এ কাজে সব সময় প্রেরণা দেন। শ্বশুর অনুপ্রাণিত হয়ে এই সমিতির জন্য একখণ্ড জমিও লেখাপড়া করে দিয়েছেন। তাতেই সমিতির জন্য বহু কষ্ট করে এই ঘরটি তৈরি করেছেন। হোসেন আরা বিষণ্ন ভাষায় বর্ণনা করলেন তার গ্রামের নারীদের দূরবস্থার কথা। তিনি চেষ্টা করে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান 'কেয়ার'-এর কাছ থেকে সামান্য সাহায্য নিয়ে সমিতির সদস্য নারীদেরকে কিছু প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা সব ভুলে যাচ্ছে। কারণ প্রশিক্ষণের পর তার কোন ফলোআপ করার সুযোগ পায়নি। এই বলে পাটের চটের ওপর অস্পষ্ট এমব্রয়ডারি করা একটা 'জায়নামাজ' দেখিয়ে বললেন, এটা আমার সমিতির সদস্যরা তৈরি করেছে। তাদের রোজগার করার কিছু ব্যবস্থা করে দেন। নতুবা সামনে এগিয়ে যাবার কোন উপায় নেই। তারা প্রশিক্ষণ নিয়ে ভিক্ষুকে পরিণত হোক এটা আমি চাই না। আপনাদের কাছে আর কিছু চাওয়ার নেই।

তার কথাগুলোর প্রতিধ্বনি এখনো আমার কানে বাজে। এই সমিতির জন্য কিছু করা যায় কিনা তার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করবো, একথা বলে আমরা বিদায় নিলাম।

প্রথম পর্যায়ে ছয়টি এনজিও'র মধ্যে ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘকেও নির্বাচন করা হল। মনে পড়ে, ক্ষুদ্র ঋণ তহবিল হিসেবে এই সমিতিকে প্রাথমিকভাবে ষাট হাজার টাকা অনুদান দেয়া হয়েছিল। এই অনুদানকে কিভাবে ঋণ হিসেবে বিতরণ করা এবং তা রিভলভিং ফাণ্ডে পরিণত করা যায়, তার ব্যবস্থাও নেয়া হল। কয়েকজন নেতৃস্থানীয় নারীকে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির পরিচালনা এবং সমিতির সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া হল। প্রত্যেকটি এনজিও থেকে কয়েকজনকে নেতৃত্ব বিকাশ অর্থাৎ লিডারশিপ প্রশিক্ষণ দেয়া হল। ব্যবহারিক শিক্ষার ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হল। সদস্যদের ঋণ দেয়ার কাজ শুরু করা হল। নূরুল ইসলাম স্থানীয় রিসিক, পাবলিক হেলথ অফিস এবং অন্যান্য সম্ভাবনাময় জায়গায় হোসনে আরাকে সংযোগ স্থাপন করার ব্যবস্থা করে দিল। সদস্যদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ যেন কাজে লাগাতে পারে সেজন্য এই পাড়ায় টিউব-ওয়েল বসানো হল। ক্রমে ক্রমে স্যানিটারি ল্যাট্রিন, পুষ্টিকর খাদ্য ও আয়োডিনযুক্ত লবণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা এবং তার সরবরাহের ব্যবস্থা করা হল।

বর্তমানে ঠেঙ্গামারা সবুজ সংঘ নারী ও শিশু উন্নয়ন কর্মসূচিতে মুখর। বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। সামান্য সহযোগিতা পেয়ে কিভাবে হোসনে আরা একটি কুঁড়ে ঘরকে অট্টালিকায় পরিণত করলো তা ভেবে বিস্মিত হই। শক্তিশালী নেতৃত্ব, কঠোর পরিশ্রম এবং দৃঢ় মনোবল থাকলে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। আজ ঠেঙ্গামারা মহিলা সমিতি, বগুড়া ছাড়িয়ে অনেক জেলায় বিস্তৃত। অভিনন্দন জানাই আমার স্নেহভাজন হোসনে আরাকে।

এই সময় বিশেষ নির্দেশনা এবং সাহায্য পেয়েছি আমার সুপারভাইজার জো জাডের কাছ থেকে। উল্লেখিত চারটি প্রকল্পের জন্য মোট তিন লাখ, একষট্টি হাজার চারশ' ডলারের বাজেট করা হয়। তার মধ্যে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্পের জন্য এক লাখ,

চৌচল্লিশ হাজার দু'শ ডলার এবং সবচেয়ে কম অঙ্ক অর্থাৎ ছাব্বিশ হাজার, চারশ ডলার বরাদ্দ করা হয়েছিল ইনফরমেশন বেইজ প্রকল্পের জন্য। এটাও অনেক কষ্ট করে রাখা হয়। কারণ এই টাকাও নারী উন্নয়ন বিষয়ক তথ্য সমৃদ্ধির জন্য আমরা খরচ করতে পারবো কিনা, এ ব্যাপারে অনেকে সন্দিহান ছিল। যাহোক, প্রথমবারের মতো নারী উন্নয়নের জন্য আমি একটা একান্ত তহবিল পেলাম। তার আগে রীনি জেরার্ড ইউনিসেফের ডেভেলপমেন্ট ফান্ড থেকে নারী উন্নয়নের কিছু কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। খালি হাতে আর নারীদের জন্য অকার্যকর এডভোকেসি করতে হবেনা ভেবে স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেললাম। বাংলাদেশের নারীদের সার্বিক অবস্থার ওপর একটি বই প্রকাশ করার জন্য ইনফরমেশন বেইজ প্রজেক্টে বিশেষ বরাদ্দ রাখা হলো এবং এটাকে একটি জরুরি কর্মসূচি হিসেবে চিহ্নিত করা হলো।

পরবর্তী কান্ট্রি প্রোগ্রামে (জুলাই ১৯৮৫ থেকে জুন ১৯৮৮) ইনফরমেশন বেইজ প্রজেক্ট বাদ দিয়ে বাকী তিনটা অর্থাৎ ডে-কেয়ার, এন.জি.ও এবং গ্রামীণ ব্যাংক প্রজেক্টে ইউনিসেফের সহযোগিতা দেয়া হয়। ১৯৮৮ জুলাই থেকে ১৯৯৩ জুন পর্যন্ত পাঁচ বছর মেয়াদি কান্ট্রি প্রোগ্রামে Advocacy, Awareness, Strengthening of Information Base for Women in Development (AASIB) নামে আবার একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এবং এই প্রকল্পকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। এতে বিশেষ কর্মসূচি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হলো : ১. সরকারি সংস্থা, ডোনার-এজেন্সি এবং এনজিওদের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং নেটওয়ার্কিং জোরদার করা; এবং ২. বাংলাদেশের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯০-১৯৯৫) তথ্য যোগান দেয়ার উদ্দেশ্যে নারী উন্নয়নের ওপর জাতীয় কর্মশালা করা। আমাদের তিন বছর মেয়াদি (১৯৮২-১৯৮৫) কান্ট্রি প্রোগ্রাম চলাকালীন যদিও উল্লেখিত কর্মসূচিগুলোর অনানুষ্ঠানিক সূত্রপাত, ১৯৮৮-১৯৯৩ কান্ট্রি প্রোগ্রামে এসেই প্রকৃত পক্ষে নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় আনার আনুষ্ঠানিক গোড়াপত্তন করা হয়। এই সময় চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী উন্নয়ন ম্যাক্রো অধ্যায় সংপৃক্ত করার কাজকে এগিয়ে নেয়া হয়। উইড এল.সি.জি সাব-গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে উইড ফোকাল পয়েন্ট করা হয়। গভর্নমেন্ট-ডোনার্স উইড টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। এই সব বিষয়ের ওপর আগে বিস্তারিত লিখেছি।

কোল ডজ ইউনিসেফের রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকাকালে (১৯৮৯-১৯৯১) আমাদের কর্মসূচি নতুন মোড় নেয়। তাঁর সময় বাংলাদেশের টিকাদান এবং ওরাল-রিহাইড্রেশন থেরাপি কর্মসূচির উন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়। টিকাদান কর্মসূচি প্রসারের ব্যাপারে ইউনিসেফের একজিকিউটিভ ডাইরেক্টর জেমস.পি.গ্রান্ট দু'বার বাংলাদেশে আসেন। এছাড়া জগৎখ্যাত ক্রিকেট প্লেয়ার ইমরান খান, সুবিখ্যাত জাপানি অভিনেত্রী কোরিওনাগী, ইউনিসেফের এসব গুডউইল এম্বেসেডারও বাংলাদেশে আসেন। আরো এসেছিলেন আমার প্রিয় চলচ্চিত্র অভিনেত্রী অড্রে হেপবার্ন। অকল্পনীয় হলেও সত্যি যে আমাদের অফিসে তাঁর সাথে মুখোমুখি এক টেবিলে বসে আলাপ-আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। চোখে মুখে তাঁর সারল্যের দীপ্তি। তাঁর শিশুসুলভ চাহনি এবং সুকোমল কণ্ঠস্বর বারবার আমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল My Fair Lady তে তাঁর

অভিনয়-নৈপুণ্যের কথা। টিকাদান কর্মসূচি প্রসারের জন্য আমাদের দেশের খ্যাতনামা শিল্পীরাও এগিয়ে এসেছিলেন এই আন্দোলনে। এর সাফল্যে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। আমাদের বরেণ্য শিল্পী আসাদুজ্জামান নূর-এর আন্তরিক প্রচেষ্টার কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। তাঁর অনেক মূল্যবান সময় এ কাজের জন্য ব্যয় করেন। কবরী সারোয়ারও আমাদের সঙ্গে আনন্দের সাথে অংশগ্রহণ করেন টিকাদান কর্মসূচি এগিয়ে নেয়ার কাজে। টিকাদান, ওরাল-রিহাইড্রেসন থেরাপি ইত্যাদি কর্মসূচির প্রসারে জেমস গ্রান্টের বাংলাদেশ পরিদর্শন বিশেষ গতিবেগ সঞ্চার করে। মনে পড়ে এ ব্যাপারে তিনি ভোর ছয়টা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত অবিরাম কাজ করতেন। বক্তৃতা দেয়ার সময় তাঁর পকেট থেকে টিকাদান কর্মসূচির লোগো এবং ও.আর.এস এর প্যাকেট বের করে দেখাতেন। শুনেছি, এগুলো নাকি সবসময় তাঁর পকেটে থাকতো। কথা বলার সময় তাঁর অঙ্গীকারের দৃঢ়তা ফুটে ওঠে। এমন ব্যক্তিত্ব দেখলেই শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। তাঁর সব কথা আমাদের রিপ্রেজেনটেটিভ কোল ডজকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করতে দেখেছি। তিনি আমাদের মধ্যেও এই উদ্দীপনার সঞ্চার করেন। আমরা নতুন উৎসাহে জেগে উঠি।

কোল ডজের কাছ থেকে যে প্রেরণা পেয়েছি তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। তিনি প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে নারী উন্নয়নকে ধাক্কা দিয়ে যেভাবে উপরে উঠিয়ে দেন তেমনি ইউনিসেফে নারী স্টাফদের অবস্থানকেও বিশেষভাবে উন্নীত করেন। সিনিয়র মেনেজমেন্টের সঙ্গে প্রথমবারের মতো তিনি আমাকে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করেন। কোল ডজ ইউনিসেফে নারী-সহায়ক এবং নারীর জন্য মর্যাদা সম্পন্ন যে পরিবেশ সৃষ্টি করেন তা কোন মাপকাঠিতে পরিমাপ করা যায় না। তার উৎসাহে কর্মকর্তাদের জন্য ইউনিসেফে জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করি। এই ট্রেনিংয়ে ছিলেন ODA-এর মাধ্যমে লন্ডন থেকে আগত দু'জন নারী প্রশিক্ষক। বোধকরি ইউ.এন ষ্টাফদের জন্য ঢাকায় অনুষ্ঠিত এটাই সর্বপ্রথম জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং, যদিও গুণগত দিক থেকে এই প্রশিক্ষণ অত্যন্ত দুর্বল ছিল। কিন্তু তখনই শুরু না করলে এই কর্মসূচিটি হয়তো আর বাস্তবায়িত হতো না। পরবর্তীতে WiD LCG sub-Group এর তরফ থেকে ডানিডার শিরীন হক নারী উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে সংশ্লিষ্ট দাতাসংস্থার কর্মকর্তা এবং সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য একটি উচ্চমানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল। এতে আমিও অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। এই ট্রেনিংয়ের উচ্চমান দেখে আমি অত্যন্ত উৎসাহিত বোধ করলাম। বিশেষ করে এই কারণে ইউনিসেফের সকল অফিসারদের জন্য দ্বিতীয়বারের মতো ২৪ আগস্ট থেকে ৫ সেপ্টেম্বর (১৯৯২), হোটেল সোনারগাঁয়ে জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করলাম। প্রথম ট্রেনিং বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি বলে আমার মনে বেশ দুঃখ ছিল। তাই সবরকম প্রচেষ্টা নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো এই ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করলাম। এতে ইউনিসেফের প্রায় ছত্রিশ জন অফিসার অংশগ্রহণ করেছিলেন। শান্তি দাইরিয়াম, প্রফেসর মাহমুদা ইসলাম এবং শিরীন হক প্রশিক্ষক হিসেবে কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে এ দায়িত্ব পালন করেন। এই সময় ইউনিসেফের রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিলেন রলফ কেরিয়ার।

Shumati.com
Pioneer in village based website

তিনি এই প্রশিক্ষণের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করলেও কিছু কিছু অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এর অভাব লক্ষ্য করে সেদিন হতাশ হয়েছিলাম। জেন্ডার ইস্যুগুলো যে নারী পুরুষ সকলের জন্য প্রযোজ্য তা সবাইকে বুঝানো আসলে খুবই কঠিন।

১৯৯২ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত জাগুয়াগ-এর (Joint Government Unicef Advisory Group) চেয়ারম্যান ছিলেন এম. মোকাম্মেল হক। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর সদস্যের (প্ল্যানিং কমিশন) পদাধিকার বলে তিনি জাগুয়াগের চেয়ারম্যান। নিয়ম অনুযায়ী প্রতিবছর জাগুয়াগের দু'টো করে মিটিং হতো। সেখানে ইউনিসেফের রিপ্রেজেন্টেটিভ, সব সেকশন প্রধান এবং প্রয়োজনীয় কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকতেন। সরকারের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণও উপস্থিত থাকতেন। এই মিটিংয়ে ইউনিসেফ সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং পরবর্তী ছয় মাসের কার্যক্রম উপস্থাপন করা হতো। মোকাম্মেল হক জাগুয়াগের মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করতেন। যে কোন সমস্যার ত্বরিত সমাধান দেয়ায় তাঁর অপূর্ব ক্ষমতা। যে সকল ইস্যু পরবর্তীতে ফলো-আপ করার প্রয়োজন হতো সেগুলোর ওপর তিনি তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তাঁর স্মৃতিশক্তি কম্পিউটারের মতো। তাঁকে ফাঁকি দিয়ে নিশ্চুপ থাকা চলতো না।

মোকাম্মেল হক প্ল্যানিং কমিশনে থাকাকালীন আমরা ইউ.এন.এর টুয়েন্টি-টুয়েন্টি (২০/২০) ভিশনের ওপর খুব গুরুত্ব সহকারে চিন্তা ভাবনা করছিলাম। এই সময় আমাদের রিপ্রেজেনটেটিভ রল্‌ফ কেরিয়ার প্রায়ই এই ব্যাপারে তাঁর সাথে আলোচনা করতেন। এই ভিশনের সারমর্ম ছিল দাতাগোষ্ঠীরা অর্থাৎ উন্নত দেশসমূহ তাদের অফিসিয়েল ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স-এর বিশ পারসেন্ট অনুদান হিসেবে সোস্যাল সেক্টরের জন্য বরাদ্দ করবে। এর সাথে ম্যাচ করে রিসিপিয়েন্ট কান্ট্রিও তাদের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের বিশ পারসেন্ট সোস্যাল সেক্টরের জন্য বরাদ্দ করবে। এই ব্যাপারে আমাদের সাপ্তাহিক সেকশন প্রধানদের মিটিংয়ে নিয়মিত আলোচনা হতো। এই মিটিংয়ে একদিন রল্‌ফ কেরিয়ার বললেন, মোকাম্মেল বাংলাদেশের সোস্যাল সেক্টরে বরাদ্দ বাড়াবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। বহুদিন ধরে আমাদের উন্নয়ন বাজেটে এই সেক্টরের জন্য গতানুগতিক বরাদ্দ ছিল মাত্র নয় থেকে এগারো পারসেন্ট। শুনেছিলাম মোকাম্মেল হকের প্রচেষ্টায় এই বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯২ সালের জুন মাসে চৌদ্দ পারসেন্ট, ১৯৯৩ সালে চব্বিশ পারসেন্ট এবং ১৯৯৪ সালে বত্রিশ পারসেন্টে উন্নীত হয়। উল্লেখ্য, ওই সময়ে বাংলাদেশের এই বরাদ্দ এশিয়ার সকল উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে ছিল সর্বোচ্চ। মনে মনে গর্ববোধ করেছিলাম, অন্তত একটি বিষয়ে হলেও আমরা তাদের চেয়ে এগিয়ে আছি।

তাঁর সাথে আমার স্বামীর পরিচয় বহু বছর আগে। যখন মোকাম্মেল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। তাঁর একমাত্র বড় বোনের বিয়ে হয়েছিল চট্টগ্রামে। এই সুবাদে তাঁর সাথে আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং পরবর্তীতে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

Pioneer in village based website

ইউনিসেফের নারী উন্নয়ন ইউনিটে কাজ করার সময় দীর্ঘদিন ধরে যারা আমাকে ছায়ার মতো সঙ্গ দিয়েছে তারা হলো আফরীন হক, মাহেরা খাতুন, কিকো নিশিনো, মুনিরা নাইম, আব্দুল আউয়াল, লায়লা করিম, মেহেরুন্নেসা এবং পলিনা। মাহেরা ছিল আমার ডান হাতের মতো। সে আমার সঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করেছে। সে অত্যন্ত কর্মঠ, এবং কর্তব্যপরায়ণ। তাকে যেকোন দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতাম। স্পষ্টবাদী মাহেরা নারী উন্নয়ন কর্মসূচিতে থাকতে মাঝে মাঝে গঠনমূলক সমালোচনা করে আমাকে শক্তিশালী করেছে। মুনিরার গবেষণামূলক অভিজ্ঞতা আমার কাজকে সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়া বড় বোনের মতো শ্রদ্ধাভরে যারা আমাকে আপা বলে ডাকতো এবং বিভিন্নভাবে সাহায্য করতো, তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করতে চাই। কামাল, পারভেজ, আফসান, শামসুদ্দীন, ফজলু, আজাদ, আজিজ, শারিফ, তৌফিক, এস এস আলম, নূরুল, শফিক, ডা. মোস্তফা, এ.টি. সিদ্দিকী, সেলিম, মীরা এবং ডা. ইয়াসমীনের কথা সবসময় মনে পড়ে। যদিও তারা অন্য সেকশনে কাজ করতো, আমার সঙ্গে তাদের আন্তরিক সম্পর্ক ছিল।

১৯৯৩-এর মাঝামাঝি থেকে ১৯৯৫-র ডিসেম্বর পর্যন্ত দুই বছরের কান্ট্রি প্রোগ্রামে Advocacy, Awareness and Strengthening of Information Base for Women in Development এবং Social Development for Grameen Bank Women Members, এই দু'টো প্রজেক্টে ইউনিসেফের সাহায্য দেয়া হয়। এডভোকেসি প্রজেক্টে অন্তর্ভুক্ত ছিল বিভিন্ন স্তরের সরকারি অফিসারদের জন্য জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং, তথ্য সমৃদ্ধি, রিসার্চ, নেটওয়ার্কিং, বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উপাত্ত সরবরাহ, জাতীয়ভাবে নারী উন্নয়ন কর্মসূচির মনিটরিং ইত্যাদি।

Pioneering village based website

১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর জাতিসংঘ CEDAW, বাংলাদেশ অনুমোদন করে স্বাক্ষর করে এবং এর মাধ্যমে সরকার এর বাস্তবায়ন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। খুব সম্ভব ১৯৯৩ সালে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদের (CEDAW) বাংলা অনুবাদ করালাম। সিডও-এর এই বাংলা অনুবাদ নিয়ে ছোট একটি পকেট-সাইজ পুস্তিকা তৈরি করা হলো। অনুবাদ করেছিলেন মোতাহারুল হক। প্রথম সংস্করণ পনের হাজার কপি, ইউনিসেফের নারী-উন্নয়ন ইউনিট থেকে ছাপিয়েছিলাম। এগুলো ব্যাপকভাবে বিতরণ করা হয়। বাংলা সংস্করণ করেছিলাম যেন প্রত্যেকের পকেটে অথবা ব্যাগে এই পুস্তিকার কপি সবসময় থাকে। সকল পর্যায়ের মানুষ যেন এই সনদের সব কয়টি ধারা অনুধাবন করতে পারে এবং ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে তা বাস্তবায়িত করার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়। পরবর্তীতে এর পুনর্মুদ্রণ হয় আমি অবসর গ্রহণ করার পর ইউনিসেফ সাহায্যপুষ্ট মহিলা উন্নয়নে সচেতনতা বৃদ্ধি ও তথ্য সমৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে।

এই কান্ট্রি প্রোগ্রাম ভালভাবে চালু হওয়ার আগেই আমি নারী উন্নয়ন থেকে চলে এলাম প্রোগ্রাম প্ল্যানিং-এর প্রধান হিসেবে। এখানে এসে নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্তায়ণের অধিকতর সুযোগ পেলাম। জেন্ডার ইস্যুগুলোকে ইউনিসেফ সাহায্যপুষ্ট সব সেক্টরের প্রকল্পের মধ্যে আরো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেলাম। এই সময় আমাদের

সিনিয়র প্রোগ্রাম প্ল্যানিং অফিসার সরদ সাপরা আমাকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করেন। প্রোগ্রাম প্ল্যানিংয়ে যাওয়ার পর ইয়ামীন মজুমদার আমার সাথে কয়েক বছর কাজ করেছে। ইয়ামীনের বিনয়ীভাব এবং ভদ্র ব্যবহার যে কোন লোককে হার মানাতে পারে। তাকে নীরব কর্মী বলা যায়। যেকোন কাজ নিঃশব্দে সম্পন্ন করার দক্ষতাও ছিল তার। এই সময় ইরশাদ খান আমাকে প্রতিনিয়ত সাহায্য করে।

শূন্য থেকে শুরু করে ইউনিসেফে নারী উন্নয়নকে এই পর্যায়ে আনতে আমাকে যতখানি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছি আত্ম-তৃপ্তি। এটা আমার জন্য বিরাট পাওয়া। এই লেখাটিকে একটি প্রতিবেদন মনে হতে পারে। রীনি জেরার্ডের উত্তরসূরী হিসেবে অনেক উত্থান-পতনের মধ্যদিয়ে কিভাবে নারী উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশীদার হলাম, তার ইতিহাস বলার প্রয়োজনের তাগিদ থেকে এই লেখাটি উপস্থাপন করলাম।

ইউনিসেফ থেকে অবসর গ্রহণ

সাড়ে সতেরো বছর কর্মজীবন শেষে ইউনিসেফ থেকে অবসর গ্রহণ করলাম ১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাসে। তার আগে সমাজকল্যাণ বিভাগে কাজ করেছি আরো সাড়ে আঠারো বছর। অবসর গ্রহণের প্রক্রিয়া অত্যন্ত বেদনাদায়ক। ভাগ্যিস ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় (১৯৬৪-১৯৬৫) Preparation for Retirement বলে একটা প্রবন্ধ আমাদের পাঠ্যসূচিতে ছিল। তাতে পড়েছিলাম যারা চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে তাদের দু'বছর আগে থেকে কিভাবে মানসিক প্রস্তুতি নিতে হয়, যেন অবসরপ্রাপ্ত জীবনে তাদের মানসিক বিপর্যয় না ঘটে।

এই কথাগুলো অনেকদিন ধরে আমার মনের মধ্যে ঝড় তুলছিল। আমার নিজের অবসর গ্রহণের কথা যখনি মনে হয়েছে, তখনই মনের গভীরে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছি। কিন্তু জানতে দিইনি কাউকেও। তবে সেই প্রবন্ধটি আমাকে খুবই সাহায্য করেছে এই বিষণ্ন অবস্থা থেকে নিজেকে উত্তীর্ণ হতে। তাই দু'বছর আগে থেকে আমি মনে মনে প্রস্তুতি নিয়েছি। নিজে সচেতনভাবে সকলের কাছে বারবার বলেছি আমার অবসর গ্রহণের কথা। ঢাকা শহরে যারা আমাকে চেনে বোধকরি সকলেই জেনেছিল এই খবর। আসলে আমার নিজের মানসিক প্রস্তুতির জন্যই এই প্রচেষ্টা। শেষের দিকে যখন রাজেন্দ্রপুর ব্র্যাক সেন্টারে ইউনিসেফের প্ল্যানিং এন্ড রিভিউ কমিটির মিটিংয়ে বসতাম, তখন সভাপতি হিসেবে আমি শেষ কথা বলতাম, এটাই আমার সর্বশেষ মিটিং। একথা বলতে গেলেই আমার গলার স্বর ধরে আসতো। আমাদের রিপ্রেজেনটেটিভ রলফ কেরিয়ার ঠাট্টা করে বলতেন, তুমি ছাড়লেও ইউনিসেফ তোমাকে ছাড়বেনা। পরবর্তীতে তাঁরা আমাকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে যুক্ত করেন। ওই সময়ে তাঁদের এই উদারতা আমার মানসিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ভীষণভাবে সাহায্য করে।

অবশেষে সেই দিনটির মুখাপেক্ষী হলাম। ৩১শে অক্টোবর। সকাল ৮টা ৩০ মিনিট। ইউনিসেফের ছয় তলায় জেমস পি গ্রান্ট কনফারেন্স হলে সকলে মিলিত হলাম।



দিল্লীতে কমনওয়েলথ সম্মেলন, ১৯৭৭

Chunati.com
Pioneer in village based website



নাইরোবীতে: বিশ্ব নারী সম্মেলনে (১৯৮৫) ইউনিসেফ আয়োজিত সভায় আলোচনারত, টেবিলে রাখা নারীর অবস্থানের উপর সমাজ কল্যাণ ও মহিলা মন্ত্রণালয়ের প্রথম প্রকাশনা



উইমেন ফর উইমেন আয়োজিত চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার প্রস্তুতিমূলক 'নারী ও জাতীয় পরিকল্পনা' কর্মশালায় মাইকের সামনে আলোচনারত আমি, উপবিষ্ট বাম দিকে থেকে ড. হামিদা হোসেন, ড. খলিকুজ্জামান, ১৬ অক্টোবর ১৯৮৯

Chunati.com
Pioneer in village based website



বাম দিক থেকে প্রফেসর ইউনূস, আমি, ইউ. এন.-এর স্থায়ী প্রতিনিধি আনোয়ারুল করিম চৌধুরী, ইউনিসেফের শুভেচ্ছা দূত কোরিওনাগী (জাপানী নাগরিক), কুরিয়ার সম্পাদক এনায়েতউল্লা খান



হাওয়াই ইস্ট-ওয়েস্ট সেন্টারে শিক্ষকদের সাথে, আমার ডান পাশে ড. ইকলস্, ১৯৭৫

Chunati.com
Pioneer in village based website



এসকাপ পপুলেশন কমিটি মিটিং-এ বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্য
আমার পাশে ড. এম. এ. সাত্তার এবং তাহরুন্নেসা আবদুল্লাহ, ব্যাংকক ১৯৭৬



বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ম্যাকনামারার ছনকা মাতৃকেন্দ্র পরিদর্শন, ১৯৭৬
বাম দিক থেকে ম্যাকনামারা ও তৎকালীন অর্থমন্ত্রী এম. এন. হুদার সাথে আমি

Pioneer in village based website



আমার পাশে মিসেস ম্যাকনামারা, মাতৃকেন্দ্র পরিদর্শন করছেন, ১৯৭৬



জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং-এর উদ্বোধন, ইউনিসেফ প্রতিনিধি রলফ্ কেরিয়ার এর সাথে, হোটেল সোনারগাঁও, ২৪ আগষ্ট ১৯৯২

Chunati.com
Pioneer in village based website



টোকিওর আশাকুশা এলাকায় ইয়োকো আবের সাথে



ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী ও শিরিন হকের সাথে

Chunati.com
Pioneering village based website



SYNOD RECEPTION AT BISHOPS COURT.— Photographs taken yesterday. The Rev. D. M. Taylor (General Secretary of the National Council of Churches), Mrs Jowshan Rahman (a welfare worker from Pakistan), Miss S. Monaghan (Christchurch), gcnd Mrs J. Morrison (Christchurch).

আমি যখন নিউজিল্যান্ডে



ইউনিসেফের প্রতিনিধির বাসায় আমি, মেরিলীন ডজ এবং ফজলে হাসান আবেদের সাথে

Chunati.com
Pioneer in village based website



আমার বাম পাশে ইউনিসেফের এক্সেকিউটিভ ডাইরেক্টর জেম্‌স্ পি. গ্রান্ট
ডান পাশে বাংলাদেশের ইউনিসেফ প্রতিনিধি কোল পি. ডজ



চট্টগ্রাম, হোটেল আগ্রাবাদে ইউনিসেফ ওয়ার্কশপ, বাম দিক থেকে ইউনিসেফ প্রতিনিধি কোল পি. ডজ, ড. মীজানূর রহমান শেলী এবং আমি

Chunati.com
Pioneer in village based website



উ. এম. ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট ড. টিম ওয়ার্ম, গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ ইউনূস, প্রাক্তন তত্ত্বধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রোকেয়া এ. রহমান -এর সাথে হোটেল শেরাটনে


Pioneer in village based website